আপনি ও আপনার ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্বের স্বরূপ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের পথ-নির্দেশ

ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়

কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
কলকাতা

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৪

প্রকাশক ঃ কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী
২৮৬ বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০১২।
টাইপসেটিং ঃ অভিনব মুদ্রণ
৭২ শরৎ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০৬৫।
মুদ্রক ঃ কমার্সিয়াল প্রেস সার্ভিস
৪৫ মলাঙ্গা লেন, কলকাতা-৭০০০১২।

বিশিষ্ট চিকিৎসক দম্পতি

প্রফেসর ডি. কে. রায়

এম ডি, এফ.আর.সি.পি

ও

ডাঃ শ্রীমতী ঊর্মিলা রায়

এম.বি.বি.এস (ক্যাল) ডি.এ. (লন্ডন)

বহু সুখ দুঃখের ফেলে আসা বছরগুলি স্মরণে

এই লেখকের আত্মবিকাশ গ্রন্থমালা

হতাশ হবেন না (১ম) (হতাশার উর্ধ্বে জীবনবাদ প্রতিষ্ঠার বই।)
হতাশ হবেন না (২য়) (ব্যক্তিগত জীবনে অবসাদ ও মনোবেদনা দূর কবার উপায়।)
হতাশ হবেন না (৩য়) (দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি।)
হতাশ হবেন না (৪র্থ) (অশান্তি থেকে মুক্তি।)
হতাশ হবেন না (৫ম) (কর্ম জীবনে অশান্তি থেকে মুক্তি ও কর্মদক্ষতা অর্জন।)
হতাশ হবেন না (৬ষ্ঠ) (পরিপূর্ণ জীবনের পথ নির্দেশ।)
কেমন করে মানুষ চিনবেন? (মানুষ চেনার ওপর নতুন ধরণের বই।)
কেমন করে বাস্তববাদী হবেন? (বাস্তবজীবনে চলার অমোঘ পথ নির্দেশ।)
যারা বড় হতে চাও (বড় হওয়ার পথ নির্দেশ। প্রতিটি কিশোর কিশোরীর অবশ্য পাঠ্য।)
হতাশ হইনি (১ম)

সাহিত্য গ্রন্থ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ : শেষ অমৃত
নির্বাচিত সরস গল্প
ভৌতিক অমনিবাস (লেখকের সমগ্র ভৌতিক ও অলৌকিক গল্প সংকলন)
রাশি রাশি হাসি (ছোটদের হাসির গল্প)

প্রকাশিতব্য গ্রন্থ

কেমন করে আত্মবিশ্বাস বাড়াবেন?
আপনি ও আপনাদের সন্তান
হতাশ হইনি (২য়)

লেখকের কথা

কিছুকাল আগে কেমন করে মানুষ চিনবেন নামে একটি বই লিখেছিলাম। অল্পদিনের মধ্যেই বইটির তিনটি সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। বইটির জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয় প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিসত্তা সম্পর্কে জানার আগ্রহ অপরিসীম। তাই ব্যক্তি ও ব্যক্তিসত্তার স্বরূপ নিয়ে আরও বিস্তারিত একটি বই পাঠককে উপহার দেবার জন্য গত দু বছর ধরেই প্রস্তুতি চালিয়ে আসছি। অবশেষে 'আপনি ও আপনাব ব্যক্তিত্ব' বইটি প্রকাশিত হল।

বই এর নামকরণ দেখেই পাঠক বুঝতে পারছেন এই বই-এর মুখ্য বিষয় ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব বলতে কী বুঝি এবং তা অর্জনের জন্য আমাদের কতটা সচেতন চেষ্টা দবকার সে বিষয়ে এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা ও দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠে এক সতেজ সুস্থ ব্যক্তিত্ব অর্জনের চাবি কাঠি এই বইতে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ব্যক্তিত্ব মনস্তত্ত্বের বিষয় সেকারণে ব্যক্তিত্ব নিয়ে যে নানা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত আছে তাব আলোচনা এই বইতে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে পড়েছে। তবে যেহেতু ব্যক্তিত্ব নিয়ে ইতিপূর্বে কোন বাংলা বই আমার চোখে পড়েনি সেজন্য মনস্তত্ত্বের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে আমি সাধারণ পাঠকের বোঝার মত করে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেছি। ব্যাখ্যা করতে হয়েছে যথেষ্ট হালকা চালে যাতে পাঠকের কোথাও ক্লান্তি না জাগে। মনস্তত্ত্ব এমন একটি বিষয় যার উপজীব্য মানুষ—শরীরী ও সচেতন মানুষ যে মানুষের একটি মন আছে পরিবেশ ও মনের পারস্পরিক প্রভাবে মানুষের ব্যক্তিত্বের অনেকটাই তৈরি হয়। এই ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শৈশব থেকে যাতে সন্তানের সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে তারই নির্দেশনা থাকবে এই বইতে।

মানুষের প্রত্যক্ষ উপকারের জন্য গত ১৭ বছর ধরে লিখে চলেছি আত্মবিকাশ গ্রন্থমালা যার শুরু হতাশ হবেন না ১ম খণ্ড দিয়ে। শেষ? না এই পর্যায়ের বই-এর কোন শেষ নেই। যতদিন আমার লেখার শক্তি থাকবে, প্রকাশকের ছাপাব ইচ্ছা ও পাঠকদের আগ্রহ থাকবে তত দিন এই সিরিজের একটি বা একাধিক বই প্রতিবছর পাঠকদের উপহার দিয়ে যাবো। কারণ আত্মবিকাশ গ্রন্থমালার মাধ্যমে মানুষের বৌদ্ধিক ও ভাবগত জাগরণের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার জন্যই এই বই। জীবনকে ইতিবাচক করে তোলার জন্যই আমার যাবতীয় বই এর পরিকল্পনা। আপনারা যখন No এব অর্থ করেন-'না'। আমি তখন অর্থ করি, New Opportunity—নতুন সুযোগ। তাই মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে। ব্যক্তিত্বকে নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের হাত থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায় তার পথনির্দেশও এই বইতে আছে।

আপনি ও আপনার ব্যক্তিত্ব মোট তিনটি পর্যায়ে সম্পূর্ণ হবে। এর পরে প্রকাশিত হবে কেমন করে আত্মবিশ্বাস বাড়াবেন। তৃতীয় পর্যায়ে প্রকাশিত হবে আপনি ও আপনার সন্তান। এই তিনটি বই এর উদ্দেশ্য এক, যে কোন মানুষ তার ব্যক্তিত্বের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে পারে এবং সে যদি তার ব্যক্তিসত্তা তথা ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অবহিত হয় তাহলে সে চেষ্টা করে নিজের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ অসৎ সৎ হতে পারে, দুর্বল সবল হতে পারে, মূর্খ বিদ্বান হতে পারে। অলস তৎপর হতে পারে। গরিব সচ্ছল হতে পারে।

প্রতিটি মানুষের প্রথম চেষ্টা হওয়া উচিত নিজেকে জানা। তার ব্যক্তিসত্তার উপলব্ধি। তার অন্তরের আইডেনটিটি। জাতপাত, ধর্ম-ভাষা ও টাকা-পয়সার খানদান নয়। আমি কে? আমার শক্তি কতটুকু? আমি কতদূর যেতে পারি? আমি কীভাবে আমার ভাবমূর্তিকে উজ্বল করতে পারি? কীভাবে আত্মবিশ্বাস বাড়াতে পারি? এই সব কিছু প্রশ্নের উত্তর নিয়ে আপনি ও আপনার ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হল। শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত মানুষের বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্ব যেভাবে বিকশিত হয় তাকে নিয়ন্ত্রিত করার পদ্ধতিটা কী সেটি নিয়েই এই বই। ইংরেজিতে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ওপর যে সব উল্লেখযোগ্য বই রয়েছে তা থেকেও বহু উদ্ধৃতি এই বইতে দেওয়া হয়েছে শুধু এটা বোঝানোর জন্য যে এই বইতে আমার মনগড়া কোন তত্ত্ব প্রকাশ করতে চাইনি। স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলিকে বিশ্লেষণ করে সুব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার সপক্ষে একটি চেতনা নির্মাণের চেষ্টা করেছি মাত্র। চাকরি বাকরির ক্ষেত্রে যখন নিয়োগকর্তা ঝাড়াই-বাছাই করেন তখন সবশেষে তাঁরা প্রার্থীর ব্যক্তিত্ব যাচাই করে নেন। এখানে যদিও ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তি অন্য; তবু সচেতনতার অভাবে অনেকেই নিজের ভাবমূর্তি বদলাতে পারেন না। যার ফলে অনেক ভালভাল ছাত্রছাত্রীই ব্যক্তিত্বের পরীক্ষায় পিছিয়ে পড়েন।

বিদেশে এখন ব্যক্তিত্ব গঠনের জন্য বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা ও পাঠক্রম চালু আছে। এর ওপর অসংখ্য অডিও ও ভিডিও ক্যাসেট বেরিয়েছে। এই তিনটি বই মিলে একটি অখণ্ড ধারণাকে পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে চাই সেটি হল—

(১) আমাদের ব্যক্তিত্ব নানা সংকট ও সংঘাতের সম্মুখীন। যার জন্য পরিপূর্ণ মানুষ তৈরি হচ্ছে না। শিক্ষিত, প্রতিভাধর ও কর্মজীবনে সফল মানুষও ব্যক্তিত্বের নানা সংকটে ভুগছে। যার জন্য সে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারছে না।

(২) ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা স্বাভাবিক।

(৩) মানুষ সচেতন হলে সে তার চারিত্রিক ত্রুটিগুলিকে দূর করে ব্যক্তিত্বকে সুস্থ উজ্বল করে তুলতে পারে।

এজন্য সন্তানের প্রতি পিতামাতারও বড় দায়িত্ব থেকে যায়। বাংলায় এই ধরনের একটি চেষ্টার পোড়াপত্তন হল। ইচ্ছা আছে ব্যক্তিত্ব গঠনের ওপর নিয়মিত কর্মশালা গড়ে তোলার যার মূল কথাই হবে নিজের বিনির্মাণ। অর্থাৎ ভেঙে আবার নতুন করে গড়া।

আগ্রহী পাঠক-পাঠিকা এ সম্পর্কে আরও জানার জন্য সরাসরি লেখককে জবাবী খাম পাঠিয়ে লিখতে পারেন।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র

এক : কোথায় পাবো তারে? ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা, বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব, মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য (৯—২০)

দুই : ব্যক্তিত্বের উৎস সন্ধানে, ব্যক্তিত্ব মাপার চেষ্টা, ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ, ছকে বাঁধা ব্যক্তিত্ব, চেহারা ও ব্যক্তিত্ব, দৈহিক গড়নের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক, পেশীবহুল মানুষ, ছিপছিপে মানুষ, উচ্চারণ ও ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্ববর্দ্ধক পোশাক-আশাক, নামকরণ ও ব্যক্তিত্ব নামে এসে যায়। (২১—৫৭)

তিন : ব্যক্তিত্ব এক চলমান ধারণা—ব্যক্তিত্বের স্বরূপ, ব্যক্তিত্বের অনুভূতি, প্রথম দেখা, নাম নিয়ে পরীক্ষা। (৫৮—৬২)

চার : সাফল্য ও ব্যক্তিত্ব, বন্ধুত্ব : জনপ্রিয়তা, অর্থের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক। (৬৩—৬৯)

পাঁচ : জিন ও ব্যক্তিত্ব : ব্যক্তিত্ব গঠনে জিনের অবদান। (৭০—৭৪)

ছয় : ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ : ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবেশের ভূমিকা কতটুকু? ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণতার জন্য : মনোবিদ ইয়াংএর অভিমত, পরিবেশের শ্রেণীভেদ, সাংস্কৃতিক পরিবেশ, পরিবার—মূল্যবোধের শেষ ইউনিট। পরিবেশ ও প্রতিবেশী। (৭৫—৮৬)

সাত : সংস্কৃতি : মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব : ঈশ্বর ও ব্যক্তিত্ব। (৮৭—৯৪)

আট : ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ : মানুষের জীবনপঞ্জী, যা করতে মন চায়, ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্পর্কে ফ্রয়েড, বাউন ও মসলোর বক্তব্য। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, ব্যক্তিত্বের অষ্টমার্গ : মনোবিদ এরিকসনের অভিমত, কেন মানুষ অবিশ্বাসী? অর্ধনারীশ্বরের সন্ধানে, বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব, যারা কমপ্লেক্সে আক্রান্ত (৯৫—১১২)

নয় : ইয়্যুংএর বয়ঃসন্ধিতত্ত্ব, মধ্যবয়সের ব্যক্তিত্ব, অচলায়তন যারা ভাঙে, হীনম্মন্যতা দূর করার উপায়, সাফল্য ও ব্যর্থতা, বড়-মেজ-ছোট : ব্যক্তিত্বের তারতম্য, একমাত্র সন্তান। (১১৩—১২৫)

দশ : প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্ব, প্রথাবিরোধী যৌনতা, অপরাধ, প্রতিভাবান ছেলেমেয়ে কেন হয়? (১২৬—১৪৬)

এগার : ব্যক্তিত্ব ও ভাবাবেগ : ভাবাবেগের কারণ, স্নায়ু ও মস্তিষ্ক, প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব, প্রবৃত্তির প্রকারভেদ, অধিকার প্রবৃত্তি, যৌনপ্রবৃত্তি, অহংপ্রবৃত্তি, মেজাজ, সবল ব্যক্তিত্বের সন্ধানে, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তথা ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ, কেমন করে সামাজিক হবেন? প্রেজুডিস কেন জন্মায়? প্রেজুডিস দূরীকরণ। (১৪৭—১৯৪)

বারো : অসুস্থ ব্যক্তিত্ব : ব্যক্তিত্ব কেন অসুস্থ হয়? হালছেড়ে বসে থাকার দশটি কারণ, মেজাজি ব্যক্তিত্ব, আত্মপ্রত্যাহার, উদ্বেগের আতিশয্য, অপূর্ণাঙ্গতা, প্রত্যাগমন, নিষ্ঠুরতা, ফোবিয়া, ডিপ্রেসিভ নিউরোসিস, নিউরেস্থেনিয়া, সিজোফ্রেনিয়া, সাফাই গাওয়া, দায়িত্বহীনতা, আত্মহত্যার প্রবণতা (১৯৫—২১৩)

তেরো : বি-স্বাভাবিক (অ্যাবনর্মাল) ব্যক্তিত্ব, ফোবিয়া, ডিপ্রেসিভ নিউরোসিস, নিউরোস্থেনিয়া, সিজোফ্রেনিয়া। (২১৪—২২১)

চোদ্দ : কেমন করে সুব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবেন? ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত শক্তি, ব্যক্তিত্বগঠন সম্পর্কে কতগুলি অবশ্যপালনীয় নির্দেশ, ব্যক্তিত্ব গঠন ক্লাশে যোগদানকারীদের আত্মপরিচয়। (২২২—২৩২)

উপসংহার : ব্যক্তিত্ব নিয়ে নয়টি প্রশ্ন ও লেখকের উত্তর। নির্দেশিকা। বঙ্গানুবাদ সহ আব্রাহাম লিঙ্কনের পত্র তথা চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠনের চিরন্তন উপদেশ। (২৩৩—২৫০)

নির্দেশিকা (২৫১—২৫৩)

নির্ঘণ্ট (২৫৪—২৫৬)

এক

কোথায় পাবো তারে?

ব্যক্তিত্ব কথাটার মানে কী? ব্যক্তিত্ব খায় না মাথায় দেয়, এ সম্পর্কে অনেক লোকেরই কোন সঠিক ধারণা নেই। অনেকে ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝেন ভারিক্কি চেহারার এক মানুষ। বেশি কথাবার্তা বলেন না। শুধু গম্ভীরভাবে পাইপ খেয়ে চলেন এবং মাঝে মাঝে ফ্রেঞ্চকাট দাড়িতে হাত বোলান। কিছুকাল আগে পুনে ফিল্ম ইনস্টিটুটিউটে গিয়ে সেখানকার রেজিস্ট্রার এক আই. এ. এস. মহিলার সঙ্গে দু'চারটে কথা বলেই আমার স্ত্রী মুগ্ধ। বললেন, কী দারুণ ব্যক্তিত্ব দেখেছ ভদ্রমহিলার। ওই মহিলা কিন্তু গম্ভীর ও ভারিক্কি গোছের ছিলেন না। সুশ্রী, ঝকঝকে এবং সৌজন্যপরায়ণ। ভাল ইংরেজি বলেন। একটি কমলা রঙের বুটিদাব শাড়ি ছিল তাঁর পরনে। সেই সঙ্গে রঙ মিলিয়ে ব্লাউজ। বাঁ হাতে একটি সোনার ব্যান্ডের রিস্টওয়াচ ছাড়া তাঁর সঙ্গে কোন আভরণ ছিল না। লিপস্টিকও নয়। আবার ব্যক্তিত্বশালিনী ইন্দিরা গান্ধীকেও দেখেছি, সাজতে ভালবাসতেন। যেখানেই যেতেন, সঙ্গে যেত কয়েক বাক্স শাড়ি আর সাজগোজ দেখভাল করার জন্য এক মহিলা সঙ্গিনী। এক শাড়ি কদাচ দু'দিন পরতেন। কিন্তু তাতে কোথাও ব্যক্তিত্বের খামতি পড়েনি। দেশ-বিদেশে তার সঙ্গে ঘুরে দেখেছি সাধারণ মানুষ থেকে তাবড় তাবড় লোকেরা সবাই তাঁর ব্যক্তিত্বমুগ্ধ।

ইন্দিরা তাঁর বাবার মতই মেজাজী মানুষ ছিলেন। তাঁর বাবা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও একটুতে চটে যেতেন। সবাই তাঁর জন্য তটস্থ থাকত। কিন্তু রাজীব গান্ধী ছিলেন অন্য ধরনের ব্যক্তিত্ব। ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। ভেতরে বাহিরে এক। অথচ তাঁর আপন সহোদর ভাই তাঁর সম্পূর্ণ বিপরীত। অত সহজ-সরল নন। ডানপিটে, কূট বুদ্ধির অধিকারী। কিছুটা নিষ্ঠুর প্রকৃতিরও।

ইতিহাসে দেখেছেন, সম্রাট শাজাহানের চার ছেলে, দারা, সুজা, ঔরংজীব ও মুরাদ চার রকমের। দারা পণ্ডিত উদার, ন্যায়পরায়ণ, সুজার তেমন কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নেই কিন্তু সৎ। মুরাদ মদ্যপ ও শিথিল নৈতিক চরিত্রের লোক। ঔরংজীব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্রুর, খল, সাম্প্রদায়িক কিন্তু ধার্মিক ও সৎ।

স্কুলে পড়ার সময় ইতিহাসে বড় বড় রাজাদের চরিত্র লিখতে হত। তখন ভাবতাম

সবাইতো রাজা, তাহলে সবাই এক রকম চরিত্রের হয় না কেন?

পরবর্তীকালে মনোবিজ্ঞান নিয়ে নাড়চাড়া করতে গিয়ে দেখলাম এ পৃথিবীতে দুজন মানুষ কখনও এক রকম হয় না। পৃথিবীতে এখন ৬০০ কোটি লোক। কিন্তু প্রতিটি লোকই আলাদা রকমের। সহোদর ভাইবোনের চেহারার মধ্যে মিল থাকে। শরৎ বসু ও সুভাষ বসুর মধ্যে এত মিল যে এক সময় ছবিতে আলাদা করে চেনাই শক্ত। দুজনের মধ্যে মিল যেমন যথেষ্ট কিন্তু অমিলও প্রচুর। দুই যমজ ভাইবোনের মধ্যে বা দুই ভাই বা দুই বোনের মধ্যে চেহারার আরও মিল। কিন্তু মানসিকতা ও চিন্তা- ভাবনার অনেক তফাত। এমনকি, গঙ্গা-যমুনা বলে পশ্চিমবঙ্গে যে দুই শ্যামদেশীয় ধরনের যমজ বোন আছে, কোমরের ওপর থেকে যারা দুজন আলাদা। তাদের দুই মুখ। দুটি মস্তিষ্ক আলাদা আলাদা চিন্তা করে।
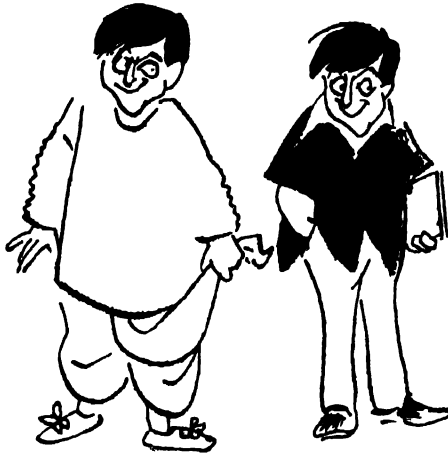
দুভাই যমজ। পোশাক আলাদা

মনোবিজ্ঞানের বিশিষ্ট অধ্যাপক প্যাট্রিক এ টাইলার বলেন : প্রতিটি মানুষই অভিনব (unique)। পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যাকে আর একটা 'আপনি' বলা যাবে। হয়তো খুঁজলে এক রকম চেহারার দুজনকে পাওয়া যাবে। কিন্তু তবু দুজনের ব্যক্তিত্ব একই রকম হবে না। অভিনেতাদের মেক আপ করিয়ে ঐতিহাসিক চরিত্রের অনুরূপ করে তোলা হয়। তাঁরা অনুকরণ করেন ওই চরিত্রের কথা বলার ঢঙ ও ম্যানারিজম বা হাবভাব। কিন্তু সেটা নকল। নকল কখনও আসলের মত হয় না। গান্ধীজীর সময় অনেক নেতা গান্ধীজীর মত বসার ভঙ্গিও নকল করতেন। পশ্চিমবঙ্গে অনেক বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসুর হাবভাব কথা বলার ভঙ্গি নকল করেন। ওঁরই মত করে ধুতি- পাঞ্জাবি পরেন। ওঁরই মত চাঁচাছোলা কাটা-কাটা কথা বলেন। দু-তিনটে শব্দ বলার পরই স্বরাঘাত, সীমিত পরিচিত দিশি শব্দ সম্ভারের মধ্যে বাক্য সীমিত রাখা। সর্বোপরি শ্রোতার দিকে না তাকিয়ে কথা বলা এবং অনেক বাক্য অসম্পূর্ণ রাখা। এটি সফল ব্যক্তিত্বের নকল করার চেষ্টা।

অনেকেই এই ধরনের 'প্রিয় ব্যক্তিত্ব' নকলের চেষ্টা করেন। এটি এক ধরনের আচ্ছন্নতা (obcession)। ছোটবেলায় ছেলে যেমন বাবার মত ব্যক্তিত্ব নকলের চেষ্টা করে। শিষ্য গুরুর ব্যক্তিত্ব নকলের সচেতন চেষ্টা চালায়। ছোটবেলায় অনেকের হিরো থাকে। এখন 'হিরোরা' মুখ্যত সিনেমার হিরো-হিরোইন। বহু ছেলেমেয়ে তাদের ছবি টাঙিয়ে মনে মনে তাদের ব্যক্তিত্ব নকলের চেষ্টা করে।

আমার কলেজে পড়ার সময় একবার কলেজে বক্তৃতা দিতে এলেন ম্যাগসেসে পুরস্কার পাওয়া সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী (শ্রীনিরপেক্ষ)। আমার কাছে তখন হিরো সাংবাদিকরা। তাঁরাই আমার উপাস্য। অমিতাভ চৌধুরীর তখন ভরা যৌবন। নাতিদীর্ঘ মানুষটির পরনে ছিল খদ্দরের ধুতি আর খদ্দরের শাদা ঝোলো পাঞ্জাবি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ফরসা রঙ এক মাথা চুল। আমাকে আকর্ষণ করল তাঁর কথা বলার ভঙ্গি। তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে অথচ খুব স্পষ্ট করে প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করতেন। একটিও অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না।

আমি অনেকদিন ধরে তাঁর কথা বলার ভঙ্গি নকল করার চেষ্টা করেছি। পারিনি। পারা যায় না। পারলেও তা কৃত্রিম হয়ে যায়। হেমন্ত, মান্না দে, লতার গলা নকল করে অনেকে নিখুঁত গান করেন। তা শুনে শ্রোতারা বলেন হুবহু লতার মত গাইছে। কিন্তু যে শিল্পী 'লতা-কণ্ঠী' হয়ে সারাজীবন কাটিয়ে দেন তিনি কখনই লতার মত সম্মান অর্জন করতে পারেন না।

ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মৌলিক। আর এই মৌলিকত্বটুকুই স্বাভাবিক এবং গৌরবের। আরডিস অ্যান্ড হুইটম্যান বলেন :

আপনি যে অন্যের থেকে আলাদা এর মধ্যে অগৌরবের কিছু নেই। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যতটুকু মিল তা মানুষ-প্রজাতি হিসাবে। শরীরগতভাবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের মধ্যে মিল যথেষ্ট। মানুষের জীবন রসায়ন এক। অর্থাৎ যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে আমাদের দেহ সৃষ্টি তা সবার ক্ষেত্রেই এক। কিংবা ধরা যাক মগজের চেহারা। তা পৃথিবীর যে কোন দেশের সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে একই রকমের। সকলের মগজের মধ্যেই রয়েছে ষাট রকমের রসায়ন যার সম্মিলিত নাম নিউরোপেপটিডেস (Neuropepeptides) এই এন.পি. বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের মধ্যে দিয়ে মগজে গিয়ে পৌঁছয়।[১] বৈজ্ঞানিকরা বলেন : মানুষের মনোগত ভাব (emotion), আনন্দ (joy), প্রেম (love), ক্রোধ (anger) প্রভৃতি সমস্ত মানসিক অভিব্যক্তির মূল কেন্দ্র এই মগজ তা সেই আকবর বাদশার মগজই হোক হরিপদ কেরানির মগজই হোক।

শুধু বুদ্ধির ক্ষেত্রেই মানুষে মানুষে তফাত।

কারণ হরিপদ কেবানি ও আকবর বাদশা দুজনের বুদ্ধি সমান নয়। বুদ্ধি সম্পর্কে একটু বিশদ আলোচনা করি। বুদ্ধি কাকে বলে তা নিয়েও নানা ধরনের সংজ্ঞা আছে। এর মধ্যে এম. জে. ওয়াগনন এর দেওয়া সংজ্ঞাটি আমি গ্রহণ করেছি।

বুদ্ধি হল, 'শেখার ক্ষমতা এবং সেই শিক্ষা অনুসারে তুলনামূলকভাবে নতুন এবং পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া।

Intelligence is the capacity to learn and adjust to realitively new and changing condition.[২]

বুদ্ধি থাকলে মানুষ ক্রমাগত অভিজ্ঞতা থেকে শেখে আবার বই পড়েও শেখে। কিন্তু বই পড়ে শেখাটাই বুদ্ধির একমাত্র উৎস নয়। আকবর বাদশা তো শুনেছি বইটই পড়েননি। আর হরিপদবাবু বি.এ. পাস করে কেরাণী হয়েছেন। কিন্তু হরিপদবাবু পড়েছেন, শেখেননি। শিখলেও সেই শিক্ষা বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে শেখেননি। তাছাড়া যাকে আমরা সূক্ষ্ম ব্যাপার স্যাপার (abstraction) বলি। সেটা হরিপদবাবুর মাথায় ঢোকে না। বুদ্ধি হল: চট করে শেখার বা ধরে নেওয়ার ক্ষমতা।

১. একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হা বলতেই হাওড়া বুঝতে পারেন। একবার বললেই তিনি ধরে ফেলেন। শুধু ভাষা দিয়ে নয়। তিনি ইঙ্গিতেই ধরে নেন।

২. সূক্ষ্ম বস্তু বা তত্ত্ব কথা তিনি বুঝতে পারেন। শুধু বোঝা নয়, তিনি বোঝাতেও পারেন।

৩. বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারেন। তিনি যেখানে যেমন সেখানে তেমন ব্যবহার করেন।

৪. বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যেমন আচরণ প্রয়োজন তেমন আচরণ করতে জানেন। যেখানে যেমন কথা বলা উচিত তেমন কথা বলেন। কোথায় চুপ করে থাকতে হবে, কোথায় সমর্থন জানাতে হবে আর কোথায় প্রতিবাদ জানাতে হবে তা তিনি ভাল বোঝেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তির বড় লক্ষণ যে তিনি নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবেন না।

তাহলে বুদ্ধির সামগ্রিক সংজ্ঞা হল :

'প্রতিটি কাজ ভেবেচিন্তে করা। ইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপে পড়ে অথবা পরিণাম না ভেবে কিছু করা নয়। যুক্তি দিয়ে সব কিছু চিন্তা করা (to think rationally) এবং পরিবেশ অনুযায়ী যা করা দরকার বা যা করলে মানায় সেটাই করা।

বুদ্ধির পরিচয় মেলে এক একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে। যেমন আপৎকালে, দুটি বিকল্পের মধ্যে কোন একটি বিকল্প বেছে নেওয়ার প্রশ্নে। আচমকা কোন ঝঞ্ঝাট বা বিপত্তি উপস্থিতি হলে সেটা মোকাবলার সময়। বুদ্ধি মগজে গজগজ করলেই হয় না। ব্যক্তির সময়োচিত ব্যবহার এবং জীবনের প্রতিটিক্ষেত্রে ব্যক্তির ভূমিকার ওপর তার বুদ্ধির পরিমাণ ও গুণ নির্ভর করে।

যেহেতু বুদ্ধির প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক সেহেতু শুধু একটি মাত্র ক্ষেত্রে বুদ্ধির যথার্থ প্রয়োগ করলেই তাকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। এজন্য পুঁথিগত ভাবে বিদ্বান ও পণ্ডিতকেই আমরা একমাত্র বুদ্ধিমান বলতে পারি না। পণ্ডিতদের মূর্খতা নিয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। কৃষিবিদ্যার একজন ডক্টরেটের চেয়ে একজন অধিক ফসল ফলানো চাষী অনেক বুদ্ধিমান বলে গণ্য হতে পারে।

ভারতবর্ষে সাক্ষরতার হার এতদিন সামান্যই ছিল। কিন্তু তাবলে দেশে বুদ্ধিমান লোকের অভাব ছিল তা মনে করার কারণ নেই। আগে মনে করা হত যে বুদ্ধি বহুমুখী। একটা বিষয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিলে সে বিভিন্ন বিষয়ে বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারবে। অর্থাৎ কোন ছাত্র যদি গণিতে খুব ভাল হয় তাহলে যে কোন বিষয়ে সে সমান ব্যুৎপত্তি দেখাবে। কিন্তু আদপে তা হয় না। দেখা যায় অঙ্কে একশর মধ্যে একশ পেয়েছে একটি ছেলে রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝতে পারছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসকমিউনিকেশন পড়াতে গিয়ে

আমার একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমরা সব বিষয়ের ওপর প্রচুর ছেলেমেয়ে নিতাম। এর মধ্যে বিজ্ঞানের প্রথম শ্রেণী পাওয়া অনেক ছেলেমেয়ে আসত। কিন্তু তারা অনেকে বিষয়টির মধ্যে ঢুকতে পারত না বলে মাস খানেক পরে কোর্স ছেড়ে দিয়ে নিজেদের বিষয়ে গিয়ে ভর্তি হত। আমি তাদের বুদ্ধি কম বলতে পারি না। বহু বিজ্ঞানের ছাত্র ভাল ছবি আঁকে, ভাল গল্প উপন্যাস লেখে (বনফুল, রাজশেখর বসু, নারায়ণ সান্যাল উদাহরণ)। আবার আইনস্টাইনের মত বিজ্ঞানী ছোটখাটো হিসাব করতে পারতেন না। সুতরাং কেতাবি বিদ্যার ক্ষেত্রে বিশেষীকরণের বাইরে যদি কারও মাথায় কিছু না ঢোকে তাহলে তার বুদ্ধিতে খামতি আছে বলে মনে করার কোন কারণ নেই। প্রবণতা অনুসারে বুদ্ধি বিকশিত হয়ে থাকে। আমি দেখেছি লেখাপড়ায় যারা বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেনি তারা ব্যবসায় বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বিরাট ব্যবসায়ী হয়েছ। বস্তুত পক্ষে সফল ব্যবসায়ীদের অধিকাংশই স্কুল কলেজে সাধারণ মেধার ছেলেমেয়ে। অনেকে আবার ড্রপ আউট। রাস্তার ধারে গ্যারেজে কালিঝুলি মেখে যে সব ছেলে মিস্ত্রির কাজ করে তারা সবাই প্রাইমারি পাস করেছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তারা অক্লেশে মোটর গাড়ির অসংখ্য যন্ত্রাংশ মুখস্ত রেখে যেখানকার জিনিস সেখানে পটাপট লাগিয়ে দিচ্ছে। এরা কী কারও চেয়ে কম বুদ্ধিমান? কিন্তু এরা কেউ শক্তি-সুনীলের কবিতা পড়েনি, আইনস্টাইনের নাম শোনেনি। বিশ্বায়ন বা উত্তর আধুনিকতা এদের কাছে মনে হতে পারে এক ধরনের মোটর পার্টস। কিন্তু তা বলে কি এদের বুদ্ধি কম বলা যাবে?

সেজন্য বুদ্ধিমান বলতে শুধু কেতাবি শিক্ষিত মেধাবী বা প্রতিভাবানদের ধরলে চলবে না। বুদ্ধিকে প্রয়োজনমত ব্যবহার করতে জানা ও পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতাই বুদ্ধিমানের সাধারণ লক্ষণ। এই গুণের জন্যই গণতান্ত্রিক দেশে হরিপদ কেরানি, বড়বাবু থেকে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হতে পারেন। আব্রাহাম লিঙ্কন লগ কেবিন থেকে প্রেসিডেন্ট হাউসে গিয়েছিলেন। জৈল সিং মাটির বাড়িতে জন্মে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের মত বুদ্ধিজীবী ব্যবসা চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। অথচ রাজেন্দ্রলাল মুখার্জি, সাধন দত্তর মত সাধারণ ইঞ্জিনিয়র বিশাল কর্পোরেট সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন।

তাত্ত্বিক পাণ্ডিত্যের চেয়ে কমন সেন্স বা সাধারণ বুদ্ধির যথার্থ প্রয়োগই প্রকৃত বুদ্ধিমানের লক্ষণ। যাকে আমি বলেছি বাস্তববাদ বা Pragmatism (লেখকের কেমন করে বাস্তববাদী হবেন পড়ুন)।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, সকলের মধ্যে সমান বুদ্ধি থাকে না। বুদ্ধির তারতম্য ঘটে। বুদ্ধি কিছুটা আসে উত্তরাধিকার সূত্রে। কিছুটা পাওয়া যায় পরিবেশ থেকে। এজন্য কারও বুদ্ধি সাধারণ। কারও সাধারণের থেকে বেশি। কেউ বা নির্বোধ। অধিকাংশ লোকেরই বুদ্ধি সাধারণ মাপের। এর কারণ বুদ্ধি অর্জন করার জন্য যে বুদ্ধি দরকার, যে মানসিকতা দরকার সে বুদ্ধি তাদের নেই।

প্রথম কথা হচ্ছে বুদ্ধিহীনেরা নিজেদের অতি চালাক ভাবে। তাদের বুদ্ধি যে কম এবং এই ঘাটতিটুকু পুরণের জন্য যে সচেতন চেষ্টা চালাবার দরকার এই বোধটুকু তাদের নেই।

দেখা গেছে বয়সের সঙ্গে মানসিক বুদ্ধি (তত্ত্বগত জ্ঞান, গাণিতিক জ্ঞান) বাড়ে না। ২০ থেকে বড় জোর ২২ বছর বয়স পর্যন্ত বুদ্ধি বাড়ানো যায়। তারপর আর বাড়ে না। তখন বাড়ে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, নৈপুণ্য আর প্রয়োগগত বুদ্ধি।[৩]

আমি এ বয়সে আমার বুদ্ধ্যাঙ্ক বাড়াতে পারব না। কিন্তু আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে আমি যে প্রজ্ঞা অর্জন করেছি তা দিয়ে বুঝতে পারি কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ। এই প্রজ্ঞা মানুষের চিন্তাশক্তিকে পরিশীলিত করে, তাকে ধৈর্যশীল করে; সহনশীল করে।

বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব

ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে এতক্ষণ বুদ্ধির কথা বললাম কারণ বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব একই মুদ্রার এপিঠ ও পিঠ। বুদ্ধিই ব্যক্তিত্ব তৈরি করে। বুদ্ধি গঠন করে ধারণা (Concept)। বুদ্ধিই আবার ধারণা বিশ্লেষণ করে তার ব্যাপ্তি ও পরিবর্তন ঘটায়। সেই যে গল্পে আছে একটি শূকর দেখে হবুচন্দ্র রাজা তার গবুচন্দ্র মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, মন্ত্রী ওটা কী জন্তু? কারণ দুজনেই কখনও শূকর দেখেননি। গবুচন্দ্রও মোটা বুদ্ধির লোক কিন্তু তিনি তা স্বীকার করেন না। তিনি অনেক ভেবে বললেন, জন্তুটা নতুন। হতে পারে এটা গজক্ষয়, অর্থাৎ হাতি বিবর্তিত হতে হতে এই রকম হয়েছে। অথবা হতে পারে মূষিকবৃদ্ধি। মূষিক বাড়তে বাড়তে এই আকার ধারণ করেছে।

এটি নয় গজক্ষয়, না হয় মূষিকবৃদ্ধি

যার যেমন বুদ্ধি, তার ধারণাও তেমন এবং ওই ধারণা দিয়েই তিনি সব কিছু বিশ্লেষণ করে থাকেন। তাঁর নিজস্ব ধারণা অনুসারেই তাঁর ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়ে যায়। ব্যক্তি বুদ্ধিকে অবলম্বন করেই তার জীবন ও জীবিকা গড়ে তোলে। তার সামাজিক উত্তরণের অবলম্বন বুদ্ধি।

হরিপদ কেরানি মশাই যে কেরানির চাকরিটা পেয়েছেন সেটা তাঁর বুদ্ধি দিয়ে (প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা ইত্যাদি)। চাকরিটা যে রাখছেন এবং প্রমোশনের পথ পাকা করছেন সেটাও বুদ্ধি দিয়ে (ঠিকঠাক কাজ করা, ওপরওয়ালার মন যুগিয়ে চলা, ঘুসটুস খেয়ে ফেঁসে না যাওয়া, অফিসের সহকর্মিনীদের কারও সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে কেলেংকারি না ঘটানো, মন্ত্রীমশাই বা শাসক দল সম্পর্কে প্রকাশ্যে বেফাঁস কথা কিছু বলে না ফেলা) টিকিয়ে রেখেছেন। তেমনি আকবর বাদশা তো পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ জিতে, বৈরাম খাঁকে হটিয়ে, হিন্দু মুসলমান মিলনের চেষ্টা করে, বিশাল সাম্রাজ্য বিস্তার করেছেন।

বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে হরিপদবাবু ও আকবর বাদশা যে যার ফিল্ডে করে খেয়েছেন, খাচ্ছেন। আর যে যেমনভাবে আছেন তদনুযায়ী তাঁর ব্যক্তিত্বও তেমনভাবে তৈরি হচ্ছে। হরিপদবাবু ছা-পোষা কেরানি। তিনি বসের কাছে বিগলিত। তবে অধস্তনদের কাছে নিজের প্রেস্টিজ সম্পর্কে সচেতন। খুব কড়া হাতে কনিষ্ঠদের সামলান। এজন্য আড়ালে গালমন্দও সহ্য করেন।

অন্যদিকে আকবর বাদশা দিল্লিশ্বরোবা তিনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। গানবাজনার ভক্ত। উদার ও সেকুলার। অন্যদিকে নির্মম। বিদ্রোহীদের দমন করেন নির্মম হাতে। আপন অভিভাবককেও হত্যা করতে দ্বিধা করেন না।

মানুষে মানুষে বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে ব্যক্তিত্বেরও তারতম্য ঘটে। কারণ উভয়ের উৎস তো একই— সেই জিন আর পরিবেশ। বুদ্ধিকে প্রভাবিত করে কিছু রাসায়নিক পদার্থ। কতগুলি নির্দিষ্ট জিন, এনজাইম ও MAO (monogmine oxidase) এরা মগজের স্নায়ুকোষগুলিকে পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ ঘটাতে সাহায্য করে। যদি কারও জিনের মধ্যে কিছু গোলমাল থাকে তাহলে পর্যাপ্ত এনজাইম আর মগজে ঢুকতে পারে না। MAO-এর অভাবে অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ মগজে জমতে থাকে। স্নায়ু প্রবাহের ফলে (transmission of nerve impulse) উদ্বেগ তাড়িত মানুষ হিংসাপ্রবণ হয়ে ওঠে।[৪]

মানুষের মধ্যে প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য

টাইলার তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যতত্ত্বে বলেছেন : আমাদের পরস্পরের মধ্যে তফাত জৈবিক (Individual differentiation) কারণে। জৈবিক কারণটা হল আমাদের ক্রোমোজমের ভেতরকার ডি. এন. এ. প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা। জিনের প্রভাবেই আমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য। তবে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে (biological) জিনের প্রভাবই সবটা নয়। পরিবেশও অনেকটা দায়ী। জন্মসূত্রে জিনের প্রভাবে গঠিত ব্যক্তিত্বকে ব্যক্তির পরিবেশ অনেকটা পুনর্নির্মাণ করে নিতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে এলে ব্যক্তিত্ব বদলায়। রানী রাসমণি গরিব ঘরের মেয়ে ছিলেন। ছোটবেলায় তাঁর রাজপরিবারে বিয়ে হওয়ায় তিনি পরিবেশের সাহায্য পেলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের অভাবনীয় রূপান্তর ঘটল। মফঃস্বলের ছেলে শহরে এলে সে কিছুদিনের মধ্যেই শহুরে হয়ে ওঠে। তখন তার ব্যক্তিত্বও বদলায়। গ্রাম শহর হয়ে ওঠায় শহুরে পরিবেশে গ্রামের লোকের ব্যক্তিত্ব বদলে শহুরে

লোকের ব্যক্তিত্বে রূপান্তরিত হচ্ছে।

* দীর্ঘকাল বিদেশে বাস করার পর অনাবাসী ভারতীয়দের ব্যক্তিত্ব ভারতবাসীদের ব্যক্তিত্ব থেকে আলাদা হয়ে যায়।

* কর্ম পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নতুন কর্ম পরিবেশ ও কর্ম সংস্কৃতি অনুসারে কর্মীর ব্যক্তিত্ব বদলায়। অনেক অধ্যাপক অধ্যাপনা ছেড়ে আই. পি. এস. হয়েছেন। আমি দেখেছি তাঁদের ব্যক্তিত্বেরও আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তাঁরা তখন মারকুটে পুলিশ অফিসার। আমার এক ছাত্র ছিল নাম পরিতোষ (আসল নামটি লিখলাম না) সে গ্রামের ছেলে, ধর্মভীরু ও সৎ। খবরের কাগজে চাকরি না পেয়ে সে শুল্ক বিভাগে চাকরি নেয়। কয়েক বছর পরে তাকে দেখে চিনতে পারিনি। প্রচণ্ড মোটা হয়ে গিয়েছে। সে স্বীকার করল মদ্যপান করে সে মোটা হয়েছে। শুধু তাই নয় এখন সে নিয়মিত ঘুষ খায়। তার বক্তব্য, এই চাকরিতে ঘুষ না খেলে চাকরি করা যাবে না।

একদা ছাত্র ঠেঙাতেন, এখন পুলিশ হয়ে চোর ঠেঙাচ্ছেন

* গরিব বড় লোক হলে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। রাজনৈতিক নেতারা যখন ক্ষমতাচ্যুত হন তখন তাঁদের এক রকম ব্যক্তিত্ব আবার যখন মন্ত্রী-টন্ত্রী হন তখন এক রকম ব্যক্তিত্ব। মেয়েদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের আকাশ-পাতাল পরিবর্তন ঘটে বিয়ের পর। স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির স্ট্যাটাস, প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনুসারে স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের রূপান্তর ঘটে।

বুদ্ধি কীভাবে ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে সে সম্পর্কে এলিজাবেথ হারলক যা লিখেছেন, তা একবার বিশ্লেষণ করা যাক।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় দরকার কোনটা? নিশ্চয়ই অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থান। সেই সঙ্গে একই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন, Adjustment বা মানিয়ে চলা। মানিয়ে চলা অন্যের

সঙ্গে ও পরিবেশের সঙ্গে। আমার বা আপনার মনের মত করে সব কিছু চলবে না। আবহাওয়া আমাদের মনের মত হবে না। সরকার কখনই আমাদের মনের মত হবে না। আমাদের কর্মক্ষেত্র আমাদের মনের মত হবে না। আমাদের সকলের ফ্ল্যাট বা বাড়িতে দক্ষিণ খোলা জানলা থাকবে না। মনের মত প্রতিবেশী হবে না। মনের মত বউ-স্বামী-ছেলে মেয়ে হবে না। তাই যা পেয়েছি তার সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে হবে। আমরা এই সমঝোতা কতখানি সাফল্যের সঙ্গে করতে পারি সেটা নির্ভর করছে আমাদের বৌদ্ধিক ক্ষমতার (intellectual capacity) ওপর। মানুষের এই বৌদ্ধিক ক্ষমতার যত উন্নতি হয় ততই এই দুনিয়া ও লোকজন সম্পর্কে তার ধারণা ও পরিবর্তন হতে থাকে। সে ধীরে ধীরে বুঝতে পারে রাগারাগি করে, অভিমান করে কিছু হবে না, সমাজ যেমন আশা করে তেমনি ভাবে কাজ করে যেতে হবে। চিন্তা ও কাজের মধ্যে ধারাবাহিকতা আনতে হবে। এলোমেলো বা আধাখেঁচড়া করে কিছু করা চলবে না। অগ্রাধিকার ঠিক রাখতে হবে। এই সব চিন্তা আসে বৌদ্ধিক ক্ষমতা থেকে।

বুদ্ধি প্রয়োগ করে (প্রয়োগ করার মত বুদ্ধি থাকলে তবেই না) মানুষ তার সামাজিক কর্তব্য ঠিক করে নেয়, তেমনি নির্ধারণ করে ফেলে কোন পথ ধরে চললে সে সমাজের স্বীকৃতি পাবে। যখন দেখে এই পথ ধরে চলে সে সামাজিক স্বীকৃতি পাচ্ছে তখন তার মন আত্মবিশ্বাসে ভরে ওঠে। ক্লাশে যারা পড়াশোনায় তেমন ভাল নয় কিন্তু ভাল গান করে, ছবি আঁকে, ফুটবল খেলে এবং তার জন্য স্বীকৃতি পায়, তার আত্মবিশ্বাস তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। কিন্তু যারা পড়াশোনায় ভাল নয় অথচ যাদের কোন আলাদা প্রতিভা নেই তাদের স্কুলে-কলেজে নানা ধরনের নিন্দাবাদ শুনতে হয়। এতে করে তার ব্যক্তিত্বও ক্রমশ দুর্বল হযে পড়ে। এজন্য দেখবেন কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ বিকাশ-লাভ করে না।

আবার স্কুল-কলেজে মেধাবী ও বুদ্ধিমান ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য যদি ভাল না থাকে তাহলে তারা তাদের বৌদ্ধিক সাফল্য সত্ত্বেও নানা হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারে না। আগেই বলেছি মানুষের বুদ্ধি শৈশব থেকে বাড়তে বাড়তে ২০ থেকে ২৪ বছরে শীর্ষে গিয়ে পৌঁছয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়তে আসে তখন তাদের যা হবার হয়ে গিয়েছে। প্রথম যৌবনের অর্জিত বুদ্ধি নিয়েই বাকি জীবনটা চালাতে হয়। পঞ্চান্ন বছর পর্যন্ত এই সঞ্চয় অটুট থাকে। ষাটোর্ধ্ব একজন মানুষ যদি নতুন করে জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করে তবে সে যে তা পারবে না তা নয়, তবে এ বয়সে শিখতে সময় লাগবে। অনেক সময় দেখবেন যে সব কবিতা আপনি স্কুলজীবনে সহজে মুখস্থ করেছিলেন, সেই সব কবিতা এখনও মনে আছে। কিন্তু ষাটের পর আর চট করে নতুন কবিতা মুখস্থ করতে পারছেন না।

অনেক সময় বৃদ্ধরা নিজেরাই ভেবে নেন যে তাঁরা এই বয়সে কিছু মনে রাখতে পারবেন না। সেটি তাদের জ্ঞানবোধকে ব্যাহত করে। ব্যক্তিত্বকেও ভীষণভাবে আহত করে।

এটা ঠিক নয় যে বয়স হলে জ্ঞানের গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তবে তা কমে যেতে পারে। আবার সকলের ক্ষেত্রে একই বয়সে স্মৃতি বিভ্রম ঘটে না। আমি মৌলানা ভাসানিকে ৮০ বছর বয়সে দেখেছিলাম অনর্গল পরিসংখ্যান আউড়ে যাচ্ছেন।

স্মৃতিধারণ ক্ষমতা বৌদ্ধিক বিকাশ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশ উভয়ের ক্ষেত্রেই ভীষণ জরুরি। বুদ্ধির পরিচয় সমাজের সঙ্গে সমঝোতায়। এজন্য সামাজিক হওয়া দরকার। আর সামাজিক হতে গেলে তাকে গল্পগুজব করতে হয় এবং সেই প্রসঙ্গে অসংখ্য স্মৃতিকথা ও উদ্ধৃতি দিতে হয়। পরিচিত ব্যক্তিদের নাম মনে রাখতে হয়। আমি দেখেছি সামাজিক স্বীকৃতি পেতে স্কুলের পাঠ্যবইগুলি থেকে প্রয়োজনীয় অংশ কেউ যদি কোট করতে পারে তাহলেই সে জ্ঞানী বলে পরিচিত হবে। যিনি উপযুক্ত জায়গায় গীতা উপনিষদ বা কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারেন শেক্সপিয়র বা রবীন্দ্রনাথ আওড়াতে পারেন তাহলে সেটি তাঁর ব্যক্তিত্বকে এক স্বতন্ত্র মর্যাদা দেয়। আমি অনেক ব্যক্তিত্বকেই দেখেছি যাঁরা এমন অনর্গল কোট করতে পারতেন। আবার মদের আসরে দেখেছি অনেকেব বন্ধ স্মৃতির দরজা খুলে গিয়েছে। তাঁরা শেক্সপিয়র থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় আবৃত্তি করে শুনিয়ে শ্রোতাদের সমীহ অর্জন করছেন। ঘরোয়া বৈঠকে সাল তারিখ দিয়ে আকর্ষণীয় আত্মস্মৃতি, অ্যানেকডট ও জোকস সকলের প্রশংসা অর্জন করে। আর ব্যক্তি যতই সমাদর বা স্বীকৃতি পায় তার ব্যক্তিত্ব ততই বিকশিত হয়।

বুদ্ধির আর একটা পরিচয়, যুক্তি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। নতুন কোন সমস্যা বা পরিস্থিতি এসে পড়লে তাকে সামাল দেবার ক্ষমতাই বুদ্ধি। সামাল দিতে হলে সমস্যাটা বোঝার মত ক্ষমতা চাই। তবেই না একটা সমাধান সূত্র বার করা যায়। মজার ব্যাপার হল, এই যুক্তিবিচার ক্ষমতা ২৪ বছরে এসে শমে ওঠে। তারপর কমতে থাকে। প্রবীণরাও (ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে) স্বভাবত সমাধানের নতুন সূত্র বার করতে পারে না। তারা প্রথাসিদ্ধ পথেই ঘুরপাক খায়। এখানে নবীনেরা প্রবীণের শাসন নাশন। তাঁদের উদ্ভাবন ক্ষমতা অনেক বেশি। প্রবীণ যদি নবীনের সঙ্গে সমঝোতা না করে নিজের সূত্র আঁকড়ে বসে থাকেন তাহলে তিনি পরিবেশের সঙ্গে সমঝোতা করতে ব্যর্থ হন এবং বৌদ্ধিক শক্তির পরিচয় দিতে পারেন না। নবীন প্রবীণ যিনিই হন না কেন, যাঁর যুক্তিবিচার ক্ষমতা (reasoning ability) নেই, যিনি আবেগের দ্বারা তাড়িত হন তাঁকে বুদ্ধিমান বলা যায় না। এই ধরনের নির্বোধ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে ঔদ্ধত্য দেখা যায়।

সমঝোতা বা adjustment-এর জন্য শিক্ষার দরকার হয়। শিক্ষা আনে বৌদ্ধিক উন্নতি। এই শিক্ষাকে আরও উন্নত করা যায় ট্রেনিং দিয়ে। এজন্য প্রত্যেক বিষয়ে সব বয়সেই ট্রেনিং-এর একটা প্রয়োজন আছে। বয়স্ক লোকেরা ট্রেনিং নেওয়াটাকে অপমানজনক মনে করেন। এটা আসে সাধারণত ভীতি থেকে। অল্পবয়সের ছেলেমেয়েরা যত তাড়াতাড়ি শেখে, বয়স্কদের শিখতে সময় লাগে। এ কারণে বয়স্করা শিখতে অনাগ্রহী। তার ফলে তারা আধুনিক জ্ঞান থেকে পিছিয়ে পড়ে। নতুন জ্ঞান ব্যক্তিত্বকে দেয় আত্মবিশ্বাস, অতীত জ্ঞানের সঙ্গে নতুন জ্ঞান যোগ করে জ্ঞান ভাণ্ডারকে ক্রমাগত সমৃদ্ধ করে তুলতে হয়।

এই কম্পিউটারের যুগে এখন পুরনো জ্ঞান ভাণ্ডারকে আধুনিক করে তুলতে গেলে কম্পিউটার জানতে হয়। বর্তমান বিশ্বে 'কম্পিউটার লিটারেসি' বলে নতুন শব্দ চালু হয়েছে। যারা কম্পিউটার জানে না, আধুনিক বিশ্বে তাদের পরিচয় 'অশিক্ষিত' বলে। এই সংস্কার ফলে কম্পিউটার না জানা ব্যক্তিদের ব্যক্তিত্বে যথেষ্ট হীনম্মন্যতা দেখা দিচ্ছে। যাঁরা নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত হচ্ছেন না, তারা যথেষ্ট বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও ব্যক্তিত্বের দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছেন।

বুদ্ধির সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে বলা যায়, বুদ্ধিমান ব্যক্তিকেও ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে হয়। একজন সাধারণ বুদ্ধির লোক চেষ্টা করে ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু চেষ্টা না করলে একজন প্রখর বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে পারেন না।

কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাক। শ্যামল (কাল্পনিক নাম) বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। একটি সরকারি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে আছেন। তাঁর বাড়িতে হানা দিয়ে সি.বি.আই. এক কোটি টাকা পেল। সব কাগজে খবরটি বেরুল। এরপর আত্মীয় স্বজন পরিচিত, বন্ধুবান্ধব সমাজে কী তাঁর ব্যক্তিত্ব আগের মত অমলিন থাকবে?

সুমন (কাল্পনিক নাম) এক বনেদি পরিবারের ছেলে। ঠাকুর্দা ও বাবা দুজনেই হাইকোর্টের জজ ছিলেন। সুমনও পড়াশোনায় ভাল ছিল। কিন্তু কলেজে উঠে সুমন ড্রাগ ধরল। পড়া ছেড়ে দিল। বাবা একটা চাকরি জুটিয়ে দিলেন। সেটাও মন দিয়ে করল না। একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বাবা তার বিয়ে দিলেন। বিয়ের পর বউ-এর ওপর সুমন অত্যাচার শুরু করল। বউ বাড়ি থেকে চলে গেল। আর ফিরল না।

যথেষ্ট বুদ্ধিথাকা সত্ত্বেও সুমন তার সুস্থ ব্যক্তিত্ব তৈরি করতে পারল না। অথচ উত্তরাধিকার সূত্রে সে সবই পেয়েছিল।

ব্যক্তিত্ব আবার বুদ্ধিবৃত্তিকে কীভাবে প্রভাবিত করে তার কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যাক। বিদ্যা-বুদ্ধি-নিরপেক্ষ ভাবে মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়ে যেতে পারে সেই একই উত্তরাধিকার ও পরিবেশ নিয়মসূত্র অনুসারে।

যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে কেউ কট্টর (rigid), কেউ রাগী ও মারমুখী (hostile)। কিন্তু তাবলে তাঁদের বুদ্ধাঙ্ক কম নয়। লেখাপড়াতেও তাঁরা খুব ভাল। ভাল চাকরি বাকরি করেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তাঁদের ব্যক্তিত্ব জন্মসূত্রে তৈরি হয়ে গিয়েছে। এখানে পরিবেশের প্রভাব পড়েনি। বিদ্যা পরিবেশের দান। কিন্তু বিদ্যা তার ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করতে পারেনি। অথচ স্বাভাবিক নিয়ম হল বিদ্যা বিনয় দান করবে। কিন্তু দেশে দুর্বিনীত শিক্ষিত লোকের কী অভাব আছে? বুদ্ধাঙ্ক দিয়ে বিচার করলে এই দুর্বিনীত ব্যক্তির আই কিউ হয়তো স্বাভাবিকের থেকে বেশি। তিনি অক্লেশে গণিতের ও বিজ্ঞানের নানাসূত্র বোঝেন। গড়গড় করে গীতাও আওড়াতে পারেন। কিন্তু যেহেতু তিনি পরিবেশের ও সমাজের মত করে নিজেকে তৈরি করতে পারেননি তাই তাঁকে প্রকৃত বুদ্ধিমান বলা যাবে না।

দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব পরস্পরের পরিপূরক হয় না। তেমনি বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব রূপ ও স্বাস্থ্যের ওপরেও নির্ভর করে না। প্রতিভাবান ব্যক্তিদের অনেকেই দৈহিক প্রতিবন্ধী ও কুদর্শন। অনেক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়তো মূক অথবা বুদ্ধি শুদ্ধি কম।

বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব এক সঙ্গে মিশে একটি আদর্শ মানুষ তৈরি করে। অনেক সময় প্রতিভাবান ব্যক্তিরা নিজেদের নিঃসঙ্গ মনে করেন। তাঁরা সমমনস্ক এমন কোন বন্ধু পান না যাঁদের সঙ্গে প্রাণখুলে তাঁদের ভাষায় কথা বলতে পারেন। এটি তাঁদের এক রকম ব্যর্থতা, কারণ পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে তিনি নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না। তাঁরা কেউ কেউ নির্জনে বাস করেন। কেউ সমাজ সংসারের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আধ্যাত্মিক মুক্তি খোঁজেন। কেউ বা আত্মহত্যা করেন।

আবার অন্যদিকে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি যথেষ্ট সামাজিক। সমাজের মানুষের সঙ্গে মিশে আনন্দ পান। সমাজকে বদলাতে চেষ্টা করেন। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

সারা পৃথিবীতেই বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ স্ববিচ্ছিন্ন। জনসাধারণকে তাঁরা mass বলে ঘৃণা করেন। তাঁদের মতে এই mass বা গণ এক দেহহীন অবয়বহীন সত্তা। যারা শুধু জড়জীবনের মধ্যেই আনন্দ খোঁজে। বুদ্ধির চর্চায় যারা উৎসাহী নয়। অন্যদিকে তাঁরাই হলেন বুদ্ধিজীবী, বৌদ্ধিক চর্চায় দিনপাত করাই যাঁদের জীবনধারণের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁরা নানা ধরনের তত্ত্ব দিয়ে জড় ও চেতন জগতের ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা মনে করেন সভ্যতার প্রকৃত বিবর্তন ঘটে থাকে চিন্তার রাজ্যে। আর সেই চিন্তার রাজ্যে আলোড়ন তোলাই তাঁদের কাজ। পক্ষান্তরে বিরাট বিশাল জনসমষ্টি দৈহিক সুখের বাইরে সেই জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে অচেতন।

দুই

ব্যক্তিত্বের উৎস সন্ধানে

অনেককাল আগে আমার এক সাংবাদিক সহকর্মী বন্ধুর বিয়ের জন্য খবরের কাগজ পড়ে পাত্রী খুঁজছিলাম। এক জায়গায় দেখলাম একটি পাত্রীর বর্ণনায় লেখা : পাত্রী (২৭) বি.এ. পাশ; উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা; স্বাস্থ্যবতী এবং ব্যক্তিত্বশালিনী। আমার পাত্রীর বর্ণনা পছন্দ হল। কিন্তু বন্ধু বিবরণ পড়ে এক কথায় পাত্রী নাকচ করলেন। বললেন : একে ২৭ বছর বয়স তার ওপর ব্যক্তিত্বশালিনী। স্বাস্থ্যবতী আর উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা মানে ধুমসো কালো এক মহিলা। তদুপরি তার ব্যক্তিত্বের দাপটে বাড়িতে কাক চিল বসতে পারবে না। পত্রপাঠ 'ব্যক্তিত্বশালিনী' বাতিল হলেন।

ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা সাধারণের মতে : 'অহংকার' একটা ডোন্টকেয়ার ভাব। বন্ধুটি এই প্রচলিত ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন।

আসলে ব্যক্তিত্ব বলতে সাধারণত বোঝায় একজন ব্যক্তি সম্পর্কে অন্যের ধারণা। এই ধারণাটা একদম ওপর ওপর (Superficial) ও বাইরের ব্যাপার (external)। এই ধারণাটা হয় কথা বলা, কণ্ঠস্বর, পোশাক, রূপ, চলাফেরা কাজকর্মের ধারণা বা স্টাইল, চেহারা এবং উচ্চতার ওপর।

ব্যক্তি থাকলেই তার ব্যক্তিত্ব থাকবে। কিন্তু ওপরের গুণগুলি যদি আমরা কারও মধ্যে ইতিবাচক দেখি তখনই বলি ব্যক্তিত্বশালিনী বা ব্যক্তিত্বশালী। তবে সবাইকে ছাপিয়ে ব্যক্তিত্বের একটি উজ্জ্বল দিক ফুটে ওঠে তা অন্যকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা। যার দ্বারা মুগ্ধ হয়ে আমরা বলি ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব আছে। একেই আমরা আটপৌরে ভাষায় বলি ব্যক্তিত্বশালী। কিন্তু ব্যক্তিত্বের উপরোক্ত দিকগুলি বহিরঙ্গের দিক।

ব্যক্তিত্ব যা কথায়-বার্তায়, আচার-আচরণে পোশাক-পরিচ্ছদে ফুটে ওঠে, তা অর্জন করা যায়। এগুলি এত পরিবর্তনশীল এবং এর প্রতিক্রিয়া অপরের ওপর এত সাময়িক যে অভিনয় করে অপরের চোখে সহজেই ধুলো দেওয়া যায়। অথবা অপরকে সহজে ইমপ্রেস করা যায়। চাকরির ইন্টারভিউ দেবার সময় অনেকে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে স্যুট ধার করে পরে যান। তিনি কখনও জীবনে স্যুটবুট পরেননি। কিন্তু সাহেবি ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য তিনি এটা করেন এবং সফলও হন। এইসব কারণে ব্যক্তিত্ব আসলে একটি মুখোশ।

মুখোশ আর মুখ

ব্যক্তিত্ব কথাটার উৎপত্তি ল্যাটিন শব্দ Persona থেকে। Persona শব্দটির মানে হল মুখোশ। Persona থেকে Personality অর্থাৎ মুখোশত্ব। তার মানে কে কেমন মুখোশের যথাযথ ব্যবহার করতে পারছে। আমি একবার আথেন্সে সফোক্লিশের একটি ধ্রুপদী গ্রিক নাটক দেখেছিলাম। সেখানে চরিত্রগুলির প্রত্যেকের হাতে একটি করে মুখোশ। যখন কারও সঙ্গে কথা বলছে মুখোশটি পরে নিচ্ছে।

মুখোশের বাইরে পাওয়া যায় সত্যিকারের মানুষটিকে যাকে বলতে পারি 'আমার আমি'। নইলে সমাজে চলতে গেলে ভদ্রতার মুখোশ এঁটে চলতে হয়। অধস্তনদের সঙ্গে হম্বিতম্বি করতে হয়। নারীর মন জয় করতে গেলে আন্তরিকতার অভিনয় করতে হয়। সব প্রেমিক-প্রেমিকাই বলে : তোমার জন্য আমি জীবন দিতে পারি। আকাশের চাঁদ ধরে এনে দিতে পারি। সেই যে একটা জোক পড়েছিলাম, প্রেমিকা-প্রেমিককে চিঠি লিখছে, তোমার জন্য আমি সাগর পাড়ি দিতে পারি। যে কোন বাধা তুচ্ছ করে তোমার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে পারি। আজ তুমি সন্ধ্যার ছটার সময় মেট্রোর সামনে দাঁড়াতে বলেছ। আমি নিশ্চয়ই দাঁড়াব। অনেকদিন তোমায় দেখিনি। আমি ঠিক সময় পৌঁছব। তবে বৃষ্টি হলে যেতে পারব না।

তবে সকলেই যে কৃত্রিম ব্যক্তিত্বের মুখোশ পরে সব সময় ঘুরে বেড়ায় তা নয়। আন্তরিক প্রেমিক-প্রেমিকাও তো আছে। যারা পরস্পরকে ছাড়া বাঁচতে পারে না। তাই বিবাহে বাধা পেলে যুগল আত্মহত্যা করে। আবার কত ছেলেমেয়ে আছে যারা প্রেমের অভিনয় করে, এক সঙ্গে ঘুরে, অনেক রোম্যান্টিক কথাবার্তা বলে, অনেক ক্ষেত্রে দৈহিক সান্নিধ্য ভোগ করে শেষ পর্যন্ত শাঁসালো শ্বশুর দেখে বিয়ে করে অথবা ভবিষ্যতের কথা ভেবে অনাবাসী কোনও ছেলেকে বিয়ে করে অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, কিংবা মার্কিন মুলুকে চলে যায়।

ব্যক্তিত্ব যে মুখোশ, কর্মজীবনে তার অসংখ্য প্রমাণ ছড়িয়ে আছে। সেলসম্যানকে খদ্দেরের কাছে মাল গছাতে গেলে আন্তরিক এবং মধুর ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে হয়। দোকানে যদি শাড়ি কিনতে যান দেখবেন, তুখোড় সেলসম্যান এক মিনিটের মধ্যে আপনার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলেছেন এবং এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে আপনি যাতে কম দামে এক নম্বর মালটি পান সেটি নিশ্চিত করার জন্যই ঈশ্বর তাঁকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। গাঁটের পর গাঁট খুলে শাড়ি দেখিয়ে আপনাকে বিভ্রান্ত করার পর একটি খেলো মাল চড়া দামে গছানো যে তার শেষমেশ উদ্দেশ্য তা তাঁকে দেখে কে বলবে?

তারপর আপনি সন্তুষ্ট হয়ে প্যাকেটটি নিয়ে চলে যাবার পর তিনি এক চোট হেসে নেন।

চোরকে তার অপরাধী ব্যক্তিত্বকে গোপন করার জন্য অতি-ভক্তি দেখাতে হয়। সংসারে স্বামীকে স্ত্রীর কাছে, স্ত্রীকে স্বামীর কাছে আন্তরিক প্রেমিক সাজতে হয়। স্বামী যদি বার বার ঘ্যান ঘ্যান করে স্ত্রীকে না বলেন, 'তোমাকে ভীষণ ভালবাসি।' তুমি আমার জীবনে এসেছ বলে আমি তরে গেলাম', তাহলে স্ত্রীর মনেও সন্দেহ হয় স্বামী তাকে সত্যিই ভালবাসে তো? না তলে তলে কারও সঙ্গে আশনাই করছে। পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস নেই।

বসের কাছেও অধস্তনকে ভাণ করতে হয় তিনি তার কতখানি অনুগত ভৃত্য। কাজের মধ্য দিয়ে আন্তরিকতার প্রমাণ সবক্ষেত্রে গ্রাহ্য নয়। কথাবার্তা এবং আচরণের মধ্য দিয়ে সর্বত্র সমীহ ভাব ফুটিয়ে তুলতে হয়। সবাই যে সমান এই তত্ত্ব কর্মজীবনে অচল। বস বেশি সমান।

মিলিটারি প্যারামিলিটারি ও পুলিশ বিভাগে ব্যক্তিত্বের আনুষ্ঠানিক বিভাজন হয়ে গিয়েছে। এখানে যাঁর যত পদমর্যাদা তাঁকে তত গম্ভীর, বদমেজাজী এবং অধস্তনের প্রতি অকারণে রূঢ় হতে হয়। অধস্তনও আবার র‍্যাঙ্ক বা পদমর্যাদা অনুসারে খাতির ও সমীহের তারতম্য ঘটান। আমি আই পি এস অফিসারদের দেখতাম অধস্তনদের সঙ্গে সব সময় ধমকে কথা বলছেন। এক অফিসারকে দেখতাম কাগজে সই করার পর কাগুজগুলি হেলাভরে মাটিতে ফেলে দিচ্ছেন, আর কেরানিবাবু টেবিলের তলা থেকে সেগুলি কুড়িয়ে নিচ্ছেন। অথচ ভদ্রলোক যখন আমার সঙ্গে কথা বল্‌ছেন তখন খুব ভদ্র, মিষ্টভাষী। আমি তাঁকে বললাম আচ্ছা আপনি সব সময় অধস্তনদের ধমক দেন কেন? তিনি বললেন, ওদের সঙ্গে এভাবে কথা না বললে ওরা মানতে চাইবে না। এ লাইনে এটাই কালচার। ভদ্রভাবে কথা বললে পেয়ে বসবে। আসলে অধস্তনের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত হতে দিতে

সাজলে গুজলে আমায় ভালই দেখায়

চান না উপরওয়ালারা। অধস্তনরাও জানে ওপরওয়ালাদের কাছে কেন্নোর মত গুটিয়ে থাকতে হয় এবং যত উঁচু অফিসার তাঁকে তত বেশি খাতির করতে হয়। খাতির জানাবার একটা বড় উপায় ঘন ঘন স্যালুট আর কথায় কথায় স্যর স্যর করা। কিন্তু এই মানুষই আবার সাধারণ মানুষের কাছে অন্যমূর্তি ধরেন। ব্যক্তিত্বের এই তাৎক্ষণিক পরিবর্তন তাদের সহজাত। একটা মজার গল্প বলি। তখন আনন্দবাজারে রিপোর্টারি করি। কী একটা খবরের

জন্য আমি অফিসের গাড়ি নিয়ে হাসনাবাদ থানায় গিয়েছি। তখন বিকেল। গাড়িটা ছিল জিপ। জিপটা থানা চত্বরে নামামাত্র সবাই তটস্থ হয়ে উঠল। জিপ থেকে আমি নেমে কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে গট গট করে হেঁটে সেন্ট্রিকে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলাম : বড়বাবু কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রি আমাকে বড় পুলিশ অফিসার ভেবে খটাস করে একটা স্যালুট দিয়ে বলল : বড়বাবু তাঁর অফিসে আছেন। আমি সেই রকম ভাবে গটগট করে সোজা ওসির ঘরে ঢুকে বললাম : আপনি ওসি? পিছনে পিছনে সেন্ট্রিও এসেছে। বড়বাবু আমার পোশাক-আসাক ও ব্যক্তিত্ব দেখে ভাবলেন নির্ঘাৎ কোন বড় অফিসার, থানা পরিদর্শনে এসেছেন। তিনিও সর্বপ্রথম খটাশ করে একটি স্যালুট ঠুকলেন। তারপর বললেন : আমি ওসি স্যার।

আমি এবার ভাবলাম অনেকখানি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। আর এগুনো ঠিক হবে না। এবার বললাম : আমি আনন্দবাজারের রিপোর্টার।

এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ওসি যেমন অপ্রস্তুত হলেন, তেমনি রেগে গেলেন। একজন বিনয়ী অধস্তন অফিসারের ব্যক্তিত্ব মুছে গিয়ে এক জাঁদরেল ঘাগু দারোগার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠল তার মুখেচোখে। বুঝতে পারলাম অপাত্রে স্যালুট গেল ভেবে তিনি প্রচণ্ড রেগে রয়েছেন। পারলে আমরায় চিবিয়ে খান, কিন্তু রিপোর্টার অবধ্য বলে তিনি কিছুই করতে পারলেন না। শুধু গম্ভীরভাবে বললেন : বসুন।

ব্যক্তিত্ব যদি মুখোশ হয় তাহলে ভালমত মুখোশ পরতে পারলেই অন্যের চোখে প্রথম ধারণাটি পালটে দেওয়া যায়। অন্যকে বিভ্রান্তও করা যেতে পারে কৃত্রিম ব্যক্তিত্ব দেখিয়ে। যেমন আমি হাসনাবাদ থানার সেন্ট্রি ও বড়বাবুকে করেছিলাম। চতুর ও প্রতারকরা এইভাবে অন্যের চোখকে ধোঁকা দিতে পারে। এ ব্যাপারে সহায়ক হয় পোশাক ও চেহারা। আমি যদি উধর্ধতন আই পি এস বা আই এস-দের মত পোশাক না পরতাম (মোটামুটি ভাল একটা ফুলপ্যান্ট আর বুশ শার্ট অথবা স্যুট-বুট। যদিও এরাজ্যে অফিসারদের মধ্যে খুব কম জনই স্যুট-বুট পরেন।) তাহলে আমাকে 'তেনারা' এস পি বা ডি আই জি বলে ভুল করতেন না। এলিজাবেথ হারলক বলেছেন, ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে লোকের মনে একটা বাধা ছক কাজ করে (স্টিরিওটাইপ)। এই স্টিরিওটাইপ গুলি উড়িয়ে দেবার মত নয়। তবে এগুলি থাকলেই যে ব্যক্তিত্ব থাকবে, না থাকলে ব্যক্তিত্ব তৈরি হতে পারবে না। এটা বলা ঠিক হবে না।

এবার ব্যক্তিত্বের স্টিরিওটাইপ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা যাক।

ব্যক্তিত্বের স্টিরিও টাইপ

আগেই বলেছি দুজনের ব্যক্তিত্ব সমান হয় না। তবে উভয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা মিল থাকতে পারে। এই কমবেশি মিল যাদের যাদের মধ্যে আছে তাদের নিয়ে একটা করে স্টিরিও টাইপ গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে। এই স্টিরিওটাইপ কখনও গুণভিত্তিক, কখনও পেশা-ভিত্তিক, কখনও জাতি-ভিত্তিক, কখন বা আর্থিক আয় ভিত্তিক।

অ্যারিস্টটলের সুযোগ্য ছাত্র থিওফাসটাস (Theophastus) ব্যক্তিত্বকে ত্রিশভাগে ভাগ করেছেন। এদের মধ্যে Miser বা 'কিপ্টে' ব্যক্তিত্বের একটা টাইপ। আর একটা

টাইপ হল Boor অর্থাৎ 'মাথা-মোটা'। এগুলো গুণবাচক টাইপ। কিপ্টেরা কেমন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় তা আমরা জানি। এদের নিয়ে নানা গল্প চালু আছে। স্টিরিওটাইপ কিপ্টে কোন্ কোন্ বিশেষ জাতির লোক হয় তাও বলা হয়। যেমন আইরিশরা নাকি ভীষণ কৃপণ হয়, তাদের নিয়ে নানা গল্প চালু আছে। ইহুদিরাও ধনী কিন্তু কৃপণ। স্বয়ং শেক্সপিয়রই মার্চেন্ট অব ভেনিসে তাঁর ইঙ্গিত দিয়েছেন।

থিয়োফাসটাস যে ত্রিশ ধরনের ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন তা সমগ্র মানবজাতি সম্পর্কে অবশ্য প্রযোজ্য নয়। তখনকার নগররাষ্ট্র এথেন্সের মানুষজন সম্পর্কেই তিনি ব্যক্তিত্বের ওই শ্রেণী বিভাগ করেন।

গ্রিসের নগর রাষ্ট্রে এক ঐক্যমুখী (homogeneous) সমাজের মধ্যে কীভাবে এই সাড়ে বত্রিশ ভাগ রকমের ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হল থিয়োফাসটাস তা নিজেই ভেবে পাননি।

আধুনিক কালের মনোবিদরা ব্যক্তিত্বের বিভাজন করতে গিয়ে একই ব্যক্তিত্বের চুলচেরা বিভাজন করেছেন। যেমন হিটলারের ইহুদি নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা 'প্রভুত্বকামী ব্যক্তিত্বের' কথা বলেই ক্ষান্ত হননি। ওই প্রভুত্বকামী ব্যক্তিত্ব আবার কত রকমের তার ধারো বিশ্লেষণ করেছেন। দেখা গেছে প্রভুত্বকামী ব্যক্তিত্ব তাঁদের কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চায় অধস্তনদের ওপর। কিন্তু ওপরওয়ালাদের তারা স্যর স্যর করে সর্বদা তেল মাখায়। 'Sycophantic to Superiors, ruthless to inferiors' তাছাড়া তারা ভীষণভাবে আইন মেনে চলে।[৫] আইন বা বিধি নির্দেশ তাদের কাছে কণ্ঠস্থ। আইনের দোহাই দিয়েই তারা ডিক্টেটরশিপ চালায়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আর এক ধরনের ব্যক্তিত্ব টাইপ তৈরি করেছেন। এদের বলা হচ্ছে টাইপ এ (Type A)। ফ্রেডম্যান ও রোজ ম্যান নামে দুই মনোবিজ্ঞানী ১৯৭৪ সালে মডেলটি তৈরি করেন।

টাইপ এ ব্যক্তিত্বের লোকেরা খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী হন, কঠোর পরিশ্রম করতে পারেন। একটা কিছু ধরলে সেটা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ তারা সেটায় লেগে থাকেন অর্থাৎ তাঁরা assertive[৬]

যাঁরা উঁচুপদে কাজ করেন যেমন, বড় সংস্থার ডাইরেক্টর, বড় সংস্থার চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, নামী পেশাদার ব্যক্তিদের অনেকেই এই টাইপ 'এ' ব্যক্তিত্বের মানুষ। এঁরা সহজেই হৃদরোগের শিকার হন। কারণ অত্যধিক স্নায়ুর ওপর চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে যা যা করা দরকার তা তাঁরা করেন না।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজে পদমর্যাদা, আয় ও সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অনুসারে শ্রেণী ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়। সমাজতত্ত্ববিদ মাইকেল হ্যারামবস (Michael Haralambos) তাঁর সম্পাদিত একটি গ্রন্থে দেখিয়েছেন, ওয়ার্কিং ক্লাশ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হবার ফলে একই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের হেরফের ঘটে। ওয়ার্কিং ক্লাশের লোকেরা বলে "Quesera. Sera"—যা হবার তা হবে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলে, ধৈর্য ও মনোবল থাকলে অবস্থা ফেরানো যায়।[৭]

ব্যক্তিত্ব মাপার চেষ্টা

উচ্চতা এবং ওজনের মত ব্যক্তির বুদ্ধি বৃত্তি ও তা থেকে সঠিক ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করার একটা চেষ্টা চলছে। এই আই.কিউ টেস্ট বা বুদ্ধির পরীক্ষা যে নিখুঁত তা কিন্তু বলা যাবে না। এই পরীক্ষা গাণিতিক বোধের ওপর নির্ভরশীল। ভাল ছাত্ররা গণিতে ভাল হয়। কিন্তু যে ছেলেটি অঙ্কে একশ পায় আর যে ৩০ পায় দুজনের আই কিউ এর আশমান জমিন ফারাক ধরা পড়বে কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে লোকটি তত বোকা নাও হতে পারে। গণিতে তেমন কাণ্ডজ্ঞান নেই এমন অনেক লোক বড় জজ ব্যরিস্টার লেখক, কবি সাংবাদিক ও অধ্যাপক হয়েছেন। গাণিতিক ভিত্তিতে আই কিউ নিলে আমি নির্ঘাৎ পয়লা নম্বর নির্বোধ বলে প্রমাণিত হবো। কিন্তু আদপে অতটা নির্বোধ হলে এই বাজারে একদম করে খেতে পারতাম না। আসলে বোধি থেকে তো বুদ্ধি এসেছে। তার মানে বুঝতে পারা। আমি কোন জটিল তত্ত্ব বুঝতে পারি না কিন্তু সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে ছোটখাটো ব্যাপার ধরতে পারি। এই সাধারণ বুদ্ধিকে অনেকে 'অসাধারণ' বলেন। এটা এক ধরনের সহজাত বুদ্ধি। এর সঙ্গে কেতাবি শিক্ষার সম্পর্ক নেই। এই সাধারণ বুদ্ধির জোরেই দেশের পঞ্চাশ শতাংশ নিরক্ষর লোকও দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে।

অভিজ্ঞতা ও সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে বহু লোক-ব্যবসা বাণিজ্য করে কোটিপতি বনে যাচ্ছেন। সামান্য শিক্ষিত, স্কুল কলেজের ড্রপ আউট এমন বহু লোক রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তাঁরা অনেকে বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রী হচ্ছেন। কিন্তু কেতাবি বিদ্যা অল্প বলেই তাঁরা যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসফল তা বলা যাবে না। আকবর ও শিবাজী নিরক্ষর থেকেও প্রথম শ্রেণীর শাসক হয়েছেন। সে দিক থেকে যিশু কিংবা রামকৃষ্ণেরও কেতাবি শিক্ষা ছিল না। সমরেশ বসু গৌরকিশোর ঘোষের ডিগ্রি নেই বলে সাহিত্য প্রতিভায় খামতি পড়েনি। তবে কি কেতাবি শিক্ষার দাম নেই? বিদ্যার মূল্য নেই। তা কেন? বিদ্যা মানুষের সহজাত বুদ্ধিকে ঔজ্জ্বল্য দেয়, শাণিত করে। সেই সঙ্গে দেয় আত্মবিশ্বাস যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে ঝকঝকে করে তোলে। প্রতিভাবানদের কথা ধরছি না, একজন সাধারণ অশিক্ষিত মানুষ ও একজন শিক্ষিত মানুষকে পাশাপাশি রাখুন, তাদের দুজনের মুখ দেখেই বুঝতে পারবেন কে শিক্ষিত কে অশিক্ষিত।

অনেক কুদর্শন পুরুষ ও নারী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করলে তাদের ব্যক্তিত্ব এমন দীপ্তিময় হয়ে ওঠে যে তাদের চেহারার ত্রুটিগুলি আর চট করে ধরা পড়ে না। যেমন দেওয়ালের গঠন যত নড়বড়েই হোক না কেন এবং যত নিকৃষ্ট মাল-মশলা দিয়ে তৈরি হোক না কেন, রঙ করলে সব ত্রুটি ঢেকে যায়, বাইরের ঝকঝকে ভাবটাই বড হয়ে ওঠে। সেজন্য গাণিতিক পদ্ধতির ওপর জোর না দিয়ে অনেক মনোবিদ বুদ্ধি তথা ব্যক্তিত্ব মাপার অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেন। এখানে বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্ব মগজের বুদ্ধিরই বহিঃপ্রকাশ। নির্বোধের ব্যক্তিত্ব কখনই সম্পূর্ণ হতে পারে না।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর উডওয়ার্থ প্রথম ব্যক্তিত্ব (বুদ্ধি নয়) মাপার উপায় উদ্ভাবন করেন। প্রথমে তিনি কতগুলি প্রশ্ন তৈরি করে নিয়েছিলেন। ওই প্রশ্নগুলি করা হয়েছিল জার্মান সৈন্যদের জন্য। ক্রমাগত যুদ্ধের চাপের মধ্যে থাকার ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা ঘটছে কি না সেটা দেখাই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য। অনেকটা চাকরির Self

appraisal এর মত। ব্যক্তিকে বলা হত, তোমার নিজের সম্পর্কে জানাও। যেমন তুমি কতখানি সৎ, কতখানি বন্ধুবৎসল, তোমার মধ্যে উৎকণ্ঠার (anxiety) পরিমাণ কত? বৈরীভাবও বা কত (hostility) এবং তোমার আবেগপ্রবণতা কতখানি? এইসব প্রশ্নের পাঁচটি করে উত্তর দেওয়া ছিল। উত্তরদাতা যে কোনটিতে টিক মার্ক দিতেন। তা থেকে একটা পরিসংখ্যান বার করা হত। নিজের নিজের মত করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কালের অগ্রণী মনোবিদ রেমন্ড বি ক্যাটেল, হ্যানস, অঙ্গিসঙ্ক প্রমুখ এই ধরনের টেকনিক প্রয়োগ করে ব্যক্তিত্বের পরিমাণ করতেন।

কার্ল ইয়ুং ব্যক্তিত্বকে দুভাগে ভাগ করেন। বহির্মুখী (extroverts) ও অন্তর্মুখী (introverts) ওই সময়ই তৎকালীন মনোবিদরা 'নিউরোসিস' শব্দটির সঙ্গে সাধারণের পরিচয় ঘটিয়েছেন। যাঁরা অতিমাত্রায় উৎকণ্ঠায় ভোগেন তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না। তাঁরা নিউরোটিক। আইসেঙ্ক নিউরেটিক সৈন্যদের ব্যক্তিত্ব নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ক্যাটেল[৮] ব্যক্তিত্বের পরিমাণকে আরও ছোট করে আনলেন। শুধু extravert বললে হবে না কী ধরনের extrovert সেটা ব্যাখ্যা করতে হবে। কেউ আলোচনার সময় নিজেই বেশি কথা বলে। আর কাউকে বলতে দেয় না। কেউ গ্রুপের মধ্যে নেতৃত্ব দেবার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কেউ আবেগতাড়িত (impulsive)। ক্যাটেল ব্যক্তিত্বের ১৬টি প্রলক্ষণ ধরে সেগুলি কার মধ্যে কতমাত্রায় আছে তার মাত্রা বিচার করলেন। এগুলি 16PF নামে পরিচিত। ক্যাটেলের মতে চার ধরনের ব্যক্তিত্ব থেকেই ওই ১৬টি ব্যক্তিত্ব পাওয়া যাবে। এই চারধরনের ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণ হল : উৎকণ্ঠা, কঠোরতা, অনুভূতি প্রবণতা ও নির্ভরতা (anxiety, toughness, sensitivity and dependence–independence.)

উৎকণ্ঠাকে মনোবিদরা anxiety নাম দিয়েছেন। anxiety বলতে তাঁরা উৎকণ্ঠার সঙ্গে উদ্বেগও বোঝান। এত রাত হল ছেলে কেন বাড়ি ফিরল না। এটা যেমন উৎকণ্ঠা তেমনি শনি ও রাহু এমন বক্রী হয়ে বসে আছে যে এই শুভকাজটা কিছুতেই সুষ্ঠুভাবে হবে না এই চিন্তাও উৎকণ্ঠা। আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রমহিলা ছিলেন। তিনি নিউরোটিক হয়ে যান। সব সময় জিজ্ঞাসা করতেন, কটা বাজল বলতো, আমার ছেলে তো বাড়ি ফিরল না। তিনি প্রতিবেশীর বাড়িতে টেলিফোন করতে ছুটতেন। এই ধরনের উৎকণ্ঠিত ব্যক্তিত্বের নানা ধরনের প্রকাশ আছে। ছোটবেলায় কোন কাজের জন্য অপরাধবোধ মনের মধ্যে জেগে থাকলে উৎকণ্ঠা বাড়ায়। নিজের সম্পর্কে নিশ্চিত না থাকলে, আত্মবিশ্বাসের অভাব ঘটলে উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটে।

Anxiety কথাটা ফ্রয়েড ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফ্রয়েডের মতে যতক্ষণ কারও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি না ঘটছে ততক্ষণ এই anxiety বা উৎকণ্ঠা থেকে যাবে। ধরুন শহরে একটা ভাল সিনেমা এসেছে। সেটা আপনার খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কোন কারণে আপনার দেখা হয়ে উঠছে না। আপনার ভেতরে ভেতরে একটা উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হবে। যতক্ষণ না সেটা দেখছেন, ততক্ষণ তার নিবৃত্তি হবে না। ইচ্ছার (desire) পরিমাণ যত, তীব্র উৎকণ্ঠার পরিমাণও তত তীব্র। আপনি যদি ক্ষুধার্ত হন, যতক্ষণ না খাচ্ছেন ততক্ষণ উৎকণ্ঠা থাকবে। আবার যেমন তেমন করে ক্ষুধা নিবৃত্তি করলে তৃপ্তি হবে না,

উৎকণ্ঠা থেকেই যাবে। আপনি রাতে রোজ রুটি খান, ভাত খেলে পেট ভরবে তবে উৎকণ্ঠার অবসান হবে না। Gold Rush ছবিতে খিদের জ্বালায় চার্লি চ্যাপলিন খুব তৃপ্তি করে জুতো সিদ্ধ করে খাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁর উৎকণ্ঠা থেকেই গিয়েছিল। এমনকী যিনি নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন, তাঁকে একটা টিভি কিনে দিলে তাঁর নিঃসঙ্গতা কিছুটা প্রশমিত হবে। কিন্তু সামনাসামনি পরিচিত ও সমমর্মী মানুষের সঙ্গে কথা বলার আরাম কী আর টিভি-তে পাওয়া যাবে? উৎকণ্ঠা প্রশমিত হবে, নির্মূল হবে না। তেমনি কারও যদি জীবনের কোন উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে জীবনটা ফাঁকা ফাঁকা লাগে না কি? তখন আপনার আত্মীয়-স্বজন ইয়ার-বকসি কাউকে ভাল লাগবে না। আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সময় আমার কাছে অনেক ছাত্র ছাত্রী আসত, যাদের জীবনের লক্ষ্য খুব স্পষ্ট নয়। একবার আমার এক ছাত্রীকে ডেকে পাঠালাম। সে পড়াশোনায় অমনোযোগী। ২৪ বছর বয়সেও তার মধ্যে যথার্থ সুপরিণত ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়নি। প্রশ্ন করতে করতে কারণ জেনে ফেললাম। স্কুলজীবনে তার ডাক্তারি পড়ার ইচ্ছা ছিল। সুযোগ হয়নি। তারপর বিকল্প পথের সন্ধান কেউ তাকে দেয়নি। পড়তে হয় পড়ে গেছে। এইভাবে ভাসতে ভাসতে সে মাসকমিউনিকেশনে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু এখনও লক্ষ্য ঠিক করতে পারছে না। সে এখন বি এড পড়ার কথা ভাবছে। আমি তাকে ধমক দিয়ে বি এড পড়া বন্ধ করলাম। তারপর তাকে তিন-চার দিন ধরে কাউনসেলিং করে তার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দিলাম। দেখলাম তার anxiety র পরিমাণ ক্রমশ কমে আসছে। চাকরি পাবার পর সেটা শূন্য হয়ে যাবে। ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন আসবে। ফ্রয়েডের মতে মানুষের সব আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। কারণ আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। সব তরুণরাই মনে মনে কল্পনা করে অমুক ফিল্ম আকট্রেস যদি আমার বউ হত। মেয়েরা ভাবে অমুক হিরো যদি আমার বর হত। বাস্তবে তা হওয়া সম্ভব নয়। তাই ওই সব ইচ্ছাকে লোকে মুছে ফেলার চেষ্টা করে। কিন্তু বাসনা তো মুছে ফেলা যায় না। তার চিরস্থায়ী অবসান ঘটাতে গেলে বুদ্ধদেবের মত তপস্যা করা দরকার। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে কী হয়? তাদের বাসনা অবচেতন মনে চলে যায়। কিন্তু অবচেতন মন থেকে যে কোন সময় ওই বাসনা আবার চেতন মনে উঠে আসতে পারে। তখন চেতন মনে উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ দেখা দেয়। অনেক সময় এই ধরনের উৎকণ্ঠার প্রকাশ ঘটে শারীরিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে।

ডেভিড লেস্টার নিজের জীবনের একটি ঘটনা থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। ভাষান্তর ঘটিয়ে ঘটনাটি বলি।

'একবার আমি হাসপাতালে অসুস্থ মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। মায়ের পরদিন বড় অপারেশন হবে। মায়ের বেডের কাছে যেতেই আমার হঠাৎ anxiety attack হল। মনে হল আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমার একটু খোলা হাওয়া দরকার। তাড়াতাড়ি আমি সেখান থেকে উঠে বাইরে খোলা হাওয়ায় এসে বাঁচলাম। পরে আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, সে সময় আমার মধ্যে অবচেতন মন থেকে কোন বাসনা উঠে এসেছিল কি? আমার মা সে সময় খুব ভয় পেয়েছিলেন। কারণ পরদিন অপারেশন হবে। তিনি চেয়েছিলেন, আমি তাঁকে জড়িয়ে ধরি। আমি তাকে জড়িয়ে ধরতে পারিনি। কেন? সেটাও আর একটা অবচেতন মনের বাধার জন্য। আমার যখন চার-পাঁচ বছর বয়স তখনকার

কোন অবদমিত যৌন আকাঙ্ক্ষার জন্য? আমার ভেতরে ভেতরে একটা চাপা ক্রোধ জন্মেছিল মায়ের বিরুদ্ধে? নিশ্চয়ই সেইরকমই কিছু একটা হবে। তা না হলে কেন আমি মাকে দেখামাত্র অমন উৎকণ্ঠায় আক্রান্ত হলাম?'
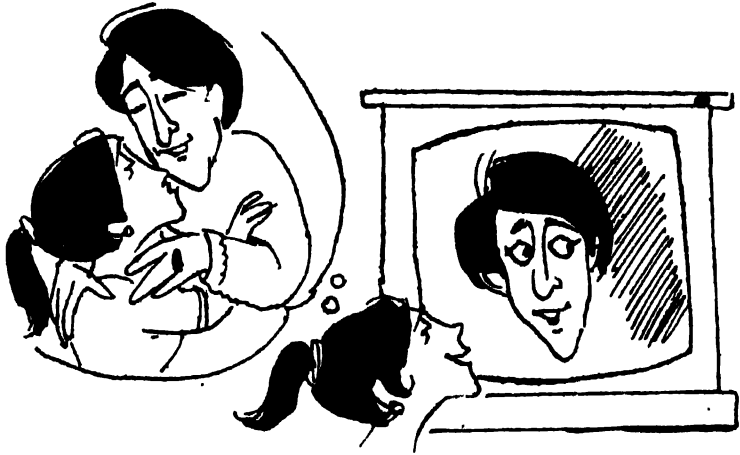
আহা ও যদি আমাব বর হত

ফ্রয়েডের মতে এই **উৎকণ্ঠা** আমাদের ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমাদের ব্যবহার ও আচরণের ক্ষেত্রে যে সব ব্যতিক্রম দেখা দেয়, মুডের যে ওঠানামা হয়, তার পিছনে আছে ওই উৎকণ্ঠার আক্রমণ।

এজন্য মানুষ অবচেতন ভাবেই তার উৎকণ্ঠার পরিমাণ কমিয়ে আনার জন্য নানা ব্যবস্থা নিয়েছে একে বলে System Principle।

ডেভিড লেস্টার একে ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে, 'এটা করতে গেলে আমাদের অবচেতন মনের ইচ্ছাকে আগে পূরণ করতে হয়। এই 'ইচ্ছাপূরণ' সচেতন মনের অগোচরে ঘটে চলে। এর ফলে মানুষ অনেক খ্যাপামি করে।'[১০]

কেউ হয়তো খিটখিটে। কারণ শৈশবে তার অনেক ইচ্ছাপূরণ হয়নি। হয়তো বাবা মা তাকে মারধর করতো। বন্ধুরা তাকে খেলায় নিত না। তাকে নিয়ে ঠাট্টাতামাশা করত। তার শরীর দুর্বল বলে বন্ধুরা তাকে অত্যাচার করত। সেজন্য তার চেতন মন বড় হয়ে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে। সে সবাইকে আক্রমণ করছে। এতে করে সে মেজাজ না দেখালে, মাথা গরম না করলে কিছুতেই স্বস্তি পায় না। তার ক্রমাগত anxiety হতে থাকে। মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে, অন্যদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করলে, অপমান করলে তবেই তার শান্তি হয়। ব্যক্তিত্বের ওপর এইভাবেই অবচেতন মনের প্রভাব পড়ে। বিশেষ করে এই নিউরোটিক লোকগুলো কোন সফল লোক দেখলে ভেতরে ভেতরে তেলেবেগুনে

জ্বলে ওঠে। ফ্রয়েডের কথা মত যখনই বাসনার নিবৃত্তি না হবে তখনই anxiety বা উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। বাসনার তো অন্ত নেই। যিনি রাজনীতি করেন তাঁর মন্ত্রী হবার বাসনা, যিনি আনন্দ পুরস্কার পেয়েছেন, তাঁর বাসনা জ্ঞানপীঠ, যিনি জ্ঞানপীঠ পেয়েছেন তিনি নোবেল পুরস্কার পেতে চান। যদি এই সব আশা না পূরণ হয় তখন অশান্তির বেদনা বুকে বড় লাগে। ততই উদ্বেগ বেড়ে যায়। আকাঙ্ক্ষা সবার মধ্যেই কম বেশি থাকে। আকাঙ্ক্ষার পরিমাণ, তার পূরণ অথবা পূরণে ব্যর্থতার ওপর নির্ভর করবে ব্যক্তিত্বের ওঠা পড়া। আকাঙ্ক্ষা জৈবিকও হতে পারে। ক্ষুধার্তের আকাঙ্ক্ষা শুধু উদর পূরণের। নিঃসঙ্গ মানুষের আকাঙ্ক্ষা সঙ্গের। অন্তর্মুখী অনেক মানুষ লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে না। অথচ মানুষের তো সঙ্গ চাই, সান্নিধ্য চাই। বয়ঃসন্ধির সময় থেকে তরুণ তরুণীরা গার্লফ্রেন্ড ও বয়ফ্রেন্ড খোঁজে। না পেলে উদ্বেগ বাড়ে। আমাদের দেশে অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা অনেকে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুর মত প্রকাশ্যে মিশতে পারে না, ডেট করতে পারে না।

ডেটকরে লুকিয়ে চুরিয়ে। বাড়িতে বলতে হয় বাস পাচ্ছিলাম না। লাইব্রেরি গিয়েছিলাম। অথবা এক বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। এই ধরনের মিথ্যে কথা। যে বয়সের পক্ষে যেটা স্বাভাবিক সেটি না ঘটলে তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মানসিক উদ্বেগ দেখা দিতে পারে। এর প্রভাব ব্যক্তিত্বের ওপরেও পড়ে। অনেক ছেলেমেয়ে মনমরা হয়ে থাকে, বিষাদ ও একাকীত্বে ভোগে। অনেকে ইভটিজার হয়ে যায়। মেয়েদের দেখলে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করে। বহু ছেলেমেয়ে সমকামী হয়ে ওঠে। সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য ছেলেমেয়েদের একটা বয়সে স্থায়ী পুরুষ বন্ধু বা মেয়ে বন্ধু থাকা দরকার।

উৎকণ্ঠিত ব্যক্তিত্ব ছটফটে ও অস্থির হয়ে ওঠে। এক জায়গায় স্থির হয়ে বসে গল্পগুজব করতে পারে না। হয় তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়, না হয় অনেক বেলায় তার ঘুম ভাঙে।

কঠোরতা বা toughnesss ব্যক্তিত্বের আর এক প্রকাশ। আমরা যেমন কোন অফিসার সম্পর্কে বলি, লোকটা টাফ। অর্থাৎ সে কাউকে পরোয়া করে না। ঝুঁকি নিতে পারে। যাকে বলে গতিশীল ব্যক্তিত্ব। যার জন্য সাহসের দরকার হয়। এঁরা আত্মবিশ্বাসী হন। ওপরওয়ালার ভয় করেন না। যেটা মনে করেন ঠিক, সেটাই করেন। দরকার হলে আইন আদালত করেন। প্রাণের ভয়ও করেন না।

অনুভূতিপ্রবণ বা সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব প্রধানত মানবিক গুণসম্পন্ন। তাদের হৃদয় কোমল। কিন্তু তা বলে বজ্রের মত কঠোর হতেও তাঁদের আপত্তি নেই। গান্ধীজীর এমন ব্যক্তিত্ব ছিল।

সংবেদনশীলতা হল প্রতিটি ঘটনার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলির প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা। জীবজগতের সুখদুঃখের শরিক হওয়া। এমনকি প্রকৃতির মধ্যেও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবনের প্রাণস্পন্দন অনুভব করা। দার্শনিক স্পিনোজা বন্য লতা ধরে নাকি কথা বলতেন : 'বলো বলো ডিয়ার।'

সংবেদনশীল মানুষকে সাধারণ মানুষ সেন্টিমেটাল বলে হেয় করেন। সংবেদনশীলতা কিন্তু সেন্টিমেন্টালিজম বা ভাবপ্রবণতা নয়।.ভাবপ্রবণ ব্যক্তি সর্ব্বদা বুদ্ধি (rationaltiy) বিসর্জন দিয়ে ভাবকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তাঁরা একটু আঘাতে বিচলিত হয়ে ওঠেন। চরম

সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেন। বসের সঙ্গে সামান্য কথাকাটিতে চট করে চাকরিতে ইস্তফা দেন। প্রিয়জনের দুর্ব্যবহারে আঘাত পেয়ে আত্মহত্যা করে বসেন। যুক্তিতর্কো দিয়ে কোন কিছু বিচার করেন না। একটু দুঃখে চোখে জল আসে। আবার আবেগেও জল আসে।

আমার এক ছাত্র ছিল শুভেন্দু ভট্টাচার্য। সে একদিন চাকরি পেয়ে বাইরে চলে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে আমার কাছে এম.ফিল. করছিল। তার গবেষণাপত্রটিও জমা দিতে এসেছিল। যাবার সময় আমায় প্রণাম করে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগল। আমি অবাক, আমার ছাত্ররা কদাচিৎ প্রণাম করে। প্রণাম করলেও কেউ তো কাঁদে না। শুভেন্দুর কী হল? শুভেন্দু বলল : 'স্যার আর হয়তো দেখা হবে না। তাই মনটা বড় খারাপ লাগছে। তাই কান্না চাপতে পারলাম না।'

আবেগপ্রবণতা সকলের মধ্যেই কিছু না কিছু আছে। কারও কম, কারও বেশি। প্রখর যুক্তিবাদীরা আবেগ প্রবণতাকে শত্রু বলে মনে করে। তারা ভাবরাজ্যের দরজায় পাহারা বসিয়ে রাখে। আজকাল এই প্রজন্মের মধ্যে আবেগ প্রবণতাব মাত্রা কমে যাচ্ছে। অথচ সুভাষচন্দ্রের মত মানুষও আবেগপ্রবণ ছিলেন। বিনোবা ভাবেকে দেখেছি বিহার থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে পা দিয়ে ইসলামপুরের সভায় প্রথম ভাষণ দিলেন। ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন। 'আমি শ্রীচৈতন্যের প্রেমভূমিতে এসেছি'—বলেই কান্না। এই কান্না গভীর আবেগপ্রসূত যার উৎস— ভালবাসা থেকে।

নির্ভরতা বা dependence ব্যক্তিত্বেরই আর এক প্রকাশ। এঁরা বুড়ো বয়সেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখেনা। শৈশবে মা, যৌবনে পত্নী ও বৃদ্ধ বয়সে কন্যা বা পুত্রবধূর প্রতি নির্ভর হয়ে থাকেন। আজকালকার বাবামায়েরা ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকে স্বনির্ভর করে তোলে না। ছেলে ইস্কুলে যাবে, মা তার জামা পরিয়ে দিচ্ছে, জুতো-মোজা পরিয়ে দিচ্ছে, এমনকি ভাতও খাইয়ে দিচ্ছে, স্কুলে নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে আসছে, স্কুলের ব্যাগ বইছেও মা। — এই অবস্থায় পরনির্ভরতার মধ্যেই ছেলেমেয়ে বড় হয়। তাদের ব্যক্তিত্বও হয়ে ওঠে পরনির্ভরশীল। পরনির্ভরশীল ব্যক্তিত্বের একটা বড় উদাহরণ গৃহবধূ এবং বৃদ্ধরা।

ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণ

আপনাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে আপনার পাড়ায় থাকেন, রামবাবুকে চেনেন নাকি?

আপনি বলবেন, তা আর চিনবো না। এই তো বাজারে রোজ দেখা হয়।

কেমন লোক উনি?

একদম ছোটলোক মশাই, যাকে বলে, mean কাজ করিয়ে লোককে পয়সা দিতে চায় না। হাড় কঞ্জুষ। একটা ছোট ব্যাগে দিনে দশটাকার করে বাজার করে। বাড়ির বাচ্চা কাজের মেয়েটাকে মারধর করে।

আর শ্যামবাবু?

কোন শ্যামবাবুর কথা বলছেন, আমাদের পাড়ার শ্যাম চক্কোত্তি। দেবতুল্য লোক। খুব helpful. আর ব্যবহারও অমায়িক।

এইভাবে রামবাবু ও শ্যামবাবুর ব্যক্তিত্ব নির্ধারিত হয়ে যাচ্ছে তাঁদের অজান্তেই। যদিও তাঁদের সম্পর্কে এই সব মন্তব্য বস্তুনিষ্ঠ নয়, এটি আপনার নিজস্ব অভিমত মাত্র। আপনি

আপনার বিচারবুদ্ধি দিয়ে যা ভেবেছেন তাই। আপনার মূল্য বিচার অনেক সময় প্রভাবিতও হতে পারে। ধরা যাক আপনি একদিন রামবাবুকে গিয়ে বলেছিলেন, আপনার তো এত লোকের সঙ্গে আলাপ, দিন না আমার ছোট ছেলেটার একটা গতি করে। বি.এ. পাস করে বাড়ি বসে আছে। রামবাবু বলেছেন, কোথায় চাকরি বলুন। আমাদের অফিসে যা আছে তাও ছাঁটাই হচ্ছে।

আপনি সেই থেকে ভেবে বসে আছেন রামবাবু আপনার জন্য কিছুই করলেন না। তারপর থেকে আপনার অবচেতন মনে রামবাবু সম্পর্কে বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আপনি তাই তাঁর সম্পর্কে বাইরে এই সব কথা বলেন। আবার আপনার মন্তব্য সত্যিও হতে পরে। মানুষ তো যথেষ্ট পরিমাণে সংকীর্ণমনাও হয়। আমি জীবনে প্রচুর নোংরা ও সংকীর্ণ লোক দেখেছি। অনেক লোকই তাঁদের সম্পর্কে আমার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। অন্যের চোখে আপনার যে ইমেজ সেটাই আপনার ভাবমূর্তি। এই ধরনের অসংখ্যা বিশেষণ দিয়ে কারও ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত করা যায়। ম্যাকরে এবং জন ১৭৯৭ সালে ব্যক্তিত্বের পাঁচটি ক্ষেত্র (factor) বিবৃত করে প্রতিটি ক্ষেত্রের সম্ভাব্য পরিসর (scale) নির্দেশ করেছেন। একে তিনি বলছেন factor. সংক্ষেপে একে বলা হয় (EACNO) ফ্যাক্টর।

E অর্থে Extraversion বা বর্হিমুখীনতা। এর অন্য নাম সামাজিক অভিযোজন ক্ষমতা। মূর্খ সামাজিক হলে তার ব্যক্তিত্ব আসামাজিক পণ্ডিতের চেয়ে গ্রহণীয় হবে। প্রায়শই দেখা যায় পণ্ডিতেরা আসামাজিক হন বা হতে ভালবাসেন। কারণ তাঁরা মনে করেন, তাঁর সমান আর একজন পণ্ডিত ছাড়া তাঁর কথাবার্তা কেউ বুঝবে না। কিন্তু যাঁরা কম লেখাপড়া জানেন, অথবা যাঁরা আমার মত বিদ্বান বা পণ্ডিত নন, তারা বিদ্যার খামতির জন্য একটু দমে থাকেন এবং সেটা সামাজিক হয়ে পুষিয়ে নেন। এতে তাঁদের সমাজে জনপ্রিয়তা বাড়ে। বহির্মুখীরা যথেষ্ট গোঁয়ারগোবিন্দ হন। তাঁদের প্রবণতা হল কাজটা করে ছাড়া। তাঁরা বার বার তাঁদের ব্যক্তিত্বকে জোর করে খাটাতে চান। এই Assertive ব্যক্তিত্বের আর একটি লক্ষণ হল এঁরা নিজেদের অধিকারকে পুরোপুরি প্রয়োগ করতে চান। যতটুকু ক্ষমতা তাঁরা দায়িত্ব সূত্রে পেয়ে থাকেন সেই ক্ষমতার পূর্ণ প্রয়োগ করা না পর্যন্ত তাঁদের শান্তি নেই।

মানবিক অধিকার, নাগরিক অধিকার (human right and civil right), নারীবাদী আন্দোলন (feminist movement) প্রভৃতি অসংখ্য গোষ্ঠী যে আন্দোলন করে যাচ্ছেন তাঁরা এই assertive ব্যক্তিত্বের মানুষজন। বহির্মুখী মানুষেরাই assertive ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। অন্তর্মুখী মানুষেরা কদাচ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চাপ সৃষ্টি করে থাকেন। ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হলেও তাঁরা বলেন, ঝামেলা করে কী হবে।

বর্হিমুখী ব্যক্তিরা প্রত্যেক কাজে যথেষ্ট উৎসাহ পান। তাঁরা স্বেচ্ছায় কাজের দায়িত্ব নেন।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। পাড়ার দুর্গাপূজা কমিটির মিটিং হচ্ছে। সভাপতি নির্বাচিত করা হল জনৈক পয়সাওয়ালা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিকে। তিনি রাজি হলেন। যদিও তাঁর সময় খুব কম। সব সময়ই পয়সার ধান্ধায় ঘোরেন। কিন্তু তিনি রাজি দুটো কারণে। এক, তাঁর অনেক তো পয়সা হল। এবার একটু খাতির দরকার। এর জন্য কিছু অর্থ

ব্যয় করতেও তিনি রাজি। আর প্রেসিডেন্টের পদে খুব খাটনি নেই। শুধু মাঝে মাঝে এসে মিটিঙে বসে খবরদারি করা। আর উদ্বোধনের দিন যা ছাইপাঁশ মনে আসে তা বলে বক্তৃতা করা। কিন্তু সেক্রেটারি পদের দায়িত্ব আছে। ঝামেলাও যথেষ্ট। একটু পান থেকে চুন খসলে মেম্বররা চটে যাবে। মেম্বরদের কোন দায়দায়িত্ব নেই। শুধু সমালোচনা করার অধিকার আছে। চাঁদাদাতাদের অনেকের সন্দেহ, সেক্রেটারি আর ক্যাশিয়ার মিলে প্রচুর টাকা সরিয়েছে। ঠিক পুজোর পরই সেক্রেটারি তাঁর পুরনো টিভি পালটে নতুন টিভি কিনলেন, এ কার পয়সায়? অথবা তিনি পুজোর পর সপরিবারে পুরী গেলেন এটাও হয়ত পুজোর টাকা থেকে সরিয়ে। সেক্রেটারি তাই কেউ হতে চান না। না না, আমার অত সময় নেই। অফিসে ভীষণ কাজের চাপ। তার ওপর নতুন বস এসে ভীষণভাবে দুরমুশ করছে। আমায় মাফ করুন। কিন্তু বহির্মুখী ব্যক্তি সেক্রেটারি হতে এগিয়ে আসবেন। সেক্রেটারি হবেনও। স্যুভেনিরে বিজ্ঞাপন তুলবেন। পাড়ায় বাড়ি বাড়ি যাবেন চাঁদা আদায় করতে।

বহির্মুখীরা ঘরকুনো নন, সামাজিক মেলামেশায় আগ্রহী। পাড়ার সবাইকে তিনি চেনেন। দেখা হলে কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করেন। তবে তাঁদের একটাই দোষ, একটু বেশি কথা বলেন।

এবার আসা যাক A factor এর ক্ষেত্রে। A অর্থ Agreeableness সহমর্মী ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বের অধিকারীররা সবাইকে 'হ্যাঁ' বলেন, তুমিও ভাল, আমিও ভাল। একজন বললেন, এই সরকারের আমলে দেশটা শেষ হয়ে গেল মশায়। সব দিকেই অগ্রগতির চাকা থমকে দাঁড়িয়েছে। এরা কবে যাবে বলতে পারেন? আপনি বললেন : যা বলেছেন। আমার ভাগ্নে থাকে গ্রামে সে তো বলছিল গ্রামেগঞ্জের অবস্থা আরও খারাপ। তারা রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারে না। মাস খানেক পরে এক প্রভাবশালীর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন : এটা তো স্বীকার করবেন, এই সরকার যথেষ্ট ভাল কাজ করছে। গ্রামগঞ্জের চেহারা পালটে দিয়েছে। আজ গ্রামে বেকারি নেই বললেই চলে। চাষীর হাতে কাঁচা পয়সা। বহরমপুর, মালদা শহরে ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজ বিক্রি হচ্ছে লাখ লাখ টাকার। এসব মালপত্র গ্রামের চাষীরাও কিনছে। কী ছিল বিশ বছর আগে, কী হয়েছে।

আপনি। এটা ঠিক বলছেন। আমার ভাগ্নে তো বি.এ. পাস করে আর চাকরি বাকরি করে না। গ্রামে চাষ-আবাদ করছে। এই করে ছেলে-মেয়েকে কলকাতায় হস্টেলে রেখে পড়াচ্ছে।

তবেই বুঝুন, এই সরকার যথেষ্ট ভাল করছে কি না। নেতৃত্বের একটা প্রয়োজন আছেই।

তা তো আছেই — আজ যদি নেতাজী থাকতেন--

নেতাজীর কথা ছাড়ুন মশাই। তিনি তো মহান ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমাদের বর্তমান নেতৃত্বে যারা রয়েছেন, তাঁরা বড় স্ট্যাচারের কেউ নয়-- একজন ছাড়া। কিন্তু তাঁরাই যেটুকু করেছেন আজ পর্যন্ত এটা তো কেউ করল না। গরিব মানুষদের দাবিয়ে রাখা হয়েছিল এতদিন। আজ তারা কথা বলতে পারছে কার জন্য? নেতৃত্বের জন্যই তো—

'একশ বার।' আপনি সহমত পোষণ করলেন।

আসলে Sincerity of purpose থাকা চাই। এটা থাকলে ব্যক্তিগত নেতা বড় হয়ে

ওঠে না— গোষ্ঠীগত নেতৃত্বই প্রাধান্য পায়— Collective leadership ভদ্রলোক আবার বলে চলেন।

ঠিক। ঠিক।

সেইজন্যই আমাদের যা ঘটনা তা স্বীকার করা চাই। পশ্চিমবঙ্গের যে আজ সারাভারতে একটা ইমেজ গড়ে উঠছে —সুশাসিত রাজ্য বলে, সেটা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ হবে।

আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে কিনা সম্প্রতি ল অ্যান্ড অর্ডার একটু সমস্যা হয়েছে।

কোন রাজ্যে এই সমস্যা নেই বলুন তো? অন্য রাজ্যের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে কেউ কিছু বলে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে কিছু হলে তা নিয়ে মিডিয়া হইচই করে। এই সমাজ ব্যবস্থায় এমনই হয়।

তা অবশ্য ঠিক। যত না হছে তার চেয়ে বাড়িয়ে লেখা তো হচ্ছেই।

এই হল সহমতী প্রবণ ব্যক্তিত্ব। এরা কিন্তু সুখে থাকেন, চড়চড় করে উন্নতি করেন। কারণ সকলের তালে তাল দেন বলে সবাই তাঁকে তাদের সমর্থক ভাবে। এঁরা সাধারণত বিনয়ী এবং কোমল স্বভাবের।

C অর্থে বোঝায় Conscientiousness অর্থাৎ বিবেকপ্রবণ ব্যক্তিত্ব।

এঁরা বিবেকের নির্দেশে চলেন। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর বলে বিশ্বাসী। দায়িত্বশীল। যে দায়িত্ব তাকে দেওয়া হয় সেটি সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল। তিনি দক্ষ। আত্মশৃঙ্খলা পরায়ণ অর্থাৎ কারও ভয়ে বা হুকুমে নয়, নিজে থেকেই নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলেন। কোন কিছুতে সাফল্যলাভের জন্য তাঁরা সক্রিয় চেষ্টা চালান।

N অর্থে Neuroticism নিউরোটিক গ্রস্ত। এঁরা সব সময় উদ্বিগ্ন। নিজের দুর্ভাগ্যকে করাঘাত করে নিজের জন্য দুঃখিত হন। যেমন, আমি সব ব্যাপার ব্যর্থ। অনেক আশা ছিল কিছু করতে পারলাম না। আমাদের ভাগ্যে কী আর চাকরিতে উন্নতি হবে। এইভাবেই পচে মরতে হবে। নিউরোটিকরা এই সব কথা বলে লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। এঁরা ঠিক এমার্জেন্সি লাইটের মত। বারবার ব্যাটারি চার্জ করে রাখতে হয়। আসলে তাঁর ভেতরে কোন বিদ্যুৎশক্তি নেই। বাইরের বিদ্যুৎ লাইন থেকে তিনি যতটুকু শক্তি সঞ্চয় করেন ততটুকু নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন।

O অর্থে Openness মুক্তমনা ব্যক্তিত্ব। এরা সব সময় জিজ্ঞাসু এবং সংস্কৃতিবান। বুদ্ধি বৃত্তিকে কাজে লাগান প্রয়োজনমত। তাঁরা মৌলিক. সেই সঙ্গে কল্পনাপ্রবণও। যথেষ্ট আইডিয়া ধরেন। এরা মূল্যবোধেও বিশ্বাসী।

তবে দরজা জানালা খোলা রাখলে যেমন দক্ষিণের বাতাস আসে তেমনি মশামাছিও ঘরে এসে ঢোকে। উদারমনস্কতার সুযোগ নিয়ে অনেক বাজে লোকও এদের জীবনে আসে। সব সময় ধান্ধাবাজ লোকেরা এসে তাঁদের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে। এটা করে দিন। এটা করে দিন। কাজ গুছিয়ে নিয়ে যাবার পর তাঁরা আর আসেন না। এঁরা নিজেরা মূল্যবোধে বিশ্বাসী, কিন্তু অন্য ব্যক্তিত্বের লোকেরা তো কোন মূল্যবোধ মানে না। তাই মুক্তমনা ব্যক্তিরা প্রায়শই আঘাত পান এবং অনেক সময় নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেন।

এছাড়া এলিজাবেথ হারলক ব্যক্তিত্বের আরও কতগুলি স্টিরিও টাইপের কথা বলেছেন। এই টাইপগুলি ব্যক্তিত্বের এক একটি ধারণা।

ছকে বাঁধা ব্যক্তিত্ব

হারলক বর্ণিত স্টিরিও টাইপের মধ্যে আছে :

১. চেহারা, ২. উচ্চারণ. ৩. নামকরণ, ৪. সাফল্য. ৫. সুনাম। আমরা প্রথম তিনটি নিয়ে আলোচনা করব।

স্টিরিও টাইপ বলতে বোঝায় একটা ছক। ছক অনুযায়ী এই এই গুণ যাদের থাকে তারা ইতিবাচক বা দৃঢ় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। লোকে তাদের মানে। অথবা একজন সু ব্যক্তিত্বের অধিকারীর চেহারা আকর্ষণীয় হয়, তাঁব কণ্ঠস্বব বাচনভঙ্গি উচ্চারণ মিষ্টি, সুন্দর ও নির্ভুল। তাঁর নামটিও স্মার্ট ছিমছাম। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সফল ও সুনামের অধিকারী। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সব কিছুর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইমপ্রেস করার মত চেহারা যার নয় তাকেও দেখেছি ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে। আবার 'সাচ অ্যান্ড সাচ'কে স্যাস অ্যান্ড স্যাস' বলছেন, পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য উচ্চারণে কথা বলছেন, এমন লোককেও দেখেছি কোন রাজ্যের কেউকেটা হয়ে বসেছেন। আটপৌরে এমনকি হাস্যকর নাম নিয়েও সফল হয়েছেন এমন কম লোক নেই। বাজারে বদনাম প্রচুর। অথচ তার জন্য কোথাও ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব চাপা পড়েনি।

কিন্তু ব্যতিক্রম আছে বলেই নিয়মটা যে অর্থহীন হয়ে পড়বে তা নয়। এলিজাবেথ হারলকের স্টিরিওটাইপগুলি তাই উপেক্ষা করার নয়। ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির জন্য কোন পাঠক যদি সচেতন থাকেন, তাহলে তাঁর প্রলক্ষণগুলি ভাল করে খতিয়ে দেখুন।

চেহারা ও ব্যক্তিত্ব

চেহারা যে ব্যক্তিত্বকে বাড়িয়ে তোলে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র। রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, সুভাষচন্দ্র, নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী, রাজীব গান্ধী, জন কেনেডি, ক্লিনটন, টনি ব্লেয়ার প্রমুখ অনেকের ক্ষেত্রেই তাঁদের চেহারা ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। কিন্তু প্রতিভাবানদের ক্ষেত্রে প্রতিভার আলোকেই তারা আলোকিত থাকেন। চেহারা বড় জোর অতিরিক্ত কিছু, কিন্তু আবশ্যিক নয়। জর্জ বার্নাড শ এর চেহারা ভাল ছিল না তাতে তাঁর কিছু যায় আসেনি। কিন্তু সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে চেহারা ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির অনেকখানি সহায়তা করে। কতগুলি চাকরিতে চেহারা দিয়েই ব্যক্তিত্বের বিচার হয় যেমন রিসেপশনিস্ট (চেহারা ও সৌজন্য) এয়ারহোস্টেস (চেহারা ও স্মার্টনেস) সেলস প্রতিনিধি (চেহারা ও দক্ষ আলাপচারিতা) ধর্মগুরু (চেহারা ও স্মৃতিশক্তি) অভিনেতা (চেহারা ও কণ্ঠস্বর)

ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের চেহারাকে ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্ব দেওযা হয়। এর কারণ পুরুষশাসিত সমাজ সর্বদা রূপ-বুভুক্ষু। তারা নারীকে 'সেক্স সিম্বল' বলে ভাবতে অভ্যস্ত। তাছাড়া সাহিত্যে, চলচ্চিত্রে বিজ্ঞাপনে নারীর রূপের একটি স্টিরিওটাইপ গড়ে তোলা হয়। সেই স্টিরিও টাইপ অনুসারে সুন্দরী নারী হবে দীর্ঘাঙ্গিনী। তন্বী, আয়তলোচনা, তার দাঁত হবে ডালিমের দানার মত ঘন সন্নিবিষ্ট। চোখের তারা হবে কালো। ভুরু ধনুকের মত। চুল ঘন কৃষ্ণ কুঞ্চিত। গ্রীবা হবে হাঁসের মত। স্তনযুগল হবে উত্তুঙ্গ। কোমব চিকণ কিন্তু পুরুষ্ট নিতম্ব ও জঙঘা। বলা বাহুল্য রঙ হবে ফর্সা।

অধুনা এই ধারণা বদলাচ্ছে। নারীর রূপ বর্ণনার স্টিরিও টাইপ ভারতীয় নারীকে ব্রীড়াবতী এবং স্বল্পবাক করেই রাখা হয়েছে। তার বিদ্যা বুদ্ধিকে রূপের অঙ্গ বলে ধরা হয়নি। কিন্তু আধুনিক নারী প্রগতির যুগে নারীর রূপকে আর ব্যক্তিত্বের একমাত্র মাপ কাঠি বলে ধরা হয় না। কারণ রূপ তো জন্মগত। রূপহীনা নারীও ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হতে পারে যদি তার মধ্যে বিদ্যা ও বুদ্ধির সুষম সমন্বয় ঘটে। সরোজিনী নাইডু বা পদ্মজা নাইড়ু কেউই রূপবতী ছিলেন না। সরোজিনীকে আমি দেখিনি কিন্তু পদ্মজা নাইডুকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন। তার কণ্ঠস্বর ছিল সুরঝংকারের মত। ইংরাজিতে তিনি যখন বক্তৃতা দিতেন তখন মনে হত কোন কবিতা গ্রন্থ থেকে পাঠ করছেন বুঝি। তাঁর রূপের দীনতা চাপা পড়ে যেত তাঁর গুণের কাছে। লতা মুঙ্গেশকরও কী খুব রূপবতী? কিন্তু সে কথা কি মনে হয় তাঁকে দেখে?

আগেই বলেছি প্রতিভাবানদের কাছে রূপ সবসময়ই গৌণ। কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে রূপ ব্যক্তিত্বের প্রধান আকর্ষণ। তবে রূপের প্রচলিত স্টিরিওটাইপ অনুসারে ক'জনই বা সেই রকম রূপবতী? ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে রূপের যথেষ্ট ঘাটতি আছে। এর একটা বড় কারণ তাদের ফিগার। এদেশে মেয়েদের গড় উচ্চতা পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চির বেশি নয়। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতীয়দের রঙ হয় কালো না হয় বাদামী। পুষ্টিকর ও সুষম খাদ্যের অভাবে ভারতীয় মেয়েরা অধিকাংশই অপুষ্টিতে ভোগে। দ্বিতীয়ত উপযুক্ত ব্যায়াম বা খেলাধুলার অভাবে তাদের ফিগার বা অবয়বে প্রয়োজনীয় খাঁজ গড়ে ওঠে না। হয় তারা রোগা না হয় মোটা।

অথচ শুধুমাত্র সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহবল্লরীর ফলে যে কোন নারীই নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে। সেই সঙ্গে পরিপূর্ণমাত্রায় আত্মবিশ্বাস থাকলে সেটা তার ব্যক্তিত্বের সহায়ক হয়। নারীর সাজগোজকে উৎসাহ দেওয়া হয় কিন্তু নারীর দেহচর্চাকে এদেশে ভাল চোখে দেখা হয় না। যারা অ্যাথলেট হতে চায় তারাই শুধু শরীরচর্চা করে। কিন্তু শুধু সুঠাম শরীর গঠনের জন্য মেয়েরা নিয়মিত খেলাধুলা করছে বা কোন ব্যায়াম করছে এদৃশ্য বিরল না হলেও তার সংখ্যা কম। ব্যক্তিত্ব আসে আত্মবিশ্বাস থেকে। আত্মবিশ্বাস আসে সুস্থতা থেকে। মেয়েরা যদি ছোটবেলা থেকে সুষমখাদ্য গ্রহণ করে, স্নেহজাত খাদ্য যথাসম্ভব কম খায়, শাক-সবজি বেশি করে খায়, নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধুলা করে বয়সের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তার অঙ্গগুলিকে ঠিকমত বিকশিত হতে দেয় তখন দেখা যায়, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য তার অবয়বগত অসঙ্গতিকে ঢেকে দিয়েছে। তখন আর তার বোঁচা নাক, কটা চোখ, নাতিদীর্ঘ চেহারা ও শ্যামবর্ণ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তুলছে না। এর সঙ্গে দরকার সপ্রতিভতা, নারীসুলভ কমনীয়তা, লজ্জা এবং সুস্পষ্ট উচ্চারণে গুছিয়ে কথা বলার ক্ষমতা। এক্ষেত্রে ইংরাজি মাধ্যম স্কুলে পড়া ছেলেমেয়েরা অধিকতর সপ্রতিভ হবার শিক্ষা পায় এবং ইংরাজিতে অনর্গল কথা বলার অভ্যাসের জন্য তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস দেখা দেয় যা তাদের ব্যক্তিত্বকে একটা নতুন মাত্রা দেয়।

মেয়েদের তুলনায় আমাদের দেশে ছেলেরা অপেক্ষাকৃত সুঠাম চেহারার অধিকারী। কারণ তরুণদের মধ্যে স্বাস্থ্যচর্চা ও খেলাধুলার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। স্টিরিও টাইপ অনুসারে ছেলেরা রূপবান হবে আমরা এমন প্রত্যাশা করি না। আসলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী

হলেই ছেলেদের ব্যক্তিত্বের অধিকারী বলে ভাবি। ছেলেদের কাছ থেকে আমরা আশা করি স্মার্টনেস, চালাক-চতুর অর্থাৎ কইয়ে বলিয়ে হওয়া। আজকাল ছেলেরা ফ্যাশান সচেতন হচ্ছে। আমাদের ছেলেবেলায় এটা ছিল না। সে সময় ধুতি-পাঞ্জাবি পরত বহু তরুণ। এখন ফুলপ্যান্ট, নানা ধরনের ক্যাজুয়াল ওয়্যার বা স্পোর্টস ওয়্যার বেরিয়েছে। পোলোনেক গেঞ্জি, টি শার্ট যে কোন ধরনের ফিগারকে স্মার্ট করে তোলে। তবে ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য যথাসম্ভব ছিমছাম পোশাকই দরকার। সেই সঙ্গে দরকার আত্মবিশ্বাস। মানুষের দেহের কাঠামো-গায়ের রঙ বংশগত জিন থেকে মানুষ পায়। তাই তার ওপর কারও কোন হাত নেই। বাঙালিদের মধ্যে এত জাতিগত মিশ্রণ ঘটেছে যে টিপিক্যাল বাঙালি চেহারা বলে কিছু নেই। আমি কিছুদিন উত্তর, পূর্বাঞ্চলে বাস করে দেখেছি বহু বাঙালিকে মণিপুরি বা অহোম বলে ভুল হয়। আবার বাংলাদেশের বহু মুসলমান বাঙালির চেহারার সঙ্গে আরবদের সাদৃশ্যগত মিল খুব স্পষ্ট। বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ছিলেন। অথচ তাঁর ছেলেরা তাঁর চেহারা পায়নি। উত্তমকুমারের বাবা কিন্তু উত্তমের মত সুপুরুষ ছিলেন না। উত্তমের ভাই তরুণ কুমারকে উত্তমের মত দেখতে নয়। আমার নিজের সহোদর ভাই-এর সঙ্গে আমার চেহারার কোন মিল নেই। কাজেই বাঙালির চেহারার কোন নির্দিষ্ট মান নেই। সুতরাং যে যেমন চেহারা পেয়েছে তাকে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমার মাঝে মাঝে আফসোস হয় আমি যদি আরও দু'তিন ইঞ্চি লম্বা হতাম। অনেকে তেমনি ভাবেন আহা যদি আমি একটু ফর্সা হতাম। অথবা আমার নাকটা যদি একটু উঁচু হত।

সালঙ্কারা দেহরক্ষী নিয়ে নিমন্ত্রণ বাড়ি চলেছেন

কিন্তু এসব ভাবলেই হীনম্মন্যতা জাগবে। যে যেমন বাসস্থানে থাকে সেটাকে সে তেমনভাবে গুছিয়ে নেয়। তেমনি এই দেহটা আপনার। আপনাকে তাকে ভালবাসতেই

হবে। রূপের ঘাটতি পূরণ করতে হবে স্বাস্থ্য, আর শিক্ষা দিয়ে। বুদ্ধির দৃপ্ততা চোখে মুখে ঔজ্জ্বল্য এনে দিতে পারে। পরনের পোশাক, চুলের ছাঁট, মেয়েদের ক্ষেত্রে হালকা প্রসাধন, ছেলেদের ক্ষেত্রে নিখুঁত দাড়ি কামানো অথবা গোঁফ-দাড়ি রাখা তার চেহারাতে নতুন গতি এনে দিতে পারে। সেই সঙ্গে পোশাক নির্বাচনও একটা বড় দিক। তবে কোন উপলক্ষে পোশাকটা পরছেন এটাও কিন্তু বিচার্য বিষয়। শ্রাদ্ধবাড়িতে যা পরে যাবেন, বিয়েবাড়িতে নিশ্চয়ই তা পরে যাবেন না। মেয়েরা কোথাও যাবার সময় গহনা পরবে, কতগুলো গহনা পরবে, কোন শাড়ি কোথায় পরবে সেই নির্বাচনও যথাযথ হওয়া দরকার। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা ইংলন্ডের রানীর পেশাদার ড্রেসার আছেন, যারা নির্দিষ্ট স্থানের উপযোগী নির্দিষ্ট পোশাক তৈরি করে দেন।

দৈহিক গড়নের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সম্পর্ক

মনোবিদদের একাংশ মনে করেন দেহের গড়নের ওপর মানুষের ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। অর্থাৎ চেহারার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এক ধরনের ব্যক্তিত্ব নিয়ে জন্মায়। চেহারার গড়ন দেখে এঁরা আভাস দেন মোটা-রোগা ও তাগড়াই চেহারার লোকেরা কে কেমন হবে—যা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। কিন্তু দেহের কাঠামো দেখে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করার প্রক্রিয়া বহু পুরনো। পশ্চিমী চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিস (৪৬০-৩৩৭ খৃঃ পূর্বাব্দ) Constitutional psychology বলে একটি বিদ্যার প্রবর্তন করেন। হিপোক্র্যাটিস অবৈজ্ঞানিক লোক ছিলেন না। আজও ডাক্তার হতে গেলে তাঁর লিখে যাওয়া শপথ নিতে হয়। হিপোক্রেটিস মানুষের দৈহিক গঠনকে দু'ভাগে ভাগ করে গেছেন। প্রথম দলে আছেন, তাগড়াই পেশীবহুল চেহারার লোকেরা। দ্বিতীয় দফায় আছেন, রোগা দুব্‌লা ছিপছিপে চেহারার ব্যক্তিত্ব। প্রথম শ্রেণীর লোকেদের স্ট্রোক হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদের আবার টিবি হবার সম্ভাবনা বেশি। সমসাময়িক গ্রিক দার্শনিক এমপেডোক্লিস এর সঙ্গে ঐক্যমত হয়ে হিপোক্রেটিস মানুষকে চার ভাগে ভাগ করেন। বাতাস, জল, আগুন আর পৃথিবী। এই উপাদানগুলি কার দেহে কী পরিমাণ আছে তার ওপর নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব। আধুনিক যুগে আকৃতিতত্ত্ব (phrenology) নিয়ে যথেষ্ট চর্চা হচ্ছে। এই তত্ত্বের উৎপত্তি অষ্টাদশ শতকের জার্মানিতে। এই তত্ত্ব বলে যে মস্তিষ্কের একটা বিশেষ অঞ্চল থেকেই নাকি মনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন ধরা যাক আশাবাদ, সতর্কতা, আত্মগৌরব (self-esteem) সবই মস্তিষ্ক থেকে আসে।

উনিশ শতকে বোস্টন প্রমুখ ফরাসি লেখকেরা মানুষকে সহজপাচ্য (digestive) পেশীবহুল ও প্রশ্বাসভিত্তিক (respiratory) এই তিনভাবে ভাগ করেছেন।

বিশ শতকের গোড়ায় জার্মান মনোবিদ Ernst Krestchmer মনে করতেন যে চেহারার সঙ্গে মানসিক ভারসাম্যহীনতার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। সম্পর্ক আছে চেহারার সঙ্গে ব্যবহারেরও। অর্থাৎ আকৃতি দেখে প্রকৃতি বলে দেওয়া যায়। চেহারাগত মনস্তত্ত্ব (Constititional psychology) নিয়ে সেই হিপোক্রেটিসের সময় থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা গবেষণা চলে আসছে।

আধুনিককালের মনোবিদ সেলডন (William H. Sheldon) আবার জোরের সঙ্গে

বলতে থাকেন আকৃতির সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

সেলডন বলেন, আমরা যদি কোন মানুষের দৈহিক কাঠামোটা একবার জানতে পারি তাহলেই সেই মানুষ কখন কী রকম আচরণ করতে পারে তা আন্দাজ করা যায়। আমাদের চেহারা (বাহিরের চেহারা শুধু নয় আমাদের ভেতরের শরীর যন্ত্রটা) এক একজনের এক এক রকম। মানে আমাদের শরীর যন্ত্রের কাজকর্ম এক একজনের এক এক রকম। কারও বা হৃদযন্ত্র তেমন মজবুত নয়। কারও বা ঠাণ্ডার ধাত। কারও বাত ব্যাধি, কারও পাচনক্রিয়া শক্তিশালী নয়। প্লীহা, লিভার, বৃহদন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্রের কাজকর্ম এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম। আমাদের এই যে জৈবিক গঠন (biological structure) জেনেটিক অর্থাৎ জিন-বাহিত। এই জিন প্রভাবিত (genotype) দেহটি পরিবেশের সংস্পর্শে এসে কতগুলি বাহ্যিক আচার আচরণের জন্ম দেয়। পরিবেশের সঙ্গে সকলেরই তো মোলাকাত হচ্ছে কিন্তু এই বিস্তর মোলাকাতের ফলে কার মধ্যে কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে তা নির্ভর করে অবয়বগত কাঠামোর ওপর। অর্থাৎ যার হার্ট খুব দুর্বল সে একটু আঘাতেই কাতর হয়ে পড়বে। যার হজমের গোলমাল, সে যথেচ্ছ খেতে পারে না বলে ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন থাকবে। প্রচলিত ধারণা: ডিসপেপসিয়া রোগীরা খিটখিটে, প্রেসারের রোগীরা রাগী হয়। দেহ তাই মনকে প্রভাবিত করে নানাভাবে। যে কোন মানুষের দৈহিক কাঠামোর অন্তরে আর একটা জৈবিক কাঠামো আছে বলে সেলডন অনুমান করেন। ওপরের কাঠামোটা আমরা দেখতে পাই। যেমন নাক মুখ চোখ হাত পা ভেতরের জৈবিক কাঠামোটি (biological structure) আমরা দেখতে পাই না। এর নাম morphogenotype সেলডনের মতে 'মোরফোজেনোটাইপ' দেহের বিকাশ ঘটায় আবার ব্যক্তির আচরণকেও তৈরি করে দেয়। অর্থাৎ সেলডন (Seldon) বলতে চান, আপনার বাহিরের ও ভেতরের চেহারাটি— দুটোই তৈরি হয়েছে একই উপাদান থেকে। তবে 'মোরফোজোনো টাইপ' উপাদানটিকে ধরা ছোঁয়া যায় না। যাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি, পরিমাপ করতে পারি সেটা আমাদের বাইরের দৈহিক কাঠামোটি। অর্থাৎ আমরা দেহটির পরিমাপ করে একটা টাইপ তৈরি করে দিতে পারি। আপনি খুব রোগা বা খুব মোটা তাহলে আপনি এক একটি টাইপে পড়বেন। আকৃতি অনুযায়ী এই টাইপের নাম সোমাটোটাইপ। সোমাটিয়া এই গ্রিক শব্দের অর্থ মানুষ। অর্থাৎ মানুষের টাইপ বা শ্রেণীবিন্যাস।

সোমাটোটাইপকে তিনভাগে ভাগ করেছেন সেলডন।

1 মোটার ধাত (Endomorphic) দেহের পরিপাক শক্তি অনুসারে মোটা ধাতের সৃষ্টি হয়। এরা তুলতুলে, গোলগাল। দেহের মাসল ও হাড় অপরিণত। খুব কঠোর পরিশ্রমের মত করে দেহ তৈরি নয়। এইসব দেহ জলে ভাসে, কেননা এদের Specific gravity বা আপেক্ষিক গুরুত্ব কম।

2 শক্তপোক্ত ধাত (Mesomorphic) : এদের হাড় ও পেশী শক্ত। শরীরের টিসুগুলোও মজবুত। এরা গোলগাল নয়, আয়তক্ষেত্রের মত। লম্বাটে মুখ। মেদ ভার বর্জিত দেহ। এরা শ্রমসাধ্য কাজ করতে পারে। খেলাধুলা, সৈনিকের ও পুলিশের কাজ, শ্রমিকের কাজে এরা পারদর্শী হয়।

3 ছিপছিপে ধাত (Ectomorphic) : এদের দেহে চামড়া ও স্নায়ুতন্ত্র যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ।

এরা রোগা ও লম্বাটে। এদের দেহের অনুপাতে মস্তিষ্ক খুব বড়। এদের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রও বড় সাইজের। কিন্তু হলে হবে কি। এরা প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠে না আর বেশি খাটাখাটনি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, রোগা মানুষ খাওয়া দাওয়া পেলে মোটা হয়ে যেতে পারে। আবার মোটা ব্যায়াম করে ওজন কমাতে পারে অথবা অসুখে ভুগে ভুগে রোগা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু চেহারা সাময়িকভাবে মোটা রোগা হলেও সে কালক্রমে তার আসল ধাত ফিরে পায়। অনেক মহিলা বিয়ের পর মোটা হতে শুরু করে বুঝতে হবে তার মোটার ধাত। আবার মোটার ধাত হলেও সে ডায়াট করে ও ব্যায়াম করে ওজন একটা জায়গায় রেখে দিতে পারে। কিন্তু জন্মকালীন ধাতটা আর লুকনো যায় না। দেহের কয়েকটা জায়গার আর পরিবর্তনই হয় না, যেমন মাথার খুলি, শরীরের যে সব এলাকায় চর্বি জমে না সেখানকার মাপ। তাছাড়া দেহের আরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মাপ আছে যার পরিবর্তন ঘটে না।

কী ধরনের চেহারার লোকেরা সাধারণত কী কী ধরনের গুণের (trait) অধিকারী হন তা নিয়ে সেলডন বহু মানুষের মধ্যে গবেষণা চালান। তিনি ৬৫০ ধরনের গুণের এক তালিকা করেন। সেটা থেকে কমিয়ে ৫০টি গুণ নিয়ে ৬৫০ মানুষের ওপর গবেষণা চালান। এই ৬৫০ জন মোটা, পেশীবহুল ও পাতলা ধাতের লোক। এক বছর ধরে সেলডনের টিম এঁদের খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করে। এরপর তাদের কাছে কিছু প্রশ্ন রাখা হয়। প্রশ্নগুলিকে পাঁচভাগে ভাগ করে উত্তর থেকে ৫০টি গুণের কে কোনটিতে পড়ে তা পরীক্ষা করা হয়। এর ভিত্তিতে কতগুলি গ্রুপ বা cluster ঠিক করা হয়। তিনটি গ্রুপ করে দেখানো হয় এই তিনটি গ্রুপের প্রত্যেকে মোট ৬০টি গুণের মধ্যে ২০টি করে গুণ পেয়েছে। এই গুণগুলিকে বলা হয়েছে মেজাজ (temperement)। এইভাবে আমরা তিনধরনের মেজাজ পাচ্ছি।

4 আয়েসি (Viscerotonia) : এরা খেতে খুব ভালবাসে। লোকজন ভালবাসে। ঢিলেঢালা মেজাজের লোক। relax করতে জানে। কোন ব্যাপারে টেনসন করে না। মেজাজ প্রায় সময়ই ভাল থাকে। তারা আলাপী। এদের সঙ্গে কথা বলতে আপনার ভালই লাগবে।

5. সর্দারিপ্রবণ (Somatotonia) : এরা ভালবাসে অ্যাডভেঞ্চার। ঝুঁকি নিতে জানে। গায়ের জোর লাগে এমন কাজে এদের উৎসাহ খুব। এরা খুব মারকুটে। অন্যেরা কী ভাবছে না ভাবছে তা ভাবে না। তারা সাহসী কিন্তু হলে কী হবে তারা অপরকে দাবিয়ে রাখতে চায়। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করছে ততক্ষণ ঠিক আছে। কিন্তু কেউ যদি তার মুখের ওপর কথা বলে তাহলে হয়ে গেল।

ভীতুসম্প্রদায় (Cerebrotonia) : এরা খুব সতর্ক হয়ে চলে। বেশি উচ্ছ্বাসের আতিশয্য প্রকাশ করে না। আত্মসচেতন এবং বাছাই লোকজনের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখে। তবে যথা সম্ভব একা থাকতেই ভালবাসে ওরা। বিশেষ করে সংকটে পড়লে তারা একা গুম মেরে বসে থাকতে চায়। খুব তাড়াতাড়ি কাজ করে এরা। ঘুমোয় কম। চেহারার দিক থেকে viscerotonia হন গোলগাল মোটাসোটা। somatotonian-রা পেশীবহুল আর cerebrotania বা রোগা লম্বা।

সেলডন চেহারা অনুসারে মেজাজের যে চার্ট তৈরি করেছেন সেটা একবার পাঠকেরা নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

গোলগাল-মোটাসোটা : আপনি উদ্বেগহীন, ঢিলেঢালা মানুষ। আরামপ্রিয়। সব কিছুতে আপনার প্রতিক্রিয়া খুব ধীর। খেতে ভালবাসেন। সামাজিক কাজকর্মে যথেষ্ট উৎসাহ। খুব মিশুকে প্রকৃতির। সকলের সঙ্গে অমায়িক ব্যবহার করেন। আপনি চান সবাই আপনাকে ভালবাসুক। ভালবাসা পাওয়ার জন্য আপনি লালায়িত থাকেন। চান, সবাই আপনাকে বাহবা দিক। আপনি জনমুখী। জনসাধারণের প্রতি আপনি সহনশীল। আত্মসন্তুষ্টি উপভোগ করেন। ঘুমতে ভালবাসেন, এমনকি আপনার গাঢ় ঘুমও হয়। আপনার মধ্যে কোন দমন প্রবৃত্তি (Inhibition) নেই। একটু মদ্যপান করলে আপনার ভাবপ্রবণতা দ্বিগুণ হয়ে যায়।

পেশীবহুল, স্বাস্থ্যবান চেহারার মানুষ : আপনি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠা না করে ছাড়েন না। যাকে বলে আপনি assertive দৌড়ঝাঁপের কাজ বেশি পছন্দ করেন। আপনার মধ্যে প্রচুর প্রাণশক্তি আর উদ্যম আছে। আপনি নিয়মিত ব্যায়াম ও খেলাধুলা করেন। ঝুঁকি নিতে পারেনা বাজি ধরা বা জুয়ো খেলার প্রতি আগ্রহ আছে। মারকুটে স্বভাবের। প্রায়ই একে ওকে চড়চাপড় বসিয়ে দেন। মারদাঙ্গা করতে ভালবাসেন। প্রতিযোগিতায় দাঁড়ালে আপনি আক্রমণকারী হয়ে ওঠেন। অন্যের আশা আকাঙ্ক্ষা ও অভিপ্রায়কে আপনি একদম পাত্তা দেন না। আপনাকে বয়সের তুলনায় একটু বড়সড়ো দেখায়। একটু মদ্যপান করলে আপনার মারধর করার প্রবণতা চাগিয়ে উঠতে পারে।

ছিপছিপে, রোগাটে চেহারা : চলাফেরা এবং হাবভাবে ফুটে ওঠে আপনি সদা উদ্বিগ্ন। তবু আপনি নিজেকে সংযত রাখেন। গোপনীয়তা ভালবাসেন। আপনি ভাবপ্রবণ কিন্তু সেই মনোভাবটা চাপা থাকে। মানসিকভাবে আপনি সদাসতর্ক। সামাজিক ব্যাপারে কোথাও জড়িয়ে পড়ার ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত থাকেন। তবে আপনার মনের গতি বোঝা ভার। রাতে আপনার ঘুম হয় না। ক্রমাগত ক্লান্তি অনুভব করেন। আপনাকে বয়সের তুলনায় বেশ ছেলেমানুষ লাগে। একটু ঝামেলায় পড়লে আপনি. নির্জনতা খোঁজেন।

সেলডন বখাটে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে সমীক্ষা করে দেখেছেন যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই পেশীবহুল অর্থাৎ mesomorphic দের মধ্যেই মারকুটে ও বখাটে ছেলেমেয়েদের সংখ্যা বেশি। এই প্রসঙ্গে আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াবার সময় একবার খবর পেলাম একটি ছেলে আর একটি ছেলেকে একাধিকবার মারধর করেছে। আমি দেখলাম মারকুটে ছেলেটি mesomorphic আর যে মার খাচ্ছে সে ectomorphic

দৈহিক গঠনের সঙ্গে মানুষের মনের একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক রয়েছে। একারনে সেলডন, ক্যাটেল (Cattel), আইসনেক (Eyesneck) প্রমুখ মনোবিদরা গবেষণা করে এই তত্ত্বে এসে পৌঁছেছেন চেহারার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের একটা সম্পর্ক রয়েছে। তবে মনঃস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে কখনই বলা যায় না যে কোন তত্ত্ব শতকরা একশভাগ ক্ষেত্রেই একই ফল দেবে। মনঃস্তত্ত্ব শুধু একটা প্রবণতা বলে দিতে পারে। যেমন অবাধ্য বখাটে ছেলেদের সবাই যে mesomorphic হবেই তা নয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তারা হয়ে থাকে।

দেহের কথা উঠলেই জীববিজ্ঞানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্কটা এসে পড়ে। কারণ

মনকে ধারণ করে দেহ। আবার দেহই মনকে প্রভাবিত করে।

আবার দেহ বলতেই ঘুরে ফিরে সেই জিনের কথা এসে পড়ে। কারণ দেহের মধ্যেই জিনের বাসা। তাহলে জিনই আমাদের আচরণের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে। এই চিন্তার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে জিনভিত্তিক আচরণবাদ (behaviour genetic)। এই বিষয়টি হল আচরণের ওপর জিনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা। এবার ব্যক্তিত্বের কতগুলি অঙ্গের কথা বলি।

উচ্চারণ : ব্যক্তিত্বের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হল নিখুঁত উচ্চারণভঙ্গি। উচ্চারণ দেখেই কবি কালিদাসের নববিবাহিতা বিদুষী স্ত্রী ধরে ফেলেছিলেন কালিদাস পণ্ডিত সেজে তাঁকে বিয়ে করলেও তিনি একজন গোমুখ্যু। আসলে তাই তো ছিলেন তিনি, নয়তো ডালে বসে ডাল কাটবেন কেন? উচ্চারণের বিকৃতি নানা উপভাষায় স্থান পায়, শেষ পর্যন্ত সেই বিকৃত শব্দ উপভাষার অভিধানে স্থান করে নেয়। কিন্তু প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠীরই একটি উচ্চারণের মডেল আছে। সেটি কোন একটি ভৌগোলিক স্থানের। ইংলন্ডে যেমন অক্সফোর্ডের উচ্চারণকে মডেল উচ্চারণ বলে ধরা হয়। হিন্দিতে বারাণসীর উচ্চারণকে মডেল উচ্চারণ বলে ধরা যায়। বাংলায় তেমনি শান্তিপুর-কৃষ্ণনগরের উচ্চারণকে মডেল উচ্চারণ ধরা হয়। রেডিও টেলিভিশন, সাহিত্য নাটক এই মডেল উচ্চারণকে গ্রহণ করে। কথ্য বাংলা যা এখন লেখারও ভাষা তা এই নদীয়া জেলার ভাষাকে অবলম্বন করেই। শুধুই কলকাতা, শিলিগুড়ি নয়, ত্রিপুরা, শিলচর ও বাংলাদেশের সমস্ত রেডিও ও টিভি স্টেশন এই গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং এই উচ্চারণই মেনে নিয়েছে।

শিক্ষিত ব্যক্তি যখন আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বক্তব্য রাখবেন অথবা নিজস্ব উপভাষা গোষ্ঠীর বাইরের লোকজনের সঙ্গে সামাজিক কথাবার্তা বলবেন তখন উচ্চারণ যাতে স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ হয় সেটার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। অনেকে উপভাষার প্রতি এমন অন্ধ আনুগত্য প্রকাশ করেন যে স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ শিখতে চান না। কিন্তু যারা নিজস্ব আঞ্চলিক বৃত্তের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে বৃহত্তর সমাজে কথাবার্তা বলতে চান, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনায় অংশ নিতে চান তাদের উচ্চারণ শুদ্ধ হওয়া উচিত।

ইংরেজদেরও ডায়ালেকট আছে। একবার একটি দেহাতি মিডল্যান্ডের মেয়ে আমায় বলেছিল, আই কেম বাই বুস অর্থাৎ বাস। এখন ওই দেহাতি স্বল্পশিক্ষিত মেয়েটির মুখে যে কথা মানায় কোন বিদগ্ধ সংস্কৃতিমনস্ক ব্যক্তির পক্ষে তা মানায় না। বাংলা মাধ্যম স্কুলে ইংরেজির সঠিক উচ্চারণ শেখানো হয় না।

মনে রাখতে হবে সঠিক কম্যুনিকেশন করতে গেলে সঠিক উচ্চারণ শিখতে হবে। ছোটবেলায় উচ্চারণ শুদ্ধ না হলে বেশি বয়সে হয় না। যদিও সাহিত্যিক সাংবাদিক নিরঞ্জন মজুমদার তা সম্ভব করেছিলেন। চাঁদপুর পাঠশালার ছেলে নিরঞ্জন মজুমদার বাংলা মাধ্যমে লেখাপড়া শিখে দুরন্ত ইংরাজি লিখতেন। তিনি স্টেটসম্যানের সহ-সম্পাদক হয়েছিলেন। বাংলা গদ্যও লিখতেন অসাধারণ। তাঁর শীতে উপেক্ষিতা উপন্যাসটি যাঁরা পড়েছেন তাঁরা এটি স্বীকার করবেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় সাফল্য তিনি পরিণত বয়সে নিয়মিত বিবিসি শুনে শুনে ইংরাজি উচ্চারণকে ঠিক সাহেবদের মত করেছিলেন।

বাংলা উচ্চারণের ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে এ এবং অ্যা এর তফাতটা বুঝতে হবে। কারণ ফরাসি ভাষার মতই বাংলায় লেখা. ও উচ্চারণের মধ্যে তফাত আছে। যেমন এক উচ্চারণ হবে অ্যাক। তা বলে ভেক ভ্যাক হবে না। সুন্দর হে- উচ্চারণ হবে সুনদরো হে। স শ ষ এই তিন Shaw এর উচ্চারণের সূক্ষ্ম তফাত মনে রাখতে হবে। দন্ত ন ও মূর্ধন ণ এর উচ্চারণগত প্রভেদ অবহিত হতে হবে। র এবং ড় এর প্রভেদ তো আজকাল লেখার মধ্যে উঠেই যাচ্ছে। কিন্তু তা বলে তো উচ্চারণের সময় আষাঢ়কে আসার বলা যাবে না। বাড়িকে বারি বললে সেটা খুবই খারাপ শোনাবে। উচ্চারণ শুদ্ধ করার একমাত্র উপায় নিয়মিত রেডিও ও টেলিভিশনের খবর শোনা। আমি যখন শিলচরে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতাম তখন ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চারণ নিয়ে খুব বেগ পেতে হত। পশ্চিবঙ্গে দেশবিভাগের পর পূর্ববঙ্গের বহু মানুষ এসেছেন। কিন্তু তাদের তৃতীয় প্রজন্মে এখন সকলেই কলকাতার শুদ্ধ বাংলা বলেন। কিন্তু আসাম ও ত্রিপুরায় পূর্ববঙ্গ থেকে আসা মানুষেরা এই অর্ধশতাব্দী পরেও কথ্যভাষা হিসাবে নিজেদের প্রাক্তন জেলার উপভাষাকে রেখে দিয়েছেন। যদিও লিখিত ভাষা হিসাবে কলকাতার বাংলাই পড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সেগুলো পড়াবার সময়ও উচ্চারণে উপভাষার টান এসে যাচ্ছে। উচ্চারণ শুদ্ধ হচ্ছে না। শুদ্ধ করার প্রয়োজনও হচ্ছে না। কারণ তাঁরা বাংলা ভাষাভাষী গোষ্ঠীর মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু যাঁরা বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে বিদগ্ধ বাঙালি সমাজের সঙ্গে কথাবার্তা আলোচনা চালাতে চান, তাদের পক্ষে উচ্চারণ শেখাটা জরুরি। আমার কোর্সের অনেক ছেলেমেয়ে ছিল যথেষ্ট চালাক চতুর এবং মেধাবী কিন্তু টিভি রেডিওতে তাদের কাজ করার বড় প্রতিবন্ধক ছিল শুদ্ধ বাংলা উচ্চারণ করতে না পারা। অথচ শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাটা কঠিন কাজ নয়। তার প্রমাণ আগরতলা, শিলচর, ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা রেডিও স্টেশনে সংবাদ পাঠক ও ঘোষকদের উচ্চারণ। তাঁরা তো চেষ্টা করেই নিখুঁত উচ্চারণ শিখেছেন।

যাঁরা ব্যক্তিত্ব অর্জন করতে চান তাঁদের নিয়মিত উচ্চারণ প্র্যাকটিশ করতে হবে। রেডিও থেকে টেপে উচ্চারণ ধরে রেখে বার বার বাজাতে হবে আর প্র্যাকটিশ করতে হবে।

প্রকাশের শক্তি অর্থাৎ জ্ঞাপনের ক্ষমতাই হল ব্যক্তিত্ব। যে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, লাজুক এবং সবার সামনে উঠে দাঁড়িয়ে দু চার কথা বলতে গেলে যাদের পা কাঁপে, জিভ শুকিয়ে যায় তাদের ব্যক্তিত্বে খামতি আছে।

যে নিখুঁত স্পষ্ট উচ্চারণে ইংরাজি ও মাতৃভাষায় বক্তৃতা দিতে পারে, প্রশ্ন করতে পারে, কবিতা আবৃত্তি করতে পারে তার আত্মবিশ্বাস অনেক বেশি। এই আত্মবিশ্বাসই তার ব্যক্তিত্বের উৎসভূমি।

শুধু বক্তৃতা দেবার সময়ই নয়, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময়ও উচ্চারণে জড়তা রাখা চলবে না। কথা বলার সময় যদি কোন মত প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাহলে বেশ জোর দিয়েই কথাগুলো বলতে হবে। যদি বিতর্ক সভায় যোগ দেন তাহলে শুধু তথ্য থাকলেই চলবে না তথ্য পেশ করতে হবে স্বচ্ছন্দ ভাষার মাধ্যমে এবং যথেষ্ট দাপটের সঙ্গে। আবার যখন গুরুজন, বাবা, মা, শিক্ষক শিক্ষিকার সঙ্গে কথা বলবেন, তখন হতে

হবে মৃদুভাষী এবং বিনয়াবনত। ব্যক্তিত্বের ৫০ শতাংশ নির্ভর করে চেহারা পোশাক আশাক ও চালচলনের ওপর কিন্তু বাকি অর্ধেকটা নির্ভর করে কথাবলার ভঙ্গির ওপর। যার মধ্যে উচ্চারণ ও কণ্ঠস্বরও পড়ে। অধিকাংশ লোকই কথা বলতে জানেন না।

* নিজের অভিমতকে প্রকাশ করার সময় বেশ জোর দিয়ে কথা বলুন, কিন্তু কণ্ঠস্বরে যেন ঔদ্ধত্য ও অন্যের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ না পায়।

* কখনও বলবেন না : আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না। বলবেন : 'আমি হয়তো ঠিক আপনাকে বোঝাতে পারছি না।' কখনও বলবেন না : 'অল ননসেন্স' অথবা বাজে কথা বলার জায়গা পাননি : বলবেন, এ ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না। আমার মনে হয় আমরা আসল পয়েন্টটা মিস করছি।

* নিজের কথা যে সাতকাহন করে বলে তাকে বোর (Borc) বলে. কিন্তু নিজের কথা অন্যাকে শোনাবার দরকারও আছে। তবে স্থান-কাল-পাত্র বুঝে উপযুক্ত প্রসঙ্গ টেনে তবে নিজের কথা শোনাবেন এবং বলার সময় কথাগুলো বিশ্বাস্য করে বলতে হবে।

* কখনও অন্যের কাছে কথা প্রসঙ্গে বার বার নিজের বউ-ছেলেমেয়ের প্রসঙ্গ টেনে আনবেন না। নিজের সাফল্যের কথা বার বার বললে যারা আপনার কথা বিশ্বাস করবে তারা আপনার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে পড়বে আর যারা আপনার কথা বিশ্বাস করবে না তারা আপনাকে হামবাগ ভাববে।

প্রাণখুলে হাসুন

* বিভিন্ন জায়গায় কথা বলার সময় এমন কোনও ব্যক্তির নামে নিন্দা করবেন না যাতে আপনার ক্ষতি হতে পারে। অসাক্ষাতে শত্রুর নিন্দা করার আগেও একবার ভাববেন, কারণ আপনার যে শত্রু আছে এটা আপনার দুর্বলতা। এই দুর্বলতা নিজমুখে স্বীকার করবেন না। আপনাকে এমনভাব দেখাতে হবে আপনি শত্রুর নিন্দার পরোয়া করেন না। সকলেই

আপনার প্রিয়। শত্রুকেও পরোয়া করেন না। অথবা আপনার কোন শত্রুই নেই। কিন্তু মনে মনে জানবেন, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরও শত্রু ছিল, আপনি কোন ছার।

* সাক্ষাতে প্রশংসা করবেন না, তাহলে তৃতীয় ব্যক্তি আপনাকে চাটুকার ও ব্যক্তিত্বহীন ভাববে। প্রশংসা করবেন অলক্ষ্যে। নিন্দা ও প্রশংসা ঠিক সময় আসল ব্যক্তির কানে পৌঁছে যাবে। লোকেও ভাববে আপনি নিন্দুক নন; সুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

* পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র সৌজন্য বিনিময় করুন। কুশল প্রশ্ন করুন। অন্যে কথা না বললে আপনি কথা বলবেন না, এই আত্মম্ভরিতা ছাড়ুন। কারণ তিনিও হয়তো নিজের 'ইগো' নিয়ে বসে আছেন, বরং ভাবছেন আপনিই আগে কথা বলবেন। একজনকে তো প্রথমে কথা বলতেই হবে। সেই প্রথম ব্যক্তি না হয় আপনিই হলেন।

* পার্টিতে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে নিজে যেচে আলাপ করুন। যেচে আলাপ করলে কেউ খেলো হয়ে যায় না বরং সদালাপী ব্যক্তিত্ব বলে পরিচিত হয়।

* প্রাণখুলে হাসুন, কিন্তু আস্তে কাশুন। সভায় বক্তৃতা দেবার সময় জোরে কথা বলুন যাতে শেষ বেঞ্চের লোকও শুনতে পায় কিন্তু প্রেমিকা বা বান্ধবীর সঙ্গে কথা বলার সময় এমন আস্তে বলুন যাতে পাশের লোকও শুনতে না পায়।

* সবজান্তা ভাব দেখাবেন না, কোনও মানুষের পক্ষেই সব জানা সম্ভব নয়। নিজে যতটুকু জানেন ব্যক্ত করুন। যা জানেন না বিশেষজ্ঞের কাছে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

* ভাল বক্তা হোন। তেমনি ভাল শ্রোতাও। একজন প্রচুর কথা বলে বাচাল আখ্যা পান। অন্যজন কম কথা বলে পণ্ডিত বলে পরিচিত হন।

* সরস করে কথা বলতে শিখুন। জোকস, অ্যানেকডটস ও নিজের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছোটখাটো কাহিনী ঠোঁটের আগায় রেখে দিন। একটু সুযোগ পেলেই তা প্রয়োগ করুন।

* বড় বড় কথা বলবেন না। কথায় দম্ভ ও অহংকার প্রকাশ করবেন না। তাহলে খেলো হয়ে যাবেন। আবার মিউমিউ করবেন না, তাহলে লোকে আপনাকে ব্যক্তিত্বহীন বলে মনে করবে। অথচ ভেতরে ভেতরে যেন অহংকার থাকে। অহংকারই আত্মবিশ্বাস। কিন্তু তাকে গোপন অঙ্গের মত ঢেকে রাখতে হয়।

পোশাক আশাক

শুধুমাত্র পোশাক ব্যক্তিত্বকে বাড়ায় না; স্থান কাল উপযোগী মানানসই পোশাকই ব্যক্তিত্বকে বাড়ায়।

পোশাক-সংস্কৃতি ও লোকাচারের ওপর নির্ভরশীল। ধরুন, গ্রামের বিয়ে বাড়িতে আপনি এলেন থ্রিপিস স্যুট পরে, এতে আপনি হাস্যাস্পদ হবেন। এটি আপনার ব্যক্তিত্বকে বাড়াতে একদম সাহায্য করবে না। বরং কমিয়ে দেবে। বাঙালি বয়স্ক মহিলা শালোয়ার কামিজ পরে কোন অনুষ্ঠানে গেলে সেটা তাঁর ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে না। পোশাক সব সময় সমাজ অনুমোদিত হওয়া চাই। যে সব মহিলা মোটাসোটা তাঁদের জিনস না পরাই ভাল। মোটা চেহারার পুরুষেরা টাইট শার্ট বা পাঞ্জাবি পরলে তাঁদের ভুঁড়ি বিশ্রীভাবে জেগে ওঠে।

শার্ট সব সময়ই প্যান্টের ভেতর গুঁজে পরতে হবে। বাইরে বেরুবার সময় ইস্ত্রি করা পোশাক পরে বেরুবেন। জুতোয় কালি দিতে ভুলবেন না। নিজের জুতো নিজে পালিশের অভ্যাস ভাল। স্যার আশুতোষকে একবার এক সাহেব জিজ্ঞাসা করেছিল তোমার জুতো তুমি নিজে পালিশ করো? স্যার আশুতোষ বলেছিলেন : তুমি কার জুতো পালিশ করো? পোশাক যেমন ব্যক্তিত্বের ইঙ্গিতবহ তেমনি পোশাক সম্পর্কে খুঁতখুঁতানিকে মনোবিদরা ব্যাখ্যা করেন আত্মচেতনার (Self Concept) অভাব বলে। অনেকে পোশাক সম্পর্কে উদাসীন। শিবরাম চক্রবর্তীকে দেখতাম এক ঢোলা হাতার ঘি রঙের শার্ট আর ধুতি পরে সারা জীবন কাটিয়ে গেলেন। আদর্শবাদী ও আত্মবিশ্বাসী মানুষেরা সহজ সরল পোশাক ব্যবহার করেন। এঁরা একই ধরনের পোশাক পরেন। যেমন শাদা রঙের ধুতি পাঞ্জাবি তো সারা জীবন শাদা ধুতি পাঞ্জাবিই। কোর্তা পায়জামা তো কোর্তা পায়জামাই। তখন পোশাকই হয়ে ওঠে বাক্তির আত্মপরিচয় বা আইডেনটিটি।

কিন্তু বহু পুরুষ ও মহিলা আছেন যাঁরা নিত্য নতুন ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেন। তাঁরা রকমারি পোশাক জমান। মেয়েদের শাড়ির প্রতি মোহ সহজাত। এ বিষয়ে অশিক্ষিত শিক্ষিত সকলেরই মানসিকতা এক। একমাত্র ব্যতিক্রম তাঁরাই যাঁরা রাজনীতি ও সমাজ-সেবাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে ইতিমধ্যেই সুপরিচিত। পোশাকের প্রতি অত্যধিক আসক্তি ব্যক্তিত্বের খামতি পুরনেরই লক্ষণ। ইওরোপ আমেরিকায় প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ বৃদ্ধারাই জমকালো পোশাক পরে। যৌবন শেষ হয়ে যাওয়ার খামতিটুকু তাঁরা পোশাকে ঢাকতে চান। কিন্তু পোশাক বয়সোচিত না হলে তা ব্যক্তিত্বের মর্যাদাহানি করে।

পোশাক সহজ ও সরল হলেও তা পরিপাটি ও পরিষ্কার হওয়া চাই। এলোমেলো ভাবে পরা নোংরা পোশাকও আত্মচেতনার খামতি প্রমাণ করে। অন্যেও ওই মানুষটিকে অত পাত্তা দেয় না।

উদ্ভিন্ন যৌবনমেয়েদের পক্ষে টাইট পোশাক অথবা লোকাট পোশাক পরাটা আত্মবিশ্বাসের অভাবই প্রকাশ করে। তাঁরা এইভাবে পোশাক পরেন পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আত্মশ্লাঘা অনুভব করার জন্য। কিন্তু এটার প্রয়োজন হয় তখনই, যখন অন্য কিছু নিয়ে গর্ব বোধ করার মত সম্পদ থাকে না। অথবা যাঁরা শো-বিজনেসে আছেন, যেখানে শরীর দেখানোটাই পেশার অঙ্গ। এল আর অহিকেল পোশাক ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমেরিকার কলেজ ছাত্রীদের মধ্যে এক গবেষণা চালান। দেখা যায় যে সবমেয়েরা বাহারি রঙ চঙে পোশাক পরে তারা প্রথাসিদ্ধ, বিবেকবান, বাহ্য (Conforming) অবুদ্ধিজীবী, সামাজিক ও সহানুভূতি সম্পন্ন।[১২] পোশাক একটা সময় স্বাধীন চিত্তের প্রতীক হয়ে ওঠে। সেটা বয়ঃসন্ধির সময়কালে। এই সময়টায় ছেলেমেয়েরা তাদের বাবা মায়ের পছন্দ করা পোশাক পরতে চায় না। চায় তার বন্ধু বান্ধবদের মত পোশাক। পোশাক সচেতনটা এই বয়সে খুব বেড়ে যায়। মেয়েরা এই বয়সেই যৌন উদ্দীপক পোশাক পরতে বেশী আগ্রহী হয়। এ নিয়ে মায়ের সঙ্গে মেয়ের বিরোধ বাধে। অবশেষে মেয়েরই জয় হয়। এই বয়সে এই ধরণের পোশাক পরে তারা ছেলেদের দৃষ্টি কাড়তে চায়। তাছাড়া তাদের স্বাধীনচেতা মনের প্রতিফলনও এই পোশাক। পোশাকই তাদের প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহ।

লোকে যেমন অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য পোশাক পরে তেমনি পোশাক আবার

শ্রেণী পরিচয়ের টিকিটও। মানুষই তার শ্রেণীকে অতিক্রম করতে চায় না। একজন চাষী কিংবা ক্ষেতমজুর যে দামী প্যান্ট ও শার্ট পয়সা জমিয়ে কিনতে পারে না তা নয়। কিন্তু সে তার শ্রেণীগত পোশাক (ধুতি ও গেঞ্জি অথবা খালি গা) বদলাতে চায় না। এইভাবে সব শ্রেণীরই পোশাকের এক একটা স্টিরিও টাইপ গড়ে ওঠে। যেমন কেরানীর পোশাক, শিক্ষকদের পোশাক, ডাক্তারদের পোশাক।

আমাদের কর্মজীবনের গোড়ায় আমরা অনেক ধুতি পাঞ্জাবি পরা রিপোর্টার দেখেছি। আমাদেরই দুতিনজন সহকর্মী ধুতি পাঞ্জাবি পরে অফিসে আসতেন। তারপর আমাদের প্রজন্ম থেকেই প্যান্ট-শার্ট শুরু হয়। মহাকরণে দুজন রিপোর্টার স্যুট বুট পরে আসতেন। দুজনেরই ব্যক্তিত্বের কিছু খামতি ছিল, যা তাঁরা সাহেবি পোশাক পরে পূরণ করতে চেয়েছিলেন। আগে আমাদের কলেজের প্রায় সব অধ্যাপকই ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কলেজে আসতেন। এটাই ছিল অধ্যাপকদের শ্রেণীগত পোশাক। এখন কদাচিৎ অধ্যাপকরা ধুতি-পাঞ্জাবি পরে কলেজে আসেন।

লিঙ্গভেদে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা আলাদা পোশাক সুনির্দিষ্ট করা আছে। কিন্তু বহু মেয়ে ছেলেদের মত প্যান্ট-শার্ট পরতে শুরু করেছে। আজকাল এমন পোশাক বেরিয়েছে যা ছেলেমেয়ে উভয়েই পরতে পারবে। মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পছন্দ করে এই কারণে যে মেয়ে হিসাবে তারা নিজেদের কম যোগ্যতাসম্পন্নভাবে। সেকারণে

ধুতি ও পাঞ্জাবি পরা রিপোর্টার

ছেলেদের সমকক্ষ হওয়ার জন্যই তারা ছেলেদের পোশাক পরে। অনেক সময় নারী সুলভ লক্ষণগুলি কিছু কিছু মেয়েদের মধ্যে ফুটে ওঠে না, তার বদলে পুরুষালি আচার আচরণই বেশী করে দেখা দেয়। এই সব মেয়ে পুরুষের পোশাকই পছন্দ করে।

পোশাকের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আরও এই কারণে যে অধিকাংশই

অচেতনভাবে এক ধরনের পোশাকের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এর মধ্যে দুটি জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১) ব্যক্তিগত রুচি ও নান্দনিক চিন্তাধারা ২) নিজের আইডেনটিটি। আইডেনটিটি বলতে শুধু শ্রেণী বা পেশাগত আইডেনটিটি নয়, ব্যক্তি হিসাবে তার অস্তিত্ব। টিন এজাররা চায় পোশাকের মধ্য দিয়ে তাকে বয়সের চেয়ে বড় দেখাক। এ জন্য অনেক মেয়ে শখ করে মাঝে মাঝে শাড়ি পরে। অথবা টাইট পোশাক পরে যাতে তাদের স্তনযুগল আরও সুপরিণত দেখায়। আবার বৃদ্ধারা প্রসাধন করে ও রঙিন শাড়ি পরে নিজেদের কমবয়সী দেখাতে চায়। বিধবারা আর আগের মত থান পরে বৈধব্যের বেশ ধারণ করেন না।

পোশাক হল অপরের আয়নায় নিজেকে দেখা ও নিজের সম্পর্কে এক আরোপিত ভাবমূর্তি তৈরি করা। পোশাকের মধ্য দিয়ে মানুষ সামাজিক স্বীকৃতি আদায় করতে চায়। সেজন্য ধনীরা দামী পোশাক পরে। বড়লোকের বউরা সর্বাঙ্গ গহনায় মুড়ে নেমন্তন্ন খেতে আসে। এর মধ্য দিয়ে তাদের অহংবোধ তৃপ্ত হয়। কারণ তারা মনে করে এই দামী পোশাক পরে সমাজে বেরুলে অন্যেরা তাকে স্বীকৃতি দেবে। যদি তা না দেয়, পোশাক নিয়ে যদি অন্যেরা হাসাহাসি করে তাহলে মানুষের ব্যক্তিত্ব ভীষণভাবে আহত হয়।

তবে যাইহোক না কেন, যে পোশাক ব্যক্তিত্ব বাড়ায় সে পোশাক যে দামী পোশাক হতে হবে তার কোন মানে নেই। কমদামী পোশাকও যদি ভেবেচিন্তে নির্বাচন করা যায় তাহলে তা ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে পারে। শুধু পোশাক নির্বাচনের সময় প্রথমে দেখতে হয় সেটি মাপ অনুসারে তৈরি কি না। ঢলঢলে বা গায়ে ছোট হয় এমন পোশাক ব্যক্তিত্বকে খেলো করে দেয়। দ্বিতীয়ত পোশাক পরতে হয় বয়স ও দৈহিক কাঠামোর উপযোগী করে। লোকে যেন পোশাকটা না দেখে আপনাকেই দেখে। আপনার ব্যক্তিত্ব বাড়িয়ে তোলা ছাড়া পোশাকের আর গুণ থাকতে পারে না। আপনি একটি পাঁচহাজার টাকা দামের শাড়ি পরতে পারেন কিন্তু শাড়িটি আপনাকে মানিয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে। অনেককে দারুণ মানিয়ে যায়। অনেকে শাড়ি পরতে অস্বস্তিবোধ করেন। অনেকে ধুতি সামলাতে পারেন না। পোশাক যদি ক্রমাগত অস্বস্তির কারণ হয় তাহলে হাবভাবে সেটা ফুটে ওঠে। তখন পোশাকটা ব্যক্তিত্ব প্রকাশের চেয়ে বোঝায় পরিণত হয়। সামাজিক কাজেকর্মে, অফিসে ও সভা সমিতিতে যেখানে সবাই আপনাকে লক্ষ্য করছে সেখানে পরিবেশ উপযোগী পোশাক পরে না গেলে হীনম্মন্যতা বোধ জাগতে পারে।

আমার মনে আছে ছোটবেলায় (তখন বোধ হয় আট-ন বছর বয়স) আমার এক পিসতুতো দাদার বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা তখন এত গরিব ছিলাম যে কোথাও পরে যাবার মত আমার ভাল জামাকাপড় ছিল না। আমি একটি শস্তা জামা প্যান্ট পরে গিয়েছিলাম, অন্যদিকে আমার অন্যান্য পিসতুতো দাদার ছেলেমেয়েরা দামী পোশাক পরে গিয়েছিল। তারা আমার পোশাক দেখে আমায় নানা বিদ্রূপ করেছিল। সেই বালক বয়সে আমার ব্যক্তিত্বের ওপর এই আঘাত আমি এখনও ভুলতে পারিনি। এই ঘটনা আমার ওপর এমন রেখাপাত করে যে দামী পোশাকের ওপর আমার বিতৃষ্ণা এসে যায়। কর্মজীবনে প্রবেশ করে আমি দামী পোশাক কেনার মত সঙ্গতি অর্জন করি,

কিন্তু কখনও নিজের জন্য দামী পোশাক কিনিনি।

ছোট ছেলেমেয়েদের রকমারি পোশাক পরাবার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। সেটি হল এতে করে তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা দেখা দেয় না। বড় হলে তারা বোঝে ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির জন্য পোশাক ছাড়া আরও নানা উপকরণ আছে। যেমন একজন উচ্চশিক্ষিত ও সম্মানজনক পদে নিযুক্ত ব্যক্তির পোশাকের দিকে অত নজর না দিলেও চলে। পশ্চিমবঙ্গে আই এ এস অফিসাররা একটি সাধারণ সুতির বুশ শার্ট পরেই তো বেশিরভাগ সময় কাটিয়ে দেন। দেখা যায় যে সব কিশোর কিশোরী বা যুবক যুবতী পড়াশোনায় তেমন ভাল নয়, অথবা ভাল চাকরি করে না তাদের মধ্যে জমকালো পোশাক পরার প্রবণতা বেশি। কারণ পোশাক তাদের সুপ্ত অহংবোধকে স্বাভাবিক মাত্রায় রেখে দেয়। হীনম্মন্যতাকে চেপে রাখে।

নামে এসে যায়

শেক্সপিয়র বলেছেন, নামে কি এসে যায়। গোলাপকে যে নামে ডাকো, সে গন্ধ দেবেই। এতকাল এই ধারণাতে চিড় ধরেনি। তাই ছেলে মেয়েদের নামকরণ নিয়ে বাবা মায়েরা মাথা ঘামাতেন না। তাঁরা এত সৃজনশীল মনের অধিকারী ছিলেন না। যে নামটি মনে আসত সেই নামটিই দিতেন। অধিকাংশই ঠাকুর দেবতার নামে ছেলেমেয়েদের নাম দিতেন। নতুবা সমাজে প্রচলিত যে সব নাম আছে তা থেকে একটি সাধারণ নাম বাছাই করতেন। এটি সব সমাজেই প্রচলিত। যেমন খ্রীস্টাদের মধ্যে ফিলিপস, ডেভিড, স্মিথ, জন হাজারে হাজারে রয়েছে। মুসলমান নামের মধ্যেও জিয়া, ফজলুর, রহিম জামাল, ওসমান প্রভৃতি কতগুলি নাম অত্যন্ত বেশী প্রচলিত। হিন্দুদের মধ্যে রাম, শ্যাম, যদু, মধু প্রচলিত নাম বলে সেটা কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুরা এখন আবিষ্কার করছেন, নামের এক বিশাল ব্যাপক দ্যোতনা রয়েছে। নামের মধ্যে দিয়ে অনেক সময় একটা পজিটিভ ধারণাও সঞ্চারিত হয়। নামকরণের মধ্যে পারিবারিক কৃষ্টি, শিক্ষা, রুচি ও ঐতিহ্যের ছাপও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মানুষ তার নিজের নামকরণের জন্য দায়ী নয়। শিশুকালেই তার বাবা-মা আত্মীয় স্বজন তার নাম ঠিক করে দেন আর সেই নামই তাকে সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয়।

তবে অনেককে দেখেছি বড় হয়ে তাদের পারিবারিক সারনেম এভিডেবিট করে বদলে নিতে। আমার এক ছাত্রীর উপাধি ছিল দেব, সে অগ্নিহোত্রী এই মারাঠি সারনেম গ্রহণ করে। আর একজন ছাত্রীর সারনেম ছিল চক্রবর্তী। সারনেম বদলে সে হয়েছে আয়তাক্ষী। একটা সময় ইংরেজদের প্রভাবে পড়ে ভারতীয়দের সমস্ত সারনেম বিকৃত হয়ে গেছে। যেমন ডাট, রে, টেগোর, গশ, শ বাসু, ডন। এইভাবে বাঙালি দোকানের নামও পালটে গেছে যেমন আশুতোষ হয়েছেন এ.টস।

বাঙালি পারিবারিক নাম ছেটে ইংরাজি উচ্চারণ মোতাবেক করাটাকে সবাই স্মার্টনেশেরই অঙ্গ বলে মেনে নিয়েছিলেন। আজকাল অনেকে প্রথাসিদ্ধ টাইটেলে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন। অনেকে ব্যানার্জি না লিখে বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য নামেই পরিচিত হতে চান। যখন সবাই ব্যানার্জি, তার মধ্যে একজন বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সগৌরবে আত্মঘোষণা

করেন তাহলে এটি তাঁর স্বাতন্ত্র্যই সূচিত করে। আর স্বাতন্ত্র্যই ব্যক্তিত্ব।

আমি এই স্বাতন্ত্র্য দেখাতে গিয়ে ১৯৯৪ সালে বিদেশ যাত্রার সময় বিপদে পড়েছিলাম। অপ্রাসঙ্গিক হলেও এই গুরুগম্ভীর প্রসঙ্গটি হালকা করবার জন্য গল্পটি বলি।

আমি বাংলায় চট্টোপাধ্যায় লিখি। ইংরাজিতে চ্যাটার্জি। পাশপোর্ট ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে চ্যাটার্জি লেখা। ১৯৯৪ সালে ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতর আমাকে আমেরিকার এক শহরে বক্তৃতা সফরে পাঠান। কলকাতার পররাষ্ট্র দফতরে বাঙালি অফিসার প্লেনের টিকিট কাটার সময় টিকিটে দরখাস্ত অনুসারে আমার উপাধি চট্টোপাধ্যায় লেখেন। পাশপোর্টে ছিল চ্যাটার্জি। আমি এই তফাৎটা খেয়াল করিনি। আমেরিকা যাত্রার আগের রাতে দিল্লির সেন্টুর হোটেলে ছিলাম। সেখানে রিসেপসনে টিকিট ও পাশপোর্ট জমা দিই প্রথামত।

রাত দশটা নাগাদ দেখি ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের এক অফিসার (হোটেলটি ওই এয়ারলাইন্সের) এসে আমাকে বলেন, আপনার টিকিটে লেখা চট্টোপাধ্যায় আর পাশপোর্টে লেখা চ্যাটার্জি—এটা কী রকম ব্যাপার? দুটো নাম না মিললে আমরা বুঝব কী করে আপনি একই লোক? আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম বাংলায় যিনি চট্টোপাধ্যায়, ইংরাজিতে তিনিই চ্যাটার্জি। যেমন যার নাম চাল ভাজা, তার নাম মুড়ি। কিন্তু তিনি বুঝলেন না। বললেন, আপনার দেখছি যাওয়া কপালে নেই। এয়ারপোর্টে সিকিওরিটি আপনাকে যেতে দেবে না। বুঝুন অবস্থা, পরদিন ভোরবেলা আমার ডিপারচার। তখন রাত দশটা। পাগলের মত ফোন করার চেষ্টা করলাম পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জিকে। তাঁকে ভালই চিনতাম। কিন্তু তাঁর চেলা-চামুন্ডারা ফোন দিল না।

সারারাত ঘুমতে পারলাম না। পরদিন ভোরে দুরু দুরু বুকে এয়ারপোর্টে গেলাম। কিন্তু ভাগ্য ভাল সিকিওরিটি অতশত দেখল না। প্লেনে উঠে পড়লাম। দুপুরে লন্ডন থেকে নিউইয়র্কের প্লেনে উঠতে গিয়েই বাধা পেলাম। মেমসাহেব কোন কথাই শুনতে চায় না। আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেই। শেষে অনেক কাকুতি মিনতি করে ছাড়া পেলাম। আমেরিকা পৌঁছে শিকাগোর ভারতীয় কনসাল জেনারেলের কাছে (ভাগ্যিস তিনি বঙ্গসন্তান ছিলেন) গিয়ে সব খুলে বলে একটা সার্টিফিকেট নিলাম। চট্টোপাধ্যায় আর চ্যাটার্জি একই ব্যক্তি। ওই চিঠির বলে ফেরার সময় আর অসুবিধা হয়নি। কিন্তু প্রশ্নটা বার বার উঠেছিল।

নাম ও পদবি ছাটার মূলে কাজ করে প্রচ্ছন্ন আত্মরতি অথবা ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধা। রবীন্দ্রনাথও টেগোর বলে বিদেশে পরিচিত হতে আপত্তি করেননি। সুভাষচন্দ্রও 'চন্দর' বোস' নামটি মেনে নিয়েছিলেন। যদিও ভারতীয়দের বিদেশীদের মত সারনেমের সাহায্যে পরিচিত হবার রেওয়াজ নেই। কিন্তু মোহনদাস করম চাঁদ কোথায় হারিয়ে গেলেন। বেঁচে থাকলেন গান্ধী। কিন্তু জওহরলাল তাঁর প্রথম নামেই স্বদেশে পরিচিত। আবার বিদেশে তাঁর পরিচয় নেহেরু বলে।

আধুনিক প্রজন্মে বাঙালি নামের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর রূপান্তর ঘটেছে। এখন নাম নেওয়া হচ্ছে উপনিষদ মহাভারত ও রামায়ণের বিভিন্ন চরিত্র থেকে। আগেও দেওয়া হত। কিন্তু সেগুলি মূল চরিত্র থেকে। এখন উঠে আসছে বহু পার্শ্বচরিত্র। উদ্দালক, শ্বেতকেতু অত্রি, অঙ্গিরা, অরিত্র, জাবালা, ইত্যাদি। আমি তো আরও কিছু স্বল্প প্রচলিত নামের তালিকা দিতে পারি যেগুলি আমার মতে খুবই স্মার্ট নাম এবং এই নামগুলি শুনলেই মনে হয়

এরা যেন সাধারণের ভিড়ে হারিয়ে যাবার মত ছেলে-মেয়ে নয়। অঙ্গিরা, সোমাহুতি বেদের ঋষি অগস্ত, পরাশর, কণ্ব, ঋতম (সত্য) অগ্নি, জাবালা, সত্যকাম, পূষা, যাজ্ঞবল্ক্য, উদ্দীপক, গৌতমী, সুচিত্র (মহাভারত), উদ্ভব, চারণ, বৈদেহী, শল্য, ধৌম্য। এই তালিকা আর দীর্ঘ করতে চাই না।

তবে খটোমটো বিরল নাম ব্যক্তির পক্ষে বিড়ম্বনার কারণ হয়ে ওঠে। যেমন আমার এক ছাত্রের নাম বীভৎসু। বীভৎসু অর্জুনের একটি নাম, কিন্তু একেবারে নতুন নাম। আমি সারা বিশ্বে এই নামটি দ্বিতীয় কারও খুঁজে পাইনি।

আবার আমার মেয়ের অনুযোগ, তার এমন নাম দিয়েছি যে নামে ভারতের সব শহরে সিনেমা হল, না হয় রেস্টুরেন্ট না হয় একটি কাপড়ের দোকানও থাকবে। মেয়ের নাম বৈশালী। আমি বৌদ্ধযুগের এক গৌরবময়ী নগরীর নামে তার নাম রেখেছিলাম। কিন্তু অশিক্ষিতরা বৈশালীকে বৈশাখী বলে ভুল করে, কারণ বৈশাখী নামটি আরও কমন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহুয়ায় তাঁর নায়িকাদের ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন নামের অবতারণ করেছিলেন। তাঁর কাছে প্রত্যেকটি নামই গভীর অর্থবহ, নামের মধ্য দিয়ে মেয়েটির রূপ যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়।

যেমন : কাজলী, (সে যেন গো কাকচক্ষু স্বচ্ছ দিঘি জল অচঞ্চল) খেয়ালি (অপরাহ্নে ছাদে বসি, এলোচুল বুকে পড়ে খসি/গ্রন্থ নিয়ে হাতে/উদাস হয়েছে মন সেযে কোন কবিকল্পনাতে) পিয়ালী (চাহনি তাহার, সব কোলাহল হলে সারা সন্ধ্যার তিমিরে ভাসা তারা) নাগরী (ব্যঙ্গ সুনিপুণা) সাগরি (বাহিরে সে দুরন্ত আবেগে উচ্ছলিয়া উঠে জেগে) জয়তী (যেন তার চক্ষুমাঝে/উদ্যত বিরাজে/মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী) ঝামরী (সে যেন খসিয়া পড়া তারা)। যুগাবসানের সঙ্গে সঙ্গে রুচিও বদলায় এবং পুরনো বহু প্রচলিত নাম বহু ব্যবহারে পুরনো ফ্যাশনের মত বাতিলের দলে চলে যায়।

আমার এক তরুণ পাঠকের নাম ছিল কানাই। সে আমায় চিঠি লিখেছিল নামটির জন্য তাকে বন্ধু বান্ধবেরা খেপায়। অতঃকিম?

নামকরণের আগে ভাবতে হবে এই নাম ভবিষ্যতে জাতকের মনে কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা।

১. কালো মেয়ের নাম কালী দিলে তাকে মা কালী বলে বন্ধুরা হাসি ঠাট্টা করতে পারে।

২. ভূতনাথ, পাঁচু গোপাল, পাঁচকড়ি, হাজারিলাল, কানাই, নিতাই, বলাই, গৌর প্রভৃতি নাম আধুনিক যুগে অচল।

ব্যক্তিত্ব ও নাম নিয়ে বিদেশে অনেক গবেষণা হয়েছে। একটা গবেষণায় দেখা গেল প্রথাবহির্ভূত নামের মেয়েদের চেয়ে আটপৌরে নামের মেয়েরা বউ হিসাবে ভাল হয়। কেন বলুন তো? প্রথা বহির্ভূত নামের মেয়েরা ছোটবেলা থেকে ইস্কুল কলেজে নানা ঠাট্টা শোনে। ঠাট্টা শুনতে শুনতে তার মধ্যে হীনম্মন্যতা জাগে। তার ব্যক্তিত্বে এজন্য চিড় ধরে। অন্যদিকে সাধারণ নামের মেয়েদের যেমন রমা, ইন্দিরা, তুলিকা, মালতী, স্নিগ্ধা, মমতা, প্রিয়া এই সব নাম সেকেলেও নয় অথচ পরিচিত। এই সব মেয়েদের মধ্যে নাম নিয়ে কোন হীনম্মন্যতা জাগে না। যদি না আমার মেয়ে বৈশালীর মত সে নাম সচেতন হয়ে পড়ে।

'Continued embarrasment from disliked names often cantributes to

maladjustment, college students with eccentric names have more than their proportional number of flunk outs, dropouts and phychoneuroses.'[১৩]

অর্থাৎ না পছন্দ নাম ছেলেমেয়েদের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ফলে তাদের মানিয়ে চলতে অসুবিধে হয়। অর্থহীন উদ্ভট নামের জন্য কলেজের অনেক ছেলেমেয়ে ঠাট্টা তামাশার চাপে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা মানসিক অসুখ।

মনস্তাত্ত্বিকরা বলছেন, ছেলেমেয়েদের নামকরণের সময় ভেবে চিন্তে করবেন। কারণ ছোটবেলাতেই তো মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়ে যায়। মনে রাখবেন নাম মানুষের বড় সম্পদ। 'স্বনামধন্য' কথাটার মানে হল, যাঁর নামকরণ সার্থক কারণ ওই ব্যক্তি তাঁর নামের মর্যাদা অনুসারেই কাজ করেছেন এবং এক ডাকে তাঁকে লোকে চিনছে।

এমন কী Nickname বা ডাক নাম দেওয়ার ব্যাপারেও ভেবে চিন্তে দিতে হবে।

৩. নামকরণের ক্ষেত্রে গুণ নিরপেক্ষ নাম দেওয়াই ভাল। প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে যে কোন নাম দেওয়ার মধ্যে কোন ঝুঁকি থাকে না। নদীর নামে নাম ঃ গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনা, কোয়েল, অঞ্জনা, রেবা, মন্দাকিনী, অলকানন্দা আরও কত মিষ্টি নাম আছে। হিমালয়, সমুদ্র, সাগর, আকাশ আরও কত নাম। আমি একদা দুটি যমজ ছেলের নাম দিয়েছিলাম আকাশ নীল ও সাগরনীল। ওই নামের গুণেই তারা চটজলদি পরিচিতি পায়। আজকাল বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও বাঙালি নামের চলন বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে নজরুল পথিকৃৎ ছিলেন। দুই ছেলের নাম মহাভারত থেকে নিয়েছিলেন, অনিরুদ্ধ ও সব্যসাচী। এখন মুসলমান মেয়েদের নাম ফুলের নামে নদীর নামে আকছার রাখা হচ্ছে।

নাম যখনই সামাজিক ভাবে স্বীকৃতি পাবে এবং উন্নতরুচির নিদর্শন বলে গণ্য হবে, নাম যত সহজবোধ্য এবং সংক্ষিপ্ত হবে ততই তা সর্বগ্রাহ্য হবে। দু অক্ষরের সহজ সরল নাম : রমা, চন্দ্রা, মিতা, জনা, ইতি, স্নিগ্ধা, স্বপ্না, জয়া, স্নেহা, রূপা, শান্তি, রাত্রি, নদী, রেবা, সেবা নামগুলি হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান নির্বিশেষে সর্বগ্রাহ্য।

ছেলেদের নামের মধ্যে আর্য, সৌম্য, ব্রতী, রুদ্র, ঋষি, জয়, প্রভৃতি দু অক্ষরের নাম যথেষ্ট স্মার্ট। কিন্তু দু অক্ষরের নামের সঙ্গে পর্দাবর ছন্দ মেলাবার জন্য একটি করে মধ্যপদ ব্যবহার করা হয়। যেমন কুমার, চন্দ্র। কিন্তু তাহলেও অপভ্রংশ হিসাবে মুখে মুখে প্রথম নামটি থেকেই যায়। জয়সূর্য, জয়প্রদ, জয়দ্রথ যেনামই হোক, মুখে মুখে জয় নামটাই থেকে যাচ্ছে। আজকাল অনেকে নামটি সহজ সরল করার জন্য ইচ্ছা করেই মধ্যপদ বর্জন করছেন। যেমন জয় গোস্বামী। সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নামের পর মধ্যপদ ছিল কুমার, বিবাহের আগেই আমি কুমারত্ব বর্জন করেছিলাম।

অনেক মনোবিদ বলেছেন : ছেলেমেয়েরা একটু বড় হয়ে নাম মাহাত্ম্য বোঝার আগে তাঁদের স্থায়ী নামকরণ করা উচিত নয়। মাধ্যমিক পরীক্ষার ফরম ফিলআপ করার সময় বুঝে শুনে তখনই পোশাকি নাম দেওয়া উচিত।

আমার তো মনে হয় যে সব জাতিবাচক উপাধি মানুষে মানুষে বৈষম্যের সৃষ্টি করতে পারে সেই সব উপাধি বর্জন করে নিরপেক্ষ উপাধি গ্রহণ করা উচিত। যেমন রুইদাস, কাহার, সূত্রধর, কর্মকার, রজক, প্রামাণিক, নমঃশুদ্র, প্রভৃতি জাতি-কর্মবাচক পদবির অবসান ঘুচিয়ে ঢালাও ভাবে রায়, চৌধুরী, বিশ্বাস, মজুমদার প্রভৃতি উপাধি দেওয়া উচিত। কারণ গুণকর্ম বিভাগ অনুসারে এখন আর চতুবর্ণের কোন অস্তিত্ব নেই। বরং এইসব পদবির মধ্য দিয়ে ব্যক্তিকে সব সময় নিম্নবর্গের শিরোপা বহন করে বেড়াতে হয়। ভারতীয়

সমাজে জাতিভেদ ব্যক্তিচেতনার ওপর বিরাট আঘাত। ব্যক্তিত্ব পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দবকার যেখানে সমস্ত ব্যক্তি মনস্তাত্ত্বিকভাবে নিজেকে ব্যক্তি হিসাবে সমান ভাবতে শিখবে।

সংরক্ষণ শুধু শিক্ষা চাকরি নিশ্চিত করতে পাবে কিন্তু মানসিক ব্যবধান কমাতে পাবে না। তার প্রমাণ শিক্ষিত ও উচ্চপদে আসীন তফশিলি জাতি উপজাতি সম্প্রদায়ের বহু মানুষ আজও তাদের সমাজের মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে কবেন। এই প্রসঙ্গটি শেষ করার আগে মনোবিদ W F Murphy-র একটি উক্তি স্মরণ করতে বলি : The names of individual play an important role in the organization of their ego defense pattern and are cathected and utilized from the point of view of ego defenses in a manner similar to an organ or body part For same, the name may become part of the core of a severe neurosis The degree of pathological disturbance varies from exaggerated pride or exaggerated shame over the name to extremes of psychotic proportions কোনদিন কী এসব কথা ভেবেছিলেন যে পিতৃদত্ত নাম আমরা প্রত্যেকে আমাদের দেহের মতই বহন করছি তা আমাদের অহংবোধেব কতখানি ক্ষেত্র জুড়ে আছে। নাম আমাদের দেহের এক একটি প্রত্যঙ্গের মতই আমাদের কাছে দামী। এর প্রমাণ চান? একজনের নাম ও পদবির সামান্য ভুল বানান লিখে দেখুন না কী প্রতিক্রিয়া হয়। অশিক্ষিত সাংবাদিকরা কারও নামের বানান বা ব্যক্তির নাম লেখার নিজস্ব স্টাইলের ওপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন না। যেটা শিক্ষিত সাংবাদিকেরা করেন। আমরা সাংবাদিকতার ক্লাশে গোড়াতেই শেখাই, ইন্টাবভিউ করার সময় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করবে আপনার নামের বানান আপনি কীভাবে লেখেন? ঐ এত কাণ্ডের পর একবার আমার এক ছাত্র আমাব পদবি লিখল চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তীরা যে খারাপ লোক তা বলছি না, কিন্তু পেশাগতভাবে নামের বানান ও পদবি ভুল লেখা মারাত্মক অপরাধ। কিন্তু আমি নিজের নামের ভুল বানানও অনেককে লিখতে দেখেছি। তখন প্রার্থর্না করতে ইচ্ছা হয়, তোমার নাম যারে দাও, তারে বানান লিখিবারে দাও শকতি।

গ্রামের দিকে অকথ্য ডাকনাম দেবার প্রচলন ছিল যেমন গুয়ে, পেদো, পুঁটে, হেগো, খাণ্ড। আমার এক মাস্টারমশাইকে আমরা সবাই গুয়েদা বলতাম। খাণ্ড ছিল আমার এক পিসতুতো ভাইপোর নাম। ইয়ার্কি করে অথবা কিছু না ভেবে এসব নাম রাখা হয় কিন্তু পরিচিত মহলে ডাক নামটাই পরিচিত হয়ে ওঠে। কী ভাগ্যি সত্যজিৎ রাযেব ডাকনাম ছিল মানিক। সিদ্ধার্থরায়ের ডাক নাম মানু, কিন্তু এঁদের ডাকনাম আরও খারাপ কিছু হতে পারত। রবীন্দ্রনাথের ডাক নাম যদি ফটকে কিংবা পচা হত তাহলে নাম চাপা দেওয়ার আর কোন উপায়ই থাকত না।

১. নামকরণের ক্ষেত্রে এমন বিশেষণবাচক নাম দেওয়া উচিত নয় যা অত্যধিকমাত্রায় গুণের দ্যোতক অথবা যা অত্যধিক মাত্রায় নামের বাহককে বিব্রত করতে পারে। যেমন বিপ্লবকেতন। (বিপ্লবের পতাকা), ধ্বজাধারী মণ্ডল, রিপুদমন, রমণীমোহন। এই নামগুলির গুণের সঙ্গে ব্যক্তির চরিত্রেব যদি ফারাক থাকে তখন নাম নিয়েই ঠাট্টা তামাশা শুরু হয়ে যায়।

২. মেয়েদের নামের ক্ষেত্রে সতী, প্রিয়া, প্রিয়দর্শিনী, সুকন্যা, শোভনা, সুরূপা প্রভৃতি গুণবাচক নামগুলির সঙ্গে ব্যক্তির চরিত্র ও চেহারার সামঞ্জস্য থাকা চাই। সুরূপা নামের মেয়েটি সত্যিই সুরূপা কি না দেখে নিন।

তিন

ব্যক্তিত্ব এক চলমান ধারণা

আমার হতাশ হবেন না গ্রন্থমালায় দেখিয়েছি 'বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির জীবনে পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের জীবনের পরিবর্তন ঘটেছে। সুতরাং ব্যক্তি কোন অচল অনড় বস্তু নয়। তবে ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কার প্রভাব কত এনিয়ে নানা মুনির নানা মত আছে। ফ্রয়েড তাঁর সাইকো অ্যানালিটিক তত্ত্বে দেখিয়েছেন, মানুষের অবচেতন মনের প্রবাহ ও তার শৈশবের নানা মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা (traumatic experience) তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে।

আধুনিক মানবতাবাদী ও জ্ঞান-তত্ত্ববিদরা (Humanistic and Cognitive theories) বলেন : ব্যক্তিত্ব অর্জন করা যায়। জীবনকে সুসংহত ও সুপরিণত করে তোলার জন্য ব্যক্তিত্ব অর্জনের সচেতন চেষ্টা চালায় মানুষ। আবার সমাজ নির্ভর শিক্ষাতত্ত্ব (Social learning theories) অনুযায়ী সামাজিক পরিবেশ এবং পরিবেশলব্ধ সামাজিক অভিজ্ঞতাই ব্যক্তিত্ব গঠন করে।

ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব নিয়ে কচকচি পরে হবে। এ পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তি ও তার সামগ্রিক জীবনদর্শনের অভিব্যক্তি। ব্যক্তিত্ব অনেকটা কাব্যের ধ্বনির মত। ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা হল যা কাব্যের শব্দার্থকে ছড়িয়ে পাঠককে অনেকদূর নিয়ে যায়। আলঙ্কারিকেরা যাকে নারীদেহের লাবণ্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন। যে মুগ্ধতা রূপকে ছাড়িয়ে যায় সেটাই লাবণ্য। নারীর প্রতিটি অঙ্গের সুঠাম ও সংস্থান তার রূপ। কিন্তু লাবণ্য রূপের অতিরিক্ত কিছু। ব্যক্তিত্বও ঠিক তেমনি ব্যক্তির বুদ্ধি, চিন্তা, বাচনভংগি, পোশাক পরিচ্ছদ ও তার চেহারাকে ছাড়িয়ে এমন একটা কিছু যা অনির্বচনীয়। সেন্ট অগাস্টাইনকে একবার রোম্যান্টিকতার সংজ্ঞা জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সেন্ট উত্তর দিয়েছিলেন : যদি জিজ্ঞাসা করো বলতে পারবো না। যদি জিজ্ঞাসা না করো, তাহলে বলতে পারি। ব্যক্তিত্বও ওই রোম্যান্টিসিজমের মত উপভোগ করা যায়। উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু ব্যাখা করা কঠিন। স্নিগ্ধ সুখদায়ী ব্যক্তিত্ব সান্নিধ্যকে মধুর করে। একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তির ব্যক্তিত্বে অন্যজন স্নাত হতে পারেন। (বুদ্ধিমান ও বুদ্ধিজীবী এক নন)। আবার একজন নির্বোধ, একজন চতুর, ঈর্ষাপরায়ণ ও হতাশ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব দুঃসহ। দুই সমান ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। সে সংঘর্ষ রাজায় রাজায় হতে পারে আবার পিতাপুত্রে হতে পারে। (তারাশঙ্করের 'দুই পুরুষ' উল্লেখযোগ্য)।

এসব কারণেই ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একজন মনোবিজ্ঞানী বলেছেন : ব্যক্তিত্ব হল, অন্যের কাছে আপনার ইতিবাচক ভাবমূর্তি। প্রতিদিন কত মানুষের সঙ্গে আপনার দেখা হচ্ছে। এই মানুষগুলোর মধ্যে আপনার যে ভাবমূর্তি তৈরি হচ্ছে সেটাই আপনার ব্যক্তিত্ব।

আমরাই অন্যকে জিজ্ঞাসা করি অমুকবাবুর সঙ্গে তো আপনার আলাপ আছে। কেমন লোক বলুন তো? আপনি বললেন : খুব পণ্ডিত। অথবা খুব খোলামেলা। অথবা মাইডিয়ার লোক। অত জ্ঞানী মনেই হয় না। অথবা ভীষণ দাম্ভিক। মানুষকে মানুষ বলেই মনে করেন না।

ব্যক্তিত্ব হল অন্যের আয়নায় দেখা ব্যক্তির আর একটা ছবি। মানুষ তো আসলে তিনটে। আপনি আপনার সম্পর্কে যা ভাবেন। অন্যে আপনার সম্পর্কে যা ভাবে। আর আপনি আসলে যা। আপনি যদি নিজেকেই জানার চেষ্টা না করেন, যদি নিজের সম্পর্কে নির্মোহ না হন, তাহলে আপনি প্রকৃত কী আপনি নিজেই তা জানতে পারবেন না। আপনি নিজের সম্পর্কে যা ভাবেন সেই ভাবনাটা কিন্তু নিরপেক্ষ নয়। কারণ নিজের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হওয়া কঠিন। অন্যায় করে বা ভুল করে নিঃশর্তভাবে স্বীকার করতে কম লোককে দেখেছি। অনেকেই ওপর চালাকিতে বিশ্বাস করেন। তাঁরা নিজেদের বুদ্ধিমান ও অন্যদের বোকা ভাবেন। নিজেদের কথাই অন্যের কাছে সাতকাহন করে বলেন। অন্যরা শুনতে চাইছেন কিনা তা জানার আগ্রহ তাঁর নেই। এজন্য অন্যের কাছে তাঁদের প্রকৃত ভাবমূর্তি তৈবি হতে পারে না।

প্রতিটি মানুষই তার মনোমত ব্যক্তিত্বের সন্ধান করছে। পরিচিত পরিবেশে সেই প্রত্যাশিত ব্যক্তিত্ব পাচ্ছে না। তাই দেখবেন অধিকাংশ লোক অন্যের সম্পর্কে নেতিবাচক কথাবার্তা বলছে। কোন মানুষ যদি কখনও জানতেন পরিচিত মহলে তাঁকে নিয়ে কী পরিমাণ হাসি ঠাট্টা বা গালিগালাজ চলে তাহলে তিনি বলতেন, এই কী সেই আমি।

প্রতিটি মানুষই তাঁর নেতিবাচক ব্যক্তিত্বকে বদলাতে পারে। উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব একজন সম্পূর্ণ মানুষ তৈরি করে। তাকে লড়াই করতে শেখায়। সততা, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা সেই সঙ্গে বুদ্ধির চর্চা ও সুসংস্কৃত মানসিকতা যাকে আমরা বৈদগ্ধ বলি, কোন ব্যক্তির মধ্যে সেগুলি থাকলে তবেই লোকে তাকে সুব্যক্তিত্ব বলে সম্ভ্রম করে। মনস্তাত্ত্বিক ও জৈবিক কারণে অনেকেব মধ্যে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হয়। স্বাভাবিক থেকে কেউ কেউ ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে। কিন্তু উপযুক্ত সচেতনতা ও চেষ্টার ফলে এই সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে যে কেউ সফল ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন। দ্বিতীয়টি আরও বেশি জরুরী। কারণ সাফল্য বস্তুটি আপেক্ষিক। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ক্রমাগত বাড়তে থাকলে আমি কিছুতেই সন্তুষ্ট হব না। সাফল্যের টার্গেট ক্রমশ পিছিয়ে যাবে। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাওয়ার মাত্রা ধাপে ধাপে বেড়ে চলে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। অথচ আর্থিকভাবে অসফল ব্যক্তিও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন। আলেকজান্ডার ভারতে এসে এক সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীকে দেখে নতজানু হয়েছিলেন, সে শুধু ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে।

আপনি আপনাকে যা ভাবেন সেটি আপনার আর এক ব্যক্তিত্ব। আপনি যদি নিজেকে দুঃখী ভাবেন বঞ্চিত ভাবেন, তাহলে আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুঃখী দুঃখী ভাব ফুটে উঠবে। যদিও প্রকৃত পক্ষে আপনার নিজেকে দুঃখী মনে করার কোন কারণ নেই। হয়তো দেখা যাবে প্রকৃত দুঃখী লোকদের দুঃখের তুলনায় আপনার দুঃখ তেমন কিছুই নয়। কিন্তু নিজেকে দুঃখী ও বঞ্চিত বলে ভাবার জন্যই ব্যক্তিত্বের ওপর তার প্রভাব পড়ছে। সামান্য

আঘাতে ভেঙে পড়েন এমন অনেক লোক আছেন। মানুষ যখন ভেঙে পড়ে, যখন সে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে তখন তার ব্যক্তিত্বেরও পরিবর্তন হয়।

আবার প্রকৃত দুঃখ ও মনোবেদনার মধ্যেও শুধু মনের জোর বা আত্মবিশ্বাসের জোরে বহুলোক ব্যক্তিত্বকে অটুট রাখতে পারেন। বিপদের মধ্যেই তাদের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় প্রকৃত ব্যক্তিত্ব।

'The tests of life are to make, not break us. Trouble may demolish a man's business but build his character. The blow at the outward man may be the greatest blessing to the inner man.'[১৫]

জীবনের পরীক্ষা হল ভাঙা নয় গড়া। বিপর্যয়ের ফলে কারও ব্যবসা বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বিপর্যয়ের মোকাবেলা করলে তৈরি হয় চরিত্র।

ব্যক্তিত্ব তাই গড়ে ওঠে নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। শালগ্রাম শিলা কারখানায় তৈরি করা যায় না। গণ্ডক নদীর তীব্র স্রোতে ঘা খেতে খেতে ছোট ছোট কালো পাথরের নুড়ি একটা নতুন আকৃতি ধারণ করে। এগুলিই শালগ্রাম শিলা। হল এবং লিন্ডজে তাই বলেছেন : ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা।[১৬]

ব্যক্তিত্বের অনুভূতি : প্রথম দেখা

মনোবিজ্ঞানীদের অনেকে বলেন, দুজন মানুষের প্রথম দেখায় পরস্পরকে পরস্পরের যে গুণগুলি আকৃষ্ট করে সেটাই পরস্পরের ব্যক্তিত্ব। অথবা একটু ঘুরিয়ে বলা যায় ব্যক্তিত্বই অন্যের ওপর ছাপ রেখে যায়। ক এর সঙ্গে খ এর দীর্ঘ স্থায়ী কোন সম্পর্ক গড়ে উঠবে কিনা সেটা নির্ভর করে প্রথম দেখার ওপর। প্রথম দেখার পর যদি কোন ব্যক্তিত্ব মনে ছাপ ফেলে তখনই তাঁরা দুজনে চাইবেন আরও কয়েকবার মিলিত হতে। এরপর যদি উভয়ের মনের মিল হয় তাহলে বন্ধুত্ব বা প্রেম স্থায়ী হয়ে যায়। যাঁরা প্রেমে পড়েন তাঁদের অনেকে প্রথম দেখাতেই পরস্পরের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। আবার প্রথম দেখায় কোনও ঔৎসুক্য জাগেনি, পরে নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ও পারস্পরিক সান্নিধ্য, লাভের মধ্য দিয়ে প্রেম হয়েছে। সুন্দরী মেয়েরা প্রথম দর্শনেই পুরুষকে আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু দৈহিক সৌন্দর্যের গভীরতা শুধু ত্বকের গভীরতা পর্যন্ত। ইংরাজিতে যাকে বলে skindeep. কিন্তু আসল সৌন্দর্য : ব্যক্তিত্ব। অনেক সুন্দরী নারী ব্যক্তিত্বের অভাবের জনাই তার সৌন্দর্যকে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে না। তাই দৈহিক সৌন্দর্য না থাকলেও শুধুমাত্র ব্যক্তিত্বের সৌন্দর্যের জন্যই প্রথম দর্শনে বহু নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। বহু সুন্দরী নারী 'কুদর্শন' পুরুষের প্রেমে পড়েছে। আবার বহু সুপুরুষ রূপহীনা নারীর প্রতি আসক্ত হয়েছে। আমরাই তো অনেক সময় বলি, কী দেখে ওই মেয়ের প্রেমে পড়ল। অত ভাল ছেলেটি। আমরা শুধু বাইরের রূপ দেখে বিচার করি বলেই এই মন্তব্য করি। প্রতিটি মানুষ যে আলাদা তার প্রমাণ প্রতিটি মানুষের ভাল লাগা মন্দ লাগাও আলাদা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেও রুচির অজস্র অমিল থাকে। বাবা-মা চান ছেলেমেয়েরা তাদের কার্বন কপি হবে। কিন্তু জৈবিক কারণেই তা হওয়া সম্ভব নয় বাবা ও মায়ের ২৩টি করে ৪৬টি ক্রোমোজোম মিলে যে নতুন কোষ তৈরি হয়। তার মধ্যে ৩০ হাজার জিন থাকে।

এই প্রতিটি জিন ব্যক্তিগত চরিত্রের বাহক। কিন্তু এই জিনগুলি যদিও বংশগত উত্তরাধিকার থেকে আসে কিন্তু এগুলি সবার ক্ষেত্রে মৌলিক। অর্থাৎ আপনার বড় ছেলের দেহকোষের জিনের সঙ্গে মেজছেলের জিনের মিল নেই। এই মিল ঘটার সম্ভাবনা ৩০০,০০০,০০০,০০০,০০০ (৩০ লক্ষ কোটি) কোটিতে একটি।[১৭]

এইজন্যই প্রতিটি ব্যক্তির অভিরুচি আলাদা। আপনার ছেলে আপনার পছন্দমত মেয়েকে বিয়ে করতে চায় না এই কারণে। তার একটি নিজস্ব ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছে। তার ভাললাগা মন্দ লাগা ও রূপের ধারণা ও অন্য ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণের ধারণা আপনার চেয়ে আলাদা। এই তত্ত্ব নিয়ে আর একটু আলোচনা করলে ব্যক্তিত্বকে বুঝতে সুবিধে হবে। তবে তার আগে প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম বা love at first sight সম্পর্কে আর একটু বলে নেই।

ফ্রয়েডের মত শিশুর ক্রমবিকাশ যৌন চেতনার ওপর নির্ভরশীল। নারী-পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের পিছনেও সুপ্ত যৌন চেতনা কাজ করে। সেই সঙ্গে ব্যক্তিত্বের আকর্ষণও থাকে। এত মেয়ে থাকতে ওই বিশেষ মেয়েটিকেই আমার ভাল লাগল কেন? তাও তো শুধু এক পলকের একটুখানি দেখার জন্য। সকলেরই পথেঘাটে এমনই পলকের ভাল লাগার ব্যাপার ঘটে। কিন্তু তা বলে সবাই তো আর প্রেম নিবেদন করে না। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে আমরা সেই ভাল লাগাকে চেপে রাখি। আবার অনেকে চেপে রাখতে পারে না। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের অনেকে তাদের মনের কথা জানায়। কেউ কেউ ধরা পড়ে অভিভাবকের বকুনি ও মারধর খায়। থানাপুলিশ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়ায়। সবই যে বিশুদ্ধ প্রেম তা নয়। কোনটির মধ্যে যৌন তাড়নাও থাকে। কোনটি নিছকই কৌতূহল। নরনারীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ সর্বদা ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ নয়। বয়ঃসন্ধির পর থেকে অন্তত ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত নারীপুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের পিছনে শুধু যৌন তাড়নাও থাকতে পারে। যৌন আকাঙ্ক্ষা নরনারীর জীবনে স্বাভাবিক এবং আশীর্বাদ। যৌনতা জীবসৃষ্টির অপরিহার্য অংশ। সেই সঙ্গে শ্রেষ্ঠতম আনন্দ উপলব্ধিও। কিন্তু যৌনতার উদ্দাম প্রকাশ জীবনে সর্বনাশেরও মূল। বয়ঃসন্ধির পর ছেলেমেয়েরা যখন পরস্পরের সঙ্গে মেশে তখন তাদের পরস্পরের প্রতি যৌন আকর্ষণবোধ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু সেটি প্রেম নয়। সেটি শুধু যৌনতাড়না। প্রেমের জন্য মনের সুপরিণতি দরকার হয়।

এ সম্পর্কে কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি চিঠি উদ্ধৃতি করছি।[১৮]

প্রথম চিঠি :

আমি দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র। একটি কো-এড স্কুলে পড়ি। পড়াশুনায় খারাপ নই। বন্ধুবান্ধবীদের সঙ্গে মেলামেশাতেও আমার কোনও জড়তা নেই। কিন্তু একটা সমস্যা আছে-যে কারণে চিঠি লিখছি। মেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করার সময় যদি কোনও ভাবে ওদের গায়ে হাত লাগে, তবে উত্তেজনা বোধ করি। অনেক সময় ইচ্ছা করেও করেছি কিন্তু ওরা ইয়ার্কি ভেবে গ্রাহ্য করেনি। কিন্তু এই প্রবণতা দিনদিন বাড়ছে। মেয়েদের প্রতি দিনদিন আরও বেশি সেক্সুয়ালি আকৃষ্ট হচ্ছি। অনেক সময় উত্তেজনায় বাড়িতে মাস্টার

মশাইকেও করেছি। কিন্তু তারপর শরীরের উত্তেজনা কমে গেলে অপরাধবোধ হয় কী করব জানান।

দ্বিতীয় চিঠিটি একজন ছাত্রীর লেখা :

আমার বয়স ২১। কলেজে পড়ি। আমার দাদার বন্ধুরা অনেকেই আমার পরিচিত। তারাও আমাকে খুব ভালবাসে। ওদের দু-এক জনকে আমাব খুব ভাল লাগে। কিন্তু ঠিক কাকে আমি মনের মানুষ হিসেবে চাই বুঝে উঠতে পারছি না। এদিকে আমার ক্লাসের বন্ধুদের কাউকেই ঠিক সেভাবে ভাল লাগে না। সবসময় মনে হয় কখন দাদার বন্ধুরা আসবে, ওদের সঙ্গে কথা বলব, ওদেব কাছে যাব। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে ভয় হয়, জানি না ওরা অন্য কাউকে ভালবাসে কি না বা ওরা আমাকে খাবাপ ভাববে কি না। কী করব বলবেন?

এই দুটি চিঠিই বয়ঃসন্ধি বা প্রথম যৌবনকালে প্রজননক্ষম দুটি ছেলেমেয়ের অদম্য যৌন ইচ্ছার প্রকাশ।

এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এ ধরনের ইচ্ছা জাগা খুব স্বাভাবিক। এটা কিন্তু প্রেম নয়। প্রেমও যৌনতা আশ্রিত। কিন্তু তার মধ্যে মিশে থাকে ব্যক্তিত্বের প্রতি পরস্পরের তীব্র আকর্ষণ। প্রেম আরও গভীরতর এক উপলব্ধি যা শুধু কবিতা সঙ্গীত বা নিসর্গশোভার একান্ত আস্বাদের মত। এ উপলব্ধি অপরকে বোঝানো যায় না।

যেহেতু ব্যক্তিত্ব একটি আয়নার মত তা নিমেষের মধ্যে একজনের ভাবমূর্তি অপরজনের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেহেতু নারী ও পুরুষের পরস্পরের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকর্ষণ প্রথম দর্শনেই প্রকাশিত হয়ে পড়তে পারে। আমরা প্রত্যেকেই মনে মনে আমাদের মনের মানুষের একটি কল্পিত ভাবমূর্তি তৈরি করে রাখি। এটি বিভিন্ন রোলমডেল বা স্টিরিওটাইপ থেকে তৈরি হয়ে যেতে পারে অথবা অবচেতন মনে একটা ধারণার সৃষ্টিও হয়ে যেতে পারে। অনেকগুলি ক্ষেত্রে কল্পিত ভাবমূর্তিটির সঙ্গে বাস্তবের নারী-পুরুষকে মেলাতে গেলে সময় লেগে যায়। যেখানে আমরা আশা করি আমার বন্ধু বা প্রতিবেশী সং হবে। সত্যবাদী হবে। নীচতার পরিচয় দেবে না। আমাকে বিপদে সাহায্য করবে সেখানে বাছাই করতে সময় লাগে। বেশ কিছুকাল মেলামেশার পরই আমি বুঝতে পারব লোকটি আমার মনের মত কি না।

আবার বহুক্ষেত্রে মাত্র দশ-পনের মিনিটের মধ্যেই কারও সম্পর্কে ধারণা করে নিতে হয়।

যেমন চাকরির ইন্টারভিউ-এর ক্ষেত্রে। সেখানে নিয়োগকর্তা আগে দেখেন প্রার্থী যথেষ্ট চটপটে ও উৎসাহী কি না। সেটা প্রথম দর্শনেই স্টিরিও টাইপের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হয়। ধরুন, আপনি নিয়োগকর্তা। একজন চটপটে ছেলে সম্পর্কে আপনার মনে মনে একটা ধারণা আছে। আপনি কী ধরনের কর্মচারী বা অফিসার চান সে সম্পর্কেও একটা ধারণা আছে। আপনার ধারণার সঙ্গে যদি মিলে যায় তাহালে প্রথম দর্শনেই তাকে মনোনীত করে ফেললেন। এইবার তাকে নানা প্রশ্ন করে ধারণার সমর্থন আদায় করে নেবেন। বিয়ের বাজারেও এই স্টিরিও টাইপ কাজ করে। এতদিন ধরে এটা একতরফা ছিল। অর্থাৎ

ছেলেরাই পাত্রী পছন্দ করত। এখন মেয়েরাও পাত্র পছন্দ করে। একবার দেখলাম এক সুদর্শন উচ্চশিক্ষিত মোটা বেতনের চাকরিরত একটি পাত্রকে একটি পাত্রী অপছন্দ করল। পাত্রের পাত্রী পছন্দ হয়েছিল কিন্তু পাত্রী রাজি হল না। এখানে প্রথম দর্শনে হয়ত পাত্র পাত্রীকে ইম্প্রেস করতে পারেনি।

ভেবে দেখুন, আপনার অনেক অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে প্রথম আলাপেই আপনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন কি না। প্রথম আলাপে যদি কেউ আকৃষ্ট করতে না পারে তবে দীর্ঘসময় ধরে কাজের মধ্য দিয়ে আপনি অপরের কাছে আপনার গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেন। একে বলে সেলসম্যান অ্যাপ্রোচ। সেলসের লোকেরা একবার আলাপ হয়ে গেলে তাকে ছাড়ে না। সম্পর্ক রেখেই চলে। তারা ক্রমাগত ছোটখাটো উপকার করে যেতে থাকে। একটা সময় আসে যখন সে কোন পরিবারে অপরিহার্য হয়ে যায়। তখন সে পরিবারে গ্রহণীয় হয়।

প্রেমের ক্ষেত্রেও এইভাবে প্রেমিকার কাছে কাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে থাকে অনেক প্রেমিক। এই প্রথম দিকে অপরের টান তেমন থাকে না। তবে অন্তরঙ্গ তার ফলে একটা ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হয়েই যায় অবশেষে।

কিন্তু প্রেমের ক্ষেত্রে অথবা শুধু ভাললাগার ক্ষেত্রে প্রথম দর্শনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ— প্রেম ও নারী পুরুষের ভাল লাগার ক্ষেত্রে চেহারা একটি বড় কাজ করে। কারও মনে মনে ভেবে রাখা প্রেমিকার ভাবমূর্তির সঙ্গে বাস্তবের নারী মিলে গেল। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, বধূরে যেদিন পাবো ডাকিব মহুয়া নাম ধরে। অর্থাৎ মহুয়া নামটি সম্পর্কে কবির একটা ইমেজ মনের ভেতর তৈরি হয়েই আছে। এইবার সেই ইমেজের সঙ্গে কোন নারী মিলে গেলে তার যে নামই থাক, কবি তাকে মহুয়া বলে ডাকবেন। কবি কল্পনার কয়েকটি নারীমূর্তির বর্ণনার মধ্যে জীবনানন্দ দাসের বনলতা সেন কবিতাটি প্রায় সব শিক্ষিত বাঙালিরই পড়া।

> চুল তার কবেকার বিদিশার নিশা,
> মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য , অতিদূর সমুদ্রের পর
> হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা।
> সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভেতর।
>
> (*বনলতা সেন*)

বনলতা অধরা নাবীর কল্পনা। কিন্তু এই অধরা নারীকল্পনার সঙ্গে হুবহু না মিললেও বাস্তবের নারীর অনেকখানি যদি মিলে যায়, তাহলে তাকে প্রেমিকার আসনে সঙ্গে সঙ্গে বসিয়ে দিতে বাঁধেনা। তাছাড়া প্রথম দর্শনে ভাল লেগে যাওয়াটা অনেকটা স্থানকাল পরিস্থিতি ও তখনকার বিশেষ মুডের ওপর নির্ভর করে। বিশেষ করে যাঁরা একটু ভাবপ্রবণ ও রোম্যান্টিক প্রকৃতির তাঁরা জীবনের মধ্যে সব সময় একটা নাটকীয় মুহূর্ত খুঁজে বার করার চেষ্টা করেন। তাঁরা বেশি করে প্রথম দর্শনে ব্যতিক্রমী কোন চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। তাঁদের প্রেমও এইভাবে আসে। প্রথম প্রেমের স্মৃতি তাঁরা কখনও ভুলতে পারেন না।

মহাকবি দান্তে কৈশোরে ফ্লোরেন্সে এক সমবয়স্কা বালিকাকে দেখে প্রেমে পড়েছিলেন। মেয়েটির নাম বিয়েত্রিচে পর্তিনারী। জীবনে দু'বার মাত্র তিনি বিয়েত্রিচেকে দেখেন। বিয়েত্রিচের সঙ্গে দান্তের একটিও কথা হয়নি। এর কিছুদিন পরেই বিয়েত্রিচের মৃত্যু হয়।

বয়সকালে দান্তে বিবাহ করেন। চারপুত্র ও এককন্যার জনক হন তিনি। কিন্তু কৈশোরের দেখা বিয়েত্রিচে কবির সারাজীবনে প্রভাব ফেলেছিল। দান্তে তাঁর মেয়ের নামও রেখেছিলেন বিয়েত্রিচে।

আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই কোন না কোন মানুষের সঙ্গে প্রথম দেখার অবিস্মরণীয় স্মৃতি জমা হয়ে আছে। একপলকের একটু দেখা, অথবা কিছুক্ষণ কাটাবার স্মৃতি তারপর আর জীবনে কখনও দেখা হয়নি কিন্তু স্মৃতিপটে আঁকা সে ছবি আজও ম্লান হয়নি।

আপনারা আপনাদের স্মৃতির ঝুলি হাতড়াতে থাকুন, ইতিমধ্যে আমি আমার দুর্বল স্মৃতির ভাণ্ডার খুঁজে দেখি কিছু পাই কি না। হ্যাঁ পেয়েছি।

প্রথম দেখা : স্মৃতি নং এক : তখন সাত-আট বছর বয়স হবে। গ্রাম থেকে ছুটিতে বালিগঞ্জে জনক রোডে পিসির বাড়ি বেড়াতে এসেছি। ওই বয়সেও আমি ছিলাম ভাবুক প্রকৃতির। বিস্ময় মাখানো দৃষ্টিতে শহর কলকাতার মানুষজনকে দেখতাম পিসির বাড়ির জানালা দিয়ে।

হঠাৎ সামনের বাড়ি থেকে আমারই বয়সী একটি ফ্রক পরা ফর্সা অবাঙালি মেয়ে একটি ছাগলের বাচ্চা কোলে করে তাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। আমি যদি শিল্পী হতাম আজও হুবহু মেয়েটির ছবি, তার চোখমুখ এমনকি ফ্রকের রঙটিও আমি হুবহু এঁকে দিতাম।

একটা ফোটোগ্রাফের মত মেয়েটির ছবি আমার মনে গেঁথে গেছে। অথচ তাকে দেখেছিলাম মাত্র কয়েকমিনিট।

স্মৃতি নং দুই : সম্ভবত ১৯৬৮ সাল। কাশ্মীরে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে যোগ দিয়ে পাঠানকোট এক্সপ্রেসে কলকাতায় ফিরছি। আসানসোল থেকে আমাদের কামরায় উঠলেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। সঙ্গে দুই কন্যা ও এক শিশু। একটি কন্যা বিবাহিতা। শিশুটি তারই। অন্যমেয়েটির বয়স বাইশ তেইশ।

ভদ্রলোক ও তাঁর দুই মেয়েও খুব সপ্রতিভ। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে বেশ ভাল লেগেছিল। বিশেষ করে অবিবাহিতা মেয়েটির সপ্রতিভতা আমাকে খুব আকৃষ্ট করেছিল। মেয়েটির কথা আমার এখনও মনে আছে। তার সঙ্গে আর কখনও দেখা হয়নি।

স্মৃতি নং তিন : ১৯৬০ সাল। ইংলন্ডের পড়াশোনা শেষ করে দু'মাস ধরে ইওরোপ ঘুরে বেড়াচ্ছি। এসেছি হাঙ্গেরি। গ্রামে এক ভদ্রলোকের বাড়ি অতিথি হয়েছি। ভদ্রলোক ইংরাজি বলতে পারেন। কিন্তু তাঁর ছোট্ট মেয়েটি ইংরাজি বোঝে না। বয়স সাত আট। সে আমার সঙ্গ ছাড়ছে না। তার কথা আমিও বুঝছি না সেও আমার কথা বুঝছে না। কিন্তু ভাষার অতীত তীরে কাঙাল নয়ন কিন্তু ফিরে ফিরে যায়নি। তার চোখের ভাষা আমি বুঝতে পেরেছিলাম। সেটি এক নিষ্পাপ শিশুর বন্ধুত্বের ভাষা।

এমন অনেক প্রথম দেখা স্থায়ী রেখাপাত করে আছে মনের স্মৃতি কোঠায়। বেলগ্রেড থেকে ওখরিদ যাবার পথে ট্রেনের এক যুগোস্লাভ সহযাত্রীকে আমার মনে আছে। ভাঙা

ভাঙা ইংরাজিতে সারারাত যিনি আমার সঙ্গে গল্প করে গেলেন। কত অজস্র লোকের সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে সারা জীবন ধরে। তেমনি অজস্র লোক হারিয়ে গেছে জীবন থেকে। তবু এমন কিছু কিছু স্মৃতি কেন মনের স্মৃতিপটে অমলিন হয়ে থাকে? থাকে এই কারণে যে এক একটি ব্যক্তিত্ব আমাদের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

প্রথম দর্শনে মনের মধ্যে যেগুলি দাগ কাটে তার মধ্যে আছে ব্যক্তিত্ব ও অনুষঙ্গ। ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন দিকের মধ্যে একটি বিশেষ দিক দাগ কাটতে পারে। হঠাৎ দেখা কোন একটি মেয়ের হাসি ভুলতে পারেননি লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। অক্ষয় করে রেখেছেন মোনালিসার হাসি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ নরেনের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন কী দেখে? তখন তো নরেনের মধ্যে জমাট বেঁধে আছে অবিশ্বাস। তবে কী তাঁর দৃপ্ত আয়তদুটি চোখ দেখে? প্রথম দর্শনে বহু মানুষ অন্যের মধ্যে নিজের আপন জনের মুখায়বের মিল খুঁজে পেয়েছেন। কারও কণ্ঠস্বরের মধ্যে যেন আশ্বাসের বাণী খুঁজে পাওয়া যায়। কাউকে দেখে ভালবাসতে ইচ্ছা করে, কারও পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছা জাগে। আবার কাউকে দেখে প্রথম দর্শনেই মন বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। প্রথম দর্শনের ইম্প্রেসন কী ব্যক্তির অবচেতন মনে সৃষ্টি হয়? তা কি সম্পূর্ণ Subjective? এর মধ্যে কী কোন যুক্তিগ্রাহ্যতা বা rationality নেই? এমনও তো হতে পারে আমাকে দেখেই আপনার একদম পছন্দ হল না। আপনি একবার দেখেই আমায় বাতিল করে দিলেন। বললেন : ওকে দিয়ে চলবে না।

এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে। আগে দর্শনধারী পরে গুণ বিচারী। কিন্তু সুদর্শন পুরুষ ও নারী প্রথম দর্শনে বহু জায়গায় বাতিল হয়েছেন। কিন্তু তবু সেগুলিকে ব্যতিক্রম বলেই ধরতে হয়। অতি সাধারণ চেহারার লোকজন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে কী করে আরোহণ করে? অনেককে দেখে আমারও মনে হয় আচ্ছা এই চেহারা ও বুদ্ধি নিয়ে এই লোকটি এত দায়িত্বশীল কাজ পেল কী করে? সুতরাং ব্যক্তিত্বের ঘাটতি বা খামতি সাফল্যের পথে সব সময় প্রতিবন্ধক নয়। উদ্যম ও কৌশলী বুদ্ধিরও যথেষ্ট মূল্য আছে। কিন্তু যাঁরা কৌশল করতে জানেন না তাদের ব্যক্তিত্বের পরীক্ষায় গিয়ে দাঁড়াতেই হয়। Personality test বা ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা এখন সব চাকরির অপরিহার্য অঙ্গ। প্রথম দর্শনের ইম্প্রেসন এখানে গুরুত্বপূর্ণ। অতএব এই ব্যক্তিত্বের পরীক্ষায় সময়োপযোগী স্মার্ট পোশাক পরিচ্ছদ পরে যাওয়াটাই বুদ্ধি মানের কাজ। উচ্চারণের বিশুদ্ধতা ও প্রয়োজন। খুব দ্রুত নির্ভুল ইংরাজিতে নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা এখানে বিশেষ ইম্প্রেসন গড়ে তুলতে সাহায্য করে। রপ্ত করা চাই কথা বলার আর্ট। চাকরির ইন্টারভিয়ুতে প্রথম ইম্প্রেসন তৈরি করার জন্য প্রার্থীকে সচেষ্ট হতে হয়। ঢোকার সময় গুডমর্নিং বলে ঢোকা থেকে থ্যাঙ্ক ইয়্যু স্যার বলে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে একটা সপ্রতিভতা, স্বচ্ছন্দতা ও আত্মবিশ্বাসের ভাব রেখে যেতে হয়। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস যেন সম্ভ্রম নষ্ট না করে। অনেকে ইন্টারভিউতে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এমনকী ঝগড়াও করে আসেন। আজে বাজে প্রশ্ন শুনেও মাথা ঠিক রাখাটাই এখানে বড় কাজ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি কথা এক্ষেত্রে না বলাই ভাল।

শুধু চাকরির ইন্টারভিউ এর ব্যাপারে নয়, বৃহত্তর জগতে ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ের

ক্ষেত্রে ব্যক্তির প্রথম ইম্প্রেসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সৌজন্য বোধ ও বিনয় এক্ষেত্রে দারুণভাবে কাজ করে। আমি পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ ছিলাম। অথচ জিয়াউল হক সাহেবের সঙ্গে আমার একবারই মাত্র কথাবার্তা বলার সুযোগ হয়।

নাম নিয়ে পরীক্ষা

আপনার নাম আপনার কাছে যে কতটা প্রিয় তার যদি প্রমাণ চান, তাহলে এই প্রশ্নগুলির উত্তর নিজের মধ্যেই খুঁজুন।

১. আপনার কী ইচ্ছে করে আপনার নাম খবরের কাগজে মাঝে মাঝে বেরোক? হ্যাঁ/না।

২. কোন অনুষ্ঠানে আপনি বক্তৃতা দিয়েছেন কিন্তু রিপোর্ট প্রকাশের সময় দেখা গেল আপনার নামটি বাদ পড়েছে। এতে কী আপনার দুঃখ হয়? হ্যাঁ/না

৩. ভিড়ের মধ্যে কেউ যদি আপনাকে নাম ধরে ডাকে তাহলে কী আপনি খুব খুশি হন? হ্যাঁ/না

৪. আপনার ডাক নাম ধরে কেউ ডাকলে কী আপনি অস্বস্তি বোধ করেন। হ্যাঁ/না

৫. সভাসমিতিতে ঘোষণার সময় আপনার নামে কেউ ভুল করলে আপনি কী সংশোধন করার চেষ্টা করেন? হ্যাঁ/না

৬. আপনি কী চান আপনার পাড়ায় বেশী সংখ্যক লোক আপনাকে নামে চিনুক? হ্যাঁ/না

৭. মৃত্যুর পর আপনার নাম স্মরণীয় করে রাখার জন্য আপনি কী কোন উপায়ের কথা ভাবেন?

ওপরের সাতটি প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে যদি পাঁচটির বেশি 'না' হয় তাহলে বুঝতে হবে আপনি নিজের সম্পর্কে খুব উচ্চধারণা পোষণ করেন না। সমাজের সঙ্গে আপনার আইডেন্টিফিকেশন হোক তা চান না। আপনি বিচ্ছিন্নতাবোধে আক্রান্ত।

মনে রাখবেন নিজেকে প্রকাশ করার ইচ্ছা মানুষের সহজাত। আত্মপ্রচার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা এক নয়। আত্মপ্রচার হল কিছু না করে অথবা সামান্য কিছু করে বাড়িয়ে ঢাকঢোল পেটানো। আর আত্মপ্রতিষ্ঠার চেতনা হল ব্যক্তি হিসাবে নিজের প্রতি ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালন করে সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার সঙ্গে নিজেকে জড়িত করা। এক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা করাটাকে যারা হেয় করে তাদের মতলব আছে। তারা আপনার ব্যক্তিত্ব চাপা দিয়ে তাদের পছন্দসই ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে চায়। তাই ব্যক্তিকে সমাজের কাছে ব্যাপকভাবে পরিচিতি হতে গেলে নিজের নামটিকে পরিচিত করে তুলতে হয়। যারা সেটা পারেন, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত জীবনের গণ্ডির বাইরে তাঁরা সফল হন।

চার

সাফল্য ও ব্যক্তিত্ব

লোকজনের সঙ্গে আলাপ হলে তিনি প্রথমে জিজ্ঞাসা করেন। আপনি কোথায় আছেন? কোথায় মানে কোন জায়গায় আপনার বাড়ি বা বাসা নয়, কোথায় কাজ করছেন? কোন নামী কোম্পানির অফিসার হওয়াটা সম্মান বলে স্বীকৃত এবং এই সামাজিক স্বীকৃতি ও সম্মান বলাবাহুল্য ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। এটি শুধু আপনার ব্যক্তিত্ব নয়, আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের ব্যক্তিত্বও এই প্রচ্ছায়ায় গড়ে ওঠে। এমনকি কারও দূর সম্পর্কের আত্মীয় বড় কোম্পানিতে বড় পদে থাকলেও সেটি তার ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধির ক্রেডিটে জমা হয়। দাদা, কাকা, মামা, জেঠার গরবে গরবী বা গরবিনী হয়ে কত লোক তার সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে ফেলল। আমাদের গ্রামে কেষ্টদা ছিলেন মহকুমা শাসকের পি.এ.। তিনি নিজেও এস ডি ও-র মত আচরণ করতেন। গ্রামের লোকেরাও তাঁকে সমীহ করত।

আসলে প্রতিটি মানুষই কোন না কোনভাবে সফল হতে চায়। সাফল্যের মাপকাঠি এক একজনের কাছে এক এক রকম। কেউ বা গান বাজনা সাহিত্যচর্চা খেলাধুলায় সাফল্যকে প্রকৃত সাফল্য ভাবেন। কেউ চান টাকা-পয়সা করে বাড়ি গাড়ি করতে। জমি-জমা বিষয় আশয় বাড়াতে।

মনোবিদরা বলেন : সাফল্য প্রকাশ্য হওয়া চাই। লোকে যেন আপনার সাফল্যটা দেখতে পায়। আমাদের দেশ থেকে বহু ছেলেমেয়ে বিদেশে গিয়ে কৃতী হয়েছে। কিন্তু তারা তাদের সাফল্য দেশবাসীকে দেখাতে পারছে না। এজন্য তাদের সব সময়ই চেষ্টা যাকে এদেশের খবরের কাগজে তাঁদের সম্পর্কে দুচার কথা বার করা। কেউ কেউ এজন্য তাঁদের সাফল্য দেখাতে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদেরও টিকিট পাঠিয়ে সে দেশে নিয়ে যান। কেউ কেউ সাংবাদিকদেরও প্লেন ভাড়া দিয়ে আমন্ত্রণ জানান। তাঁরা দেশের কাগজে তাঁদের সম্পর্কে দুকলম লিখে দেবেন।

আমাদের দেশে যারা পয়সা করেন তাঁরা বাড়িতে নানা অনুষ্ঠান করে লোকজন নেমন্তন্ন করে তাঁদের সাফল্য দেখান। ছেলেমেয়ের বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশনে এমনকী বিবাহ বার্ষিকীতেও প্রচুর ঘটা করেন। নতুন বাড়িতে গৃহ প্রবেশ করলে লোকজন খাওয়ান। সবাই তাঁর সাফল্যের প্রশংসা করে। এর ফলে গৃহকর্তা গর্বিত হন। গর্ব তাঁকে আত্মবিশ্বাস ও তৃপ্তি দেয়। তিনি ভাবেন জীবন সার্থক।

বাচ্চাদের মধ্যে অহংবোধ তীব্র। ছোটবেলা থেকে যেসব বাচ্চা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে, তারা বন্ধুদের কাছে গর্ব করে আমাদের বিরাট বাড়ি, বিরাট পুকুর, আমার প্রচুর খেলনা, আমার বাবার বিরাট ব্যবসা, বিরাট অফিস, আমাদের তিন তিনটে গাড়ি। বড়

হয়ে আমি একটা গাড়ি চালাব। আমার দাদা আমেরিকায়। আমি বড় হয়ে আমেরিকা যাবো। প্রত্যেকেই চায় তাদের সাফল্যের কথা অন্যকে জানাতে। শিশুরা স্কুলে সহপাঠীদের কাছে গল্প করে। স্ত্রী প্রতিবেশীদের কাছে স্বামীর সাফল্যের গর্ব করে। স্বামী বিরাট অফিসার। গুরুত্বপূর্ণ তাঁর কাজ। বার বার তাঁকে ট্যুরে যেতে হয়। এক মুহূর্ত দম ফেলার সময় নেই। কোম্পানির ফ্ল্যাট, কোম্পানির চাকর, কোম্পানির দেওয়া ফার্নিচার। সাফল্যের পর সাফল্য কাহিনীর মালা গাঁথা চলে এইভাবে। সাধারণত স্বামীর সাফল্যের কাহিনী এইভাবে শোনা যায় স্ত্রীর মুখে, বন্ধুদের আসরে—

'আমিই বাড়িটা করার পরামর্শ দিলাম। নয়তো ও এমন খরচে লোক। কিছুই জমাতে পারবে না। রিটায়ার করলে তো কোম্পানির ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে। তাই আগে থেকে একটা ব্যবস্থা করে রাখলাম।'

'দুটো গাড়ি তো লেগেই যায়। উনি সারাদিন ঘোরেন। আমি কার কাছে গাড়ি চাইব? উনি বললেন, তোমাকে জেনটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি ইন্ডিকা কিনে নিচ্ছি। এখন তো দুটোতেও কুলবে না। ছেলেমেয়েরা বড় হচ্ছে। আর তিনবছরের মধ্যে ওরা তো গাড়ি চাইবেই।'

'বাঙ্গালোরে ও আবার একটা ফ্ল্যাট কিনেছে। ওখানে কারখানাটা করার পর মাসের অর্ধেক দিনই ওখানে থাকতে হয়। ও বলল, হোটেল বড় এক্সপেনসিভ হয়ে যায়।

ক্রেডিট কার্ড আত্মবিশ্বাসের প্রতীক

তার চেয়ে শস্তায় একটা দেড় হাজার স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাট পাচ্ছি, বিশ লাখের মধ্যে হয়ে যাবে, কিনে নেই। আমি বললাম, সেটাই ভাল।'

'প্রতিটি সাফল্যই মর্যাদা এনে দেয়। এবং যেহেতু এই মর্যাদা গোপনে রাখার মত বস্তু নয় তাকে প্রকাশ করতে হয়, ঘোষণা করতে হয়, প্রতীকের মাধ্যমে। একে বলে **status symbol** এই অভিজাত অঞ্চলে বাড়ি, নতুনতম মডেলের গাড়ি, একাধিক ক্রেডিট কার্ড, ক্লাব মেম্বরশিপ, অফিসের কাজে নিয়মিত প্লেনে ট্যুর, ছুটিতে বিশ্বভ্রমণ, ছেলেমেয়েদের

কনভেন্ট স্কুলে পড়ানো, ইন্টারনেট, মিউজিক সিস্টেম, সপ্তাহে সপরিবারে রেস্টুরেন্টে খানাপিনা---এগুলি সবই স্ট্যাটাস সিম্বল এবং সাফল্যের অর্থবহ। তবে সাফল্যের এই আর্থিক বহিঃপ্রকাশ ছাড়াও আরও কতগুলি সূচক (Index) আছে। সেগুলি হল : জনপ্রিয়তা ও নেতৃত্ব।

জনপ্রিয়তা অর্জন সাফল্যের একটি অংশ বলে মনে করা হয়। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য কিন্তু বড়লোক হওয়া বড় চাকরি করার প্রয়োজন হয় না। পাড়ার একজন দুজন লোক যথেষ্ট জনপ্রিয়। কারণ তারা সামাজিক জীবনে সমঝোতা করে চলতে পারে। যে যত বেশী সমঝোতা (adjustment) করতে পারবে সে তত দ্রুত সাফল্য অর্জন করবে। ক্লাসে সেই ছেলেটি সবার প্রিয় যে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে। যার মধ্যে নেতৃত্বসুলভ গুণ আছে। সবাই যাকে চায়। তার ব্যক্তিত্ব আপনাতে আপনি বিকশিত হয়।

অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে না পারার জন্য অনেকে স্কুল-কলেজ ছেড়ে দেয়। চাকরি ছাড়ে। আমি দেখেছি স্কুল কলেজে ড্রপ আউটদের মধ্যে আর্থিক অভাব যেমন আছে তেমনি মানিয়ে চলার অক্ষমতাও আছে। আমি একাধিক ছেলেকে দেখেছি তারা মাঝপথে পড়া ছেড়ে দিতে চেয়েছিল। সবক্ষেত্রে একই কারণ। মানিয়ে চলার অক্ষমতা। গ্রুপে নানা ধরনের ছেলেমেয়ে থাকে। সবার মধ্যে থাকতে গেলে নিজেকে পরিবর্তনশীল (flexible) রাখতে হয়। কখনই নিজের মত আঁকড়ে ধরে থাকতে নেই। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটলে ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ বাধে। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা ভীষণভাবে মনের ওপর চেপে বসে। সাফল্যের কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। তবে মোটামুটিভাবে বলা যায় সাফল্য হল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে কোন অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণ। এই লক্ষ্য সব সময় এক নয়। চোরের লক্ষ্য গ্রামের জমিদার বাড়িতে সিঁদকাটা। সেখানে পাহারা অনেক কড়া। সেই বাধা অতিক্রম করা। আবার সাধুর লক্ষ্য, ভগবানকে পাওয়া। সেপথেও প্রচুর বাধা। দেখা দাও বললেই তিনি দেখা দেন না। ভক্তকে অনেক পরীক্ষা করে বাজিয়ে যদি মেজাজ হয় তাহলেই দেখা দেন।

ছাত্রের লক্ষ্য পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে পাস করে বেরুনো। আসল লক্ষ্য চাকরি বাকরি যোগাড়। নয়তো ব্যবসা করে টাকা উপার্জন।

যেহেতু সাফল্যের সংজ্ঞা এক-একজনের কাছে এক-একরকম, সেহেতু বাইরে থেকে দেখে আমরা ভাবি আরে রামবাবু ভাল চাকরি করেন। ছেলে-মেয়ে মানুষ হয়ে গেছে। বউ এখনও জীবিত। দিব্যি সুস্থ। রামবাবুর তো ব্লাডসুগার ব্লাডপ্রেসার নর্মাল। তিনি নিঃসন্দেহে সফল। কিন্তু রামবাবু ভাবছেন, আমার মত দুঃখী কে? আমি এত খেটেও ম্যানেজার হতে পারলাম না। বউ এর জন্য প্রাণপাত করেও তাকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না। সব সময় তার মেজাজ টঙ হয়ে আছে। ছেলেমেয়ে নিজের মত চলে। তাঁকে পরামর্শ করে কিছু করে না। তিনি কবিতা লেখেন। তিন-চারটে বইবার করেছেন। জয় গোস্বামী একটা বই পড়ে প্রশংসা করেছেন। কিন্তু কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি হল না এখনও। বাড়ি একটা করেছেন সর্বস্ব দিয়ে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে মিস্ত্রিরা ডাহা ফাঁকি দিয়েছে। অতএব তিনি আর সফল হলেন কোথায়?

কিন্তু লোকের চোখে রামবাবু যদি সফল বলে প্রতিপন্ন হন, তাহলে তাঁর অনেক হতাশার মধ্যেও একটা আত্মতৃপ্তি আসে। লোকে যাকে ঈর্ষা করে না তার গর্ব করার মত কিছু

নেই বলে মানতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত লোকের কাছে আপনার সাফল্য সাফল্য বলে স্বীকৃত, ততক্ষণ আপনার নিজেকে ব্যর্থ ভাবার কোন কারণ নেই।

এমনও তো হতে পারত যে আপনার সাফল্যকে কেউ স্বীকৃতিই দিল না। পৃথিবীতে বহু মানুষ নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছ থেকে কোন স্বীকৃতিই পাননি। সাফল্যের স্বীকৃতি না পাওয়া জন্য আমি একাধিক ব্যক্তিকে আত্মহত্যা করতে দেখেছি। এ ধরনের ঘটনা আকছার ঘটে বলেই গীতা নিষ্কামকর্ম করার উপদেশ দিয়েছে।

যাঁরা সাফল্যের স্বীকৃতি পাননি এবং জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে পারেননি তারা বিচ্ছিন্নতায় ভোগেন ও নানাধরনের স্নায়বিক রোগের শিকার হন। সামাজিক জীবনে জনপ্রিয়তার চাবিকাঠি (১) পাড়ার পুজো কমিটির অফিসে বেয়ারার হওয়া, (২) ক্লাব সংগঠনগুলিতে কর্মকর্তা নির্বাচিত হওয়া (৩) সমাজসেবা বা সাংস্কৃতিক কাজে পারদর্শিতার জন্য পুরস্কার পাওয়া-নিয়মিত নাটক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ (৫) খবরের কাগজে মাঝে মাঝে নাম ওঠা (৬) নির্বাচনে দাঁড়াবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে অফার আসা (৭) খেলাধুলায় পুরস্কার পাওয়া ইত্যাদি।

এগুলি জনপ্রিয়তার মাপকাঠি। আর যিনি জনপ্রিয় তাঁর ব্যক্তিত্ব আত্মসন্তুষ্টিতে ভরপুর।

বন্ধুত্ব : জনপ্রিয়তা : ব্যক্তিত্ব

যাঁর অনেক বন্ধুবান্ধব আছে তিনি নিঃসন্দেহে জনপ্রিয়। অনেকেরই এমন বন্ধুভাগ্য থাকে। বন্ধুরা তার জন্য প্রাণ দিতে পারে। পজিটিভ বন্ধু পাওয়া ভাগ্যের বিষয়। কারণ বন্ধু সমাগমে মনটা কোন সময় বিশেষ বিষয়ে ভারাক্রান্ত হতে পারে না। আত্মসন্তুষ্টি থাকে মনে যে আমি একা নই। আমার সঙ্গে অনেক মানুষ আছে। যার অনেক বন্ধু আছে, যে গুরুর প্রচুর শিষ্য আছে, যে রাজনৈতিক নেতার প্রচুর অনুগামী আছে তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটা তৃপ্তিবোধ ও সার্থকতা ফুটে ওঠে।

বিবাহিত পুরুষের অনেক বন্ধুবান্ধব থাকলে তাঁদের স্ত্রীরা বিরক্তবোধ করেন। স্বামী যাতে বন্ধুবান্ধবদের পরিত্যাগ করে তাঁর প্রতি বেশি সময় দেন সেজন্য তাঁরা স্বামীর ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্যুত হয়ে সংসার জীবন তখন পুরুষের কাছে যাঁতাকলের মত মনে হয়। তাঁর প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব খিটখিটে ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়।

প্রতিটি মানুষেরই উচিত আত্মসন্তুষ্টির জন্য সামাজিক মেলামেশা করা ও ক্লাবে ও পাড়ার নানা ফাংশনে অংশ নেওয়া। সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় ছোটবেলা থেকে ছেলেমেয়েদের অংশ নিতে দিন। তারা পুরস্কার পেলে পুরস্কার পাবার গৌরব তাদের মনের জোর বাড়াবে। বিচ্ছিন্নতাবোধ ব্যক্তিত্বের মস্ত বড় শত্রু। কলেজের পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন যারা করতে পারেন তাদের তো পিছনে ফিরে তাকাতে হয় না। ক্লাশের ফাস্ট ও সেকেন্ড বয়কে সবাই খাতির করে। আবার যারা খেলাধুলায় ভাল, বা ভাল ডিবেট করতে পারে বা গান গাইতে পারে তারাও খুব জনপ্রিয় হয়। গান বাজনার প্রতিভা থাকলে, ছবি আঁকা বা বক্তৃতা দেবার অভ্যাস থাকলে অভিভাবকদের উচিত তাকে অনুশীলন করতে দেওয়া। পেশাদারি শিল্পী হওয়ার দরকার নেই, ক্লাশে জনপ্রিয়তা অর্জনের জনাই

একটা না একটা গুণ তাকে অর্জন করতে দিন। ক্লাশে জনপ্রিয়তা সহপাঠীদের সম্ভ্রম তার ব্যক্তিত্ব গঠনে ভীষণভাবে সাহায্য করবে।

সফল ব্যক্তিত্ব : জেট-সেট এগজিকিউটিভ

সামাজিক জনপ্রিয়তা অর্জনের একটি উপায় হল বড় কোম্পানিতে বা সরকারে উঁচুপদে চাকরি। আমাদের দেশে সরকারি চাকুরিয়াদের সামাজিক সম্মান খুব বেশি। বিশেষ করে আই এ এস, আই পি এস হতে পারলে কথাই নেই। তার পরেই স্থান ডাক্তারের। ডাক্তারের পরেই ইঞ্জিনিয়র-চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। এর পর বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান থেকে পাস করা এম বি এর স্থান। এরপরের র‍্যাঙ্কে পড়েন সাংবাদিক, অধ্যাপক, ডব্লু বি সি এস প্রমুখেরা। আজকাল অসংখ্য পেশা বেরিয়েছে যে সব চাকরিতে ভাল বেতন আছে। কিন্তু লোকে অতশত বোঝেন না। তাঁরা সফল চাকুরিয়া বলতে সরকারি অফিসার ও পেশাদার বলতে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র সি.এ. বোঝেন। বেকারদের কোন সামাজিক সম্মান নেই। তেমনি অসংগঠিত শিল্পে যারা কাজ করেন তাদেরও হীন চোখে দেখা হয়। এসব কারণে কমবেতন পাওয়া মানুষ জন ও বেকারদের ব্যক্তিত্বে যথেষ্ট খামতি থেকে যায়। এমন কী যে সব বিবাহিত মহিলা চাকরি-বাকরি করেন না, শুধু গৃহবধূ হিসাবে সংসারে কাজ করেন, তারা নিজেরাই হীনম্মন্যতায় ভোগেন। সবাই চাকরি করছে, তিনি চাকরি করতে পারছেন না। নগদ টাকার জন্য স্বামীর কাছে হাত পাততে হচ্ছে আধুনিকারা এটা মেনে নিতে পারেন না এখন লেখা পড়াশেখার পর মেয়েরা কেরিয়ার না করে বিয়ে থা করতে চাইছেন না তা যত অবস্থাপন্ন পাত্র হোক না কেন। যাদের চাকরি ও পাত্র কিছুই জুটছে না তাদের ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিকশিত হচ্ছে না। তারা মনমরা হয়ে রয়েছে এবং নানা স্নায়ুদৌর্বল্যের শিকার হচ্ছে।

অর্থ ও ব্যক্তিত্ব

যীশু যতই বলুন সুচের ভেতর দিয়ে একটা আস্ত উট গলবে তো ধনী কখনও স্বর্গে পৌঁছতে পারবে না কিন্তু ধনীরা ঈশ্বরের কাছে যেতে না পারলেও প্রচুর মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে। ধনী ব্যক্তি যদি তদুপরি বদান্য হন, অর্থাৎ মোটা টাকার চাঁদা দিতে গেলে ভিরমি খান না, তাঁকে পাড়ার লোকজন কীভাবে তোয়াজ করবে ভেবে পায় না। প্রথমে ব্লক কমিটির প্রেসিডেন্ট, তারপর পুরসভার কমিশনার। তারপর বিধায়ক এম পি হবার জন্য রাজনৈতিক দল তাঁকে ধরাধরি করে। ধনীকে কারও কাছে জবাব দিহি করতে হয় না। তাঁকে দৈনন্দিন বাজারে যেতে হয় না। পথে হাঁটতে হয় না, খুচরো ঝুটঝামেলা নেই বলে তাঁর মেজাজ সাফ। তাছাড়া সবাই তাকে খাতির করে বলে তিনি হীনম্মন্যতায় ভোগেন না। তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলি ভোগ করেন।

অর্থ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি তিনটে এক সঙ্গে আসে। সেজন্য লোকে ধনী হতে চায়। পরিশ্রম করে ধনী হওয়া সময় সাপেক্ষ বলে অনেকে সহজ পথ বেছে নেয়। অর্থাৎ ঘুষ এবং কালো টাকা। যারা দ্রুত বড়লোক হবার জন্য কাজ উদ্ধার করতে চায় তারাও ঘুষ দেয়।

এরফলে রাতারাতি ধনী আরও ধনী হয়ে ওঠে। কারণ তার ভাণ্ডার ক্রমশ সমৃদ্ধ হতে থাকে। ধনীদের সম্পর্কে বা আড়ালে আবডালে লোকে হয়তো বলে, দুনম্বরি করে বড়লোক হয়েছে। কিন্তু তারাও সামনে কোন কথা বলে না। বরং ধনীকে তোয়াজ করে কিছু বাগানো যায় কিনা তার চেষ্টা করে। তাছাড়া ধনীদের পোষা গুণ্ডা বদমায়েশ থাকে বলে লোক ধনীকে ঘাঁটায় না।

আগে উঠতি বড়লোকদের কোন প্রেস্টিজ দেওয়া হত না। কিন্তু এখন পয়সা হলেই হল। তাছাড়া অচেনা জায়গায় একটি হোটেলে আমি ও একজন উঠতি বড়লোক যদি উঠি তাহলে উঠতি বড়লোক। বেয়ারাকে একশ টাকা বখশিস দিলে সে তাঁর কেনা গোলাম হয়ে থাকবে আর আমি সমান টাকা খরচ করতে না পারলে দশবার ডাকলে একবার আসবে।

বড়লোকের ছেলে হয়ে জন্মালে সে মহৎ হয়েই জন্মায়। আর যে গরিব, মহত্ত্ব অর্জন করলেও লোকে তার স্বীকৃতি দিতে চায় না। সুতরাং একজন গরিবের ছেলে ও একজন ধনীর ছেলের ব্যক্তিত্ব সমান হতে পারে না।

ধনীর ব্যক্তিত্বের স্টিরিও টাইপটা এইরকম :

১. হবে না? কার ছেলে দেখতে হবে তো।

২. ওর ঠাকুর্দার চার ঘোড়ার জুড়িগাড়ি ছিল। দুর্গাপুজোর সময় গভর্নর ওদের বাড়ি আসত। কত বড় ফ্যামিলির ছেলে ও।

৩. অত বড়লোকের ছেলে, কিন্তু একদম অহংকার নেই। আমাদের বাড়িতে এসে রুটি তরকারি খেয়ে গেল।

গরিবের ছেলে সম্পর্কে স্টিরিও টাইপ :

১. ওর বাবা খেতে পেত না। এখন ছেলেটা চাকরি করে দুটো পয়সার মুখ দেখছে অমনি অহংকারে আর মাটিতে পা পড়ছে না।

২. আরে ওতো কেরানির চাকরি করত। তারপর কী করে যেন পরীক্ষা দিয়ে আই এ এস হয়ে গেল। বড়লোকের মেয়েকে বিয়ে করে এখন একেবারে জাতে উঠেছে। লোকে তো বলে ওর আই এ এস হওয়ার পিছনে শ্বশুরের কলকাঠি ছিল।

৩. আর বোল না আঙুল ফুলে কলাগাছ। ফুটপাথের দোকান থেকে আজ বিরাট ব্যবসার মালিক হয়েছে। ভাগ্য ভাই ভাগ্য। সবই ভাগ্য।

পরিচিত মানুষজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সকলের— অনাদর অবহেলা গালমন্দ শুনতে শুনতে গরিবের ব্যক্তিত্বপূর্ণ মাত্রায় বিকাশিত হতে বাধা পায়। ব্যক্তিত্ব সব সময় উৎসাহ সহযোগিতা সাহায্য প্রশংসা ও সহানুভূতি খোঁজে।

স্টিরিও টাইপ বা পূর্ব নির্ধারিত ধারণা গড়ে ওঠে কোন সমাজের সাধারণ মানুষের জীবন-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। ভারতীয় সমাজ সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে একটা বড় বাধা। কারণ এই সমাজ বড় বেশি স্টিরিও টাইপে বিশ্বাসী। এই সমাজে প্রকৃত নগরীকরণ হয়নি। শহরগুলির ভেতরেও সেই ছোট ছোট অসংখ্য গ্রাম, যারা সংকীর্ণ চিত্ত সম্বল করে বাঁচে। অন্যকে ঈর্ষা করে। আমেরিকানদের মধ্যে কেউ বড় হতে চাইলে অন্যরা দাঁড়িয়ে দেখে। ইংরেজরা বড় হতে চাইলে অন্য ইংরেজ তাকে সাহায্য করে। কিন্তু ভারতীয়রা কেউ বড় হতে চাইলে অন্যরা তাকে টেনে নামায়।

এজন্য ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের চিরাচরিত ধারণা পালটাতে হবে।

শুধু পয়সার জোরে যারা ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করতে চায় তাদের পাত্তা দেবেন না। অর্থ ব্যক্তিত্বের সহায়ক কিন্তু অর্থবান ব্যক্তি মাত্রই নমস্য নয়। অর্থের সঙ্গে বিদ্যা ও সংস্কৃতি মিললেই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

বিনয়ী বিদ্বানকেই সম্মান করুন। বিদ্যার অহংকার ধনের অহংকারের চেয়ে ভাল কিন্তু যে কোন অহংকারই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশকে নষ্ট করে দেয়।

একমাত্র সততার অহংকারই গ্রহণীয়। দরিদ্র অথচ সৎ এবং শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন।

বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যই-রূপের ঔজ্জ্বল্যকে ছাপিয়ে যায়। কাচ ও কাঞ্চনের মধ্যে তফাত করতে শিখুন।

পাঁচ
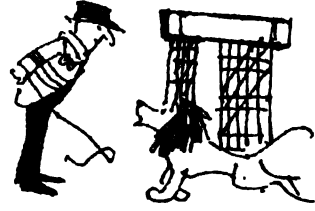
জিন ও ব্যক্তিত্ব

মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনে জিনের অবদান কতটুকু এর পরিমাণগত দিকটি নিয়ে মনস্তত্ত্ববিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

প্যাট্রিক ও টাইলার বলছেন, দুজনের মধ্যে ব্যক্তিত্বের তফাতের জন্য জিনের অবদান যথেষ্ট।

The contribution of genetic factors to individual differences in personality and ability is substantial [১৯] সম্প্রতি একটি প্রবন্ধে পড়লাম লেখক বলছেন, সাধারণ জেনেটিক মেক আপ অর্থাৎ জিনের প্রকৃতি ৯৮ ভাগ ক্ষেত্রেই এক। অর্থাৎ আমার জেনেটিক মেক আপ ও আপনার জেনেটিক মেক আপের ৯৮ ভাগই এক। শুধু দু ভাগের মত ক্ষেত্রে উভয়ের বৈষম্য।....as close to 98 percent of genetic make up is identical in all human beings. It is the remaining 2 percent that makes us differerent from each other.[২০] কিন্তু Patrick A. Tyler জোর দিয়ে বলছেন : দুজনের মধ্যে IQ এর ও ব্যক্তিত্বের কতগুলি ক্ষেত্রের (যেমন—extroversion বা বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব) যে তফাৎ হয় তার জন্য ৪৮ শতাংশই হয় জিনের জন্য।

দেখা গেছে একই পারিবারিক পরিবেশে মানুষ হয়েও ভাইবোনেদের ব্যক্তিত্ব ভিন্নভিন্নভাবে তৈরি হয়ে গেছে শুধু জিনের প্রভাবে। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে তিন ছেলেমেয়ে—তিনজনেই মা বাবার সমান ভালবাসা পেয়েছে। কিন্তু তিনজনের ব্যক্তিত্ব আলাদা। আমার দুই ছেলেমেয়ে। আমরা স্বামী-স্ত্রী দুই ছেলেমেয়ের প্রতি সমান নজর দিয়েছি। তারা দুজনেই স্বাভাবিক মধ্যবিত্ত পরিবেশে মানুষ হয়েছে। কিন্তু দুজনের চিন্তাধারা ও ব্যবহারে মিল যেমন আছে অমিলও প্রচুর। একথা ভুললে চলবে না যে বাবা-মায়ের ৪৬টি ক্রোমোজমের ভেতর যে হাজার হাজার জিন থাকে এই জিনগুলি বংশানুক্রমিক। পূর্বপুরুষের জিন পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে। সেটাও এলোমেলোভাবে। অর্থাৎ আমার দেহে আমার প্রপিতামহ ঠাকুর্দা বা আমার বাবার জিন কত পরিমাণে থাকবে তার কোন অনুপাত নেই। তেমনি মাতামহের দিক থেকেও সেই একই অবস্থা। আর প্রতিটি জিনই হল আমাদের দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর (traits) বীজ বহনকারী। এই জিনের তারতম্যের জনাই দুভাই একজন ফর্সা একজন কালো হতে পারে। উত্তমকুমারের মত তরুণকুমার অত সুপুরুষ হননি। আমি সুন্দর দম্পতির বাচ্চাদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি, অনেকেই বাবা-মায়ের রূপ পায়নি। আমি এক বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে চিনি। তাঁর দুই ছেলে বাবার মত চেহারা পেয়েছে। কিন্তু পণ্ডিতমশাইয়ের দুঃখ দুই ছেলের একটাও মানুষ হল না।

এ সমস্তই ক্রোমোজম বাহিত জিনের ফলাফল। যা শুধুমাত্র বাবা-মায়ের ওপরেই একান্ত নির্ভরশীল নয়। তবে বাবা-মায়ের প্রভাব কিছুমাত্রায় থেকে যায় বৈকী।

দুষ্ট জিন থেকে বংশগত নানা রোগের উৎপত্তি যাকে জেনেটিক রোগ বলা হয়। কতগুলি সাধারণ অসুখ ডায়াবেটিস, বাত, হাঁফানি জিন থেকে আসে। ওষুধপত্র ব্যায়াম ও খাদ্যাভ্যাস বদলে এগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় কিন্তু এদের নির্মূল করা যায় না। বাঁদরকে একটু উন্নত বাঁদরে পরিণত করা যায় কিন্তু তাকে শিব তৈরি করা যায় না। বর্তমানে গবেষণা চলছে জিন প্রযুক্তি নিয়ে। দুষ্ট জিনকে নির্মূল করতে পারলে বহু জেনেটিক অসুখ সারিয়ে তোলা সম্ভব হবে। কিন্তু দুষ্ট জিন নষ্ট করার পর তার অন্য প্রতিক্রিয়া হবে কি না সে বিষয়ে এখনও নিঃসন্দিহান হওয়া যায়নি।

এলিজাবেথ হারলক বলছেন, জিন সরাসরি ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে না। তবে জিন পরোক্ষভাবে ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কেমন করে? না, স্নায়ুতন্ত্রের (nervous system) মান (quality) কেমন হবে তা জিনের ওপর নির্ভর করে। আর স্নায়ুতন্ত্রই মানুষের দেহের জৈব রাসায়নিক (bio-chemical) ভারসাম্য রক্ষা করে। দেহের কাঠামোও নির্ধারণ করে দেয়। ব্যক্তিত্বের প্রধান কাঁচামাল (raw material) হল তিনটি : চেহারা, বুদ্ধি আর মেজাজ। এই তিনটি আসে বংশের একটা ধারা থেকে যাকে হারলক বলছেন, stuctural heritence. বংশধারা থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তিত্ব পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রায়শই দেখা যায় বাবার সঙ্গে ছেলের, মায়ের সঙ্গে মেয়ের ব্যক্তিত্বের কোথায় যেন মিল রয়েছে। বাবা খুব রাগী, ছেলেও ঠিক তেমনি রাগী ও বদমেজাজী। মা চরিত্রহীনা, মেয়েও সমান চরিত্রহীনা। প্রত্যেক প্রজাতিরই প্রজাতিগত কতগুলি দৈহিক বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন ভারতে পাঞ্জাবি পরিবারের পুরুষ ও নারীরা খুব লম্বা হয়। তাদের দৈহিক কাঠামো মজবুত। পাঞ্জাব থেকে কাশ্মীর আফগানিস্তান ইরান ইরাক পর্যন্ত আপনি একই দৈহিক কাঠামোর মানুষ পাবেন। অনেক সময় তাদের চেহারা দেখে ধরা মুশকিল তাঁরা কোন এথনিক গোষ্ঠীর। এর কারণ প্রাচীন আর্যজাতির দৈহিক কাঠামো তারা এখনও অপরিবর্তিত রাখতে পেরেছে অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাদের মিশ্রণ কম হয়েছে। পূর্বভারতে এই মিশ্রণ খুব বেশি। একারণে বাঙালি-ওড়িয়া বিহারীদের কোনও নির্দিষ্ট শারীরিক কাঠামো নেই। বাঙালিরা কদাচিৎ দীর্ঘদেহী। আবার মঙ্গোলিয়ান গোষ্ঠীর ভেতর যেমন উচ্চতার একটা মান আছে বাঙালির তা নেই। বাঙালি মেয়েদের গড় উচ্চতা পাঁচফুট এক কিংবা দুই। পুরুষের পাঁচ কিংবা ছয়। এসব নৃতাত্ত্বিক কারণের মধ্যে যাবো না। শুধু এইটুকু বলবো ভারতীয়দের মধ্যে ভাল বংশ গোত্র কুলশীল চেহারা মিলিয়ে বিবাহ দেওয়ার যে প্রথা ছিল, তা ব্যক্তিত্বের বংশগত ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য। সাধারণ বুদ্ধিতে দেখা যায় ফর্সা বাবা-মায়ের ছেলে মেয়ে ফর্সাই হয়। কিন্তু সব ছেলে-মেয়ে বাবা-মায়ের রঙ পাবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। আমার এক ছাত্র আছে তার রঙ ঘন কৃষ্ণবর্ণ। সে বিয়ে করেছে এক গুজরাতি মেয়েকে। মেয়েটি খুব ফর্সা না হলেও মোটামুটি ফর্সা। তার দুই ছেলেমেয়ে ধবধবে ফর্সা। এটা কী করে হল? গুজরাতি পরিবার ফর্সা হয়। ছেলেমেয়েদের মধ্যে মায়ের দিকের জিন বেশি এসে গেছে। যে সব ভারতীয় শ্বেতাঙ্গিনী বিয়ে করেছে তাদের ছেলেমেয়েরা সবাই নীল চোখ ও মায়ের রঙ পেয়েছে। তবে একটা প্রজন্ম আসবে যখন ছেলেমেয়েরা বাবার রঙ ফিরে পাবে। অথবা পাঁচ-ছটি ছেলেমেয়ে হলে সবার রঙ

সমান হবে না।

বংশগত পবিত্রতা সংরক্ষণ বিপজ্জনক সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তার জন্ম দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গ বিদ্বেষের মূলসূত্রই ছিল শ্বেতজাতির বংশগত পবিত্রতা রক্ষা করা। হিটলার ইহুদিদের আর্যতের জাতি বলে ভাবতেন এবং তাঁর আশংকা ছিল আর্য জার্মানদের সঙ্গে আর্যতের ইহুদি রক্তের মিশ্রণ ঘটলে জার্মান জাতির সর্বনাশ হবে। হিন্দি ছবিতে আমরা যে প্রেম বনাম খানদানের লড়াই দেখি তার জন্ম ওই বংশগত পবিত্রতা সংরক্ষণের প্রবল ইচ্ছা থেকে। যতক্ষণ পর্যন্ত 'উচ্চতর' ও 'নিম্নতর' জাতির মধ্যে জিনের সংমিশ্রণ না ঘটবে ততদিন শ্রেণীহীন সমাজের সৃষ্টি হবে না। পরিবেশ ও জিন ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে কার ভূমিকা বেশি এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। তবে প্রতিটি মানুষের জীবনেই এ দুটির প্রভাব আছেই।

এ নিয়ে প্রাণীতত্ত্ববিদরা পরীক্ষা-নিরিক্ষা করেই চলেছে। জানেৎ কিয়ারের হাসের বাচ্চা নিয়ে পরীক্ষার কথাটাই ধরুন।

শ্রীমতী কিয়ার করলেন কি ডিমফোটার পর হাসের কতগুলি বাচ্চাকে এনে ল্যাবরেটরির মধ্যে বড় করতে লাগলেন। এগুলির মধ্যে নানা ধরনের হাঁসের বাচ্চা ছিল। একদল হাসের বাচ্চা ছিল, যে সব হাঁস গাছের মগডালে বাসা বাঁধে। আর একটু বড় হলেই তাদের বাচ্চারা মগডাল থেকে মাটিতে ঝাপ মারতে শেখে। আর একদল হাঁস অত উঁচুতে বাসা বাধে না। তারা নিচেই থাকে। ল্যাবের মধ্যে কাঠের তক্তা দিয়ে একটা প্লাটফর্মের মত করে হাসের বাচ্চাগুলোকে বসিয়ে দেওয়া হল। দেখা গেল, মগডালে বাসা বাধতে অভ্যস্ত হাঁসের বাচ্চারা দিব্যি প্ল্যাটফর্ম থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। আর নিচু ডালে বসা হাসের বাচ্চারা উচ্চতা দেখে ভয় পাচ্ছে। তাঁরা ঝাঁপ না দিয়ে পাটাতনের ওপরেই রয়ে গিয়েছে।

এখন এই হাঁসের বাচ্চাদের কেউ তো নিচে ঝাঁপ দিতে শেখায়নি। তাহলে তারা কেমন করে ঝাঁপ দিতে জানল? আর দ্বিতীয় বাচ্চারাই বা ভয়ে সিঁটিয়ে রইল কেন? রইল এই কারণে যে তারা উভয়েই জিন চালিত, জিন তাড়িত। তাদের জিনের মধ্যেই রয়ে গেছে আপন আপন চরিত্র। সেটাই শিক্ষকের কাজ করেছে।

জিন চালায় প্রবৃত্তিকে। আরও একটা উদাহরণ দিচ্ছি এক প্রাণীবিদের পরীক্ষা থেকে। কাঠবেড়ালিরা যখন কোন শক্ত খাদ্য পায় তারা কিছুটা খেয়ে বাকিটা মাটি খুঁড়ে তার মধ্যে সঞ্চয় করে রাখে। ল্যাবের কাঠবিড়ালির বাচ্চাদের কোন শক্তখাদ্য না দিয়ে বরাবর তরল খাদ্যে অভ্যস্ত করানো হল। তারপর একটু বড় হতেই একদিন তাদের প্রথম বাদাম খেতে দেওয়া হল। দেখা গেল শিশু কাঠবিড়ালিরা একটু বাদাম খেয়ে বাকিটা মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে রেখে দিচ্ছে।

কে শেখাল তাদের প্রকৃতিগত এই আচরণবিধি? দেহকোষের ভেতরের জিন।[২১]

রাজীব গান্ধীর হত্যাকারী দলের নেতা শিবরাসনের ডি এন এ বিশ্লেষণ করে একদল বিজ্ঞানী বলেছিলেন বিষাক্ত কেউটে যে জিনের কারণে দংশন করে সেই জিনের DNA-এর মতই এক ডি এন এ বিন্যাস শিবরাসনের শরীরে পাওয়া গিয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের বীজ জিনের মধ্যে প্রোথিত। অনুকূল পরিবেশ পেলে শিবরাসন সংযত থাকত। কিন্তু প্রতিকূল পরিবেশে অর্থাৎ জঙ্গী তামিলরা তার মগজ ধোলাই করায় তার ভেতরের পশুটাই জেগে উঠেছে।[২২]

এইজন্যই অনুকূল পরিবেশের এত প্রয়োজন। নয়তো আমাদের কার মধ্যে কোন দুষ্ট জিন বাসা বেঁধে আছে তা আমরা জানি না। কারণ জিন আমরা দেখতে পাই না। কারও চেহারা দেখেও বোঝার উপায় থাকে না। আমাদের ধরে নিতে হয় মানুষের মধ্যে সুপ্ত পশুত্ব ওই জিন। চারদিকে হতাশাময় মর্বিড ও নেতিবাচক পরিবেশের মধ্যে এই পশু ব্যক্তিত্ব জেগে ওঠে।

দেখবেন এক একটি লোক হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে রেগে যায় তখন তার চোখ মুখের চেহারা পালটে যায়। আমি এমন অনেক চরিত্র দেখেছি। স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে বলতে সামান্যকারণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তখন তাদের চোখ মুখের দিকে তাকালে মনে হয়েছে গুপ্তগহ্বর থেকে এক পশু বেরিয়ে পড়েছে। সেদিন এক খবরে দেখলাম স্বাভাবিক বয়স্ক এক মানুষ। পাশের বাড়ির ছোট্ট মেয়েটি তার বাড়িতে নিয়মিত আসে। হঠাৎ একদিন তাকে একা পেয়ে ৫৮ বছরের ওই প্রৌঢ় তাকে ধর্ষণ করে বসল। এগুলি ভেতরের জিনের প্রভাবের ফলেই। আমার এক পরিচিত ছেলের কথাই বলি। খুব ভাল ছেলেটি, ভদ্র বিনয়ী এবং সদ্বংশজাত। বন্ধুটি একদিন আমায় স্বীকার করল সে মাঝে মাঝে এমন কামনা তাড়িত হয়ে ওঠে যে দীর্ঘকাল ধরে বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে সে যৌন সংসর্গ করে। ছেলেটি পরে সেক্স ম্যানিয়াক হয়ে যায় ও তার জীবনে অভিশাপ নেমে আসে। আমি খোঁজ নিয়ে জানলাম তার মাও ছিল চরিত্রহীনা। এটি মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে তার পাওয়া।

হাঁসের বাচ্চার ঝাঁপ . কে ওদের শেখাচ্ছে?

এক্ষেত্রে মানুষ বাঁচতে পারে সচেতনভাবে সে যদি বাঁচতে চায় তবেই। তাকে সুপরিবেশের সাহায্য নিতে হবে। সাধুসঙ্গ করতে হবে। অধ্যাত্মভাবনায় ভাবিত হতে হবে। খাদ্যাভাস বদলাতে হবে। নির্জন বাস পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে বদলাবার জন্য সচেতন প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে। এই ধরনের অ্যাগ্রেসন বা ক্রোধোন্মত্ততা এবং মারমুখী ব্যক্তিত্ব আমি অনেকের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেছি। তাঁরা এমনিতে ভদ্র সভ্য ও বন্ধু বৎসল। কিন্তু হঠাৎ এমন রেগে যান যে সেইমুহূর্তে খুন-খারাপি করে বসাও আশ্চর্য নয়।

১৯৭৪ সালে জেফারসন স্কলারশিপ নিয়ে আমি যখন হাওয়াই দ্বীপে পড়তে গিয়েছিলাম

তখন তাইল্যান্ডের এক সাংবাদিক আমার সঙ্গী হয়। সেও এই স্কলারশিপ পেয়েছিল। আমি যাওয়ার পথে ব্যাঙ্ককে কয়েকদিন ছিলাম। ব্যাঙ্কক থেকে হংকং হয়ে আমরা হনলুলু যাই। আমরা একসঙ্গেই ঘোরাফেরা করতাম। সমবয়সী বলে আমরা বেশ বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম।

একদিন এমন একটা ঘটনা ঘটল যাতে আমি তার অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সতর্ক হয়ে গেলাম। তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করলাম।

আমরা দশজন আন্তর্জাতিক সাংবাদিকের একটা দল ছিলাম। একদিন সবাই মিলে আর একটি দ্বীপে ট্যুর করতে গিয়েছি। উঠেছি একটা হোটেলে। আমি ওর সঙ্গে সর্বদা হোটেলে রুম শেয়ার করতাম।

যাবার দিন সবাই গাড়িতে উঠছে। আমি ঘরে বসে। ও কোথায় গিয়েছে ও এলে একসঙ্গে মালপত্র নিয়ে নামব এটা ঠিক করেছি। কিন্তু নিচে থেকে গাড়ি হর্ন দিচ্ছে। তাই আমি ভাবলাম আমি চলে যাই। গিয়ে বলি ও এখনও ফেরেনি গাড়ি যেন এখনই না ছাড়ে।

দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা রিসেপশনে দিয়ে যেই গাড়ির কাছে গিয়েছি, দেখি হন্তদন্ত হয়ে ও আসছে। আমায় দেখে বলছে, আমার মালপত্র কোথায়? আমি বললাম, রিসেপশনে। ও উদ্বিগ্ন হয়ে ছুটল। তারপর মাল নামিয়ে নিয়ে এসে আমার দিকে মারমুখী হয়ে তেড়ে এল। কেন আমাকে ফেলে তুমি চলে এসেছ? এই বলে মারমুখী হয়ে সে আমার কলার ধরতে এল। দেখি ওর চোখ-মুখ পালটে গেছে। সেই এতদিন কার পরিচিত মানুষটি আর নেই। ওকে আমি যেন চিনি না। ও এক অজ্ঞাত আততায়ী। মনস্তত্ত্ব পড়া থাকার জন্যই বোধ হয় আমি ওর সঙ্গে কনটেস্ট করলাম না। অন্যরা এসে ওকে থামাল। ওই সময় ওর হাতে পিস্তল থাকলে ও আমায় গুলি করত।

কাম-ক্রোধ সব মানুষের মধ্যেই স্বাভাবিক মাত্রায় থাকে। কিন্তু কাম-ক্রোধের অত্যধিক বহিঃপ্রকাশ নিঃসন্দেহে জিনবাহিত। যদি বুঝতে পারেন এটা আপনার ব্যক্তিত্বের ক্ষতি করছে তাহলে এখনই সাবধান হন। অনুসন্ধান করান আপনার বাবা- মায়ের দিক থেকে কারও এই ধরনের অসুস্থতা ছিল কি না। যদি না পাওয়া যায় এমনও হতে পারে তা কয়েক পুরুষ আগে কারও মধ্যে ছিল।

তবে শুধু যে দোষগুলিই জিনবাহিত তা নয়। গুণও জিন থেকে আসতে পারে। মেধা, প্রতিভা, হাল্কা মেজাজ-উদার মানবিকতা বংশানুক্রমে সঞ্চারিত হতে পারে। বাবা মা মেধাবী হলে ছেলেমেয়ে অন্তত পড়াশোনায় খারাপ হয় না। শিল্পী ও গায়কদের বংশে ঊর্ধ্বতন পুরুষে কেউ না কেউ গায়ক থাকে। সিনেমা ও চলচ্চিত্রে আমরা প্রায়শই দুই পুরুষের মধ্যে অভিনয় প্রতিভা দেখি। পেশাদারদের মধ্যে বাবা ছেলে বা বাবা মেয়ে পুরুষানুক্রমে একই পেশা (ডাক্তার, উকিল) গ্রহণ করে। জিন সামান্য হলেও এক সম্ভাবনার সৃষ্টি করে রাখে। এমনকি হাতের লেখার ক্ষেত্রেও দেখা যায় হাতের লেখাও জিন বাহিত। তাই কেউ কারও হাতের লেখা নকল করতে পারে না কারণ তা শৈশবেই শিশুর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। তবে তরুণ হস্তলিপিবিদ আলাউদ্দিন দাবি করেন শিক্ষা দিলে হাতের লেখা ভাল করা যায়। তবু জিন একেবারে উড়িয়ে দেবার ব্যাপার নয়। পরিবেশ সেই সম্ভাবনাকে অঙ্কুর থেকে মহীরুহে পরিণত করে।

ছয়

ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ

ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবেশের ভূমিকা কতটুকু? পরিবেশ অনুসারে মানুষের ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়ে যায় এমন একটা ধারণা সকলের মধ্যেই কাজ করে। সেটা কতখানি সত্যি?

প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী শহরের ছেলেমেয়েরা খুব চালাক চতুর হয়, গ্রামের ছেলেমেয়েরা সে তুলনায় সরল অর্থাৎ বোকা। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়। আমি বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত গ্রামে কাটিয়েছি। গ্রাম বলতে তখন সত্যিকারের গ্রাম ছিল। তারপর কলকাতায় এলাম। সেখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়লাম। বিলেতে গিয়ে এক বছর থাকলাম। সেখানে হাইসোসাইটিতে মেলামেশা করলাম। পরিণত যৌবনে আমেরিকার ইউনিভার্সিটিতে কিছুদিন কাটালাম। আধুনিকতম সমাজকে খুব কাছ থেকে দেখলাম। সাংবাদিকতার সূত্রে দিল্লি বোম্বেও হাতের মুঠোয় এসে গেল। কত বড় বড় লোকের সান্নিধ্যে এলাম। কিছু ওপর চালাকি, আদব কায়দা শিখলাম। কিন্তু ভেতরে ভেতরে গ্রাম্যসরলতা থেকে মুক্ত হতে পারলাম না। এই সরলতার জন্য খবরের কাগজে শহুরে ছেলেদের ক্ষুরধার বুদ্ধির কাছে টিকতে পারলাম না। বার বার ল্যাং খেয়ে শেষ বয়সে একটা ছোট্ট প্রত্যন্ত শহরে গিয়ে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিলাম। এটা আমার মত আরও বহু গ্রামের ছেলের ভাগ্যে ঘটেছে। তারা ওপরে উঠেও পড়ে গেছে। অথবা একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গেছে। তাদের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সমস্যা দেখা দেবে না। কারণ তারা শহুরে পরিবেশের মধ্যে মানুষ।

পৃথিবীর সবদেশেই নিম্নবর্গের মানুষ আছে। কিন্তু দেখা গেছে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটাতে পারলে বংশানুক্রমিক জিনের বিরুদ্ধে লড়াই করার মত শক্তি পরিবেশই তাদের জুটিয়ে দেয়।

ব্যক্তিত্ব গঠনের ৬০ শতাংশই আসে পরিবেশ থেকে। এটাই প্যাট্রিক টেইলার সাহেবের মত।

While genetic influences on personality are important, it should not be forgotten that environmental ones are even more important (they account for about 60 percent of individual differences in personality)

পরিবেশ বলতে এখানে শিশুর বাড়ির পরিবেশ এবং স্কুলের পরিবেশ দুটোই ধরতে হবে। আবার সামাজিক পরিবেশ ও আর্থ-সামাজিক পরিবেশ রাজনৈতিক পরিবেশ বা রাষ্ট্র কাঠামোকেও বাদ দেওয়া যাবে না।

আমার বাড়িতে কাজ করত এক স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা। তার একমাত্র ছেলে গ্রামে মামার বাড়ি থেকে পড়ত। মামারা রিকশ চালায়। তাকেও রিকশচালক হিসাবে তৈরি করা হচ্ছিল। গ্রামের অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে সে পড়ত। সে যেবার ক্লাশ ফোর পাশ করল সেবার তাকে নিয়ে সিউড়ি রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে সুভায মহারাজ ও হীরু মহারাজের সৌজন্যে ভর্তি করে দিলাম। তাঁরা তাকে বিনাপয়সায় পড়ালেন। সে যখন ওই স্কুলে ভর্তি হয় তখন ভাল করে বাংলায় সই করতে পারত না। স্পষ্ট করে কথা বলতে পারত না। কিন্তু পরিবেশের এমনই গুণ যে সে ২০০০ সালে থার্ড ডিভিশনে মাধ্যমিক পাস করে গেল। শুধু তাই নয় সে এখন ঝকঝকে চেহারার এক স্মার্ট যুবক। ওই গ্রামে থাকলে এটা কখনই হত না।

তফশিলি জাতি উপজাতিদের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখায় এই শ্রেণীর মধ্যে ওয়ার্কিং ক্লাস থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। এটার খুবই দরকার ছিল। প্রথম প্রজন্মের অনেক তফশিলি শিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে এখনও হীনম্মন্যতা থেকে গেছে। কিন্তু তাঁদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে আর সেটি নেই। কারণ তারা ভাল ভাল স্কুল থেকে পড়েছে। নানা সুযোগ সুবিধা পেয়েছে। এখন শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তারা উচ্চবর্গেরই একজন। এদের আর সংরক্ষণের সাহায্য নেবার দরকার নেই। নিজ শক্তিতেই তারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে সক্ষম। তবে আগেই বলেছি জিনের মিশ্রণ ঘটিয়ে প্রকৃত শ্রেণীহীন সমাজ যতদিন না তৈরি হবে ততদিন ব্যক্তিত্বের সমতা (Uniformity) আসবে না। ইওরোপ আমেরিকায় শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হতে পেরেছে এই কারণে যে সেখানে সকলের জন্য সমান সুযোগ আছে। আর্থিক অনগ্রসরদের সাহায্যের জন্য নানা ওয়েলফেয়ার স্কিম আছে। সেই সঙ্গে যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক সেটা হল, ছেলেমেয়েরা পছন্দ করে বিয়ে করছে যার ফলে জিন একটি বিশেষ গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকছে না। এই কারণে জাতীয় ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হচ্ছে। যার স্টিরিওটাইপ হল স্বাস্থ্যবান, পরিশ্রমী, কর্মঠ, শৃঙ্খলাপরায়ণ একজন মানুষ।

ব্যক্তিত্ব পরিপূর্ণতার জন্য

বিখ্যাত মনোবিদ সি.জি. ইয়ুং (C G. Jung) বলেছেন, সমস্ত মানবজাতির লক্ষ্য : জীবনের পরিপূর্ণতা অর্জন (fullness of life)। এরই নাম ব্যক্তিত্ব। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব অর্জনেই জীবনের পরিপূর্ণতা। প্রতিটি জাতিই অপেক্ষা করে থাকে এমন পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের জন্য।

ইয়্যুং-এর মতে ব্যক্তিত্ব গঠন হয় শৈশবে শিশুর পারিবারিক পরিবেশে এবং স্কুলের পরিবেশ। এই দু'জায়গায় শিক্ষার ঘাটতি থাকলে সেটা শিশুর সারাজীবনের ক্ষত হয়ে থাকে। ইয়্যুংএক বলছেন, life long injuries caused by stupid upbringing at home or in school are too obvious।[২৩]

আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব গঠনের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা শিক্ষকদের শিশু মনঃস্তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা। যদিও বি.এড. পাঠক্রমে শিক্ষা মনঃস্তত্ত্ব পড়তে হয় কিন্তু ক'জন বি.এড. পাশ শিক্ষক চাকরি পেয়ে সেটা মনে রাখেন? আমি ছোটবেলায় যে স্কুলে

পড়েছি সেখানে একজন মাস্টার মশাই ক্লাশে ছেলেমেয়েদের ব্যঙ্গবিদ্রূপ করতেন। বলতেন, তোর কিছু হবে না। মুদির দোকানে গিয়ে কাজ করগে যা। আমাদের হেডমাস্টার মশাই ছাত্র ঠেঙাতে ওস্তাদ ছিলেন। শিশু ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে যথেষ্ট পরিমাণ প্রণোদন বা Motivation-এর দরকার হয় সে বিষয়ে তাঁরা খেয়াল করতেন না। তার ফলে বহু ছাত্র ড্রপ আউট হত। অনেকে পড়াশোনায় ভাল ফল করত। তারা ভাল চাকরি বাকরিও পেত। কিন্তু তাদের মধ্যে কমজনেরই পূর্ণ ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পেরেছে। সাধারণ বাবা-মা সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা তাঁরাই। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত অনেক মা-ছেলেমেয়েদের এমন কড়া শাসনে রাখে যে তাদের ব্যক্তিত্ব কোনদিনই বিকশিত হতে পারে না। ইয়্যুং বলছেন, পারবেই বা কী করে বাবা-মাতো কোনদিন ব্যক্তিত্ব গঠনের শিক্ষা পাননি। কাজেই তাঁরা নিজেরাই ব্যাপারটা ভাল করে জানেন না।

ইয়্যুং এই জন্য বলছেন, শিশুদের বদলাবার আগে, আমাদের নিজেদের বদলাতে হবে। যদি কারও নিজের ব্যক্তিত্ব না থাকে তাহলে সে আবার ব্যক্তিত্বের শিক্ষা দেবে কী? ব্যক্তিত্ব বলতে বোঝায় মানুষের সর্বদিকে সর্বোচ্চ (Optimum) উন্নতি। এর জন্য অসংখ্য শর্তপূরণ করতে হয়। মানুষের সর্বতোমুখী বিকাশ যাকে এই লেখক 'পরিপূর্ণ জীবন' বলেছেন ইয়্যুং-এর ভাষায় সেটাই Optimum development। অর্থাৎ জৈবিক, সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক এই ত্রিবর্গ জীবনের উন্নতি। হিন্দুরা এক ধাপ এগিয়ে বলেছেন চর্তুবর্গ উন্নতি : ধর্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ।

ইয়্যুং-এর মতে ব্যক্তিত্ব কোথা থেকে আসে কোথায় তার উৎস এটা অনুধাবন করা অসম্ভব। আমাদের প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্বের প্যাটার্ন আলাদা আলাদা। ভাল মন্দ, মন্দের ভাল সব মিলিয়ে যে বিচিত্র জীবন প্রবাহ, তার মধ্যে কার কোনদিকে গতিপথ নির্ধারিত হবে তা বলতে পারি না। মাতৃজঠরে সব শিশুই সমান। ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময়ও সে জানে না কোনটা ভাল কোনটা মন্দ, কোনটা নিয়তি। একমাত্র জীবনের শেষ প্রান্তে এসেই মানুষ বলতে পারে তার সারাটা জীবন কেমন কাটল। কোথায় তার ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভুল ভ্রান্তি, শক্তি এবং সীমাবদ্ধতা।

ইয়্যুং বলছেন, ব্যক্তিত্ব আমাদের জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উপলব্ধি। ব্যক্তিত্ব তাই অধরা। (Unattainable ideal) কিন্তু তাকে ধরা যায় না এটা বড় কথা নয়। কারণ ব্যক্তিত্বের ধারণার সৃষ্টি কতগুলি মূল্যবোধ ও আদর্শের ওপর। ক্যাটোল বলেছেন : ব্যক্তিত্ব হল কোন ব্যক্তি একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কী করতে পারে তার ভবিষ্যদ্বাণী।[২৪]

আমরা ব্যক্তির মূল্যবোধ ও আদর্শবোধের মাত্রা দেখেই বলে দিতে পারি লোকটি এই পরিস্থিতিতে এই করবে। চোর ধর্মের কথা শুনবে না। চতুর যেকোন বিপদে মিথ্যে কথা বলে ঠিক ছিটকে বেরিয়ে আসবে। সৎ সরল ব্যক্তি এই দুনিয়ায় সহজে সততার পুরস্কার পাবে না। ব্যক্তির কতগুলি দোষ বা গুণ দেখেই ব্যক্তি সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায় সেটাই ওই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব।

ব্যক্তিত্ব মানুষের চরিত্রের স্থায়ী দিক। পরিবেশের মধ্যে থেকে পরিবেশের সঙ্গে বোঝাপড়ার শক্তি মানুষ অর্জন করে তার সহজাত বুদ্ধি ও আর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে।

যার বুদ্ধি আছে সে বোঝে কোনও মানুষ সম্পূর্ণ নয়। তাকে ঘাটতি পূরণের জন্য সচেষ্ট হতে হয়। পরিবেশ থেকে সে কি কি গ্রহণ করবে, কতখানি গ্রহণ করবে এবং কেন গ্রহণ করবে এটা তাকেই ভাবতে হয়।

আপনি গরিবের ঘরে জন্মেছেন, উন্নয়নশীল দেশে জন্মেছেন, আপনার পরিবেশ আপনার জীবনের সামূহিক বিকাশের উপযোগী নয়, সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন? পরিবেশ থেকে দূরে সরে গিয়ে কোন গজদন্ত মিনারের অধিবাসী আপনি হতে পারবেন না। ভারতচন্দ্র বলেছেন, যে মাটিতে মানুষ পড়ে যায় সেই মাটি ধরেই ওঠে। পরিবেশ আপনার প্রতিকূল। কিন্তু এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে পরিবেশকে অনুকূলে অনাটাই মানব সভ্যতা। এখন পৃথিবীটা যেমন দেখছেন গোড়া থেকেই তেমনটি ছিল না। তিল তিল করে মানুষ পরিবেশকে নিজের উপযোগী করে নিয়েছে। আবার পরিবেশও তাকে প্রভাবিত করেছে।

পবিবেশের শ্রেণীভেদ : পরিবেশ বলতে বুঝি আমাদের চারপাশের বাতাবরণ। যার মধ্য দিয়ে আমরা বড় হয়ে উঠি। আমাদের দেহমন যার মধ্য দিয়ে বিকাশিত হয়।
এস.কে মঙ্গল বলেছেন, পরিবেশ দু'ধরনের। এক আভ্যন্তরীণ পরিবেশ। দুই বাইরের পরিবেশ।

আভ্যন্তরীণ পরিবেশ শুরু হয় মাতৃজঠরে ভ্রূণ অবস্থা থেকে। মাতৃজঠরে ভ্রূণ মায়ের রক্তনালী (Blood stream) থেকে আপন খাদ্য সংরক্ষণ করে। সে সময় মায়ের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য, মায়ের অভ্যাস, আচরণ, আগ্রহ সব কিছুই জঠরের পরিবেশে শিশুর আচরণের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করে। এজন্য প্রসূতির পক্ষে মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতার বেশি করে দরকার। দরকার স্বাস্থ্যকর খাদ্যের। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষের মধ্যে অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের জন্য প্রসূতির বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় না। তাছাড়া দরিদ্রপরিবারে বহু শিশুর জন্ম হয়। বারবার প্রসূতিকে কে সেখানে পরিচর্যা করবে? অনাদরে অবহেলায় এবং অস্বাস্থ্যকর আভ্যন্তরীণ পরিবেশে যে শিশুর জন্ম সে তো জন্ম থেকেই নানা ঘাটতি নিয়ে জন্মাচ্ছে। জন্মের পর শিশু মুখোমুখি হয় বাইরের পরিবেশের সঙ্গে। এই বাইরের পরিবেশ আবার দু'রকমের। প্রাকৃতিক আর সামাজিক বা সাংস্কৃতিক।

নদী, পর্বত, অরণ্য, নগর এগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশ। আবহাওয়া, খাদ্যাভ্যাস, পানীয় জল এ সবই প্রকৃতি পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। সাংস্কৃতিক বা সামাজিক পরিবেশ হল : বাবা-মা, আত্মীয় স্বজন পারিবারিক বন্ধু, সহপাঠী, প্রতিবেশী, শিক্ষক, জাতভাই (Members of community) ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক। বাইরের পরিবেশের মধ্যে এসে যায় গণজ্ঞাপন (Mass communication), বিনোদন, ধর্ম, ক্লাব, লাইব্রেরী যা মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রুচি তৈরি করে দেয়।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ : শিশু বড় হয় তার আপন পরিবারে। তার পারিবারিক বৃত্তের মধ্যে তার বাবা-মায়ের পারস্পরিক আচরণ ও শিশুর প্রতি আচরণ শিশুর ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। বাবা-মায়ের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা না থাকলে শিশু উদ্বেগ তাড়িত হয়। আবার বাবা-মায়ের ভালবাসা না পেলে তার কোমল সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটতে পারে না। শৈশবে বাবা কিংবা মায়ের মৃত্যু হলে শিশু নিজেকে বঞ্চিত মনে করে ও তার ব্যক্তিত্বের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে আমার একটি সমীক্ষা

এই বই-এব শেষে দিয়েছি।

শিশু যেমন বাবা মাকে ভালবাসে তেমনি শিশুব প্রতি বাবা-মায়েব অত্যধিক আদর ও বাবা-মাযেব প্রতি অতিনির্ভবতা ছেলেমেযেব ব্যক্তিত্ব বিকাশে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পাবে। শিশু বাহানা কবা মাত্র তাকে সবকিছু কিনে দিলে ভবিষ্যতে সে দাবিপ্রবণ (Demanding) হয়ে উঠতে পারে।

গ্রুপেব স্বীকৃতি

সচেতন বাবা-মাই শিশুকে সমাজের উপযুক্ত করে তৈরি করতে পারেন। বাবা-মা শেখান শিশুর কর্তব্য : সমাজের প্রতি, পরিবারের প্রতি। এই শিক্ষা পনেরো- ষোল বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করতে না পারলে পরে আর শেখানো যায় না। ভারতীয় সমাজে নিকট আত্মীয় স্বজন, মামা, কাকা, মাসি, মেসো, পিসি, পিসে, দাদু, দিদিমা সকলেরই একটা ভূমিকা আছে। এঁরা আদর দিয়ে শিশুর মাথা খেতে পারেন। আবার শিশুব সামনে উচ্চ আদর্শ তৈরি করতে পারেন। সুশিক্ষা দিতে পারেন। সুশিক্ষা অর্থে স্বাবলম্বী হবার শিক্ষা আর সহবৎ শিক্ষা।

এরপর আসে স্কুলের পরিবেশ। স্কুলে যদি শিশু শৃঙ্খলাপরায়ণ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও সাংস্কৃতিক চেতনাসম্পৃক্ত হতে না শেখে তাহলে স্কুলের শিক্ষা বৃথা। সেজন্য শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য শিশুকে ভাল স্কুলেই ভর্তি করা উচিত। কোন স্কুল ভাল? সেন্টমার্কা ইংরাজি মাধ্যম স্কুলগুলিই কী একমাত্র ভাল স্কুল? না তা নয়। ছেলেমেয়েদেব স্কুলে ভর্তির সময় প্রথমেই দেখতে হয় স্কুলে খেলাব মাঠ, আর ভাল লাইব্রেরি আর অ্যাসেমব্লি হল আছে কিনা। তারপর দেখতে হয় ওই স্কুলে মূল্যবোধ-শিক্ষাকে পড়াশোনার ওপরে স্থান দেওয়া হচ্ছে কিনা। এই স্কুলে যারা পড়ছে তাদের সঙ্গে কথা বলুন, বুঝতে পারবেন স্কুল কি শেখাচ্ছে।

২০০০ সালে বরাক উপত্যকার শ্রীকোণাতে ও.এন.জি.সি. চালিত একটি সেন্ট্রাল স্কুল দেখতে গিয়েছিলাম। দেখি স্কুলে ঢোকার মুখে আব্রহাম.লিঙ্কনের একটি চিঠি বড় বড়

করে লেখা আছে। লিঙ্কনের ছেলে যখন স্কুলে ভর্তি হয় তখন হেডমাস্টার মশাইকে তিনি একটি চিঠি দিয়েছিলেন। অসাধারণ ওই চিঠিটি আমাকে এত আকৃষ্ট করে যে আমি ওই চিঠির জেরক্স করে আমার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিলি করেছিলাম।

আমি মনে করি যদি কোন স্কুল এই চিঠি অনুসারে ছেলেমেয়েদের মূল্যবোধ শেখান তাহলে বুঝতে হবে ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব গঠনে ও মূল্যবোধ পরিবর্তনে তাঁরাই যথার্থ কাজ করছেন।

চিঠির ইংরাজি বয়ান ও তার বাংলা অনুবাদ এই বই-এর শেষে দিলাম। আমি অভিভাবকদের অনুরোধ করব এটি আলাদা করে লিখে ছেলেমেয়েদের পড়ার টেবলে রেখে দিতে।

পরিবার : মূল্যবোধের শেষ ইউনিট

সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন : একটা সমাজ তখনই ভালভাবে চলতে পারে যখন সমাজের সবাই সমাজের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে মানবে। কিন্তু সমাজের সব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে যে সবাই মানবে তা কোন সমাজেই হয় না। ভারতীয় সমাজে সবাই কী ভারতীয় মূল্যবোধ মেনে চলেন? ভারতীয় সমাজে মদ্য পরিবেশন কখনই সংস্কৃতির অঙ্গ নয়, কিন্তু আজকাল বহু পরিবারে কাউকে আমন্ত্রণ জানালে আগে তাকে মদ পরিবেশন করা হয়। বহু হিন্দু বাঙালি বিবাহিতা মহিলা সিঁথিতে সিঁদুর দেন না। পশ্চিমী সংস্কৃতি অনুসারে এদেশেও ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধ বাবা-মায়েদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিচ্ছে। কিছু কিছু পরিবর্তন ভালর জন্যই হয়। হওয়া দরকার। যেমন সমাজে বিধবা মহিলাদের স্ট্যাটাসের পরিবর্তন হচ্ছে। মেয়েদের বিয়ের বয়স বাড়ছে। মেয়েরা স্বনির্ভর হচ্ছে। বিবাহ বিচ্ছেদ স্বাভাবিক ঘটনা বলেই বিবেচিত হচ্ছে। মূল্যবোধের এইসব পরিবর্তন সমাজ পরিবর্তনের জন্য স্বাগত। কিন্তু অনেক ইতিবাচক মূল্যবোধও বহু পরিবার বর্জন করে। ঠাকুমা, দিদিমা, ঠাকুর্দা, দাদামশায় থাকলে নাতি-নাতনিরা প্রিয়জনের সান্নিধ্য পায়, পারিবারিক মূল্যবোধের ধারা প্রবহমান থাকে ও কোন প্রজন্মগত ব্যবধান গড়ে ওঠে না। ফলে ব্যক্তিত্বের মধ্যে পারিবারিক ঐতিহ্যবোধ ও গৌরববোধ অব্যাহত থাকে। সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনে অনেকখানি সাহায্য করে পারিবারিক মূল্যবোধ ও পারিবারিক সাংস্কৃতিক চেতনা।

একটি পরিবারের চিন্তাভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষা ওই পরিবারের ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়। প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে কী একই পরিবারের ভাইবোনদের মধ্যে একই মূল্যবোধ গড়ে উঠবে? উত্তর : ওঠার প্রবণতাই বেশি। যদি দেখা যায় ভাইবোন অন্তত পনেরো বছর পর্যন্ত পরিবারে রয়েছে এবং বাবা-মা সচেতনভাবে তাঁদের চিন্তাভাবনা অনুসারে পারিবারিক সংস্কৃতি শেখাচ্ছেন। তাহলে সেই মূল্যবোধ সন্তানে বর্তায়। ছেলেমেয়েরা যদি হস্টেলে মানুষ হয়, বাবা যদি বিদেশে থাকেন। মা যদি সময় দিতে না পারেন বা উদাসীন থাকেন তাহলে পরিবারের মূল্যবোধ সন্তানের মধ্যে সঞ্চারিত হয় না।

কী কী কারণে সন্তান পরিবারের দ্বারা প্রভাবিত হয় তা একবার দেখা যাক।

১. বাবা ও মায়ের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল তথা ক্রমাগত সংঘর্ষ।

২. বাবা-মায়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ।

৩. বাবা কিংবা মায়ের সঙ্গে পরিবারের নিকট আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সংঘর্ষ। ঠাকুমা ও ঠাকুর্দার সঙ্গে মায়ের বিবাদ। তাঁদের প্রতি মায়ের ক্রমাগত ঘৃণা ও বিদ্বেষ।

৪. বাবা কিংবা মায়ের কোন অসম্মানজনক কাজে জড়িয়ে পড়ে সম্মানহানি হওয়া। যেমন অবৈধ প্রেমে জড়িয়ে পড়া, মদ্যাসক্তি, দুর্নীতির দায়ে চাকরি খোয়ানো, গ্রেফতার হওয়া। বাবা-মায়ের চরিত্র সম্পর্কে অশ্রদ্ধা।

৫. বাবা কিংবা মায়ের অকালমৃত্যু।

৬. দারিদ্র্য।

উপরের ছটি কারণে পারিবারিক কোন ইতিবাচক মূল্যবোধ সন্তানেব ওপর প্রভাব বিস্তাব করতে পারে না। বরং সন্তানের ব্যক্তিত্বেব ওপর ওপরের ঘটনাগুলি আঘাত করে।

সুস্থ ও আদর্শ পারিবারিক জীবনেব শর্ত হল :

১. সন্তানের যতদিন পড়াশোনা শেষ না হয় ততদিন বাবা-মা উভয়ের কর্মক্ষম অবস্থায় বেঁচে থাকা।

২. প্রাচুর্য নয় পরিবারের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যই পারিবাবিক শান্তির অন্যতম সোপান।

৩. শৈশবে মায়ের নিরন্তর সান্নিধ্য অথবা মায়ের অভাবে ঠাকুমা, দিদিমার কাছে মানুষ হওয়া।

৪. শৈশবে দাসদাসীর হেফাজতে দীর্ঘক্ষণ না থাকতে হওয়া।

৫. উপযুক্ত সময় বিদ্যারম্ভ এবং ভাল ও সম্মানজনক স্কুলে পড়াশোনার সুবিধা।

৬. বাসস্থানে পর্যাপ্ত আলোহাওয়া ও ছুটোছুটি করাব মত পরিসর।

৭. নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা।

৮. প্রবণতা অনুসারে যেকোন কলা চর্চা (নাচ গান অঙ্কন)।

৯. সুষম খাদ্যাভ্যাস। সুস্থ শরীর।

১০. পড়ার বই-এর বাইরে অন্য বই পড়ার নিয়মিত অভ্যাস।

১১. বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রতিদিন বেশ কিছু সময় কাটানো। নানা ধরনের প্রশ্নের জবাব। শিশুব কল্পনা প্রসারিত করার জন্য রূপকথার গল্প শোনানো। মধ্যশৈশবে নানা অ্যাডভেঞ্চার ও কল্প বিজ্ঞানের গল্প বলা ও কৈশোরে ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে পাঠ করে বা গল্প বলে শোনানো।

১২. বয়ঃসন্ধিকালে যৌনশিক্ষা। বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণে বাধা না দেওয়া ও স্ত্রী-পুরুষের সমস্ত সম-অধিকার সম্পর্কে সচেতন করানো।

১৩. কোন বিশেষ সম্প্রদায়, ধর্ম ও ভাষাগোষ্ঠীকে হেয় করতে না শেখানো।

১৪. নিয়মিত সংবাদপত্র পাঠে উৎসাহ দেওয়া।

১৫. সংসার সম্পর্কে ধীরে ধীরে দায়িত্বশীল করে তোলা। পারিবারিক বিভিন্ন কাজকর্মে দায়দায়িত্ব দেওয়া। নিয়মিত সংসারের কাজকর্ম করানো। বাজার করা, দোকানপাট থেকে কিছু কেনা। হিসাবপত্র রাখতে শেখানো।

১৬. ছুটিতে বিভিন্ন শিবিরে পাঠানো। কম্পিউটারের ব্যবহার শেখানো। ইন্টারনেট ব্যবহার করতে শেখানো।

১৭ দেশপ্রেম শেখানো, সামাজিক মেলা মেশায় আদব-কায়দা শেখানো, বিনয়ী ও সং হতে শেখানো। চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ করার স্বাভাবিক প্রবণতায় বাধা দেওয়া। সেই সঙ্গে ছেলেমেয়েদের শেখানো তারা যেন এমন কোন কাজ না করে যাতে বাবা-মা এবং বংশের মুখে চূণকালি পড়ে।

বাড়িতে যেন পিতৃপুরুষের ফোটো থাকে এবং কোন শুভ কাজে যাবার আগে তারা যেন সেই ফোটোব কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেয়।

১৮ আত্মীয়-স্বজন পরিচিত গুরুজনদের অঙ্কেল, আন্টি, কাকু, জেঠু, মেসো, পিসি, দিদি, কাকিমা, জেঠিমা বলে সম্বোধন করা।

বাবা-মা রোল মডেল

খুব কম বাবা-মাই সচেতনভাবে ভাবেন যে তাঁদের সন্তানের ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁদের কোন বড় ভূমিকা আছে। তাঁরা ভাবেন ছেলেমেয়েদের ছোটোবলায় খেলনা কিনে দিলে, ভাল মন্দ খাওয়ালে আর একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করে দিলেই তাঁদেব কাজ শেষ হয়ে গেল।

ছেলেমেয়েরা জন্মাবাব পর যা শেখে তা সবই পরিবেশ থেকে। প্রথমটি হল গৃহ পরিবেশ। সবার আগে দেখা দরকার বাড়িতে শান্তি আছে কিনা। শান্তি নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক ও শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে পুত্রবধূর সম্পর্কে ওপর। কোথাও শ্বশুর-শাশুড়ির দোষে, কোথাও পুত্রবধূর দোষে বাড়িতে অশান্তি দেখা দিলে তার প্রভাব বাচ্চাদেব ওপর পড়ে। কোথাও বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া হতে থাকলে ছেলেমেয়েরা নিবাপত্তাব অভাবে ভোগে।

আমি একটি ২৪/২৫ বছরের ছেলেকে জানি। ছেলেটি পড়াশোনায় ভাল। তার ব্যক্তিত্বও খুব সুন্দর। কথাবার্তায় বেশ বিনয়ী।

কিন্তু গ্রুপের মধ্যে কাজ করতে গিয়ে তার ব্যক্তিত্বের অসঙ্গতি ধরা পড়ল। কযেকজন ছেলেমেয়ে এসে বলল : স্যার ওর সঙ্গে কাজ করা যায় না। ও হঠাৎ রেগে যায়। বন্ধুদের সঙ্গে যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে। নিজে যে কাজটা করবে সেটাই ঠিক মনে করে। কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে উধাও হয়ে যায়।

আমি ছেলেটিকে ডেকে তার ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা নিলাম। অনেক প্রশ্নও করলাম। জানা গেল তার বাবা-মায়ের মধ্যে সদ্ভাব নেই। ঝগড়া লেগেই থাকে। বাবা-মা কর্ম উপলক্ষে আলাদা আলাদা জায়গায় থাকেন। প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা ভাবে সন্দেহ করেন ছেলে বোধ হয় তাঁর চেয়ে অন্যের কথা বেশী শোনে। যেমন বাবা ভাবছেন, মা-ছেলের ওপর কর্তৃত্ব ফলাচ্ছে। মা ভাবছেন, ছেলে বোধহয় বাবার দিকেই চলে গেছে। ছেলেটি থাকে আর এক শহরে, বাবা-মা দুজনেরই আওতার বাইরে। তাতে করেই আরও সন্দেহ বেড়ে চলে। সেই থেকে ছেলেটির নিজের মধ্যে অস্থিরতা প্রায়ই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং মাঝে মাঝে ডিপ্রেসনে ভোগে। তখন হতাশা থেকে অগ্রাসনের সৃষ্টি এবং হীনম্মন্যতা থেকে শ্রেষ্ঠম্মন্যতা জাগে।

ছেলেমেয়ে যদি দেখে বাবা-মা তাদের বৃদ্ধ বাবা-মাকে বা গরিব আত্মীয়-স্বজনকে ঘৃণা

করছে বা হেনস্তা করছে তাহলে তারাও বৃদ্ধদের হেনস্তা করতে শেখে। মূল্যবোধের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের কাছ থেকেই পায়।

দেখা গেছে আমাদের দেশে ধনী ও উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা অতিরিক্ত মাত্রায়, স্নেহের পক্ষপুটে আচ্ছাদিত জীবন যাপন করে। তাঁরা ছেলেমেয়েদের কোথাও একা একা ছাড়তে চান না। মেয়েরা একুশ বছরের ওপরে হলেও অভিভাবক ছাড়া কোথাও বেরুতে পারে না। যার ফলে তারা একা একা চলতে শেখে না। জীবনে কোন চ্যালেঞ্জ নিতে শেখে না। অথচ প্রতিটি ছেলেমেয়ের মধ্যেই স্বাবলম্বী হবার প্রবণতা আছে, পরিবেশের সঙ্গে তারা মানিয়ে নিতেও পারে। কিন্তু সে সুযোগই তারা পায় না।

আমি যখন শিলচরে থাকতাম, তখন দেখতাম বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজের পড়া শেষ করে অনেক অভিভাবকই ছেলেমেয়েদের দিল্লি, মুম্বই, কলকাতায় জীবিকা অন্বেষণের জন্য পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তারা সেখানে অপরিচিত পরিবেশে কঠোর জীবন সংগ্রাম করতে করতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অনেক বাবা-মা বাইরে যেতে উৎসাহ দেন না। চাকরি বাকরি পেলে বড়জোর কর্মস্থলে পাঠাতে পারেন। বিশেষ করে অনেক মেয়ের ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাদের বাবা-মা একা একা দূরে পাঠাতে রাজি হন না। এর ফলে তারা আর বাইরে যেতে পারে না। আমি ইওরোপ, আমেরিকায় মেয়েদের একা একা একদেশ থেকে আর একদেশ করতে দেখেছি। তারা হয় দেশ দেখতে বেরিয়েছে না হয় চাকরি খুঁজতে। প্রতি বছর ইওরোপ থেকে হাজার হাজার মেয়ে ইংলন্ডে আসে শুধু ইংরাজি শিখতে। তারা একাই আসে।

একথা মনে করার কারণ নেই যে ইওরোপে মেয়েদের যথেষ্ট নিরাপত্তা আছে। অথবা সেদেশে রেপিস্ট বা লম্পট পুরুষের অভাব আছে। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখে মানুষ যত পড়বে ততই তার পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি বাড়বে।

আমার মেয়েও প্রটেকশনের মধ্যে একুশ বছর পর্যন্ত মানুষ হয়েছে। তারপর সে যখন একা একা মুম্বই পড়তে গেল তখন আমরা যথেষ্ট শঙ্কিত ছিলাম। কিন্তু দু'মাসের মধ্যে দেখা গেল সে সেখানে নানা রাজ্যের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে হস্টেলে বেশ মানিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয় তার পাঠ্যক্রম অনুসারে সে মুম্বইর স্ট্রিট চিলড্রেনদের নিয়ে কাজও করছে।

ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের কাছে উৎসাহ উদ্দীপনা পেলে তবেই ব্যক্তিত্ব বাড়াতে পারে। দিনকাল যে এখন বদলে যাচ্ছে; বিশ্বায়নের যুগে গোটা বিশ্বকেই আপন দেশ বানাবার মত মানসিকতা অর্জন করতে হবে।

আগেই বলেছি ব্যক্তিত্ব গঠনে বড় সাহায্য করে বাবা-মায়ের ভূমিকা। তাঁরা যা শেখাবেন ছেলেমেয়ে তাই শিখবে। আমার এক ছাত্র ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্য। তাদের অবশ্য পালনীয় নীতিতে আছে গুরুজনদের প্রণাম করবে। তাই তার দুই বাচ্চা ছেলেমেয়ে তাদের বাড়ি যাওয়া মাত্রই আমাকে টিপ টিপ করে প্রণাম করে। অথচ আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশের মধ্যে প্রণাম করার চল নেই। এমনকী বিজয়ার পরও আমার নিকট আত্মীয়ের ছেলেমেয়েরা আমায় প্রণাম করে না।

অনেক সময় বাবা-মায়ের শিক্ষায় কাজ হয় না, সেজন্য স্কুলের শিক্ষা চাই। কারণ ছেলেমেয়েদের ওপর শিক্ষকের প্রভাব বাবা-মায়ের চেয়ে বেশি। বাচ্চারা মিস যা বলে সেটিকে বেদবাক্য বলে গ্রহণ করে এবং ওই বয়সে শিক্ষিকা বা শিক্ষকের উপর তীব্র

আকর্ষণ বোধ করে। এজন্য ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষক শিক্ষিকারা বিপ্লব আনতে পারেন।

ভারতীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী বাবা-মা ও গুরুকে একই আসনে বসানো হয়েছে। গুরু সম্পর্কে যেমন বলা হয়েছে গুরু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সমতুল। তিনি জ্ঞানের আলো দিয়ে অজ্ঞানতার তিমির দূর করেন। তেমনি পিতা স্বর্গের সমতুল। পিতাই ধর্ম। পিতাকে সন্তুষ্ট করলে তবেই সমস্ত দেবতা সন্তুষ্ট হন। পিতা যেমন স্বর্গের চেয়ে বড়, মা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়। মা এবং জন্মভূমি স্বর্গের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে পিতৃতর্পণ করার যে বিধি আছে তা পৃথিবীর আর কোন সংস্কৃতিতে নেই। আগে বাবা-মাকে রোল মডেল করে সন্তানেরা বংশ পরম্পরায় পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করত। বংশগৌরব পিতৃগৌরব ও মাতৃগৌরবের মধ্য দিয়েই ব্যক্তির আত্মবিকাশের পথ প্রশস্ত হয়।

বাবা-মায়ের মধ্যে চুলোচুলি

আমেরিকায় অসংখ্য মানুষ পূর্বপুরুষকে জানার জন্য ইওরোপে পূর্বপুরুষদের গ্রামে বা শহরে ঘুরে আসেন। একে বলে শেকড়ের সন্ধানে অভিযাত্রা। তাঁদের পূর্বপুরুষ কত বছর আগে ইওরোপে ছিল। তাঁরা এখন আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত। তবু তাঁরা পিছনে ফিরে তাকান কেন? এই পিছনে ফিরে তাকানোর মধ্য দিয়ে মানুষের আত্মানুসন্ধানের অভিযাত্রা শুরু হয়। আন্দামানে গিয়ে দেখেছি সেখানকার বর্তমান প্রজন্ম গৌরবের সঙ্গে বলে আমার ঠাকুর্দার বাবা কয়েদী হয়ে এখানে এসেছিল। পিতৃপরিচয়ে লজ্জার কারণ নেই। আপনার পিতা যদি আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হন তাহলে গৌরব করুন। আর আপনি যদি আপনার পিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন তাহলেও গৌরব করুন। কারণ আপনি পিতাকে অতিক্রম করতে পেরেছেন আপনার পরিশ্রম ও অধ্যাবসায় দিয়ে। আত্মগৌরবই সুব্যক্তিত্বের প্রধান সোপান।

পরিবেশ প্রতিবেশী

পাড়া প্রতিবেশী পরিবেশের একটা অংশ। আপনি যদি এমন পাড়ায় থাকেন যেখানে দিনরাত বোমাবাজি হচ্ছে, ছেলেরা বেশির ভাগ সময় রোয়াকে বসে গুলতানি করছে মেয়েরা বাত্তির করে বাড়ি ফিরছে, মোড়ের মাথায় ইভটিজাররা বসে। রাতদিন মাইকে গান বাজছে তাহলে সেই পাড়ায় আপনার শিশুর ব্যক্তিত্ব ওই পাড়ার মতই গড়ে উঠবে। তদুপরি যদি আপনার প্রতিবেশীরা আপনার সমমর্মী না হন তাহলে সোনায় সোহাগা। ছোটবেলায় আমি এইরকম এক জঘন্য পরিবেশে মানুষ হয়েছি। আমাদের পাড়াতে ক্লাশ ফোর পর্যন্ত পড়া একজনও ছিল না। প্রতিবেশীরা ছিল অধিকাংশই দিনমজুর না হয় বেকার। তারা দিনরাত খিস্তিখেউড় করত। তাদের অনেকের বউরা অসচ্চরিত্র ছিল। এক বিধবার বাচ্চা হল। আর এক বিধবা এক ডাক্তারবাবুর রক্ষিতা ছিল। ডাক্তারবাবু রোজ সন্ধ্যার পর তাঁর রক্ষিতার কাছে আসতেন। আমরা দুটো অন্ধকার ঘরে কোনরকমে পরিবারের ছটি প্রাণী দিন কাটাতাম। ইলেকট্রিসিটি দূরে থাক বাড়িতে একটা ঘড়িও ছিল না। কলপাযখানা

গিফটেড চাইল্ড

ছিল না। এই ধরনের পরিবেশে পাড়ার কোন ছেলেরই লেখাপড়া হয়নি। আমি কী করে যেন জানি না, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ ডিঙিযে গেলাম। আমাব মত এই ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে থেকেও অনেকে শেষ পযন্ত পড়াশোনা চালিয়ে যায় শুধু মেধাব জোরে। আমি তো মেধাবী ছাত্রও ছিলাম না। কিন্তু খুব প্রতিকূল পবিবেশ থেকে মেধাবী ছাত্রও উঠে আসে। যেকোন স্কুলের প্রাইজ বিতরণ উৎসবে গেলেই দেখবেন বেশ কিছু গরিব ঘরের ছেলেও ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছে। এমন হয় জিনের প্রভাবে। হয়তো একটা মেধাবী জিন বংশধারা থেকে ছিটকে এসেছে। আমি যখন শিলচরে ছিলাম তখন আমার বাড়িতে যে মহিলা কাজ করতেন তিনি নিরক্ষর। তাঁর স্বামী নিরক্ষর। একছেলে রিকশা চালায়। বাড়িতে ভাল করে খাওয়া জোটে না। একটি ঝুপড়িতে গোটা পরিবাব

থাকে। কিন্তু তার একটি ছেলে ক্লাশে ফাস্ট সেকেন্ড হয়, এটা ওই জিনের প্রভাবেও হতে পারে। কিন্তু পরিবেশ তাকে যেটুকু দেয় সেটুকু হল স্কুল থেকে যেটুকু পাওয়া যায়। স্কুলের মাস্টারমশাইবা ব্যক্তিগতভাবে পরিবেশ গঠনে সাহায্য করতে পারেন। তাছাড়া স্কুলের বন্ধু-বান্ধব (Peer group) পরিবেশ গঠনে সাহায্য করে। এজন্য ছেলেমেয়েরা ভাল সংসর্গে মেলামেশা করছে কিনা সেটা দেখা দরকার। ভাল মাস্টারমশাইর হাতে পড়ছে কিনা সেটাও আবার দেখার। আমার ক্ষেত্রে আমার স্কুলের মাস্টারমশাইদের সান্নিধ্য ও ভাল ছেলেদের সান্নিধ্য আমাকে পরিবেশের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। আমি ফাস্ট সেকেন্ড বয়দের সঙ্গে মিশতাম। সৃজনশীল ছেলেরাই (সাহিত্য করে, নাটক করে, বই পড়ে) ছিল আমার বন্ধু। এছাড়া আমার জিনও আমাকে কিছুটা সাহায্য করেছে।

কিন্তু তাবলে পরিবেশের ছাপ কি ব্যক্তিত্বের ওপর একেবারে পড়েনি? নিশ্চয়ই পড়েছে। আমার অবচেতন মনে শৈশবের সেই পঙ্কিল পরিবেশ এমন গভীর রেখাপাত করে যে ভদ্র ও মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি আমার মনে একটা বিদ্রোহবোধ জন্মে গেছে। সেইসঙ্গে সমাজের নিচুতলার মানুষের প্রতি একটা সাযুজ্যবোধ আমার মধ্যে কাজ করে। তাছাড়া Shophistication আমাকে জোর করে আনতে হয়। এটি আমার সহজাত নয়। এছাড়া আমি ছোটবেলায় পরিবেশের প্রভাবে কিছু কুঅভ্যাস রপ্ত করে ফেলেছিলাম। আমি খিস্তিখেউড় শিখে ফেলেছিলাম। যদিও একমাত্র সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গেই খিস্তি করতাম।

পাড়া প্রতিবেশীদের কুপ্রভাব থেকে বয়স্করা নিজেদের রক্ষা করলেও করতে পারে। তাও এটা ফ্ল্যাটবাড়িতে সম্ভব। সেখানে পাশের ফ্ল্যাটের লোকের সঙ্গে কদাচ দেখা হয়। কিন্তু বাচ্চাদের তো আর ঘরে বন্ধ করে রাখা যায় না। আমার মনে আছে বাবা আমাকে কিছুতেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দিতেন না। আমিও বাধা মানতাম না। এজন্য বাবা প্রায়ই মারধর করতেন। আর তিনি যত মারতেন ততই আমার জেদ চেপে যেত।

সচেতন বাবা-মায়েরা আজকাল বাচ্চাদের ওপর এত প্রোগ্রাম চাপান যে তারা আর পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মেশার সুযোগ পায় না। নাচগানের স্কুল, জুডো বা ক্যারাটের ক্লাশ, ছবি আঁকার ক্লাস, সাঁতার শেখানো, ঠিক যেন স্পার্টার ছেলেমেয়েদের স্টাইলে তাদের মানুষ করা হয়। এগুলি ব্যক্তিত্ব গঠনে নিঃসন্দেহে সাহায্য করে। কিন্তু ছেলেমেয়েরা যদি সমবয়সীদের সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলাধুলা না করতে পারে তাহলে তাদের দেহ-মনের পরিপূর্ণতা আসে না। এখানে পরিবেশের সঙ্গে আপস করতেই হয়। কাচের ঘরে রেখে বাচ্চাদের মানুষ করাও অস্বাস্থ্যকর।

সাত

সংস্কৃতি : মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব

সংস্কৃতি হল Learned behaviour : দেখে দেখে শেখা আচার আচরণ প্রণালী। প্রত্যেক জাতিই কতগুলি বিশেষ আচার আচরণ প্রণালী রপ্ত করে। ওই আচার প্রণালী অনুসারে তারা পোশাক পরে, বাড়ি তৈরি করে, রান্নাবান্না করে, নাচগান বিনোদনের মধ্যেও একটা নিজস্ব রীতি তৈরি করে নেয়।

কোন জাতিই শুধু নিজের সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। অন্য জাতির সঙ্গে মেলামেশার ফলে সে অন্যের সংস্কৃতি ধার করে, চুরি করে অথবা অজান্তে গ্রহণ করে ফেলে।

আচার-আচরণের কথাই বলি: আমাদের কিছু আচার আচরণ আমাদের জন্মগত। সেগুলি কাউকে শেখাতে হয় না। তার নাম প্রবৃত্তি (Instinct)। আর যা শিখতে হয় তা হল সংস্কৃতি (Culture)। এই সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে নানা প্রথা (Custom)। চারুশিল্প (Art), কারুশিল্প (Artifact) থেকে শুরু করে কলাবিদ্যা (Art)। গানবাজনা নৃত্য নাটক ইত্যাদি সংস্কৃতির একটা অংশ আবার ছবি আঁকা প্রতিমা গড়াও একটা সংস্কৃতি। এককথায় সংস্কৃতির পরিসর ব্যাপক। একটি নরগোষ্ঠীর মধ্যে হয়তো একসময় প্রথা হিসাবে তার পত্তন হয়েছিল এখন তা সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন করমর্দন, কোটপ্যান্ট টাই, সকালে উঠে টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজা, খ্রীস্টমাস কার্ড পাঠানো এগুলি সংস্কৃতি হিসাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু কিছু কিছু সংস্কৃতি তা জাতির বা নৃগোষ্ঠীর (Ethnic group) একান্ত। এইসব সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে সঞ্চারিত হয় এবং সেগুলি যখন তার বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে যায় তখন পরিণত হয় মূল্যবোধে (Value)।[২৫] মূল্য মানেই Value। আমি মনে করছি এই সংস্কৃতিটি আমার নিজের পক্ষে, আমার পরিবার ও জাতির পক্ষে খুব মূল্যবান। এই বোধটাই মূল্যবোধ।

কয়েকটি উদাহরণ দিলে ধারণাগুলি স্পষ্ট হবে। ধরা যাক খাওয়া। সব জন্তু-জানোয়ারই খায়। স্তন্যপায়ী প্রাণীরা জন্মানো ইস্তক মাতৃদুগ্ধ পান করে। এটা তাকে শিখতে হয় না। এটা প্রবৃত্তি। কিন্তু যেই শিশু একটু বড় হল, নিজে নিজে খেতে শিখল, আপনি তাকে কাঁটা ও চামচে করে খাওয়া শেখালেন। এই কাঁটা চামচ হল সংস্কৃতি। আবার হিন্দুরা গোমাংস কিংবা মুসলমানরা শূকর মাংস খায় না। কারণ ধর্মে নিষিদ্ধ। ধর্ম অতি মূল্যবান। তার বিধানও মূল্যবান। এই ধারণা মূল্যবোধ। সাইবেরিয়ার কোরিয়াক উপজাতির মধ্যে পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত। এই বহুবিবাহ প্রথা তাদের জীবন সংস্কৃতিরই অঙ্গ। একজন কোরিয়াক নারী মনে করে যে নারী একাই এক পুরুষের সঙ্গে ঘর করে সে নারী অত্যন্ত

স্বার্থপর। স্বার্থপর নারীদের তারা নিন্দা করে। কোরিয়াক রমণী মনে করে পুরুষের বহু বিবাহের ফলে আখেরে তাদেরই লাভ হয়েছে বেশি। কারণ সপত্নীদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকলে ক্ষেতখামার ও সংসারের কাজের বোঝা কারও একার ঘাড়ে বেশি চাপে না। তাদের এইভাবে মনে করাটাই হচ্ছে মূল্যবোধ। সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ ব্যক্তিত্ব গঠনে অনেখানি সাহায্য করে। জাতিগত সংস্কৃতি এক জাতিগত সাংস্কৃতিক চিন্তার জন্ম দেয়। ইওরোপে পরিচ্ছন্নতা জাতিগত সংস্কৃতির অঙ্গ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিচ্ছন্নতার প্রতি ততখানি দৃষ্টি দেওয়া হয় না। একারণে ইওরোপে গেলে প্রথমেই এই পরিচ্ছন্নতা বোধ চোখে পড়ে।

খ্রীস্টধর্ম ইওরোপ থেকে এদেশে এসেছে বলে এই ধর্মের সঙ্গে পরিচ্ছন্নতা মিলেমিশে গিয়েছে। যেকোন একটি চার্চের প্রাঙ্গণে ঢুকুন, চার্চের ভেতরে ঢুকুন এই পরিচ্ছন্নতাবোধের স্বাক্ষর পাবেন। এই বোধ খ্রীস্টানদের ব্যক্তিগত জীবনেও এসে গেছে। সাঁওতালপল্লীতে গিয়ে দেখবেন খ্রীস্টান সাঁওতালদের ঘরবাড়ি, তাদের পোশাক আশাক অন্যদের থেকে একটু আলাদা।

মূল্যবোধ জাতিগত সংস্কৃতি থেকে আসে। স্পার্টানদের মধ্যে এমন মূল্যবোধ ছিল যে দেশের জন্য প্রতিটি স্পার্টান জীবন দেওয়ার জন্য তৈরি থাকত। প্রাচীন ভারতীয় মূল্যাবোধে নারীর কাছে পতিই ছিল পরম গুরু। ইওরোপীয় মূল্যাবোধে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বন্ধুত্ব + সেক্সের সম্পর্ক। এর বেশি কিছু নয়। প্রতিটি ধর্মই আবার কিছু কিছু মূল্যবোধ শেখায়।

হিন্দুধর্মের মূল্যবোধ যেমন সব ধর্মকেই উদার দৃষ্টিতে দেখা। কর্মফলের কথা না ভেবে শুধু কাজ করে যাওয়া। কারণ জন্মান্তর আছে। কর্ম অনুসারে স্বর্গ ও নরকবাস হয়। অনেকে বলেন, ভাগ্য ও পরলোকে অত্যধিক বিশ্বাসের জন্য হিন্দুদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মত ক্ষমতা জন্মায় না। তারা কপালে নেই বলে চুপ করে বসে থাকে। ছিনিয়ে নেবার জন্য লড়াই করে না।

আবার কোন ধর্মের মধ্যে যুদ্ধবাজ মনোভাব (Militancy) বড় হয়ে উঠলে সমাজজীবনে অস্থিরতা দেখা দিতে পারে। অন্য ধর্মাবলম্বীদের উৎখাত করাটাই যদি আমাদের প্রধান লক্ষ্য হয় তাহলে আমি আমার ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে গড়ার সময় কোথায় পাবো? জেহাদ করতে করতেই তো আমার মৃত্যু হবে। ইতিহাসে দেখা গেছে চিরস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা না হলে কোন জাতির বিকাশ ঘটে না। আর জাতির বিকাশ না হলে ব্যক্তির বিকাশ হবে কী করে?

ধর্মীয় মূল্যবোধ মানুষকে নবতর চেতনা দিতে পারে। গর্ববোধ এনে দিতে পারে। এক আধ্যাত্মিক ধারণায় ব্যক্তির মনকে পরিশীলিত করতে পারে। আবার ধর্ম হয়ে উঠতে পারে আফিমের মত। নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার উপকরণ মাত্র।

ধর্মের মৌল মূল্যবোধগুলি যুগপোযোগী করে না তুললে এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে তার যুক্তিসিদ্ধ পুনর্বিচার (Rationaliation) না ঘটালে ধর্মীয় অনুশাসন শেষ পর্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে দাঁড়ায়। এক এক ধর্ম যুগের মত করে মূল্যবোধকে সংস্কার করে নেয়। আবার ব্যক্তিও ধর্মমতের ঊর্ধে গিয়ে মূল্যবোধকে পরিবর্তন করে নেন। আবার অনেকে ধর্মের গোড়ামিকেই আঁকড়ে ধরেন।

ইসলাম ধর্মে চারটি স্ত্রী গ্রহণের বিধান আছে এবং আইনও সেইমত তৈবি আছে। কিন্তু ভাবতে অধিকাংশ মুসলিমই আর্থিক সঙ্গতি ও ধর্মীয় সমর্থন থাকা সত্ত্বেও এক স্ত্রী নিয়েই ঘর করেন। এখানে বাস্তব পরিস্থিতিকেই তাঁরা মেনে নেন।

ক্যাথলিকরা বলেন, জন্মনিয়ন্ত্রণ তাঁদের মূল্যবোধ বিরোধী। মা টেরেসার মত মহীয়সী নারীও অন্ধ ধর্ম দৃষ্টিকোণ থেকে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রচার করে গেছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বহু ক্যাথলিকই ব্যক্তিগত মূল্যবোধ থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। ব্যক্তিগত মূল্যবোধের দরুনই পাক-ভারত, বাংলাদেশ উপমহাদেশে বহু মানুষ আছেন যাঁরা নাস্তিক না হয়েও, আপন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে থেকেও অন্য ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ করেন। তাঁরা ধর্মকে মানবতার দৃষ্টি . . .থকেই দেখেন। তাঁরা জানেন : ধর্মের অপব্যাখ্যা মানুষকে পরমত অসহিষ্ণু করে তুলতে পারে। মৌলবাদী ধর্মপরিবেশে মানুষ হলে মানুষের ব্যক্তিত্বও অসহিষ্ণু ও সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে। ছোটবেলা থেকে যদি কাউকে শেখানো হয় অমুক ধর্মের লোকেরা তোমার শত্রু। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের নির্মূল করে অথবা তাদের তোমার ধর্মমতে নিয়ে আসতে না পারছ ততক্ষণ তুমি তোমার ধর্মের নির্দেশ পালন করছ না। এই মনোভাব থেকেই সাম্প্রদায়িকতার উৎপত্তি।

সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্ব বিধ্বংসী বোমার মত মানুষের দেহের ভেতর কাজ করে এবং শিক্ষা কিংবা আধুনিকতা তাকে কে প্রশমিত করতে পারে না। সে তখন ফ্যানাটিকে পরিণত হয়।

নীতি আশ্রয়ী ধর্মজীবন গভীর মূল্যবোধের সৃষ্টি করতে পারে। যেমন হিন্দু মূল্যবোধের একটা বড় অংশ গুরুজনদের প্রণাম করা। আমি যখন কোন সভাসমিতিতে পুরস্কার দিতে যাই তখন যারা পুরস্কার নিতে আসে তারা কেউ কেউ প্রণাম করে। কেউ করমর্দন করে, কেউ হাতজোড় করে নমস্কার করে, কেউ কিছুই করে না, আমি তাদের এই সৌজন্যবোধগুলি দেখে তাদের পারিবারিক মূল্যবোধের বিচার করি। যেসব বাবা-মা মূল্যবোধ সচেতন তারা তাঁদের সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই প্রণাম করতে শেখান। আজকাল অনেক বাবা-মাই এ ব্যাপাবে উদাসীন। তাঁরা ছেলেমেয়েদের কোন মূল্যবোধ শেখান না। এর ফলে তাঁদের সন্তানদের মধ্যেও এক ধরনের দাম্ভিকতা (Arrogancc) দেখা দেয়।

আমি রোজ মাকে প্রণাম করে স্কুলে ও কলেজে যেতাম। একজন ইংরেজের ছেলে এটা করে না। সে কী মাকে কম ভালবাসে? তা নয়। এটা তার মূল্যবোধের মধ্যে পড়ে না। বিবাহিতা বাঙালি হিন্দুমেয়েরা সিঁথিতে সিঁদুর দেয়। এটা তাদের মূল্যবোধ। এর সঙ্গে স্বামী তথা বিবাহিত জীবনের প্রতি একটি শ্রদ্ধাবোধ জড়িয়ে থাকে। এটি নারীব পরিপূর্ণতার চিহ্ন। কেননা, হিন্দুদর্শন অনুসারে নারীই গড়ে তুলতে পারে সুখের সংসার। স্বামী ও সন্তানেই তার জীবনের পরিপূর্ণতা। আমেরিকার মিসিসিপি নদীর তীরে রেডইন্ডিয়ানদের মধ্যে চেন্নি (Cheyennc) বলেএক উপজাতি আছে। তাদের মূল্যবোধ হল কেউ ব্যক্তিগতভাবে ঘোড়া এবং অস্ত্রশস্ত্র বাড়িতে মজুত রাখতে পারবে না। এগুলো বেশি হলেই সকলকে বিলিয়ে দিতে হবে। যে তার সম্পদ বিলিয়ে দিতে পারবে সমাজে তাব সম্মান হবে তত বেশি।[২৬] আমার এক ছাত্র ও সহকর্মী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের মন্ত্রে দীক্ষিত। এঁদের নিরামিষ খেতে হয় ও সন্ধ্যায় ইষ্টপ্রণাম করতে হয়। আমি দেখি তার গুজরাতি পত্নী ও দুটি বাচ্চাও এই বিধিনিয়ম মেনে চলে।

মেয়েদের বিয়ে হলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। কারণ প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব কতগুলি মূল্যাবোধও নিয়মকানুন ও আচরণ বিধি থাকে। নববধূকে সেগুলিকে আয়ত্ত করতে হয় এবং সে যত তাড়াতাড়ি এটা আয়ত্ত করতে পারে ততই তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে।

ভারতীয়দের সাধারণত একই জাতির মধ্যে বিয়ে হয় বলে সংস্কৃতিগত ব্যবধান এত তীব্র হয় না। কাজেই নতুন মূল্যবোধ গ্রহণ করতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না। কিন্তু ধরুন, একটি গুজরাতি মেয়ে এক বাঙালি পরিবারে এল, তাও আবার কট্টর ধর্মীয় পরিবারে। তাদের ছেলেমেয়েদের এই মূল্যবোধ গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় না কারণ তারা এর মধ্যেই জন্মেছে। কিন্তু স্ত্রীর ক্ষেত্রে এই রূপান্তর খুব সহজ নয়। তবু ভারতীয় মেয়েদের মানিয়ে চলার ক্ষমতা খুব বেশি। আন্তপ্রাদেশিক, আন্তধার্মিক ও আন্তর্জাতিক বিয়ের ক্ষেত্রে উভয় পরিবাবের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতাকে মেনে নিয়ে একটি নিরপেক্ষ অবস্থানে আসার মধ্যেও ব্যক্তিত্বের শক্তি নির্ভর করে। এটা কিন্তু সমঝোতার চূড়ান্ত পর্যায়।

মার পায়ে করি নতি পাঠশালা যাই

জাতিগত বিধি অনুসারে খাদ্যাভ্যাস ও পোশাক পরিচ্ছদ গড়ে ওঠে। এবং খাদ্যাভ্যাসও ব্যক্তিত্বকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

যারা নিরামিষাশী এবং যারা মাংস, পেঁয়াজ, রসুন ছাড়া খেতেই পারেন না তাদের উভয়ের ব্যক্তিত্ব আলাদা হতে বাধ্য। নিরামিষাশীদের গায়ে জোর নেই একথা বলা যায় না আমিষ আহারীদের মত তাদের অনেকে অল্পতেই উত্তেজিত হয়ে মার-দাঙ্গা বাধায়। শারীরিক কারণে নিরামিষ আহার অধিকতর গ্রহণযোগ্য। তাতে অসুখ-বিসুখ কম হয়। দেহ ও মনের ওপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটায় না। পশ্চিমেও বহু মানুষ এখন স্বেচ্ছায় নিরামিষাশী হচ্ছেন। আমাদের ভারতীয় মূল্যবোধে নিরামিষ আহার সাত্ত্বিক আহার বলে পরিচিত।

ঈশ্বর ও ব্যক্তিত্ব

আমি অনেক ছেলেমেয়ের দেখা পাই যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। আমি ব্যক্তিগতভাবে ধর্মবিশ্বাসী কিন্তু ধর্মপরায়ণ নই অর্থাৎ প্র্যাকটিসিং নই। খুশবন্ত সিং বলেন, কাজই পুজো, আমিও তাই মনে করি। খুশবন্ত আরও বলেন কিন্তু পুজো কাজ নয়। আমি অত বড়

কথা বলি না, যার অন্য কাজ নেই, তিনি স্বচ্ছন্দে পুজো আচ্চায় সময় কাটাতে পারেন। পরনিন্দা, পরচর্চা, টি.ভি. সিরিয়াল দেখা বা মনমরা হয়ে বসে থাকার চেয়ে পুজো-আর্চা, নামাজ, প্রার্থনা অনেক অর্থপূর্ণ কাজ। কারণ এর ফলে ব্যক্তিত্বে একটা প্রসন্নতা আসে। ধর্মের ভাণও ভাল। এটাও পরিবেশের মধ্যে পড়ে। ঠাকুরঘর, মন্দির, মসজিদ, গির্জার পরিবেশ মনের ওপর একটা প্রভাব বিস্তার করে। বেলুড় বা দক্ষিণেশ্বরে যদি যান, তাহলে অতি বড় অবিশ্বাসী হলেও দেখবেন কিছুক্ষণের জন্য মনটা প্রসন্ন হয়েছে। এটিকে বিনোদন হিসাবেও দেখা যেতে পারে। আমাকে মস্কোতে এক রুশ তরুণী (তিনি তখন পার্টির সক্রিয় কর্মী) বলেছিলেন। আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, কিন্তু গির্জায় গিয়ে দেখেছি মনটা ভাল হয়ে যায়।

আসলে ব্যক্তিত্বের ইতিবাচক দিকগুলিকে যা সমৃদ্ধ করে তোলে সেই সব আচরণ ব্যক্তির পক্ষে স্বাগত। কিন্তু যদি দেখেন ঈশ্বরে অবিশ্বাস করেও আপনি ভাল আছেন, তাহলে কী দরকার ভগবানকে ডেকে? আপনি যদি একা একাই চিনে যেতে পারেন তবে অনর্থক আর একজনের সাহায্যের দরকার কী? তবে নাস্তিকদেরও সাবধান হতে হবে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না বলে স্নেহ, প্রেম, দয়া, মায়া, সভ্যতা, ভব্যতা, মূল্যবোধ কিছুই বিশ্বাস করি না এই প্রবণতা যেন তৈরি না হয়ে যায়। যুক্তিবাদীর ব্যক্তিত্ব পুরোপুরি মানবতাবাদী ব্যক্তিত্ব। বিদ্যাসাগরমশাই ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না অথবা ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন। অন্তত পুজোআচ্চা করতেন না। তিনি পুজো করতেন মানুষের। যুক্তিবাদীরা বিদ্যাসাগরকে অনুসরণ করতে পারেন। আমি তো মনে করি কোটি কোটি বছর ধরে তৈরি হওয়া এই মহাবিশ্বে মানুষের জীবনের মেয়াদ অতি স্বল্পকালের। এটি বিশেষভাবে উপলব্ধি করবেন আমার মত ষাট অতিক্রম করলে। তখন তারাশঙ্করের কবির বসনের মত মনে হবে 'জীবন এত ছোট কেনে?' কিছুই করতে পারলাম না। আবার যদি আর একটা জীবন ফিরে পাই তখন দেখা যাবে। (এই জন্যই বোধহয় সব ধর্মে জন্মান্তরের কল্পনা)। সুতরাং এই স্বল্পজীবনের মধ্যে বেঁচে থাকার সার্থকতা হল নিজেকে নির্মল রেখে বেঁচে থাকা। জীবন হবে বহতা নদীর মত সব সময়ই চলমান। তাহলে দৈনন্দিন জীবনের যত ক্লেদগানি স্রোতের টানে ভেসে চলে যাবে। জল থাকবে স্বচ্ছ নির্মল, নদীখাত রইবে গভীর তা থেকে অজস্র জল পানের জন্য নিলেও তা তেমনই পূর্ণ রইবে। কারণ উপনিষদ আমাদের শিখিয়েছে পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে।

এক একটি মানুষ যেমন এক এক ভাবে পরিবেশের সঙ্গে মোকাবলা করে তেমনি এক একটি জাতি জাতিগতভাবে পরিবেশের সঙ্গে এক একরকম ভাবে মোকাবেলা করে।

ইতিহাস ঘাঁটলেই এর অজস্র নমুনা পাওয়া যাবে। ইংরেজ, ফরাসি, পর্তুগিজ, ডাচ ও দিনেমাররা প্রায় একই সময় ভারতে এসে ঘাঁটি গেড়েছিল। কিন্তু তাদের সবাইকে হটিয়ে ভারতীয়দের মাথায় টুপি পরিয়ে ইংরেজরা সুকৌশলে গোটা দেশটা কবজা করে নিল কী করে? কারণ ইংরেজদের ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মোকাবেলা করার কায়দা অন্যদের থেকে আলাদা।

প্রজাতিগতভাবে সব মানুষ এক। শাদা-কালো-বাদামি রঙের নিচে সব মানুষই যে সমান তা সবাই জানে। কিন্তু তাহলেও জাতিগতভাবে মানুষ মানুষে এত কোয়ালিটির তফাৎ হয় কী করে? প্রত্যেক মানুষের যেমন আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে তেমনি জাতিগতভাবে

প্রত্যেক জাতির একটি আলাদা ব্যক্তিত্ব আছে। সেটা গড়ে ওঠে ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, খাদ্যাভ্যাস ও সাংস্কৃতিক চেতনার ফলে। সামগ্রিকভাবে পশ্চিমের মানুষদের অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয়তা ভারতীয়দের চেয়ে বেশি। তারা ছোটবেলা থেকে ঝুঁকি নিতে শেখে, স্বাবলম্বী হতে শেখে। ইওরোপ, আমেরিকার একটি ছেলে বা মেয়ে জানে, তার যেই আঠারো বছর বয়স হয়ে যাবে আর তাকে বাবা-মা ভরণ পোষণ করবে না। তখন তাকে একা চালাতে হবে। তার রক্তে রয়েছে অজানাকে জানার আকুল আহ্বান। আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের শৈশব দশা কাটতেই চায় না। বাবা-মা যতদিন পারে ছেলেমেয়েদের চোখে চোখে রাখার চেষ্টা করে। এসব কারণে দেশের জন্য সমাজের জন্য জীবন দেবার লোক কমে যাচ্ছে। প্রমাণ সেনাবাহিনীতে কয়েক হাজার অফিসারের পদ খালি পড়ে আছে। রামকৃষ্ণ মিশন সন্ন্যাসীর অভাবে তাঁদের কাজকর্ম সম্প্রসারিত করতে পারছে না। ইওরোপে এখনও এমন দৈন্যদশা হয়নি।

আমরা কম কাজ করে অথবা কাজ না করে বেতন চাই। যারা কাজ করে তাদের সমালোচনা করে হতোদ্যম করে তুলি। অথচ সেই আমাদেরই উৎপাদনশীলতা, আন্তরিকতা, পরিশ্রম করার ইচ্ছা বেড়ে যায় বিদেশে গেলে। এইসব নিয়ে আমাদের জাতিগত একটা ভাবমূর্তি তৈরি হয়ে গেছে। এই ভাবমূর্তিই আমাদের জাতিগত ব্যক্তিত্ব। এই ব্যক্তিত্বকে আপনি আবার ছোট ছোট ভাগে ভাগ করতে পারেন। ভারতীয়দের আপনি ভাষাগত জাতি-গোষ্ঠীতে ভাগ করতে পারেন। বাঙালি, পাঞ্জাবি, গুজরাতি, মারাঠি ইত্যাদি আবার তাদেরও জেলাওয়ারিভাবে ভাগ করতে পারেন। এইভাবে ভাগ হতে হতে পারিবারিক ব্যক্তিত্বে এসে পৌঁছন যায়। তখন দেখা যায় একটি পরিবার আর একটি পরিবার থেকে কত আলাদা।

আপনারাই তখন বলেন, এই পরিবারের সবার সঙ্গে আলাপ হল। পরিবারটি শিক্ষিত এবং বেশ ভদ্র। প্রত্যেক পরিবারে একটি পারিবারিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠে এবং মজার কথা হল, ওই পরিবারে বিয়ে হয়ে যেসব বউরা আসে তারাও কিছুদিন পরে ওই পারিবারিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়। এখন কোন পরিবার যদি বংশ-পরম্পরায় একটা পারিবারিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে পারে। তাহলে পরিবারের সবাইকার ব্যক্তিত্বের মধ্যে ওই মূল্যবোধ সঞ্চালিত হয়।

যখন আমরা ভারতীয় ব্যক্তিত্ব বলি, তখন সে ব্যক্তিত্ব নিশ্চয়ই এক ইংরেজের ব্যক্তিত্ব থেকে আলাদা। আমরা যখন বলি, ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্ব ঠিক সাহেবের মত। এটা ইংরেজদের জাতীয় ব্যক্তিত্বের একটা স্টিরিওটাইপ। স্টিরিওটাইপটা কী? মনে মনে একজন ইংরেজের ছবি কল্পনা করুন। প্রথমেই দেখবেন উনি পোশাকে আশাকে নিখুঁত। তারপর দেখুন, উনি মিতভাষী। অপরিচিতর সঙ্গে গায়ে পড়ে আলাপ করেন না। সময় সম্পর্কে খুব নিখুঁত। পাঁচটায় যাবো বললে পাঁচটাতেই যাবেন। অকারণে হই-হট্টগোল করবেন না, কিন্তু পার্টিটার্টি হলে একচোট ফুর্তি করে নেবেন। খাওয়া দাওয়াও ঘড়ি ধরে। খাদ্যাভ্যাসও সাদামাঠা। দু'তিনটে পদ হলে খাওয়া হয়ে গেল।

আমি ইংরেজ পরিবারে বেশ কিছুদিন বাস করেছি। মোটামুটি একজন ইংরেজের জাতীয় চরিত্র সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছে। ভারতীয়দের সঙ্গে ইংরেজদের জাতীয় চরিত্রে যথেষ্ট তফাত। তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ভারতীয় ইংরেজদের মত ভাল গুণ আয়ত্ত করেছেন।

বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব তুলনার সময় বলা হয় বিদ্যাসাগর বাঙালি হয়েও ইংরেজ আর মধুসূদন ওপরে সাহেব ভেতরে বাঙালি। আমার কর্মজীবনে আমি এক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিব সংস্পর্শে এসেছিলাম। তিনি কলকাতার শেরিফ হয়েছিলেন। তাঁর নাম এস.সি. রায়। এঁকে আমি সাহেব বলতাম, কারণ সাহেবদের অনেক গুণ তাঁর ছিল যেমন, সময়ানুবর্তিতা, উদারতা, গুণীর গুণের সমাদর করা, কথা দিয়ে কথা রাখা। এঁরই সহায়তায় নিকো হাউসে আমি ১৯৫৫ সালে একটি এন.জি.ও তৈরি করি। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সেন্টার ফর মাস কমিউনিকেশন স্টাডিজ। আমার কয়েকজন সহকর্মী পিছনে লেগে সেই চালু সংস্থাটি বন্ধ করে দেয়। মিঃ রায়কে তারা অনেক চাপ দেয়, যাতে তিনি আমার সংস্থাটি তাঁর নিকো হাউস থেকে তুলে দেন। অধিকাংশ ভারতীয় কানপাতলা, কিন্তু এস.সি. রায় কারও কথা শোনেননি। শেষদিন পর্যন্ত আমার কাজে সাহায্য করেছেন। এরকম ব্যক্তিত্ব আমি শুধু ইংরেজদের মধ্যেই দেখেছি। আমি ৭০ শতাংশ ভারতীয় ব্যক্তিত্বকে দেখেছি যাঁদেব পরের মুখে ঝাল খাওয়া অভ্যাস।

ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে যেমন সুস্থ ব্যক্তিত্বের বহু মানুষ আছেন তেমনি ইংরেজদের মধ্যে বহু খারাপ ইংরেজ আছে। রবীন্দ্রনাথ ছোট ইংরেজ ও বড় ইংরেজদের কথা বলেছেন। সেটা অবশ্য একই ইংরেজের দুটি চরিত্র দেখে অথবা ভারতপ্রেমিক উদার বহু ইংরেজকে দেখে। ছোট ইংরেজ সাম্রাজ্যলোভী, সাম্প্রদায়িক, জাতিবিদ্বেষী। তাদের ধর্মও সম্প্রসারণবাদী। ছোট ইংরেজ মনে করে হিদেন হিন্দুজাতি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। অজ্ঞানতিমিব অন্ধকার দূর করার জন্যই তাদের খ্রীস্টান বানানো দরকার। একথা একশ্রেণীর ইসলামি শাসকরাও ভাবত। ভারত আক্রমণের সময় ধর্মান্তর করার জন্য তারা উলেমাদের সঙ্গে কবে নিয়ে আসত।

কিন্তু এবাই তো সবাই নয়। আবার সে সময় যে সামাজিক ও রাজনৈতিক পবিবেশ ছিল তখন ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ সমাজ দেহে দানা বাঁধেনি। সামাজিক বাতাবরণের মধ্যে সহিষ্ণুতা ছিলই না। উনিশ শতকের বাংলার রেনেশাঁস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সামাজিক পরিবেশের মধ্যে যথেষ্ট পরিবর্তন আসে। এখন একুশ শতকে সামাজিক ধ্যানধারণাব যুগান্তকারী পরিবর্তন হয়েছে। তাই এখনকার প্রজন্মের জাতীয় ব্যক্তিত্ব আগের প্রজন্ম থেকে আলাদা। এখন জাত-পাত অস্পৃশ্যতা নিয়ে ছেলেমেয়েরা মাথা ঘামায় না। ধর্ম সম্পর্কেও গোঁড়ামি অনেক কমে গেছে। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে নিরীশ্বর অথবা ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। ধর্ম ও রাজনীতির চেয়ে জীবিকা সম্পর্কেই তারা বেশি সচেতন।

পাশাপাশি পরিবেশ তাদের মনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে। যেমন মৌলবাদীদের কাজকর্ম প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যাচ্ছে। তারা নানাভাবে বহু ছেলে মেয়েকে প্রভাবিত করছে। জাতপাতবাদী রাজনীতিকরাও তাদের প্রভাব প্রাণপণে বাড়াতে চাইছে। রাজনৈতিক দলগুলি তাদের অনুদার, সংকীর্ণমনা ও নিষ্ঠুর হতে শেখাচ্ছে। সিনেমা শেখাচ্ছে গায়ের জোর বাড়িয়ে কুংফু কিংবা ক্যারাটে লড়তে না শিখলে সুন্দবী নারীর সঙ্গে প্রেম করা যায় না।

জাতীয় ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এক একটি এথনিক জাতিগোষ্ঠী কোনও একটা বিশেষ বিদ্যা বা গুণে পারদর্শী হয়ে ওঠে। এটিকে জিনের প্রভাব বলা যেতে পারে। যেমন কোন জাতি কোনও কোন বিশেষ খেলাধুলায় পারদর্শী। বিশ্ব প্রতিযোগিতায় প্রতিবারই তারা শ্রেষ্ঠ পুরস্কারগুলি ছিনিয়ে আনে। কোন জাতির মধ্য থেকে ডাক্তার ও বিজ্ঞানী

বেশি করে তৈরি হয়। কোন জাতি ব্যবসায়ে বুৎপত্তি দেখায়। এইভাবে কোন জাতি ভাল যুদ্ধ করে, কোন জাতি চট করে দক্ষ কারিগর হয়ে উঠতে পারে। তবে যেসব কাজে জন্মগত প্রতিভার দরকার হয়না সেসব কাজ শেখার অনুকূল পরিবেশ যাদের আছে তারাই সেসব কাজে চটজলদি দক্ষতা অর্জন করে। গুণ, কর্ম, বিভাগ অনুসারে প্রাচীনভারতে যে বর্ণাশ্রম তৈরি হয়েছিল সেটিও ব্যক্তির ওপর জিন ও পরিবেশের কথা মাথায় রেখে। কেউ যদি বংশানুক্রমিকভাবে কোন বিদ্যাচর্চা করে তাহলে দেখা যায় বংশ পরম্পরায় নৈপুণ্য ও প্রবণতা জিনের মধ্য দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে সঞ্চারিত হতে পারে এবং সেই সঙ্গে পরিবেশ তাকে আরও দক্ষ হতে সাহায্য করে। কিন্তু শতশত বছর ধরে বিভিন্ন জাতির মধ্যে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটায় এখন কমক্ষেত্রেই রক্তের বিশুদ্ধতা বজায় আছে। তাছাড়া সার্বজনীন শিক্ষা, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সবার জন্য সমান সুযোগ দানের ফলে উপযুক্ত পরিবেশে নৈপুন্য সবাই অধিকার করতে পারে। আমেরিকায় কৃষ্ণাঙ্গরা, ভারতে তফসিলি সম্প্রদায়ের মানুষেরা এখন ধীরে ধীরে এমনসব পেশায় আসছেন যেটি আগে মনে হত শ্বেতাঙ্গ বা উচ্চবর্ণের মানুষেরা ছাড়া পারবেন না।

তর্পণ

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে ভারতের রাষ্ট্রপতি আর. কে. নারায়ণন জাতিতে একজন তফশিলি কিন্তু তিনি এমনসব গুরুত্বপূর্ণ পদে কৃতিত্বের সঙ্গে কাজ করে এসেছেন যেখানে মনে করা হত শুধু উচ্চবর্ণের লোকেরাই এসব কাজ পারে। নিত্যনতুন বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে এখন নানা সুযোগ আসছে এবং সুযোগ গ্রহণ করার পর প্রমাণিত হচ্ছে পরিবেশের প্রভাবে সব জাতির মানুষই কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। তা নাহলে মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে আমেরিকায় নিগ্রোরা সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রেই এত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করতে পারত না। দেখা গেছে আমেরিকায় বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে ভারতীয় ও চীনারা। ভারতীয়রা আমেরিকার বিজ্ঞানীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। ব্যবসাতেও তারা অগ্রণী। ইংলন্ডের হাসপাতালগুলিতে তো ভারতীয় ডাক্তাররা বড় একটা জায়গা দখল করে আছে।

দেখা যাচ্ছে উপযুক্ত পরিবেশে ব্যক্তিত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। এমনকি কোন জাতির মনোপলিকে অন্য জাতি চেষ্টা করলে ভেঙে দিতে পারে।

আট

ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ

মনোবিদরা মনঃস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের সময কোন একটা সময়কে আলাদা কবে দেখেন না। তাঁব শৈশব থেকে বযঃসন্ধি, যৌবন, প্রৌঢত্ব, বার্ধক্য পর্যন্ত কালানুক্রমিক বিচার করেন। মনঃস্তত্ত্বেব ভাষায় একে বলা হয জীবন ব্যাপ্তিব ক্রমবিকাশ : Life Span Development ব্যক্তিত্ব বিকাশের সঙ্গে মানুষেব শৈশব অনুষঙ্গ, বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতা, যৌবনের অনুভূতি, উত্তর যৌবনের বিষাদ পর্ব ও বার্ধক্যের আত্মপোলব্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কেননা এগুলি তার ব্যক্তিত্ব গঠনে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

তবে উন্নয়নমূলক মনস্তত্ত্ব বা Development Psychology মুখ্যত শৈশব ও বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তির আচরণের ওপর নির্ভরশীল। এই শৈশব ও বয়ঃসন্ধির বিশ্লেষণ দিয়েই ফ্রয়েড ১৯০৫ সালে তাঁর মনোবিশ্লেষণ তত্ত্ব প্রকাশ করে হইচই ফেলে দেন। পরবর্তীকালের মনোবিদরা কেউ কেউ ফ্রয়েডের সঙ্গে একমত হননি, কেউ তাঁর তত্ত্বকে সংশোধন করেছেন। তবে মনোবিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড যে পথপ্রদর্শক একথা কেউ অস্বীকার করেননি। কেভিন ডি. ব্রাউন ও ক্লাইভ আর. হলিন (Kevin D Browne and Clive R Hollin) তাঁদের এক প্রবন্ধে জীবনব্যাপ্তির একটি কালানুক্রমিক তালিকা করেছেন। এটি করা হয়েছে একজন ইংরেজের জীবনপঞ্জী অনুসারে। মনে রাখতে হবে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মনেব সুপরিণতি যেমন ব্যক্তিবিশেষেব ওপব নির্ভর করে, তেমনি নির্ভর করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উপর। যেমন ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের Maturity তাড়াতাড়ি আসে। পশ্চিমদেশে ছেলেমেয়েরা চোদ্দ-পনের বছব থেকেই যৌনজীবন সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে। আমাদের দেশে ওই বযসে অনেকেই অজ্ঞ থাকে। আমাদেব দেশে যৌনশিক্ষা বলে কিছু নেই। একমাত্র মেয়েরা বিয়ে হলে অন্য বিবাহিত বান্ধবী বা নিকট আত্মীয়ার কাছ থেকে রতিক্রীড়ার কিছু পাঠ নেয়। মেয়েবা তবু মায়ের কাছ থেকেও কিছু শিক্ষা পায়। কিন্তু বাবা যৌনশিক্ষার ব্যাপারে ষোড়ষবর্ষেও পুত্রের সঙ্গে মিত্রের মত [illegible]রণ করেন না।

কিন্তু [illegible]র তত্ত্ব মানতে গেলে যৌনচেতনা মানুষের সহজাত। শিশুঅবস্থা থেকেই সে এই [illegible] নিয়ে জন্মায়। তাহলে যৌনজীবন নিয়ে এত ঢাকঢাক গুড়গুড় কেন? শৈশব থেকেই এই চেতনা শিশুর মনে আপনা আপনি জাগে। সব ছেলেমেয়ে বয়ঃসন্ধিকালে নিজের অজ্ঞাতেই যৌন সচেতন হয়ে ওঠে। এখন বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে যৌনসঙ্গম করার প্রক্রিয়া সে শিক্ষার অভাবে নাও জানতে পারে অথবা প্রচলিত সামাজিক রীতির বিরুদ্ধ বলে আমাদের দেশে প্রাকবিবাহ যৌনমিলন সম্ভব নাও হতে পারে। এর সুযোগও কম

আমাদের দেশে। কিন্তু তাই বলে অবচেতন মন থেকে কাম দূর হয়ে যায় না। ফ্রয়েড বলেছেন, মানুষের ব্যক্তিত্ব তার অবচেতন মনের কামতাড়না থেকেই উদ্ভূত।

ফ্রয়েডের তত্ত্বে পরে আসছি তার আগে ব্রাউন ও হ্যালনের তৈরি জীবনের কালপঞ্জীটির দিকে একবার দেখা যাক। এখানে দেখবেন মনুষ্যজীবনকে মোট চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি স্তরেই ব্যক্তিত্বের কিছু না কিছু পরিবর্তন হয়। কারণ মনের বয়সের পরিবর্তন আচার আচরণ ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব ফেলে। শৈশবে যা ভাল লাগে, যৌবনে তা ভাল লাগে না। তার আচরণ বদলায়, চিন্তাভাবনা বদলায়, ব্যক্তিত্ব বদলায়।

মানুষের জীবনপঞ্জী

বয়স

০ ভ্রূণ অবস্থা থেকে জন্ম।

৫ স্কুলে প্রবেশ। (আমাদের দেশে এখন তিন বছর থেকে ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। এটি মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়।)

১০ বয়ঃসন্ধি (যৌন বিষয়ে আগ্রহ। আমাদের দেশে এটি আসতে ১২ বছর হতে পারে।)

১৬ সামাজিক চেতনার বিকাশ। এই বয়স থেকে ছেলেমেয়ে ভাবতে শুরু করে তারা সমাজেরই একজন।

১৮ স্কুল ত্যাগ, ভোটাধিকার প্রাপ্তি।

২০ পেশা বা চাকরিতে যোগদান। (আমাদের দেশে ড্রপ আউট না হলে ছেলেমেয়েরা আরও তিন বছর অন্তত পড়াশোনা করে)। চাকরি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেমেয়েরা বাড়ি থেকে চলে গিয়ে আলাদা থাকে। (আমাদের দেশে কর্মস্থল যদি একই শহরে (Home town) হয় তাহলে অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের সঙ্গেই থাকে।)

৩০ বিয়ে। চাকরির পরিবর্তন। স্বামী-স্ত্রী জীবন শুরু। সন্তানের জন্ম। প্রমোশন, সামাজিক সম্পর্কের পরিবর্তন। নতুন নতুন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ।

৪০ বিবাহ বহির্ভূত প্রেমের সম্পর্ক ও পরিণামে ডিভোর্স। (এটি পশ্চিমী সমাজ অনুসারে ঘটনা। অধিকাংশ বিবাহ বিচ্ছেদ এই বয়সে হয়ে থাকে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশেও ৪০-এর পর বিবাহিত নরনারীর আর পরস্পরকে অত ভাল লাগে না। তখন পরস্ত্রী বা পরস্বামীর প্রতি অনেক ক্ষেত্রেই অনুরাগ জন্মাতে থাকে। সর্বত্র এই অনুরাগ বিবাহ বিচ্ছেদে পরিণত হয় না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ শিথিল হয়ে যায়।

৫০ মেয়েদের মনোপজের সময়, মেজাজের পরিবর্তন। পুরুষের জীবনে কিছুটা হতাশা। আরও বেশি করে অফিসের কাজে বা ব্যবসায়ে মনোনিবেশ। ছেলেমেয়ের পড়াশোনা শেষ। তাদের বাইরে চলে যাওয়া। নিঃসঙ্গতা। সম্ভাব্যক্ষেত্রে মেয়ের বিয়ে।

৬০ ছেলের বিয়ে। কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর অথবা রিটায়ার করে নতুন কর্মগ্রহণ। শারীরিক অসুস্থতার শুরু। সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা। দূর ভ্রমণের ইচ্ছা। ভারতীয় জীবনে আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ধর্মপরায়ণতা।

৭০ স্বাস্থ্যের আরও অবনতি। স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু। বিপত্নীক জীবন বা বৈধব্যের নিঃসঙ্গতা।

৮০ মৃত্যু।

মানুষের জীবন বিকাশ তত্ত্বের ক্ষেত্রে (Development Theory) ফ্রয়েডের মতবাদ যে পুরোধা সে কথা আগেই বলেছি।

ফ্রয়েড বলেছেন, পাঁচ বছর বয়সের মধ্যেই মানুষের মৌলিক ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়ে যায়। তারপর যতই বয়স বাড়ুক না কেন, ব্যক্তিত্বের আর মৌলিক পরিবর্তন হয় না।

যা করতে মন চায়

ফ্রয়েডের মতে মানুষের সমস্ত আচরণ নির্ধারিত হয় প্রণোদন বা মোটিভেশনের দ্বারা। মোটিভেশন মানে যা করলে মনে সন্তুষ্টি আসে, বাসনার নিবৃত্তি হয়। আমি এমন কাজই করব যা করে আমার বাসনার নিবৃত্তি হবে। আমি বই লিখি আত্মসন্তুষ্টির জন্য। আমি মাস্টারমশাইর মত একটা গুরুগম্ভীর বিষয় সাধারণের কাছে ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছি অথবা কতগুলি চরিত্রের মধ্য দিয়ে নিজের কিছু কথা বলছি। এটাই আমার আত্মসন্তুষ্টি। এই বাসনা আমার চেতন মনেও থাকতে পারে অথবা অবচেতন মনেও থাকতে পারে। অবচেতন মনে থাকলে বুঝতেই পারতাম না কেন লিখি। তখন একটা মনগড়া ব্যাখ্যা দিতাম। ফ্রয়েড আচরণ বলতে বাইরের আচরণ ও ভেতরের আচরণ উভয়কেই বোঝাচ্ছেন। অনেক সময় আমি যে পেন্সিলটা কামড়ে ধরি অথবা চট করে একটা অতি পরিচিত নাম মনে রাখতে পারি না। এর পিছনেও আছে কারণ। এমন কোন আচরণ আমরা করি না যার পিছনে কোন না কোন সজ্ঞান বা অজ্ঞান কারণ নেই।

ডেভিড ক্রেস্টার তাঁর 'পার্সোনালিটি থিয়োরিতে' বলেছেন : 'আমি কেন প্রফেসর হলাম? অবশ্যই চাকরিটা ভাল। ভাল মাইনে। কাজে প্রচুর স্বাধীনতা। গরমের সময় ছুটি। সপ্তাহে তিনদিন মাত্র ক্লাশ। এতে লেখালেখির যথেষ্ট সুযোগ পাই। সহকর্মীদের মধ্যে ভাল বন্ধুও পেয়েছি। কিন্তু এটাই কী কারণ? আমার অবচেতন মন হাতড়ালে আর কী কারণ পাবো না?

তরুণ বয়সে আমার মনে স্বপ্ন ছিল আমি একজন অভিনেতা হবো। কিন্তু আমি খুব মুখচোরা ছিলাম। সুতরাং স্কুলের অভিনয়ে আমি স্টেজ ম্যানেজার হতাম। আমি কার মত হতাম? মিক জ্যাগারের মত গাইয়ে? স্টেজে উঠলেই যার হাজার হাজার ফ্যান? আমার ক্লাশে ৩৫ জন ছেলেমেয়ে। তারা আমার ফ্যান। আমার জোক শুনে তারা হাসে। আমিও আর্টিস্টদের মতই স্টেজে উঠে প্রকারান্তরে সেই দর্শকদেরই প্রশংসা কুড়োচ্ছি না কী? এই জন্যই কী আমি অধ্যাপনা করছি? তাহলে কর্তার ইচ্ছায় কর্ম নয়—বাসনার ইচ্ছায় যাবতীয় কর্ম। ফ্রয়েড বলছেন : বাসনার তিনটি স্তর : Id (অদস) EGO (অহং) আর Super EGO (অতি অহং)। আসলে অদসই মৌলিক স্তর। অহং ও 'অতি অহং' অদসেরই স্তরভেদ।

অদস আমাদের ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় স্তর। কিন্তু স্তরগুলি কোন বস্তু নয় এগুলি শুধু লেবেল

মাত্র। এগুলিকে বলা যায় 'ইচ্ছা'র বিশেষণ। যেমন অদস ইচ্ছা (Id wishes)। শিশুকালের সচেতন বা অবচেতন নানা ইচ্ছাকে আমরা 'অদস ইছা' বলতে পারি। 'অদস ইচ্ছা' কোন মনোগত অভিপ্রায়কে পূর্ণ করে। কিন্তু শৈশব অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'অদস ইচ্ছা'র প্রকাশ ঘটলে তার জন্য ভৎর্সিত হতে হয়। যেমন ছোটবেলায় আপনি মায়ের স্তনের বোঁটা ধরে থাকতেন। স্তন চুষতেন। কিন্তু যত বড় হতে লাগলেন, এই অভ্যাসটি নিন্দনীয় বলে গণ্য হল। আপনি এটা ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ছেড়ে দিলে কি হবে, এটা আপনার অবচেতন মনের ভেতর রয়েই গেল। শৈশবের অমন অনেক অদস ইচ্ছা মনের গহনে লুকিয়ে থাকে। সেগুলি আমাদের অজ্ঞান্তেই ব্যক্তিত্বের মধ্যে ফুটে ওঠে। মাঝে মাঝে আপনিই অবাক হয়ে যান। আরে আমি একাজটা হঠাৎ করে বসলাম কেন? এটা তো আমি করতে চাইনি। কিন্তু আপনি কাজটা করলেন না, আপনাকে দিয়ে করিয়ে নিল মনের মধ্যে সুপ্ত অদস ইচ্ছা। অদস সুখ পায় তার ইচ্ছা পূরণে। তার ইচ্ছাটা সে ব্যক্তিকে দিয়ে পুরিয়ে নেয়। কাজেই—।

অদস ইচ্ছাকে ফ্রয়েড বলেছেন কামপ্রেরণা বা নিবিক্ষা। ওই কামপ্রেরণার দ্বারাই অদস বাইরের বস্তুকে আকর্ষণ করে চলে। অর্থাৎ অদস ইচ্ছা কামজাত। কিন্তু অতি অহং ইচ্ছা জাগে তখন যখন আমরা কাউকে দেখে তার অনুকরণ করতে চাই। শিশু তার বাবাকে নকল করতে চায়। মেয়ে একটু বড় হলেই মায়ের ভাল শাড়িটা তার পরা চাই। মায়ের মত টিপ করবে সে। মায়ের মত সেন্ট মাখবে। টিভিতে শক্তিমান দেখে সব শিশু শক্তিমান হতে চায়। কেউ চায় শক্তিমানকে নকল করতে।

কিন্তু বাবা-মা-শিক্ষক-আত্মীয় স্বজনেরা শিশুর মধ্যে মূল্যবোধ তৈরি করে। এইভাবে চলো। ঈশ্বরে ভক্তি করো। লেখাপড়া করে যে গাড়ি-ঘোড়া চড়ে সে। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সমসাময়িক সামাজিক মূল্যবোধও মানুষ গ্রহণ করে। তৈরি হয়ে যায় তার বিবেক। বিবেকই ঠিক করে দেয় কোনটি ভাল, কোনটি মন্দ।

দিলে কী হবে এটা আপনার অবচেতন মনে সারাজীবন লুকিয়ে থাকল। এইসব ইচ্ছা শিশু তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাবা-মায়ের কাছ থেকেই পায়। শিশু যত বড় হয় বাস্তবের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। তখন আর সে শৈশবের অবাধ লাগাম ছাড়া অবান্তর ইচ্ছার দ্বারা সে আর পরিচালিত হয় না। কিন্তু তার অবচেতন মনে শৈশবের সেই সব অবান্তর ইচ্ছা থেকেই যায়। মনের গহনে লুকনো অবান্তর অদস ইচ্ছা মাঝে মাঝেই মনের সচেতন স্তরে চলে আসে। কারণ অদস চিন্তা হল সুখের চিন্তা, আরামের চিন্তা। হয়তো খুব খিদে পেয়েছে, অদস ভাবছে যদি অদৃশ্য মানুষ হয়ে উড়ে যেতে পারতাম তাহলে তাজ হোটেলের রান্নাঘরে ঢুকে ভালমন্দ খেয়ে আসতাম। কিন্তু তার পকেটে টাকা নেই। তাজ হয়তো অনেক দূরে। কিন্তু অদস সত্যি সত্যিইতো তাজ হোটেলে যেতে চায় না। কারণ এর জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। অদস কখনও পরিশ্রম করবে না। হাতের কাছে কিছু এনে দিলে তবেই সে খাবে। কারণ সুখভোগেই তার আনন্দ। মনে মনে তাজে খাওয়ার কল্পনা করেই সে খুশি। কারণ সে চায় আনন্দ। দুঃখকে সে পরিহার করে চলে। তার এনার্জি এত কম যে টাকা থাকলেও সে তাজ পর্যন্ত যাবে না। কারণ অদস চায় শুধু উপভোগ করতে কিন্তু তার জন্য পরিশ্রম করতে রাজি নয়। তার ইচ্ছেটা হল সবাই

তার হাতের কাছে এনে দিক।

পরিণত বয়সে আমাদের মধ্যে যে সমাজীকরণের অভিপ্রকাশ ঘটে তার পিছনেও আছে সামাজিক নিয়মনীতির অনুকরণ। পোশাক পরিচ্ছদও ফ্যাশনের অনুকরণ। যৌনকর্মীরা সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে, মাথায় ঘোমটা দিয়ে যখন গঙ্গায় স্নান করতে যায় তখন তাকে আর পাঁচজন গৃহবধূ থেকে আলাদা মনে হয় না। কারণ সে তখন সমাজবিধিই মেনে চলছে। একজন সমাজবিরোধী ও একজন সাধুর মধ্যে তফাত শুধু মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির। সাংস্কৃতিক আচরণে তারা এক। পোশাক-পরিচ্ছদ, সাজগোজ, খাওয়া দাওয়া, এমনকী শিক্ষাদীক্ষারও হয়তো তফাত নেই। আমি শিক্ষিত অপরাধী দেখেছি, ফিটফাট বাবু, মার্জিত ভদ্র, কিন্তু দশ-বারোটা খুনের মামলার আসামী। একবার এক এন.আর.আই. জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হলাম। অথচ পোশাকে-আশাকে কথায় বার্তায় সে যে প্রতারক তা কে বলবে!

অদস ইচ্ছা হল সুখভোগের ইচ্ছা। যেনতেন প্রকারেণ সুখভোগ করাই তার উদ্দেশ্য। আর তার এই উদ্দেশ্যের প্রেষণা হচ্ছে কাম। তাই তাকে কামনা বলাই ভাল। কামনার চরিতার্থ করাই অদস-এর উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তির অন্ধ তাড়নায় তার ইচ্ছা এগিয়ে চলে বাধা-বন্ধহারা। সুনীল কুমার সরকার অদসের একটি চমৎকার উদাহরণ দিয়েছেন, কোন জুলিয়েটকে দেখে হয়তো কোন রোমিওর যৌন আকর্ষণ অনুভব হল। এই যৌন আকর্ষণ নিছক প্রবৃত্তিগত, অর্থাৎ ফ্রয়েডের ভাষায় বলতে পারি রোমিওর অদস জুলিয়েটের মধ্যে বিষয়তা খুঁজে পেল। অদস অন্ধ, সে না বোঝে বাস্তবতা, না বোঝে নৈতিকতা। এক্ষেত্রে জুলিয়েটকে অধিকার করাই রোমিওর একমাত্র উদ্দেশ্য, তা সে যেমন করেই হোক। কিন্তু জুলিয়েটের 'অদস'-এ রোমিওর প্রতি অনুরূপ বিষয়াকর্ষণ নাও থাকতে পারে। অদস শুধু জুলিয়েটকে কামনা করেই ক্ষান্ত। কী করে তাকে পাওয়া যেতে পারে, সামাজিক ও অন্যান্য বাধানিষেধ ডিঙ্গিয়ে কী করে জুলিয়েটকে লাভ করা যেতে পারে সে ভাবনা এবং সে দায়িত্ব সম্পূর্ণ অহং-এর উপর ন্যস্ত।[২৭]

অহং-এর কাজ হল অনেকটা অভিভাবকের মত। সবদিক দেখেশুনে একটা বাস্তবসম্মত নির্দেশ দেওয়া। কারণ 'অহং-ইচ্ছা' পরিণত ও বুদ্ধিচালিত। রোমিওর অহং রোমিওর অদসকে বলবে, বাপু হে মেয়েটিকে যদি ভোগ করতে ইচ্ছা হয়, তাহলে জোর খাটালে মুশকিলে পড়বে। তারচেয়ে তার কাছে প্রেম নিবেদন করো। তাকে পটাও। এর জন্য মনের আপাত অভিপ্রায় অবদমন করে এক সমঝোতায় আসতে হয়। প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি ও বাস্তবতা ও সংস্কৃতির বিরোধী সব ইচ্ছাকে আমরা দমন করে একটা বিকল্প খুঁজে কোনরকমে ভেতরের অদস ইচ্ছাকে আমরা দমন করে রাখি। কিন্তু অবদমিত ইচ্ছা চেতন স্তর থেকে নির্জ্ঞান স্তরে চলে যায়। নির্জ্ঞান স্তর থেকে আমাদের কামনা বাসনাগুলি উঠে এসে আমাদের চালিত করলে আমরা বলি নিউরোসিস বা বায়ুরোগ। যাঁদের মধ্যে দেখবেন আচরণের ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে বুঝতে হবে তিনি নিউরোসিসে আক্রান্ত হয়েছেন। নির্জ্ঞান স্তর থেকে স্বপ্নের মধ্যে আমাদের অবদমিত ইচ্ছাগুলি উঠে আসে। তাই আমরা আবোল তাবোল স্বপ্ন দেখি কিন্তু আদপে তা অর্থপূর্ণ।

কিন্তু অহং যে বাস্তব সম্মত সিদ্ধান্ত নিল সেটা, তার একার ক্রেডিট নয়। 'অতি অহং' তাকে নীতিসম্মত বাস্তব বুদ্ধি দিচ্ছে এবং অদসের তাড়না ও অতি অহং-এর বাস্তববাদী নির্দেশ থেকে সে একটা মাঝামাঝি উপায় রফা করছে।

ডেভিড লেস্টারের উপমাটি দিলে পাঠকদের অতি অহং-এর ভূমিকাটি বুঝতে সুবিধা হবে। আপনার বাবার ওপর খুব রাগ হল। বাবার কাছে কয়েকটা টাকা চেয়েছিলেন। বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমায় যাবেন বলে। বাবা টাকা তো দিলেনই না উলটে যা-তা কথা শোনালেন। তখন আপনার মনে হল দিই এক বোম মেরে বাবার মুণ্ডটা উড়িয়ে। (অদস ইচ্ছা)। সঙ্গে সঙ্গে অতি অহং-এর কাছে নির্দেশ চাইলেন : দাদা কী করা যায় বলুন তো। অতি অহং সমাজ থেকে শিখেছেন, পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম। তিনি মনে মনে অপরাধ বোধ করতে লাগলেন। ছি-ছি—সেই বাবার মুণ্ডটা উড়িয়ে দিতে চাইছ। অনুতপ্ত হও এই চিন্তার জন্য। তখন অহং-এর কাছে দুজনেই হাজির। অহং দুপক্ষের মধ্যে সমঝোতা করে একটা বাস্তব সম্মত নির্দেশ দেয় যাতে একুল-ওকুল দুকুল থাকে। অহং হয়তো বলল : পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম। পিতা তোমাকে টাকা দেননি বলে তুমি সেই পিতাকে খুন করার কথা ভাবছ? না-না, ওসব চিন্তা ছাড়ো। গায়ের ঝাল যদি মেটাতেই হয় তাহলে তুমি ওকে আজই একটা কড়া চিঠি লেখ।

কার 'অতি-অহং' কেমন নির্দেশ দেবে তা নির্ভর করে তার ব্যক্তিত্ব কী ধরনের তার ওপর। অতি অহং সবসময় একটি সৎ উপদেশই দেবে। কারও অতি-অহং বলতে পারে বাবাকে একটু শিক্ষা দিতে চাও তা ঠিক আছে। তবে বাপু আমি যা বলি তাই করবে। তুমি কোন বড় শহরে গিয়ে কিছুদিন লুকিয়ে থাকো। তাহলেই তোমার বাবা হয়রান হবে। তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। অথবা আজ সারাদিন অনশন করে বসে থাকো। তাতেই তোমার বাবা অনুতপ্ত হবে।

ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ফ্রয়েড : ফ্রয়েড বলছেন, শিশুর ব্যক্তিত্ব তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে উঠতে থাকে। তবে পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয়—মৌখিক, পায়ু ও উপাঙ্গ স্তর। তবে ফ্রয়েডের মতে ব্যক্তিত্বের ক্রবিকাশের পিছনে আছে কাম বা Sex। শিশুর ক্রমবিবর্তনের স্তরগুলিকে ফ্রয়েড বলেছেন, 'মানসিক যৌনতার স্তর' (Psychosexual stagcs)।

ফ্রয়েড বলছেন, শিশুর যখন এক বছর বয়স তখন সে মুখ দিয়ে বাইরের জগতকে আবিষ্কার করে। (Explore the world through its mouth)। এই সময় মুখই তার প্রধান যৌনকেন্দ্রে। মুখ দিয়ে সে যখন স্তন্য পান করে তখন সে অনুভব করে নির্বিকল্প যৌনসুখানুভূতি। শিশু এসময় যা হাতে পায় চুষতে থাকে। তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয় চুষিকাঠি। এই চুষিকাঠি চোষা প্রকারান্তরে এক ধরনের Oral sex বা চোষ্যকাম।

আর একটু বড় হলে (দেড় থেকে চার বছর) শিশু পেশীর ওপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। তখন তার দামাল অবস্থা। এই অবস্থায় শিশু তার পায়ুর গুরুত্ব বেশি করে অনুভব করে। মলত্যাগের মধ্যে সে আনন্দ পায়। অনেক সময় মলত্যাগ না করে ধরে রাখে। কখনও বারবার মলত্যাগ করে মলত্যাগের আনন্দকে দীর্ঘ করার জন্য। ফ্রয়েড এই স্তরকে বলছেন, পায়ুস্তর বা Anal stage। এরিকসন বলেছেন, এটি শিশুর স্বশাসন স্পৃহা বনাম সন্দেহ

ও লজ্জার স্তর (Autonomy versus shame and guilt)।

তিন থেকে ছ'বছর বয়সে শিশু অনুভব করে ছেলে ও মেয়ের লিঙ্গ আলাদা। একে ফ্রয়েড বলেছেন, উপাঙ্গ স্তর (Phallic stage)। এই সময় থেকে সে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে থাকে ও সমলিঙ্গের প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে। মা ও ছেলে, বাবা ও মেয়ের মধ্যে আকর্ষণ তীব্র হয়। ফ্রয়েড একে ইডিপাস এষণা বলেছেন। এর তিন বছর পরে শিশু যৌন অবচেতন স্তরে এসে পৌঁছয় (Latency stage) এ সময়টা যেন যৌন নির্জ্ঞান অবস্থা। ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গেই খেলাধুলো করে। মেয়েরা মেয়েদের দলেই খেলে।

এর পরের স্তরই বয়ঃসন্ধির (Puberty) স্তর। ফ্রয়েড বলছেন, এই স্তরে ছেলেমেয়েদের দেহে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে শুরু করে। মেয়েদের রজঃস্রাব শুরু হয় (এটি এক একজনের বেলা এক একরকম। কারও আগে হয়। কারও ঋতুমতী হতে কিছু দেরি হয়)। মেয়েদের স্তনের বিকাশ ঘটে (এটাও নির্ভর করে স্বাস্থ্যের ওপর)। নিতম্ব প্রসারিত হয়। ছেলেরা হঠাৎ লম্বা হতে শুরু করে। স্বরের পরিবর্তন হয়। ছেলেমেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই যৌনকেশ দেখা দেয়। ছেলেরা লুকিয়ে দাড়ি কামাবার চেষ্টা করে।

দেহগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই ছেলেমেয়েদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ শুরু। ফ্রয়েড বলছেন, এসময় তাদের যৌনচেতনা ঠিক বয়স্কদের মতই। কামপীড়িত বাসনা অনেক ক্ষেত্রে প্রাকবিবাহ যৌনসঙ্গমের দিকে ঠেলে দেয়। যদি বিপরীত লিঙ্গ না পাওয়া যায় তখন সমকামী হবার দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। ছেলেরা হস্তমৈথুন করে আনন্দ পায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে অপরাধ বোধ জেগে ওঠে। কারণ অতি অহং তাকে শেখায় অকাল যৌনসঙ্গম অথবা অকারণ বীর্যপাত লোকাচার বিরুদ্ধ। অবদমনের ফলে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে নির্জ্ঞান মনের যৌন আকাঙ্ক্ষা তার দাবি পূরণের চেষ্টা করে। এই স্বাভাবিক বীর্যস্খলনকে একশ্রেণীর ব্যক্তি 'স্বপ্নদোষ' নামে আখ্যা দিয়ে তরুণদের আরও বিভ্রান্ত করে এবং তাদের মধ্যে অপরাধবোধের জন্ম দেয়। পরবর্তীকালে এই অপরাধবোধ থেকে বিবাহিত পুরুষ যৌনমিলনে পর্যাপ্ত সুখ পায় না। ব্যক্তিত্ব গঠনে শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধির সময় মানুষের জীবনে যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একথা সব মনোবিজ্ঞানীই বলেছেন।

শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে পরিবেশের কিছুই জানে না। সে এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ স্পর্শ অনুভব করে কতগুলি Reflex ও অনুভূতির (Sense) মাধ্যমে। শিশু এসময় কতগুলি শব্দ শুনে ও কতগুলি দৃশ্য দেখে দেখে তার গতিনৈপুণ্য (Motor skill) অর্জন করে। সে বুঝতে পারে কোথায় তাকে কী ধরনের সাড়া দিতে হবে। এক বছরের মধ্যেই শুধু দেখে এবং শুনে শিশু তার পরিবেশ ও চারপাশের মানুষজন সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করে ফেলে। এ আমার মা, এ বাবা, এ আমারই বন্ধু। এটি পুতুল, এটি একটা রঙ, এটা দুধ, এটি মায়ের স্তন, এটি দুধের বোতল এমন কত কি জ্ঞান। এখানে তার মানসিক বিকাশে বয়স্কদের সাহায্য ও সহযোগিতার দরকার হয়। এই সময়টা তাকে যত সঙ্গ দেওয়া যাবে, পরিবেশের সঙ্গে যত পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাবে ততই তার জ্ঞান স্পৃহা চরিতার্থ হবে।

কেলভিন ব্রাউন এই কথাই বলছেন। বলছেন, শৈশবে বয়স্ক আপনজন ও শিশুর মধ্যে যত বেশি যোগাযোগ ঘটবে তত বেশি শিশুর জ্ঞান বুদ্ধি ও ভাষার উন্নতি হবে এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটবে।

During childhood adult-child interaction enhances the child's physical perceptual social and linguistic development which in turn promotes the cognitive (intellectual) and moral abilities that are the essential to thinking. learning. self identity and actualization (full development of one's potential).

মসলো (A. H. Maslow) তাঁর মোটিভেশন অ্যান্ড পার্সোনালিটি বইতে একটি ত্রিভুজ এঁকে দেখিয়েছেন যে কোন ব্যক্তির জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হল : আত্মসুখ (Self-actualization)। সেটি পেতে গেলে কতগুলি স্তরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। ত্রিভুজ বা পিরামিডের আকারে তৈরি মডেলটি দেখাবার আগে দুটো কথা বলে নেই। আত্মসুখ আসে জীবনের পরিপূর্ণতা থেকে। জীবন তখনই পরিপূর্ণ যখন মানুষ তার ভেতরের সমস্ত ক্ষমতা ও গুণের (Ability and talent) পরিপূর্ণ ব্যবহার করে তার মৌলিক চাহিদাগুলিকে পূরণ করতে পারে। এ সম্পর্কে 'হতাশ হবেন না', 'কেমন করে বাস্তববাদী হবেন' বইগুলিতে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি। হাজার হাজার তরুণ-তরুণী এই বইগুলি পড়ে তাঁদের জীবনের ধারা বদলে ফেলেছেন।

মাসলো মানুষের জীবন বিকাশের জন্য যেসব মৌলিক প্রয়োজনের কথা বলছেন তা হল এই :

মাসলোর ত্রিভুজ

তাহলে সুস্থব্যক্তিত্ব নির্ভরশীল আত্মসুখের ওপর। আত্মসুখ আসে কতগুলি স্তর বেয়ে। একজন সুস্থব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ মানে পরিপূর্ণ জীবনের অধিকারী একজন মানুষ। মাসলোর

মডেল অনুযায়ী প্রথমেই মানুষের দরকার শরীরটাকে সুস্থ রাখা। এর জন্য ভাল খাদ্য চাই, বিশুদ্ধ পানীয় জল চাই, পর্যাপ্ত ঘুম চাই।

আমাদের কজন শিশু শৈশবে সুষম খাদ্য পায়? বিশুদ্ধ পানীয় জল কোটি কোটি মানুষের কাছে স্বপ্ন। এইসব কারণে আমাদের অধিকাংশ শিশুর দেহ দুর্বল। তাদের ওজন কম। দুর্বল দেহে সবল ব্যক্তিত্ব তৈরি হবে কী করে?

এর পরেই দরকার নিরাপত্তা ও বাসস্থান। গ্রামের অধিকাংশ মানুষইতো অস্বাস্থ্যকর ঘরে বাস করেন। শহর জীবনে অধিকাংশ মানুষের মাথা গোঁজার পরিসর অতি সংকীর্ণ। আমি কলকাতায় এসে আমরা পাঁচজন প্রাণী দেড়খানা ছোট ঘরে থাকতাম। এরচেয়েও বেশি লোক এক ঘরে থাকে।

এর পরের স্তর প্রেম ও ভালবাসা। শিশুর শৈশবে চাই বাবা-মায়ের ভালবাসা। তাকে অবহেলা করলে সে ধরে ফেলে। মাতৃহীন বা পিতৃহীন শিশু ঠিক বাবা-মায়ের অনুপস্থিতি বুঝতে পারে। অনাথ শিশুদের ব্যক্তিত্ব দুর্বল বা রুগ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। তেমনি ডিভোর্সি ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও নানা গোলমাল থেকে যায়। তারা পড়াশোনায় ভাল হতে পারে, বুদ্ধিমান হতে পারে এবং প্রতিভাবানও হতে পারে কিন্তু ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশে কোথাও না কোথাও বাধা ঘটতে পারে।

যৌবনে প্রেম জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। নারীর প্রেম পুরুষের জীবনকে বিকশিত করে। পুরুষের প্রেম নারীজীবনকে সম্পূর্ণ করে। বিয়েটা বড় কথা নয় বিবাহের চেয়ে অনেক বড় প্রেম। বিবাহ সে অর্থে প্রজন্ম সৃষ্টি (Procreation) এবং কাম চরিতার্থ করার বৈধ এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রেম ছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলন হয়। এটি পশুর মত প্রক্রিয়া। শুধু সঙ্গমের জন্যই পশুরা মিলিত হয়। সঙ্গম শেষ হলে কেউ কাউকে চিনতে পারে না।

বয়ঃসন্ধির সময় থেকে তরুণ-তরুণী যদি পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তার পিছনে থাকে পরস্পরের প্রতি তীব্র ভালবাসা যা হলে সে প্রেম হয়ে ওঠে প্রণোদনমূলক শক্তি Motivational force।

এব পরের স্তর হল আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস আসে নিজের সম্পর্কে ভাল ধারণা থাকলে। পাপবোধ, অপরাধবোধ থাকলে আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। অন্যের কাছে বারবার অপমানিত হলে, অপরে তাচ্ছিল্য করলে সামাজিক মর্যাদা না থাকলে, পরিবারের লোকজনের ভালবাসা না পেলে আত্মমর্যাদায় চিড় ধরে।

এর ওপরের স্তর জ্ঞান অর্জন। বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চেতনার দিগন্ত বিস্তৃত হয়। পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণী ক্ষমতা বাড়ে, আসে বস্তুনিরপেক্ষ ভাবে কোন সমস্যাকে বিচার করার ক্ষমতা। যদিও পণ্ডিতের মূর্খতার তুলনা নেই। মূর্খরাও পাণ্ডিত্য দেখিয়ে পণ্ডিত সাজার চেষ্টা করে। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্য নয়, দরকার হল সাধারণ বুদ্ধি। সাধারণ বুদ্ধিই মানুষের ব্যক্তিত্বকে ঝকঝকে করে তোলে।[২১]

ফ্রয়েড বলেছেন মানুষের দেহের ভেতরকার যে চালিকাশক্তি (Energy) তা আসে খাদ্য থেকে। খাদ্যের প্রয়োজন চালিকাশক্তি উৎপাদন করার জন্য। এই শক্তির জোরে আমরা নিঃশ্বাস নেই, দেহ চালনা করি, দেখি, মনে রাখি। এই চালিকাশক্তি যেমন আমাদের

মনকে চালায় তেমনি দেহকেও চালায়। মনকে চালনা করে এক মনস্তাত্ত্বিক শক্তি যেমন চিন্তাশক্তি। চিন্তাশক্তি আর দৈহিকশক্তি দুটোই আবার পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। দেহের চালিকাশক্তি আর মনের চালিকাশক্তি এই উভয়ের যোগাযোগ কেন্দ্র হল ব্যক্তিত্ব।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি

ফ্রয়েডের মতে আমাদের মনের চালিকা শক্তির পরিমাণই হল প্রবৃত্তি। সবরকমের প্রবৃত্তি মিলিয়ে যে সামগ্রিক পরিচালিকা শক্তি সেটাই ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব পরিচালিকা শক্তির সমষ্টি। দেহের এই প্রয়োজন সারাজীবন থেকেই যায়। প্রবৃত্তি চিরকালই এই প্রয়োজন পূরণ করে যায়। আর প্রবৃত্তি পূরণের জন্য মানুষকে কতগুলি লক্ষ্য পূরণ করতে হয়। যেমন ক্ষুধা একটা প্রবৃত্তি। তা পূরণের জন্য আপনাকে বাজারে যেতে হয়, দোকানে যেতে হয়। বাজার এনে রান্নাবান্না করতে হয়। তারপর রান্না হয়ে গেলে ভাত বেড়ে দিতে হয়। এখানে লক্ষ্যবস্তু যতক্ষণ না পাওয়া যায়, ততক্ষণ মানুষ কিছু বিকল্পের সন্ধান করে। চাল পাওয়া না গেলে আমরা বাজার থেকে আটা আনি। মাছ না পেলে ডিম। অলক্ষ্য বস্তু যতক্ষণ না মেলে চালিকাশক্তি ক্রমাগত বিকল্পের সন্ধান করেই যায়। এই বিকল্প শক্তিকে তাড়াতাড়ি বাছাই করে একটা সিদ্ধান্তে নিয়ে আসতে পারাটাই ব্যক্তিত্বের কাজ। ব্যক্তির অদস কিন্তু বাস্তব সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কারণ তার বাস্তব জ্ঞানই নেই! শিশু অদস স্তরে থাকে। তাই তার ক্ষুধা প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করার জন্য তার ভেতর উৎপাদিত চালিকাশক্তি তাকে তার লক্ষ্যের দিকে (খাদ্য সংগ্রহের দিকে) চালিত করে। ধরা যাক শিশু তখন হাতের কাছে পেল এক মাটির ঢেলা। সেটাই সে মুখে পুরল। এতে ক্ষুধা মিটল না। তখন চালিকাশক্তি বিকল্প পথ খুঁজে দেবার জন্য অহং-এর শরণাপন্ন হল। অহং-এর নিজস্ব চালিকাশক্তি (Energy) নেই। অদসের কাছ থেকে চালিকাশক্তি ধার করে সে অদস কী চায় জেনে নিল। অদস চায় খেতে। তখন অহং তাকে নির্দেশ দেবে মাতৃস্তন্য পান করো। অথবা মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কাঁদো নির্দেশ দেবে। যদি এতে কাজ হয় দেখা যাবে খিদে পেলে অদস নয়, সরাসরি অহংই প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে সাহায্য করছে। শিশু সরাসরি মাতৃস্তন খুঁজে নিতে শিখেছে। ফ্রয়েড বলছেন, শিশু তার বাবা-মায়ের কাছে তিরস্কার ও পুরস্কারের মধ্য দিয়ে দেখে নেয় কোনটা তার কর্তব্য। সে যত বড় হয় তত বাবা-মায়ের মডেল অনুকরণ করতে শেখে। তার শিশুসুলভ ব্যবহার সংযত করে সে বাবা-মায়ের ব্যবহারই অনুকরণ করে। কারণ এটাই তার কাছে বাস্তবসম্মত এবং সবদিক দিয়ে আদর্শও। এই স্তরে অতি অহং তাকে শেখায় বেপরোয়া অবাস্তব আচরণ না করে সমাজসম্মত আচরণ করতে। তখন শিশু বাবাকে শ্রদ্ধা করতে শেখে।

ব্যক্তিত্বের অষ্টমার্গ : এরিকসন

ফ্রয়েডের ব্যক্তিত্ব বিকাশ নিয়ে যিনি মূল্যবান তত্ত্ব প্রকাশ করেছেন তিনি হলেন এরিক এরিকসন। তিনি জন্মসূত্রে ডেনিশ। জন্মেছেন জার্মানিতে ১৯০২ সালে। এরিকসন যখন গর্ভে তখন তাঁর মা তাঁর বাবাকে ডিভোর্স করে এক জার্মান ভদ্রলোককে বিয়ে করেন। এরিকসন বড় হওয়া পর্যন্ত জানতেন ওই জার্মান ভদ্রলোকই তাঁর আসল বাবা। তাঁর

বি-পিতা ইহুদি ছিলেন বলে স্কুলে বন্ধুরা তাঁর পিছনে লাগত। কারণ তখন জার্মানিতে ইহুদি বিদ্বেষ চরমে। এরিকসন উত্তরকালে মনস্তত্ত্ব নিয়ে ভিয়েনায় পড়াশোনা করেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে ফ্রয়েডের আলাপ হয়। ফ্রয়েড তাঁকে শিষ্যত্বে বরণ করেন কিন্তু এরিকসন শিশুমনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি ফ্রয়েডের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করতেন। এরিকসনের মতে শিশুর ক্রমবিকাশের আটটা স্তর।

এরিকসন বলেন, যেমন দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাড়ে তেমনি আমাদের অহং বাড়ে। বাড়ে মনোগত আরও নানা বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক স্তরেই দেখা দেয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে সংকট।
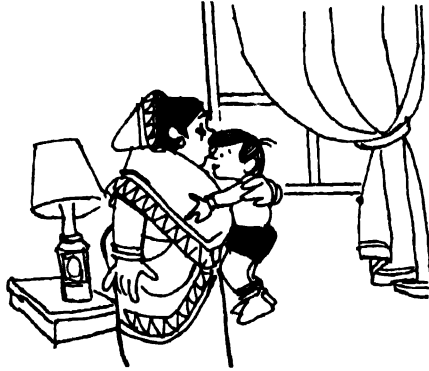
মা ও ছেলে

বয়সের ক্রমবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটে। অতিশৈশবে শিশুর ব্যক্তিত্ব পরনির্ভরশীল। সে নির্ভর করে থাকে মাকে। অবিশ্বাস করে বাকি সবাইকে। এই অবস্থায় তার আত্মবিশ্বাসের অভাব তাকে আরও শঙ্কিত করে তোলে। প্রথম শৈশবে শিশু কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণ শেখে। সেই সঙ্গে সে প্রথম পেতে শুরু করে স্বাধীনতার স্বাদ। কারণ এই বয়সে সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখে। কোলে নিলে সে কোল থেকে নেমে যেতে চায়। আপন পায়ে ভর দিয়ে পথ চলাতেই তার আনন্দ। এই বয়স থেকে তার ইচ্ছাশক্তি গড়ে ওঠে। এরিকসন এই অবস্থাকে বলছেন, 'অটোনমি'। কিন্তু এই অটোনমি সন্দেহ মুক্ত নয়। শিশু ভাবে সে স্বাধীনভাবে চলতে পারবে তো? চলতে চলতে পড়ে গেলে সে লজ্জা পায়। তবু তার স্বাধীনসত্তা সে বিসর্জন দিতে চায় না।

খেলাধুলো করার বয়সে শিশুর মধ্যে দেখা দেয় উদ্যোগ নেবার ক্ষমতা। সে নিজের উদ্যোগেই খেলা করে। তাকে খেলনা না দিলেও সে পরিত্যক্ত জিনিসকে খেলনা বানিয়ে নেয়।

ফাঁকা জায়গা পেলে ছুটোছুটি করে। সমবয়সী কাউকে পেলে স্বউদ্যোগী হয়ে তার সঙ্গে খেলতে বসে। সে সময় সে পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। সমবয়সীদের সঙ্গে খেলাও যেমন করে তেমনি ঝগড়া ও মারপিটও করে। এর ফলে তার মধ্যে অপরাধ বোধ দেখা দেয়। ভাবে আমি ঠিক করছি তো? তার উদ্দেশ্য হচ্ছে শাস্তির ভয়ে ভীত না হয়ে তার খেলাধুলো চালিয়ে যাওয়া। কারণ এটাই তার লক্ষ্য। অথবা যে ছেলেটি দেওয়ালে লিখছে বা ছবি আঁকছে সে কিন্তু মনে মনে জানে দেওয়াল নোংরা করলে

বাবা-মা রাগ করবে। তার উদ্যোগ ও অপরাধবোধের মধ্যে সংঘর্ষ হয় কিন্তু তবু সে তা করতে চায়।

স্কুলের বয়স : শিশু এখন বুঝতে শেখে যে শুধু কল্পনার জগতে থাকলে চলবে না। স্কুলের জগত বাস্তব জগত। এখানে স্কুলের পড়া আর হোমটাস্ক করতে করতে সে পরিশ্রমী হয়ে ওঠে। এই পর্যায়ে পরিশ্রম বনাম হীনম্মন্যতার মধ্যে একটা সংঘর্ষ দেখা দেয়। কারণ স্কুলে পড়াশোনায় যদি সে ভাল ফল না করতে পারে তাহলে বাবা-মা, মাস্টারমশাই তাকে নিন্দা করবে। তাই পরিশ্রমের সঙ্গে সঙ্গে জন্মায় হীনম্মন্যতা বোধ।

বয়ঃসন্ধির সময় থেকে ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন শুরু: তখন কিশোর-কিশোরীর মনে ইচ্ছা জাগে সমাজে অর্থপূর্ণ স্থান করে নেবার। সে তখন প্রথম নিজেকে জানার চেষ্টা করে। এই প্রথম সে নিজেকে পরিপূর্ণ পুরুষ বা নারী বলে ভাবতে শেখে। তার দৈহিক পরিবর্তন, কণ্ঠস্বরের পবিবর্তন ঘটে। বালিকা কিশোরীতে পরিণত হয়। প্রথম রজোদর্শন অনেককে বিহ্বল, আতঙ্কগ্রস্ত ও অস্বস্তিকর করে তোলে। পুরুষকে সে প্রথম লজ্জা করতে শেখে। পুরুষ ও নারীর কাছে সঙ্কুচিত হয়ে যায়। নতুন করে নিজের পরিচয় খুঁজে পাবার পর তার নিজের মধ্যেই বিরোধ জাগে। এই আমি কী সেই আমি? এখন এই আমিকে নিয়ে কী করব? এই সমস্যাসঙ্কুল পথে আমি কী আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব?

বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে **তারুণ্যের কাল**। এই সময় মন চায় সমস্ত তরুণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময়কার আইডেনটিটির দ্বন্দ্ব তখন মন অধিকার করে থাকে। তার ফলে এ বয়সে অনেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। একমাত্র প্রেমই পারে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ কাটিয়ে তুলে দুটি হৃদয়কে এক করতে। যেখানে প্রেম নেই সেখানে তরুণ-তরুণী বিচ্ছিন্নতা অভিমুখী। তারা নির্জন দ্বীপের অধিবাসী। তাই এই বয়সের দ্বন্দ্ব বিচ্ছিন্নতা বনাম অন্তরঙ্গতার।

বয়স্কতা (Adulthood) ২১-৬০ : এই বয়সটা সৃজনের। সন্তান উৎপাদনও মানুষের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। কারণ সন্তানের মধ্যে সে বেঁচে থাকে। এছাড়া আছে আরও সৃষ্টি সুখের উল্লাস। কর্মজীবনে নতুন নতুন চিন্তা রূপায়িত করতে পারে মানুষ। যদি এ সময় বিস্তীর্ণ সৃষ্টির সুযোগ না পায় মানুষ, তখনই তার স্থাণুত্ব এসে যায়। অগ্রগতি রুদ্ধ হয়। সম্প্রসারণ না সঙ্কোচন এই বয়সের এটাই সংকট।

পরিণত বয়স (ষাটোর্ধ্ব) : এই বয়সে মানুষ আবার পিছনে ফিরে তাকায়। পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে। এই সময় জীবনে সন্তুষ্টি আসে। কারণ মানুষ তার অতীতের সাফল্যে আত্মসন্তুষ্টি অনুভব করে। পাঁচজনকে ডেকে ডেকে শোনায় তার যৌবনের সাফল্যের কথা। তবে অনেক আশা পূর্ণ হয় না বলে সে কিছুটা হতাশও হয়ে পড়ে। একদিকে সংহতি অন্যদিকে নৈরাশ্য এই দুয়ের মধ্যে সংঘর্ষ এ সময়কার প্রলক্ষণ।

কেন মানুষ অবিশ্বাসী?

এরিকসন বলেন, মানুষের জীবনে যে সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক লক্ষণগুলি দেখা যায়, যা কমবেশি সকলের ক্ষেত্রেই এক, তার মধ্যে একটি হল, অন্যের প্রতি অবিশ্বাস। মানুষ চট করে কাউকে

বিশ্বাস করতে চায় না। এর কারণ নিহিত আছে সেই শৈশবে, যখন তার মা ঘুম পাড়িয়ে রেখে নিজের কাজে চলে যেত। শিশু উঠে মাকে না দেখে কাঁদত। মা ফিরবে না বলে মনে হত। মা ফিরত। তার বিশ্বাস স্থিত হত। কিন্তু মায়ের চলে যাওয়াটা থেকে তার সবার প্রতি অবিশ্বাস জেগে থাকে। মায়ের সঙ্গে সন্তানের স্বাভাবিক সম্পর্ক তৈরি হতে পারে, যদি মা বাচ্চার ছোটখাটো প্রয়োজনগুলির দিকে নজর দেয় এবং শিশুর মধ্যে যদি বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে ওঠে। ব্যক্তিত্ব তত্ত্ব নিয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে কার্ল ইয়্যুং এরও মতভেদ হয়। এরিকসন ফ্রয়েডের মনোবিশ্লেষণ স্বীকার করে নেন। কিন্তু তিনি ফ্রয়েডের মত অহংকে অদস ও অতি-অহং-এর নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাননি। তিনি বলতেন, ব্যক্তির অহংই তার প্রভু। ব্যক্তিত্ব গঠনে পরিবেশের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তি কীভাবে সামাজিক পরিবেশের মোকাবেলা করতে পারছে ব্যক্তিত্ব নির্ভর করবে তারই ওপর। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ব্যক্তির ওপর যেরকম পড়বে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বও তদনুযায়ী পরিবর্তিত হবে।

কার্ল ইয়ুং ফ্রয়েডের সমসাময়িক একজন বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানী। তিনি ফ্রয়েডের চেয়ে ২০ বছরের ছোট ছিলেন। কিন্তু ১৯০৭ সালের ৭ মার্চ তাঁদের দু'জনের প্রথম সাক্ষাৎকারের পর দু'জনের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব হয়েছিল। ফ্রয়েড তো ভেবেছিলেন ইয়্যুং হবেন তাঁর উত্তরসুরী। কিন্তু ইয়্যুং গুরুর সঙ্গে বহুক্ষেত্রে একমত হলেন না। শেষপর্যন্ত ১৯১৪ সালে গুরু-শিষ্যে বিচ্ছেদ হয়। ইয়্যুং তত্ত্ব হল **মানুষের আচরণ কখনও শুধু অতীতের প্রভাবের ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে ভবিষ্যতে যেমন যেমন ঘটবে তার ওপর**। অতীত এবং প্রত্যাশিত ভবিষ্যতের ওপর নির্ভর করে মানুষের আচরণ তৈরি হয়। ফ্রয়েড বলতেন, মানুষ নিরন্তর প্রবৃত্তির তাড়নায় তাড়িত হয়ে তার নিবৃত্তির চেষ্টা করতে করতেই বড় হয়ে ওঠে। হয় সে প্রবৃত্তির নিবৃত্তি ঘটায়, না হয় তাকে চেপে রাখে। ইয়্যুং বললেন, তা কেন, মানুষ সব সময়ই সৃজনাত্মক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে যায়। প্রবৃত্তি দমন করতে করতে সময় চলে যায় সেটা ঠিক নয়। তাঁর মতে Psyche (এটি গ্রিক শব্দ, অর্থ মন) সমস্ত ধরনের চিন্তা অনুভূতি সচেতন বা অচেতন আচরণের অবাধ লীলাভূমি। সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে আমরা কীভাবে মানিয়ে চলব মনই তার পথ নির্দেশ করে। প্রথম থেকেই এই মন একটি মিলনভূমি (Unity)। আমরা জন্মাই সমগ্রতার মধ্যে, অথবা বলা যায় আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই সমগ্রতাকে লাভ করার সম্ভাবনা আছে। জীবনের চরম উদ্দেশ্য হল, এই সমগ্রতাকে যতখানি পারা যায় উন্নত করা। ব্যক্তিত্ব হল আমাদের ভেতরকার খামখেয়ালিপনাকে উপলব্ধি করা। ব্যক্তির গঠনের পিছনে যে যে উপাদান থাকে সেই উপাদানগুলিকে স্বীকৃতি দেওয়া। আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যতটা স্বাধীনতা দরকার সেই পরিমাণ স্বাধীনতা গ্রহণ করে পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া। সংজ্ঞাটি একটু খটোমটো লাগতে পারে। ইয়্যুং-এর ভাষায় আর একটু বিশদভাবে বলতে গেলে বলতে হয় ব্যক্তিত্ব কতগুলি প্রণালী বা System দিয়ে তৈরি। এই সিস্টেমগুলি চৈতন্যের তিনটি স্তরের ওপর কাজ করে। তিনটি স্তরের প্রথম স্তরটা সচেতন স্তর। যেমন আপনি সচেতন স্তরে আমার বইটি পড়ছেন। মানুষের অহং এই সচেতন স্তরে কাজ করে। কমপ্লেক্স আর আর্কটাইপ (কাল্পনিক ভাবমূর্তি) সাধারণত ব্যক্তিগত অচেতন মনের ফসল। দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাজকর্ম সবই পরিচালিত হয় চেতন স্তর থেকে। অনেক সময় সচেতন এবং অচেতন

ব্যক্তির মধ্যে একসুরে এসে মেলে।

ইয়্যুং বলছেন, চৈতন্যের সৃষ্টি জন্মেরও আগে, মাতৃগর্ভে। ধীরে ধীরে শিশুর চৈতন্যালোক থেকে অবচৈতন্য আলাদা হয়ে যায়। শিশু যে তার পরিচিতজনকে দেখে স্বস্তিবোধ করে ও অপরিচিতদের দেখে কাঁদতে থাকে, তাদের কাছে যেতে চায় না, এটা চৈতন্যের জন্যই। চৈতন্যই তাকে আপন-পর ভেদ শেখায়। এই ভেদ থেকে আসে অহং। সচেতন মনের দরজায় প্রহরী দাঁড়িয়ে থাকে অহং। ঠিক করে দেয় আপনি কার সম্বন্ধে কী ধারণা করবেন; চিন্তা করবেন, অনুভব করবেন এবং কোন স্মৃতি মন্থন করবেন। অহং ঠিক করে দেবে কোনটা আপনার সচেতন মনে থাকবে কোনটাকে অচেতন মনের গহনে ঠেলে দেওয়া হবে। অহং যদি না থাকত তাহলে বিশ্রী কাণ্ড হত। যত রাজ্যের ভাবনা একসঙ্গে ঠেলে সচেতন মনে জমে গিয়ে ট্রাফিক জ্যাম বাঁধাতো। অহং যদি ঠিকঠাক কাজ করে তাহলে ব্যক্তির একটি পরিচয় গড়ে ওঠে এবং ব্যক্তিত্বের সামঞ্জস্যও বজায় থাকে।

ব্যক্তিগত অবচেতন বলতে বোঝায় যেসব ইচ্ছা অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা আপনি মনের ভেতর চেপে রেখে দিয়েছেন, অথবা একবারে ভুলেই গিয়েছেন; মনে করতে পারছেন না। ব্যক্তিগত অবচেতন চেতনের কাছাকাছিই থাকে। তবে কাজের সময় অহং তাকে উঠে আসতে দেয় না। ধরুন, আপনি আপনার স্ত্রীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ গল্প করছেন। ঠিক তখন অফিসের সুন্দরী সেক্রেটারির মুখটি আপনার মনে পড়বে না। অহং সেটা ঠেকিয়ে রাখবে। স্ত্রী চলে গেলে হয়তো তখন মনে পড়বে অর্থাৎ ব্যক্তিগত অবচেতন স্তর থেকে সেটা চেতন স্তরে উঠে আসবে।

আমরা কথায় কথায় এখন Complex শব্দটি ব্যবহার করি। যেমন কারও ব্যক্তিত্বে যদি সঙ্কোচ, লজ্জা, হীনম্মন্যতাবোধ দেখি তাহলে বলি, লোকটা Complex -এ ভুগছে।

Complex বস্তুটি কী? এ সম্পর্কে ইয়্যুং সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন, বলেছেন রামের Complex আছে বললে ভুল বলা হবে। মানুষের Complex থাকে না। Complex মানুষকে ধরে। যেন মানুষকে ভূতে পায়। মানুষ ভূতকে পায় না। যেমন কাউকে যদি একটা বিশেষ কোন ধারণা ও চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখে এবং ওই ধারণা তার সাধারণ কাজকে ব্যাহত করে তাহলে তাকে Complex বলা যায়। যেমন এক মহিলার দাঁতের এনামেল উঠে গেছে। তাঁর দাঁতকে আর দন্তরুচি কৌমুদি বলা যায় না। তিনি বিশেষ ভাবে এই অবস্থাটা অবহিত। প্রথমে দু-একজন তাকে বলেছে তোমায় হাসলে ভারি বাজে লাগে। ভদ্রমহিলা এটা নিয়ে সব সময় চিন্তা করেন। ভাবতে ভাবতে তিনি আর দাঁত বার করে হাসেন না। খুব হাসি পেলে মুখ টিপে হাসেন। Complex তাকে আচ্ছন্ন (Obcess) করে।

যারা কমপ্লেক্সে আক্রান্ত

ইয়্যুং বলেন, ছোটখাটো Complex আমাদের কমবেশি সব মানুষকেই প্রভাবিত করে। তবে সাধারণ ভাবে এইসব Complex অচেতন স্তরে থাকে। ইয়্যুং অনুসরণ করে বলি, কেউ যদি তোতলা হন, তাঁর অবচেতন মনে সামান্য Complex বাসা বাঁধলে তিনি হয় কম কথা বলবেন, না হয় তিনি খুব কাজের লোক হবেন। ওই ঘাটতি তিনি পুরিয়ে নেবেন ব্যক্তিত্বকে অন্যদিকে চালনা করে।

Obcession বা আচ্ছন্নতা হল দিনরাত একটা বিষয় নিয়ে ভাবা। যদি অফিসে আপনার কোন সহকর্মী পিছনে লাগে তাহলে তার প্রতিক্রিয়া আপনাকে আচ্ছন্ন করবে। অর্থাৎ বাড়িতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে তার নামে ভ্যানভ্যান করবেন। পরিচিত যার সঙ্গে দেখা হবে তার কাছে লোকটির নামে গালমন্দ অথবা দুঃখ করবেন।

তবে আচ্ছন্নতা ইতিবাচক হলে তা সাফল্যের দিকে ঠেলে দেয়। নেপোলিয়নের আচ্ছন্নতা ছিল তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হবেন। যাঁরা ছোট থেকে বড় হন, তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে বড় হওয়ার তীব্র বাসনা তাঁদের তাড়িয়ে বেড়ায়। শয়নে স্বপনে তাঁরা শুধু ওটি নিয়ে ভাবেন। কিন্তু যাঁরা বিষয়টিকে ভাবনার স্তরে রেখে দেন না, তাকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন তাঁরাই সফল হন। এ বিষয়ে হতাশ হবেন না প্রথম খণ্ড ও আমি বড় হতে চাই এই বই দুটিতে প্রচুর উদাহরণ দিয়েছি।

বই-এর প্রথমদিকে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Persona বা মুখোশের কথা বলেছিলাম। ইয়্যুং বলছেন, মানুষ সমাজে বেরুতে গেলে এক বা একাধিক Persona নিয়ে বেরোয়। প্রয়োজন মত এক একটা মুখোশ পরে নেয়। লোকে আমাদের যেমন যেমন দেখতে চায় আমরা তেমন তেমন দেখাবার জন্য মুখোশ পরি।

ইয়্যুং-এর উদাহরণ একটু বদলে Persona-র একটা দিশী উদাহরণ দি। ১৯৮৪ সালে আমি পাকিস্তানে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। আমি প্রেসিডেন্টের সৌজন্যমুগ্ধ। তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চা খেতে খেতে এক ঘন্টা আমাকে ইন্টারভিউ দিয়েছেন। আমাকে নাম সই করে অ্যালবাম উপহার দিয়েছেন। বিদায়ের সময় আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে বলেছেন, আবার আসবেন। ওই মিষ্টভাষী সৌজন্যে ভরপুর মানুষটি আমার কাছে Persona পরেছিলেন। কিন্তু ভুট্টোকে তিনি যখন গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন তখন তাঁর মুখে নিশ্চয়ই এই একই Persona ছিল না। আর একটি Persona ছিল।

অর্ধনারীশ্বরের সন্ধানে

ইয়্যুং বলেছেন পার্সোনা দিয়ে আর এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বস্তুকে আড়াল করা যায়। সেটি হল ছেলেদের ক্ষেত্রে Anima ও মেয়েদের ক্ষেত্রে Animus। নারীর ভেতরে পুরুষের কিছু চরিত্র লক্ষণ আছে। যেমন সেক্স হরমোন, পুরুষালি স্বভাব, পুরুষালি মূল্যবোধ। একে বলা হয় Animus। তেমনি পুরুষের ভেতর নারী হরমোন, নারীস্বভাব লুকিয়ে থাকে। এই দুটি চরিত্র লক্ষণ নারী ও পুরুষের পরস্পরকে বুঝতে সাহায্য করে। তবে এতে করে আবার ভুল বোঝাবুঝিরও সৃষ্টি হতে পারে। যেমন ধরুন, স্ত্রীর মধ্যে অ্যানিমাসের প্রভাবে দেখা গেল তিনি খুব ভাল অ্যাথলিট হয়েছেন। এটা পুরুষালি গুণ। উনি ওঁর স্বামীর মধ্যে বেশি করে পুরুষালি গুণ পছন্দ করবেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেখা গেল ওঁর স্বামী অ্যানিমার প্রভাবে বেশ কোমলস্বভাব। তিনি শিল্পী সুলভ গুণের অধিকারী। এর ফলে ওঁরা রাজযোটক হবেন না। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের ভেতর অ্যানিমা ও অ্যানিমাসের সামঞ্জস্য না থাকলে দোঁহের মিলন যথার্থ হয় না। কারণ দুজনের ব্যক্তিত্ব আলাদা। ইয়্যুং বলছেন, নারীর মধ্যে পুরুষালি ভাব ও নরের মধ্যে মেয়েলি ভাব যদি প্রকাশ্য না হয়

তাহলে বুঝতে হবে তা অবচেতন মনে রয়েছে। এই যে ইদানীং নারীমুক্তি আন্দোলন নিয়ে হইচই হচ্ছে—মেয়েরা ব্রা পরা ছেড়ে দিচ্ছে। পুরুষের মত চুল ছাঁটছে। কোট-প্যান্ট পরছে, পুরুষের মত শু পরছে, গহনাগাঁটি বর্জন করছে আর পুরুষালি কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা ওই অ্যানিমাসের কল্যাণে। ইয়্যুং অবশ্য এতটা দেখেননি।

ইয়্যুং আরও দেখাচ্ছেন, মানুষের মধ্যে একটা পশু প্রবৃত্তি সেই বিবর্তনের সময় থেকে থেকেই গিয়েছে। এটি খুবই বিপজ্জনক তবে আবার এর ভাল দিকও আছে। ইয়্যুং-এর নাম দিয়েছেন Shadow archtype। এই Shadow যদি সৃজনশীলতার দিকে যায় তাহলে সে মানুষ এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বে পরিণত হবে। দেখা গেছে ডাকাত ও উগ্রপন্থীরা মূলজীবন প্রবাহে ফিরে এসে সৃজনশীল কাজে আত্মোৎসর্গ করলে তারা অনেক বড় কাজ করতে পারে।

ইয়্যুং বলেছেন, চেতন স্তরে ব্যক্তিত্বের দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে অন্তর্মুখীনতা (Introversion) ও বহির্মুখীনতা (Extraversion)। অন্তর্মুখীরা নিজেদের ব্যক্তিগত কাজকর্ম নিয়েই ব্যস্ত থাকে। তাদের দেখলে মনে হয় উদাসীন, চুপচাপ ও অসামাজিক। বহির্মুখীরা বাইরের লোকদের সঙ্গে মেশে। হইচই করে।

ইয়্যুং বলছেন, অন্তর্মুখী লোকেরা কেমন জানেন? তারা মন্ময়নিষ্ঠ, ইংরেজিতে যাকে বলে Subjective। সবকিছুকে নিজেদের মত করে বিচার করেন। ওঁরা ডুবে থাকেন নিজেদের মনোরাজ্যের গহনে। তাঁদের কাছে বাস্তবতা হল সেই মনোরাজ্যের বাস্তবতা—বস্তুজগতের বাস্তবতার সঙ্গে তার মিল নেই।

বস্তুজগত মানে বাইরের পরিদৃশ্যমান জগত। এই বস্তুজগত নিত্যপরিবর্তনশীল। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী সেখানে চলতে হয় ও পদে পদে সমঝোতা করতে হয়। গোঁ ধরে বসে থাকলে চলে না। কিন্তু অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা তো বাস্তবের দরজা বন্ধ করে নিজেদের তৈরি জগতে বাস করেন। তাঁরা যা ভাবেন সেটাই তাঁদের কাছে বাস্তব।

বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব

Extraversion বা বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব বস্তুবাদী অভিজ্ঞতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের নিজস্ব আদর্শ ভাবনা-মূল্যবোধ যাই থাক, সবার ওপরে বাস্তব জগতে যা ঘটছে সেটাকেই তাঁরা বেশি মূল্য দেন। তাঁরা পরিবর্তনের সঙ্গে তাল দিয়ে চলেন। সকলের সঙ্গে মিলেমিশে হইচই করে কাটিয়ে দেন। নিজে যেটা ভেবেছেন, যদি দেখেন, সেই মত চললে তাঁর কোন লাভ হবে না, বরং ক্ষতি তাহলে তিনি তার মত পরিবর্তন করেন।

অন্তর্মুখী ব্যক্তিরা সবসময় চিন্তায় মগ্ন, তাদের নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। তাঁরা কোন জাগতিক ব্যাপারে নিজেদের জড়াতে চান না। চুপচাপ থাকেন। তাঁরা অসামাজিক। এজন্য তারা গর্ববোধও করেন। বলেন, আমি কারও সঙ্গে মিশি না। আমি নিজের মনে থাকি। যা ঘটছে তার সঙ্গে আমি একমত নই। দেখা যায়, সমাজের গতির সঙ্গে তাঁরা কোনদিনই তাল রাখতে পারেন না। মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তবে প্রত্যেকের মধ্যেই কমবেশী অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব পাশাপাশি বাস করে। একটার চেয়ে আর একটা ছাপিয়ে উঠলেই আমরা তখন বলি লোকটা Extrovert অথবা Introvert। বহির্মুখীনতা

বেশি হয়ে গেলে একটা লোকেব মননশীলতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সে খুব আলাপী, চটপটে, সপ্রতিভ। সকলের সঙ্গে যেচে আলাপ করে। কাউকে দাদা, কাউকে মাসীমা, পিসীমা বলে জমিয়ে নিতে পারে। এরা চট করে প্রেমে পড়তে পারে অথবা ছেলে কিংবা মেয়ে পটাতে পারে। অন্যদিকে এরা কোন কিছু গভীরে তলিয়ে দেখেনা। সবই ওপর ওপর। সেজন্য এদের কোন আসক্তি নেই। কমিটমেন্টও নেই। এরা পড়াশোনা করার মধ্যে নেই। এদের কাছে, জীবন সিরিয়াস কোন ব্যাপার নয়। পৃথিবীতে এসেছ। হেসে নাও দুদিন বইতো নয়। অনেককাল আগে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ককে বলেছিলাম, আপনি তো একজন সফল পুরুষ। আমাকে একটা মেসেজ দিন। উনি বলেছিলেন : Don't take life seriously : জীবনকে অত গুরুত্ব দেবেন না, সহজভাবে নিন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভালমন্দ যাহাই আসুক সত্যেরে লও সহজে। কিন্তু এই সত্যের অনুসন্ধান বহির্মুখীদের দিয়ে হয় না। তার জন্য চাই মন্ময়নিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। যাঁরা গভীরভাবে চিন্তা করতে পারেন। এর জন্য জাগতিক ব্যাপার থেকে একটু দূরে থাকলে, কিছু যায় আসেনা।

স্বাভাবিক মানুষের ব্যক্তিত্বের অন্তর্মুখীনতা ও বহির্মুখীনতা একাধারেই থাকতে পারে। দুয়ের ভারসাম্যের ওপর ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিকতা নির্ভর করে। প্রচুর বহির্মুখী ব্যক্তি বই পড়েন, ভাবেন। আমি অনেক কবিকে জানি, তাঁরা কবিতা লেখার সময় ভাবরাজ্যে থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে বাড়িগাড়ি করেছেন। স্ত্রী-পুত্রের জন্য ভালই বন্দোবস্ত করে রেখেছেন। এঁরা আর পাঁচজনের মতই অফিস পলিটিক্সে অংশ নেন এবং সুবিধে বুঝে মতাদর্শের সঙ্গে সমঝোতা করেন।

আবার অনেক বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব হইহই করেই সারাজীবন কাটিয়ে দিলেন। বাস্তববাদী হতে পারলেন না। একজন বিখ্যাত চিত্রতারকাকে চিনতাম। সকলের সঙ্গে বন্ধুর মত মিশতেন। যথেষ্ট জ্ঞানী, কিন্তু বাস্তববাদী ছিলেন না। পয়সা জমাতে পারেননি। বাড়িগাড়ি করেননি। এমনকী, কিছু বইপত্রও লিখে গেলেন না। অথচ তাঁর ক্ষমতা ছিল।

আমার নিজের মধ্যে আছে বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্বের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। এক এক সময় এক একটা ব্যক্তিত্ব মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বহির্মুখী ব্যক্তিত্ব না থাকলে আমি খবরের কাগজে রিপোর্টারের চাকরি করতে পারতাম না। রিপোর্টার থাকার সময় কলকাতার হেন ভি.আই.পি. ছিল না যে আমি তাঁর সঙ্গে না মিশেছি। আমি কোন পার্টি বা সামাজিক নেমন্তন্নে আমন্ত্রিত হয়েছি অথচ যাইনি এমন ঘটনা বিরল ছিল।

অথচ আমি পাড়ার লোকের সঙ্গেও যেচে কথা বলতে পারি না। আমি জীবনে কখনও ট্রেনে বা প্লেনে সহযাত্রীর সঙ্গে যেচে আলাপ করিনি। আমার একা একা বসে চিন্তা করতে ভাল লাগে। বৃদ্ধবয়সে পরিবার পরিজন ছেড়ে আসামের শিলচর শহরে একটা ছোট্ট ঘরে একা তিন বছর কাটিয়ে দিলাম। অনেকেই পারতেন না। আবার অন্যদিকে আমার ছাত্র-ছাত্রী ও সমমনস্ক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতে ক্লান্তবোধ করি না।

ব্যক্তিত্বের এমন দ্বিমুখীতা আপনাদের অনেকের মধ্যেই আছে। তবে কম। ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে এবার ইয়্যুং-এর মতবাদ বিশ্লেষণ করা যাক। ইয়্যুং-এর মতে শৈশবে ছেলেমেয়েরা সবাই কমবেশী ভাবগত সমস্যায় ভোগে (Emotional difficulties)-এর জন্য তার গৃহপরিবেশের বিশৃঙ্খলাই দায়ী। যতক্ষণ না একটি বাচ্চা স্কুলে যাচ্ছে ততক্ষণ

তার স্বকীয়তাবোধ (Personal identity) জন্মায় না। অর্থাৎ আমি যে একটা সত্তা (Self). আমি অন্যদের থেকে আলাদা ভাবে ভাবি; আমার একটা নিজস্ব জগৎ আছে এই বোধটা স্কুলে এসে হয়। অনেক ছেলেমেয়ের সঙ্গে মিশে সে যেমন একটা ঐক্যবোধ অনুভব করে তেমনি স্বাতন্ত্র্যও অনুভব করে। অতি শৈশব থেকে শিশু বাবা-মায়ের মানসিক ছত্রছায়ায় মানুষ হয়। ইয়্যুং একে বলেছেন, 'Psychic atmosphere'। বাবা-মায়ের চিন্তা-ভাবনার বাতাবরণেই শিশু বড় হয়। সে চালিত হয় তার কতগুলি প্রবৃত্তির দ্বারা। এই প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করে দেয় বাবা-মা। কিন্তু শিশুর মধ্যে যদি কোন অবাধ্যতা, একগুঁয়েমি বা অস্বাভাবিক আচরণ দেখা দেয় তাহলে সেটা যে শিশুর ইচ্ছাকৃত এটা বললে ভুল বলা হবে। এরকম কোন কিছু ঘটলে আগে বাবা-মায়ের অবস্থান ও তার সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক অনুসন্ধান করতে হবে। শিশুর ব্যক্তিত্ব ও আচরণের ক্ষেত্রে তার বাবা-মায়ের অবদানের কথা আরও অনেক মনোবিজ্ঞানী বলে গিয়েছেন।

মনোবিদ অ্যাডোরনো এট অল (Adorno et al 1950) বলেছেন বড় হয়ে যারা কর্তৃত্ববাদী (Authoritarian) হয় তাদের ব্যক্তিত্বের উৎস খুঁজতে গেলে তাদের শৈশবে চলে যেতে হবে। কোন শিশু কীভাবে মানুষ হচ্ছে তার ওপরই নির্ভর করবে তার ভবিষ্যৎ ব্যক্তিত্বের গঠন।

এই প্রসঙ্গটা আরও বেশি করে ওঠে একটি প্রচলিত ধারণা সম্পর্কে। ছোটবেলায় শিশুদের কড়া শাসনে রাখলে তাদের ব্যক্তিত্বের ভালমত বিকাশ হয় এমন একটা ধারণা সব সমাজেই প্রচলিত আছে। ইংরাজিতে একটা কথা আছে যদি শিশুর মাথা খেতে চাও তাহলে লাঠি তুলে রেখে দাও। শিশুর মনোবিকাশের ক্ষেত্রে কড়া শাসনের ভূমিকা নিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা সমীক্ষা করেছেন। তাঁদের বক্তব্য : কড়া শাসনের ফলে ছেলেমেয়েদের মনে বাবা-মা সম্পর্কে বিদ্বেষ গড়ে ওঠে এবং সেই বিদ্বেষ তারা প্রকাশ করে কোন দুর্বল লক্ষ্যের ওপর। আবার দেখা যায় পরবর্তীকালে তারা নিজেরাও একনায়ক হয়ে উঠতে পারে। যেমন ছোটবেলায় স্ট্যালিন বাপের কড়া শাসনে নির্যাতিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে স্ট্যালিন কঠোর নিষ্ঠুর ও একনায়কসুলভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। মনোবিদরা এজন্য স্ট্যালিনের পিতাকে দায়ী করেছেন।

বধূ নির্যাতনের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানে দেখা যায় নির্যাতনকারী শাশুড়িদের অনেকেই তাঁদের বধূজীবনের নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। আমার শৈশবে বাবা আমাকে যখন মারধর করতেন তখন বাবার প্রতি আমার প্রবল বিদ্বেষ হত। এবং যেহেতু আমি খুব বলশালী ছিলাম না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মারপিট করে সেই বিদ্বেষ দমন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই আমি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করতাম : ফড়িং ধরে তাদের পাখা ছিঁড়ে দিয়ে। একবার একটি জ্যান্ত কইমাছ আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছিলাম।

ছেলেমেয়েদের ওপর অভিভাবকদের নজরদারি দরকার কিন্তু তাদের অবিশ্বাস করার ফলে তাদের মধ্যে প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে। যেমন যেসব বাবা-মা মেয়েদের, ছেলেদের সঙ্গে মিশতে দেন না এবং কড়া শাসনের মধ্যে রাখেন তাঁদের মেয়েরা অনেকে বাবা-মাকে লুকিয়ে প্রেম করে এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে।

বাবা-মা ভাবেন, তাঁদের কড়া নজরের ফলে মেয়ে কোন ছেলের দিকে মুখ তুলে চাইতেই পারবে না। কিন্তু এই বজ্রআঁটুনি ফসকা গেরো বলে শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয়।

নয়

ইয়্যুং-এর বয়ঃসন্ধি

শৈশব থেকে এবার বয়ঃসন্ধির ক্ষেত্রে চলে আসা যাক। বয়ঃসন্ধিকে ইয়্যুং বলছেন মানসিক জন্ম (Psychic birth)। কারণ এসময় মনের মধ্যে তুমুল পরিবর্তন আসে। যৌনতার উদ্‌গীরণ (Eruption) হয়। এই সময় থেকে বাবা-মায়ের সংস্পর্শ ছাড়িয়ে তাদের মানসিক স্বাতন্ত্র্যের শুরু। এই সময়টায় যদি ছেলেমেয়ে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইতে নিতে না পারে তাহলে তার শৈশব প্রলম্বিত হয়। অর্থাৎ সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত শিশুই থেকে যায়। প্রথমত সমস্যা দেখা দেয় পেশা বা বৃত্তি বাছার ক্ষেত্রে।

ইয়্যুং উদাহরণ দিয়েছেন, একটি ছেলের ছোটবেলা থেকে ইচ্ছে পাইলট হবে। ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে দেখা গেল তার চোখের পাওয়ার বেশি, পাইলট হওয়া হবে না। এখন সে যদি অন্য পেশায় যোগ না দেয় তাহলে সে কিন্তু প্রলম্বিত শৈশবেই থেকে যাবে, যেখানে সে বায়না ধরলে বায়না পূরণ হত। উত্তর বয়ঃসন্ধিকালে বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে মোকাবিলা করতে না পারার ফলে অনেক ছেলেমেয়ের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় বসে চান্স না পেয়ে আমাদের মাসকমিউকেশন পড়তে আসত। কিন্তু ভেতরে ভেতরে কেউই তাদের অপারগতাকে স্বীকার করে নিতে পারত না।

কলকাতায় আমার এক ছাত্রী ডাক্তারিতে ভর্তি হতে গিয়ে কিছুটা সফল হয়ে কী কারণে যেন শেষ পর্যন্ত পারল না। তারপর থেকে মেয়েটি মানসিক রোগী হয়ে গেল। এখন কঠোর দুঃখের মধ্যে তার জীবন কাটছে।

একবার এক ব্যক্তিত্ব বিকাশ শিবিরে আমি ছাত্রছাত্রীদের এক এক করে জিজ্ঞাসা করছিলাম, তোমাদের কী সাধ ছিল বল, যা পূরণ হয়নি। তখন একটি মেয়ে বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলল। সেই মেয়েটিও ডাক্তার হতে চেয়েছিল। জয়েন্ট এন্ট্রান্সে পারেনি। পরে অ্যানথ্রপলজি নিয়ে বি.এস-সি. পড়ল। শেষমেশ মাসকমিউনিকেশনে এল। এখন ওর অবচেতন মনে ওই অপারগতা এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে যে তার সমস্ত সম্ভাবনাকে তা যেন ক্রমশ গ্রাস করছে। দেখা গেল প্রতি পরীক্ষার আগে সে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আবার পরীক্ষা দিলেও ভাল ফল করতে পারছে না।

বয়ঃসন্ধির সময় যৌন তাড়নাও অনেক ছেলেমেয়েকে অস্বাভাবিক করে তোলে। অথবা ছেলেমেয়েরা অতিমাত্রায় অনুভূতিপ্রবণ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে দেখা দেয় নিরাপত্তাহীনতা। আমি যখন ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্লাসে ছেলেমেয়েদের বলি, তোমরা কে কে উদ্বেগে ভুগছ হাত তোল। দেখি সবাই হাত তুলছে। তখন বলি তোমাদের উদ্বেগটা কী? সবার উত্তর

নিরাপত্তাহীনতা। আমরা পাস করে বেরিয়ে যদি চাকরি না পাই?

ইয়্যুং বলছেন, যখন তাদের কোন সমস্যা থাকার কথা নয়, তখনই তারা সমস্যায় ভুগছে। এজন্য এই সময়টায় প্রত্যেককে সিদ্ধান্ত নিতে ও বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে শেখাতে হবে। এই বইয়ের শেষ অংশে আমরা ইতিবাচক ব্যক্তিত্ব গঠনের পথ নির্দেশ নিয়ে আলোচনা করেছি।

মধ্যবয়সের ব্যক্তিত্ব

এইবার আসা যাক মধ্যবয়সে। ৩৫ থেকে ৪০। ইয়্যুং-এর মতে মধ্যবয়স। আমি ৬০ পর্যন্ত মধ্যবয়স ধরছি। এই বয়সের মানুষের ব্যক্তিত্বের একটা বড়দিক হল আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি আগ্রহ। ইয়্যুং বলছেন, আধ্যাত্মিক চেতনা মানুষের বৌদ্ধিক মনের (Phyche) একটা অংশ। তা সবার মধ্যেই থাকে তবে তা তখন লুকিয়ে থাকে। বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই দরজাটা ক্রমশ খুলতে থাকে। এই বয়সের মধ্যে যার যা কিছু পাবার তা পেয়ে যায়। টাকাপয়সা, সম্মান, খেতাব, বড় পদ, প্রমোশন। স্ত্রী-পুত্র গাড়ি বাড়ি, অর্থ এবং কাম চতুর্বর্গের দুটো বর্গই তখন মানুষের আয়ত্তে। কিন্তু তবু আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। জীবন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সব পেয়েও মনে হয় কি যেন পেলাম না। তখন মানুষ আত্মোপলব্ধির চেষ্টা করে। খুঁজতে চেষ্টা করে জীবনের মানে কী? (Meaning of his individual life) ইয়্যুং মধ্যবয়সের ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রথম কাজ করেন। ফ্রয়েড ও এরিকসন ব্যক্তিত্বের আধ্যাত্মিক দিকটি খতিয়ে দেখেননি। ইয়্যুং নিজে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ-এর অনুরাগী ছিলেন। তাঁর রোগীদের বেশীর ভাগই ছিল মধ্যবয়সী।

ইয়্যুং বৃদ্ধবয়স সম্পর্কে বলতেন দ্বিতীয় শৈশব। বৃদ্ধবয়সে শৈশবের মতই অবচেতন মানুষ অবচেতন মনের দ্বারাই পরিচালিত হয়। এটা ঘটে ধীরে ধীরে। শেষ পর্যন্ত মানুষ অবচৈতন্যের মধ্যেই লুপ্ত হয়ে যায়। ইয়্যুং মনে করতেন সব ধর্মেই মৃত্যুর পর পরলোকের কথা আছে। তাই এটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ইয়্যুং মনে করেন আমাদের ঐহিক মৃত্যু হলেও মনের মৃত্যু হয় না অর্থাৎ Physchic life বেঁচে থাকে। (গীতা যাকে আত্মা বলেছে সেটাই কী Physchic life?) ইয়্যুং বুদ্ধদেবের কর্ম শব্দটির উল্লেখ করে বলেছেন, বৌদ্ধ কর্মবাদ অনুসারে মানুষ যেমন কর্ম করে তদনুসারে তার পুনর্জন্ম নির্ধারিত হয়। এই কর্ম যতক্ষণ না শেষ হয় ততক্ষণ পুনর্জন্ম হতে থাকে। অবশেষে আসে কর্মসমাপ্তি নিধান। 'A state of oblivion in which pain, suffering and all external reality cease to exist. এটাই মনোজগত Psyche-এর শেষ অধ্যায়।

ইয়্যুং এই 'সাইক' এর শেষ পর্যায়ের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেননি। তিনি বৌদ্ধিক আধ্যাত্মিক ধারণাকে মেনে নিয়েছেন বিশ্বাস দিয়ে। ইয়্যুং-এর তত্ত্বই হল প্রতিটি মানুষের আচরণ নির্ধারিত হয় তার ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য দিয়ে। অর্থাৎ প্রতিটি আচরণের একটি লক্ষ্য থাকে। উদ্দেশ্য ছাড়া কোন আচরণ হয় না। সুতরাং ফ্রয়েড যেটা বলতেন, মানুষের আচরণ যান্ত্রিক। তা অদস, অহং এবং অতি অহং চালিত। ইয়্যুং সেটাকে মেনে নিয়েই বলছেন আচরণ শুধু যান্ত্রিক (Mechanistic) নয়, সেই সঙ্গে উদ্দেশ্যমূলকও (Purposive)। যেটা ঘটে গেছে বা ঘটছে সেটার উপর নির্ভর করবে ভবিষ্যতে কী ঘটবে।

ইয়ুং-এর তত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের ব্যক্তিত্ব তার লক্ষ্য অনুসারে তৈরি হয়। ব্যক্তিত্বকে আমরা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবেই ব্যবহার করি। সাইকিক মূল্যবোধের পরিমাণ অনুসারে মানুষ সাইকিক শক্তি লাভ করে থাকে। ব্যক্তিত্বের শক্তিকেই বলে সাইকিক শক্তি। সাইকিক মূল্যবোধের একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধে হবে। ধরুন রাম যা কিছু সুন্দর তাই ভালবাসে। সুন্দর বাড়ি, বাগান, সুন্দরভাবে সাজানো ঘর। সুন্দরের প্রতি ভালবাসাই হল ইয়ুং-এর ভাষায় 'সাইকিক' মূল্যবোধ। রামবাবু তাঁর মূল্যবোধ অনুসারে চেষ্টা করবেন এই সুন্দর বস্তুগুলি পেতে। এই মূল্যবোধ অনুসারে এক একজনের ব্যক্তিত্ব এক একরকম হয়। যিনি ক্ষমতাকে বেশি মূল্য দেন তাঁর শক্তি ব্যয় হবে ক্ষমতা অর্জন করতে। দুটি মূল্যবোধের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধলে শেষ পর্যন্ত যে মূল্যবোধকে সে ধরে রাখে সেটাই তার প্রকৃত সাইকিক মূল্যবোধ। ধরুন, আপনি ব্যবসা করে বড়লোক হতে চান, কিন্তু একটা ছোট ব্যবসা শুরু করতে গিয়ে দেখলেন ব্যবসা ফেল করে গেল। আপনি ধুত্তোর বলে চাকরিতে ঢুকে পড়লেন। আপনার সাইকিক মূল্যবোধ যে ব্যবসা নয় তা বোঝা গেল। কারণ সাইকিক মূল্যবোধ বাধার মধ্যেও দৃঢ় হয়। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। আমার সাইকিক মূল্যবোধ হচ্ছে সাহিত্য করে আনন্দ পাওয়া। আমি সাহিত্য করতে গিয়ে সারাজীবন ধরে শুধু বাধাই পেয়েছি, কোন অনুকূল অবস্থা পাইনি। খ্যাতি ও অর্থ যা এসেছে তা পরিশ্রমের তুলনায় সামান্য। আমার স্ত্রী বার বার বলেছে লেখা ছেড়ে দাও। সেই সময়টা অন্য কাজ করো। আমি শুনিনি। লেখা চালিয়ে গিয়েছি। কারণ এটাই আমার সাইকিক মূল্যবোধ। আমার সাইকিক ব্যক্তিত্ব সাহিত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে।

সাইকিক মূল্যবোধ, কমপ্লেক্স ও ভাবগত প্রতিক্রিয়া (Emotional reaction) আমাদের অবচেতন স্তরে লুকিয়ে থাকে। সেটি নানাভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশ পায়। হয়তো আমরা নিজেরা সে সম্পর্কে সচেতন নই। কিন্তু মনোবিদরা তা ধরে ফেলে দেবেন।

সাইকিক মূল্যবোধের উদাহরণ দিয়েছি। এবার লুকনো কমপ্লেক্সের উদাহরণ দেই। অনেক মেয়ে দেখবেন কথা বলার সময় বার বার মা, বাবা অথবা স্বামীর উল্লেখ করেন। 'উনি এটা বলেছেন, উনি ওটা বলেছেন,' এইজনাই তো উনি বলেন...। কেউ আবার সব সময় বউ-এর গল্প করেন। আমার বউ বলল : কেউ বলে মায়ের কথা। বুঝতে হবে কমপ্লেক্স তাঁদের পেয়ে বসেছে। Father Complex, Mother Complex, Wife Complex, Complex-এর ছড়াছড়ি।

অনেক সময় আমরা ক্ষণিকের জন্য একটা নাম বলতে গিয়ে আর একটি নাম বলে ফেলি। অনেকে বউকে ডাকতে গিয়ে মায়ের নাম ধরে ডেকে ফেলে। তারপর ভুল সংশোধন করে নেয়। এই ধরনের ভুল কিন্তু অর্থহীন নয়। এটা ও Complex থেকে হয়।

যাকে অবচেতন মনে পছন্দ করেন না দেখবেন, তার নাম কিছুতেই মনে রাখতে পারছেন না। আবার কারও একটা প্রশ্ন শুনে আপনি হঠাৎ চমকে গিয়ে একটু নীরব রইলেন। তারপর উত্তর দিলেন। ওই যে বিরতিটুকু, এটা ঘটল কেন? অনেক সময় মিথ্যা চাপা দেবার জন্য এটা হয়। আবার অনেক সময় কোন Complex থাকলে এটা হয়।

যেমন ধরুন, আপনার পরিচিত একটি ছেলের নাম মৃত্যুঞ্জয়। কিন্তু হঠাৎ একটা প্রসঙ্গ উঠতেই তার নামটা ভুলে গেলেন। অনেক চেষ্টা করেও সে সময় মনে পড়ল না। ইয়ুং-

এর তত্ত্ব অনুসারে মৃত্যু শব্দটির জন্যই আপনি মৃত্যুঞ্জয়ের নাম ভুলে গেলেন। কারণ আপনার মধ্যে মৃত্যু Complex রয়েছে। Death Complex হল অবচেতন মনে মৃত্যুচিন্তা, মৃত্যুভীতি। মৃত্যু শব্দটিকে আপনি পরিহার করতে চান। ইয়্যুং তাঁর নিজের ভাষা জার্মান থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন একজনের বন্ধুর নাম Tod। সে হঠাৎ বন্ধুর নামটাই ভুলে গেল। সাইকোঅ্যানালিসিস করে দেখা গেল Tod শব্দটির সঙ্গে Todi (মৃত্যু) শব্দের মিল আছে। আর লোকটির মৃত্যু Complex আছে। তাই Todi-র সঙ্গে মিল আছে এমন নামটি সে প্রয়োজনমত মনে করতে পারছে না।

Complex-এর কথা যখন উঠল তখন Inferiority ও Superiority দুটো Complex নিয়ে কিছু বলি। আমরা প্রায়ই এই শব্দ দুটি ব্যবহার করি। কাউকে শ্লাঘা করতে দেখলে ভাবি লোকটি শ্রেষ্ঠমন্যতা বা Superiority Complex-এ ভুগছে। আবার কেউ নিজেকে হীন ভাবলে বলি লোকটা হীনম্মন্যতায় ভুগছে। নির্বিচারে এ-দুটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে কারও মনোবিশ্লেষণ না করে এসব কথা বলা ঠিক নয়। আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন একটা সামান্য ব্যাপারে আমার এক বন্ধুর কাকা আমাকে লিখেছিল, 'যেখানে নিজের সম্পর্কেInferiority Complex সেখানে সকল কথাই দ্ব্যর্থক, সকল রশ্মিই তির্যক।' কথাটা যুৎসই ঠিকই, কিন্তু আমার ছাত্রজীবনে কোন হীনম্মন্যতাই ছিল না। বরং এখন মাঝে মাঝে এটা হয়। তবে আমি গরিবের ছেলে ছিলাম, বন্ধুরা জমিদারের ছেলে। তাদের ধারণা থাকতে পারে যে গরিবদেরই বুঝি হীনম্মন্যতা থাকে। মোটেই তা নয়। যে কোন লোকের যে কোন পরিস্থিতিতে হীনম্মন্যতা হতে পারে। হীনম্মন্যতা নিয়ে সর্বপ্রথম বিস্তৃত আলোচনা করেছেন মনোবিদ অ্যালফ্রেড অ্যাডলার (১৮৭০-১৯৩৭) ফ্রয়েডের মত অ্যাডলারও ইহুদি ও জার্মান ভাষী এবং পেশায় ডাক্তার ছিলেন। মনোবিদ ও চিকিৎসকদের স্বর্গ ভিয়েনাতেই তার জন্ম এবং কর্মভূমি। চোখের ডাক্তারি ছেড়ে তিনি জেনারেল প্র্যাকটিশ শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত মনোচিকিৎসাই হয়ে ওঠে তাঁর বিষয়। মনোবিদ হিসাবে তিনি এত সফল হন যে তাঁকে কেন্দ্র করে আমেরিকা ও উত্তর আমেরিকায় সোসাইটি অব অ্যাডলেরিয়ান সাইকোলজির নানা শাখা গড়ে ওঠে। ১৯৩৫ থেকে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত জীবনের শেষ দু'বছর অ্যাডলার নিউইয়র্ক শহরে কাটান।

অ্যাডলারের সঙ্গে ফ্রয়েডের তফাত হল : ফ্রয়েড বলতেন মানুষের মন যেন হিমবাহ বা আইসবার্গ। বেশির ভাগটাই সমুদ্রের নীচে, অদৃশ্য। তাকে আমরা বলি অবচেতন এবং অচেতন মন। বাইরে মনের যে অংশটা থাকে সেটা সামান্যই। আমাদের বাইরের মনকে চালাচ্ছে ভেতরের মন।

অ্যাডলার বললেন : ফ্রয়েডের তত্ত্ব মানি না। ফ্রয়েড যা বলছেন ঘটনাটা তার উল্টো। অর্থাৎ বাইরের মনটাই আসল। ভেতরে অবচেতন ও অচেতন মন আছে বটে তবে সেটা সামান্য। মন যদি একটা গাছ হয় তাহলে তার বাইরের পত্রপুষ্প শোভিত চেহারাটাই বড়, মাটির তলাকার শেকড়টা আছে সামান্য জায়গা জুড়ে।

অ্যাডলার বলেন, আমাদের লক্ষ্য মূলত কাল্পনিক—Fictional। সব মেয়েই কিশোরী বয়সে ভাবে তার বর হবে প্রিন্স চার্মিং, ঝলমলে রাজপুত্র। সব যুবক স্বপ্ন দেখে তার বউ হবে স্বপ্নে দেখা রাজকন্যে। কিন্তু বাস্তবে তা কী হয়? কিন্তু বাস্তবে রাজপুত্র রাজকন্যা

জুটছে না বলে মানুষ কী বিয়ে করা ছেড়ে দিচ্ছে? না তা নয়, যার ভাগ্যে যেমন জুটেছে তাকে নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। মনে মনে কল্পনা করে নিতে হয় এই আমার প্রিন্স চার্মিং। এই আমার উর্বশী-রম্ভা-মেনকা।

মানুষের লক্ষ্য দিনে দিনে আরও উন্নতি করা, আরও নৈপুণ্য অর্জন করা। কিন্তু এই 'আরও' শব্দের কোন শেষ নেই। ইংরাজিতে একটা কথা আছে Even the best can be improved। তাহলে best বলে কিছু নেই। কিন্তু বাস্তবে তো একটা জায়গায় দাঁড়ি টানতে হয়। যেমন প্রত্যেক মোটরগাড়ির একটা সর্বোচ্চ স্পিড থাকে। ঘণ্টায় কত মাইল যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে শেষতম বা সর্বোচ্চ গতি অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাহলে দুর্ঘটনাব ভয় থাকে। অথবা রাস্তার অবস্থা অনুসারে সব সময় ওই সর্বোচ্চ স্পিডে চালানো যায় না। আমি আমেরিকায় ঘণ্টায় ৮০/৯০ মাইল বেগে চলা গাড়িতে চড়েছি। ওদেশে হাইওয়েগুলি দ্রুতগতিতে গাড়ি চালাবারা জন্যই তৈরি কিন্তু তা সত্ত্বেও সব সময় এই গতি রাখা যায় না। আবার গাড়ির গতিবেগ খাতায় কলমে আরও বেশি। কিন্তু সেই গতিতে কেউ চালায় না।

মানুষের একটা আদর্শ উন্নতির স্তর আছে। মূল্যবোধের কথাই যদি বলেন, সর্বোচ্চ কত মূল্য দেওয়া যেতে পারে তারও একটা প্রাইসট্যাগ আছে। ত্যাগ বলতে সর্বোচ্চ ত্যাগ কী? না আত্মত্যাগ। কোন ক্ষেত্রে আত্মত্যাগ করা যায়? দেশের জন্য। আপনি কী দেশেব জন্য জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত? যদি দিতে পারেন তো সবচেয়ে ভাল, তাহলে শহিদ হিসাবে দেশবাসীর শ্রদ্ধা পাবেন। কিন্তু সবাইতো আত্মত্যাগের জন্য তৈরি নয়। তাহলে তারা কী সবাই ভীরু কাপুরুষ অপবাদ পাবে? তা কেন, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ভূমিকা থাকে। দেশ আক্রান্ত হলে যে লোকটি যুদ্ধে না গিয়ে সৈনিকের জন্য তরবারি তৈরি করছে তার দামও কম নয়। যে যুদ্ধ তহবিলে অর্থ দিচ্ছে সেও একটা বড় কাজ করছে দেশের জন্য। কিন্তু কিছুটা ত্যাগ করা দরকার। চরম আত্মত্যাগের পরাকাষ্ঠা আছে বলেই লোকে তার সাধ্যমত আত্মত্যাগের জন্য তৈরি থাকে। সেজন্য সর্বক্ষেত্রেই একটা টার্গেট বা লক্ষ্য ঠিক করা হয়। এখন তার মধ্যে যতটুকু লাভ করা যায় ততটুকুই ভাল। টার্গেট না থাকলে এটুকুও হত না। আমি জীবনে যতটুকু পেয়েছি তা আমার টার্গেটের ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ। কিন্তু যদি টার্গেট না রাখতাম, এলেমেলোভাবে চলতাম আর ভাগ্যের কাছে দুর্বলমনে ভিক্ষা চাইতাম তাহলে এইটুকুও পেতাম না। তাই আমি যা পেয়েছি তাতেই খুশি। কারণ আমার বাস্তবকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। এইজন্য অ্যাডলার সব সময় চূড়ান্ত লক্ষ্যকে কাল্পনিক চূড়ান্ত লক্ষ্য বা Fictional final goal বলেছেন।

অ্যাডলার বলছেন, ধরুন সব মানুষকে ঈশ্বর সমানভাবে সৃষ্টি করেছেন (All men are created equal) কিন্তু বাস্তবে সত্যিই কী তাই? সব মানুষের বুদ্ধি, মেধা, শক্তি কী সমান? সবাইকে সমান সুযোগ দিলে সবাই কী একই গুণের অধিকারী হতে পারবে? কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আপ্ত বাক্যটির প্রয়োজন আছে। কারণ তা মানুষের প্রতি মানুষের আচরণের পথ নির্দেশ করে। সব মানুষকে সমান বলে ভাবলে অন্তত পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি আমরা কিছুটা সহানুভূতিমূলক আচরণ করব।

সব মানুষ সমান এই আদর্শের ভিত্তিতে ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল। পরবর্তীকালে

বলশেভিক বিপ্লবের মূল প্রেরণা ছিল এই সাম্য। কিন্তু এই নীতি কোথাও কার্যকর করা যায়নি। ফরাসি বিপ্লবের মূল উদ্দেশ্যও কার্যকর করা গেল না। বলশেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়ায় সাম্যবাদী সমাজ গড়ার চেষ্টা হল ৭৩ বছর ধরে। সব মানুষকে সমান শিক্ষা ও সমান সুযোগ দেওয়া হল। সবাইকে তার প্রয়োজনমত সম্পদ বন্টন করে দেওয়া হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল সব মানুষ সমান হল না। কিছু মানুষ প্রতিভা নিয়ে জন্মায়, কিছু মানুষ প্রতিভা অর্জন করে, কিছু মানুষ সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারে না। সুযোগ পেলে বহু লোকই তার বর্তমান অবস্থা ফেরাতে পারে। স্বল্পভাষী বাচাল হতে পারে কিন্তু মূক বাচাল হয় না। সে বড়জোর দু'একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারে মাত্র।

অচলায়তন যারা ভাঙে

হতাশ হবেন না বইতে আমি অনেক উদাহরণ দিয়েছি, কীভাবে মানুষ চেষ্টা করে তার অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু কখনও মনে ভ্রান্তি রাখা উচিত নয় যে সবাই চেষ্টা করলে বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ বা রবীন্দ্রনাথ হতে পারবে। কিন্তু চেষ্টা করলে মূর্খ সাক্ষর হতে পারে। সাক্ষর ম্যাট্রিক পাশ করতে পারে। পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া ম্যাট্রিক পাশ গৃহবধূ চেষ্টা করে এম.এ. পাশ করে, ডক্টরেট হয়ে কলেজে পড়াচ্ছে। আমি যখন চাকরিতে ঢুকি তখন আমি শুধু গ্র্যাজুয়েট ছিলাম। চাকরি করতে করতেই এম.এ. পি.এইচ.ডি. হয়েছি।

ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্ষেত্রে তাই অ্যাডলারের Fictional final goal-এর অন্তর্নিহিত কথা মনে রাখতে হবে। নাস্তিকেরা ঈশ্বর বা পাপপুণ্যে বিশ্বাস করেন না। উন্নাসিকেরা আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী নয়। তরুণেরা সবযুগেই পুরাতন মূল্যবোধকে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু সব কিছুরই একটা অন্তর্নিহিত সত্য আছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বে যারা বিশ্বাস করে তারা মনে প্রচণ্ড শান্তি পায়, হোক না ঈশ্বর অলীক, কিন্তু এই শান্তিটা তো সত্যি। যারা নিয়মিত নামাজ পড়ে, সন্ধ্যাহ্নিক করে, গির্জায় যায়, তাদের মধ্যে ভণ্ড থাকতে পারে কিন্তু নাস্তিকদের মধ্যেও কী বদলোক নেই? বরং ধার্মিক লোকদের একটা প্রবণতা থাকে জীবনে চরম দুঃখ ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করা। এতে তারা দুঃখ সহ্য করার শক্তি পায়। যদি কোন ধর্ম বা ধর্মগুরু বলেন, পুজো আচ্চা, যাগ যজ্ঞ বা গুরু সেবা করলে, পাঁচবার দিনে নামাজ পড়লে, রোজা করলে তার আর কোন ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি হবে না, তার কোন প্রিয়জনের মৃত্যু হবে না। তার উত্তরোত্তর আর্থিক সমৃদ্ধি হবে, তার অকালমৃত্যু হবে না তাহলে বুঝতে হবে তিনি ধোঁকা দিচ্ছেন। জাগতিক দুঃখকষ্ট ক্ষয়ক্ষতি সর্বনাশ এবং উন্নতি হয় জাগতিক নিয়মে তার মধ্যে ঈশ্বরের কোন হাত নেই। ঈশ্বরের নাম করে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়া বন্ধ হয় না। মানুষের ঐহিক উন্নতি হয় তার নিজের কঠোর পরিশ্রমে। অথবা পরিশ্রম কমিয়ে অসৎপথে রাতারাতি বড়লোক হওয়া যায়। কিন্তু চাকরিতে উন্নতি হয় কাজের লোক বলে নিজেকে প্রমাণ করতে পারলে অথবা ওপরওয়ালাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে। তা দৈব বলে হয় না। অনেক সময় অপ্রত্যাশিতভাবে পরিবেশ অনুকূলে এসে যায়। তেমনি অপ্রত্যাশিতভাবে অবস্থা প্রতিকূলে চলে যেতে পারে। ঈশ্বর পুলিশ কর্মচারী বা রেলের মালবাবু কিংবা চেকার নন, যে

ঘুষ দিলেই খালাশ পাওয়া যাবে। কারণ ছাড়া কার্য হতে পারে না। ধর্ম, নীতি, ঈশ্বর মানুষকে সৎ হতে সাহায্য করে। সততা সাহায্য করে নির্ভীক হতে, কর্মঠ হতে। কারণ সৎ মানুষ জানেন, তিনি ফাঁকি দিতে পারবেন না তাঁকে কাজ করতেই হবে। এজন্য তাঁকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। দক্ষ হতে হবে। এইভাবে দক্ষতা অর্জন করেই তিনি স্বীকৃতি পান। অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। তিনি কর্মফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে শান্তি পান। কারণ তিনি জানেন, কর্মফল লাভের বাসনা তাঁকে যেমন উৎসাহ যোগাতে পারে তেমনি প্রত্যাশিত ফল না পেলে তাঁকে নিরুৎসাহ করতে পারে। তিনি বসে যেতে পারেন। আর বসে যাওয়া মানেই তাঁর সর্বনাশ। ঈশ্বর তাঁর উৎসাহদাতা, তাঁর শেষ আশ্রয়। সুতরাং ঈশ্বর স্বর্গে থাকুন না থাকুন ব্যক্তিমানুষের কাছে কিছুই এসে যায় না। কারণ ঈশ্বর তাঁর হৃদয়ে। ঈশ্বরচিন্তা এক ব্যক্তিগত অনুভূতি। হয়তো তা অলীক কিন্তু তারও প্রয়োজন আছে জীবনে। অ্যাডলার তত্ত্বটিকে আমি একটু ভারতীয় মতে ব্যাখ্যা করে নিলাম। আধ্যাত্মচেতনার সঙ্গে রয়েছে জীবনের সম্পর্ক আর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনস্তত্ত্ব। ব্যক্তিত্ব এই মনস্তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই।

হীনম্মন্যতা দূর করার উপায়

অ্যাডলার মনে করেন সমস্ত মানুষ যে কর্ম করে তার প্রাথমিক প্রেষণা একটাই, হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠে শ্রেষ্ঠ হওয়া। প্রতিটি মানুষের উদ্দেশ্য সেই সাবানের বিজ্ঞাপনের স্লোগানের মত 'Day by day lovlier দিনে দিনে সুন্দর হওয়া। তাই আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় কেমন ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমরা দেখব তার ওপর। অর্থাৎ লক্ষ্য এবং প্রত্যাশার ওপর। এই লক্ষ্য ও প্রত্যাশার রকমফের আছে। কিন্তু অধিকাংশ তরুণ-তরুণীকে জিজ্ঞাসা করে দেখেছি তারা লক্ষ্য বলতে বস্তুবাদী লক্ষ্যের কথাই বলে। ভাল কেরিযর করবো। মোটা মাইনের চাকরি করবো। মেয়েরা এখন কেউই চাকরিবাকরি না করে বিয়ে করতে চায় না এটা খাবাপ আমি বলছি না। কিন্তু মেয়েদের মূল্যবোধ পাল্টাচ্ছে। সন্তান প্রতিপালনের চেয়ে তারা কেরিয়ারকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তাদের মূল্য লক্ষ্য (Goal) বদলাচ্ছে। প্রত্যাশা পাল্টাচ্ছে (আগের মত ভাল শ্বশুরবাড়ি নয়, ভাল চাকরি, ভাল পার্কস)। এই লক্ষ্য ও প্রত্যাশা পরিপূর্ণ না হলে আমাদের মনে হীনম্মন্যতা দেখা দেয়। আমরা ভাবি আমরা বুঝি অপারগ, আমাদের যোগ্যতা নেই।

একদিকে হীনম্মন্যতা আমাদের টানছে অন্যদিকে শ্রেষ্ঠ হবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের আকর্ষণ করছে, এই দুয়ের টানাপোড়েনে আমরা চেষ্টা করে যাই যতখানি সম্ভব নিখুঁত হবার।

অ্যাডলারের মতে হীনম্মন্যতা হচ্ছে কোন কাজে নিজেকে দুর্বল এবং আনাড়ি ভাবা। এটা কিন্তু প্রচলিত অর্থে হীনম্মন্যতা নয়। সেখানে হীনম্মন্যতা মানে অন্যের তুলনায় 'মুই অতি ছার' বা নিজেকে ছোট ভাবা। অ্যাডলার হীনম্মন্যতা বলতে বোঝেন যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের নিরন্তর সংগ্রামে পিছিয়ে পড়া। ধরুন আপনি একজন শিল্পী। আপনি চাইছেন ফিদা হুসেনের মত ছবি আঁকবেন। হুসেন আপনার লক্ষ্য। আপনি চেষ্টা করছেন, খুব বেশি এগুতে পারছেন না। আকাদেমিতে একটা প্রদর্শনী করেছেন। কিন্তু ভাল রিভিউ পাননি। ভাল বিক্রিও হয়নি। তবু আপনি চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আশাভঙ্গের মধ্য দিয়ে

এই বারবার চেষ্টা করে যাওয়াটাই হীনম্মন্যতা বোধ থেকেই আসছে। এক্ষেত্রে হীনম্মন্যতা ইতিবাচক। প্রচলিত অর্থে নেতিবাচক। সেখানে হীনম্মন্যতা আপনাকে বসিয়ে দেয়। উদযোগ নষ্ট করে। It is the feeling of inferiority that gives birth to the striving for superiority, and together they make up the great upward drive that pushes us continually to move "from minus to plus, from below to above."

অ্যাডলার বলেন, হীনম্মন্যতার জন্য একদম ঘাবড়াবেন না। এটা জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। আমরা প্রত্যেকে জীবন শুরু করি একটা ছোট, দুর্বল প্রাণী হিসাবে। (একটা নবজাত শিশুকে দেখুন। কত অসহায় এবং পরনির্ভরশীল সে। ভাবুন তো যিশু, বুদ্ধ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, ওদিকে আলেকজান্ডার, নেপোলিয়ন, হিটলার সবাই এমন অসহায় শিশু হয়ে জন্মেছিলেন।)

সারাজীবন ধরে আমরা যত অপরিচিত নিত্যনতুন কাজকর্মের সম্মুখীন হই তত আমাদের নিজেদের হীন মনে হয়। মনে হয় এই কাজ আমাদের সড়োগড়ো হওয়া দরকার। একজন ডাকসাইটে প্রফেসর শেষ বয়সে এসে দেখছেন ব্যাপকভাবে কম্পিউটার এসে গেছে। এটা এখন সবাই শিখেছে। তিনি এখনও শেখেননি। তাকে শিখতেই হবে। এই হীনম্মন্যতা বোধ থেকে তিনি কম্পিউটার শিখে নেবেন। আমার এই গুণটা নেই, এটা আমায় অর্জন করতে হবে এই মনোভাব থেকেই পৃথিবীতে যত ব্যক্তিগত উন্নতির শুরু। আমি বাঙালি ছেলেদের দেখি ভাল ইংরেজি বলতে পারে না। অথচ স্পোকেন ইংলিশে সড়গড় না হলে বিশ্বায়নের যুগে করে খাওয়া মুশকিল। যারা সবাইকে শেখাচ্ছে ইংরোজি শিখে কাজ নেই। মাতৃদুগ্ধ স্বরূপ মাতৃভাষা শিখলেই চলবে তারা আসলে ভণ্ড। এখন এই হীনম্মন্যতা থেকে অনেক ছেলে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে ভর্তি হচ্ছে। কারণ তারা ইংরেজি বলতে পারা ছেলেমেয়ের সমকক্ষ হতে চায়। আসলে এটা শুধু প্র্যাকটিশের ব্যাপার। অ্যাডলারের তত্ত্ব ব্যক্তিত্ব গঠনের পক্ষে একটি মূল্যবান সূত্র। কোন ব্যক্তি যদি মনে করে আমি এটা জানি না তাতে কী হয়েছে। পৃথিবীতে এত জিনিস আছে, সব জানা কী একজনের পক্ষে সম্ভব? যেটা দরকার না জানলে নয়, শিখে নেবো। তাহলেই সে তার হীনম্মন্যতা কাটিয়ে উঠতে পারে।

খবরের কাগজে এখন পুরো কম্পিউটার চালু হয়ে গেছে। আমাদের সময় এটি ছিল না। আমি তাই শিখিনি। যদি চাকরিতে থাকতাম নিশ্চয়ই শিখে নিতাম। মধ্যবয়সী অনেক কর্মী অনেক চাকরিতে আছেন যাঁরা কম্পিউটার জানেন না। তাদের মনে হীনম্মন্যতা আছে। সবাই কেমন শিখে নিল, আমি এখনও শিখলাম না। এই হীনম্মন্যতাবোধ থেকে তারা এখন কম্পিউটার শিখে নিচ্ছেন।

অ্যাডলারের মতে শ্রেষ্ঠম্মনাতা হীনম্মন্যতাকে লুকিয়ে রাখারই একটা প্রক্রিয়া। কাজেই শ্রেষ্ঠম্মন্যতা আসলে হীনম্মন্যতারই আর একটা রূপ। কারণ হীনম্মন্যতাও অনেক সময় শ্রেষ্ঠম্মন্যতাকে লুকিয়ে রাখে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আছেন। তিনি নিয়মিত গীতা ও ভাগবত পাঠ করেন। এই গ্রন্থ দুটি নিয়মিত পাঠের ফলে তাঁর প্রায় সবটাই মুখস্ত হয়ে গিয়েছে। এতে তিনি ভাবেন তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু সেই

শ্রেষ্ঠম্মন্যতাকে লুকিয়ে রাখে। (আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক আছেন। তিনি নিয়মিত গীতা ও ভাগবত পাঠ করেন। এই গ্রন্থ দুটি নিয়মিত পাঠের ফলে তাঁর প্রায় সবটাই মুখস্ত হয়ে গিয়েছে। এতে তিনি ভাবেন তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত।) কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠম্মন্যতাকে চাপা দেবার জন্য তিনি হীনম্মন্যতা প্রকাশ করেন। কথায় কথায় বার বার বলেন, আমি মুখ্যু মানুষ, আপনার মত অত পণ্ডিত নই। অথবা আমি কী আপনাদের মত অতশত বুঝি। এইসব বই তোতাপাখির মত পড়ে যাই। আপনারা হলেন সত্যিকারের পণ্ডিত। মনে আছে আমি যখন ডক্টরেট করলাম তখন আমার বস আমার ওপর ভেতরে ভেতরে এত চটে গেলেন যে আমার যাতে চাকরির উন্নতি না হয় তার বেশি করে চেষ্টা করতে লাগলেন। আমি ভিজিটিং কার্ডে ডঃ লিখেছিলাম বলে তিনি আমার ডঃ উপাধিটা কেটে দিলেন। বললেন, কোম্পানির পয়সায় কার্ড ছাপাতে গেলে আলাদা কিছু লেখা যাবে না। অ্যাডলার তত্ত্ব অনুসারে মিলিয়ে দেখলাম ভদ্রলোকের হম্বিতম্বি, অধঃস্তনদের সব সময় চোখ রাঙানো ও নিজেকে জাহির করা আসলে তাঁর হীনম্মন্যতাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা।

জীবনে যাঁরা নিজেদের অযোগ্যতা, অপরাগতা ও চাপা মনোবেদনা (Depressison)-র জন্য বড় হতে ব্যর্থ হন তাঁরা এই ব্যর্থতার পিছনে অজুহাত খোঁজার চেষ্টা করেন। তখন তাঁরা তাঁদের লুকনো শ্রেষ্ঠম্মন্যতার দরুন বিশ্বাস করতে শুরু করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং সেকারণে সবাই তাঁতে খোশামোদ করুক।

অ্যাডলার তত্ত্ব অনুসারে এই খোশামোদ নেবার স্পৃহা আসে হীনম্মন্যতা থেকেই। হয়তো তাঁর আকাঙ্ক্ষিত কোন লক্ষ্য পূরণ হয়নি সেই ক্ষোভ পুষিয়ে নেবার জন্য তিনি সকলের কাছে খোশামোদ প্রত্যাশা করেন। খোশামোদ হচ্ছে তাঁর ভেতরকার ঘাটতির কৃত্রিম পূরীকরণ।

ব্যক্তিত্বের ব্যর্থতা

ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে সাফল্যবোধ ও ব্যর্থতাবোধ দুটোই দারুণভাবে কাজ করে। কোন মানুষই ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়তে চায় না। তার মানসিকতাই তাকে পিছিয়ে দেয়। কুঁজোরও চিৎ হয়ে শুতে ইচ্ছে হয়। ভিখারিও লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে। লাখোপতি ভিখারিও আছে। তারা কয়েক লক্ষপতি হতে চায়। কিন্তু নানা কারণে তারা ভিখারির জীবন ত্যাগ করতে পারে না। যৌনকর্মীদেরও গৃহবধূ হতে ইচ্ছা জাগে। কিন্তু তারা পারে না। যেখানে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মানুষ ইপ্সিত বস্তু লাভ করতে পারে না সেখানে তাদের ব্যর্থ বলা যায়। কিন্তু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয় কম লোক। অধিকাংশই চেষ্টা না করে ব্যর্থ হয়। রাম কোনদিনই মন দিয়ে পড়ল না। তাই ফেল করে গেল।

এছাড়া ব্যর্থ হয় কয়েক শ্রেণীর মানুষ। কারণ তাদের মানসিকতাই সাফল্যের পরিপন্থী। যেমন নিউরোটিক, সাইকোটিক, অপরাধী, মাতাল, সমস্যা-শিশু, আত্মহত্যা প্রবণ ব্যক্তি, বিকৃতকামী, বারবধূ প্রমুখেরা ব্যর্থ কারণ তাদের মানসিকভাবে সমাজ আগ্রহ (Social interest) নেই। তারা মনে করে চাকরি বা পেশার ক্ষেত্রে, বন্ধুত্ব বা যৌন সম্পর্কের ক্ষেত্রে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক অন্যপক্ষের সহযোগিতা ছাড়াই টিকে থাকবে। অর্থাৎ আপনার বন্ধুকে তার বিপদে না দেখলে আপনি কখনও আশা করতে পারেন না যে

সে আপনাকে অসময়ে দেখবে। ওপরে যে শ্রেণীর কথা বললাম তারা ভাবে তারা ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করলেই হয়ে গেল। তাদের বিজয় শুধু তাদের কাছে। কিন্তু 'সামাজিক আগ্রহ' বস্তুটি নিজেদের উন্নতির সমানতালে সমাজকে নিখুঁত করার জন্য সঙ্কল্প। সেটা তাদের মধ্যে থাকে না।

অ্যাডলার সামাজিক আগ্রহের কথা বলতে গিয়ে একটি জার্মান শব্দ ব্যবহার করতেন 'Gemein schaftsgefuhl'। এটি এখন সমাজতত্ত্ব অভিধানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে। এর অর্থ সামাজিক আগ্রহ তথা সারাজীবন ধরে অপরের মঙ্গলের প্রতি আগ্রহ ও চিন্তাভাবনা বজায় রাখা।

সামাজিক আগ্রহ ব্যক্তিত্বের একটি গুণ। এটি জন্মসূত্র থেকে মানুষ লাভ করে থাকে। তবে শৈশবে এই গুণ সুপ্ত থাকে। বাবা-মা, বিশেষ করে মা যদি শিশুর মধ্যে অন্যের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি করিয়ে না দিতে পারেন, তাহলে শিশু ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। তার ব্যক্তিত্ব হয়ে পড়ে সংকীর্ণ। সেজন্য প্রত্যেক মায়েরই উচিত শিশুর মনে সমাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো। ব্যক্তিত্বের এই ইতিবাচক দিকটি লাভ করা সম্ভব যদি মা :

১. ছেলেমেয়েদের নিয়ে নিয়মিত আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীর বাড়িতে যান।

২. ছেলেমেয়েদের যদি পাড়ার ক্লাবে ভর্তি করিয়ে দেন যেখানে ছেলেমেয়েরা আর পাঁচজনের সঙ্গে মিশে যৌথভাবে কিছু করতে শেখে।
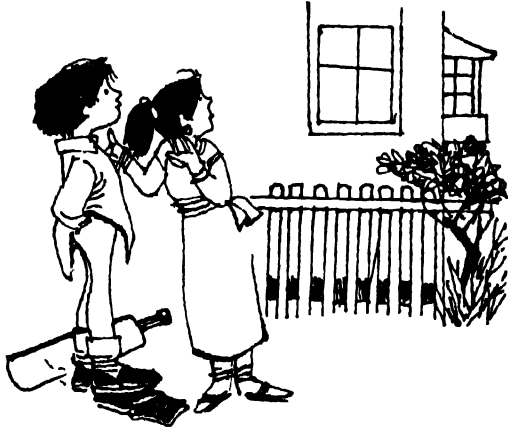
বয়ঃসন্ধির সময়কার দুই ছেলেমেয়ে

৩. বাবা-মায়ের সমাজসেবা ও সামাজিক কাজকর্মের প্রতি আগ্রহ থাকলে ছেলেমেয়েদেরও সেই কাজে শামিল করে তোলেন। যেমন অনেক পরিবার রোটারি ক্লাবের সদস্য। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও রোটারাক্ট ক্লাবের সদস্য।

৪. শৈশব থেকে ছেলেমেয়েদের সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মানুষের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। স্কুলে অ্যাডলারের মতে আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বে কিছু না কিছু অসম্পূর্ণতা আছে। তার ফলে হীনম্মন্যতা জাগা স্বাভাবিক। সেটা কাটিয়ে ওঠা যায় সমাজের প্রতি

আগ্রহ বাড়ালে।

Our striving to overcome our particular inferiorities leads us to struggle to improve society as a whole. The state of perfection toward which we all strive is one in which individual and society live, love and work together harmoniously.

সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে উদাসীন থেকে শুধু নিজের পরিবারের কথা চিন্তা করাটা ব্যক্তিত্বেরই অসম্পূর্ণতা। এই ধরনের পলায়নী মনোভাব থেকে এমন সমাজের জন্ম হয় যে সমাজের পরিবর্তন হয়ে পড়ে ধীরগতি। আর একটা সময় আসে সমাজের পরিবর্তন না হলে মানুষেরও পরিবর্তন হয় না, হলে সেই পরিবর্তন কোন কাজে আসে না। যেজন্য ভারতের মত দেশে এত প্রতিভাবান লোক থাকা সত্ত্বেও দেশের উন্নতি হচ্ছে না। কারণ প্রতিভাবানরা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের ঘরে আগল দিয়ে রয়েছেন।

বড়-মেজো-ছোট : ব্যক্তিত্বের তারতম্য

Birth order বা জন্মের কালক্রম অনুসারে ব্যক্তিত্বের যে তারতম্য ঘটে তা নিয়ে অ্যাডলার একটি মডেল তৈরি করেছেন। অ্যাডলারের মডেলটি তৈরির আগে আমাদের সমাজে বড়, মেজ ও ছোট সম্পর্কে প্রচলিত কতগুলি ধারণা প্রচলিত ছিল। যেমন বড় ছেলে হলে পরিবারের দায়দায়িত্ব তার ওপর এসে পড়ে। বয়সে বড় হলে সে অন্য ভাইবোনদের

বাবা ছেলেকে : তোমাকে আর আমি একটা টাকাও দেব না

দাবিয়ে রাখতে চায়। সে রাগী, সহনশীল, ত্যাগশীল, উদার। সম্পন্ন পরিবার হলেও সে পড়াশোনার বেশি সুযোগ পায় না। আমার পিসেমশাই তাঁর বড় ছেলেকে ম্যাট্রিক দেবার পরই তাঁর জুয়েলারির কারবার দেখার জন্য দোকানে ঢুকিয়ে দেন। কিন্তু মেজো ছেলেকে ডাক্তারি পড়ান। সেজ ও ছোট দুজনেই গ্র্যাজুয়েট হয়। গ্রামে অনেক পরিবারে বড় মেয়েকে

স্কুল ছাড়িয়ে দেওয়া হয় বাকি ভাইবোনদের মানুষ করার জন্য।

বড় ভাই বহু কষ্ট করে ছোট ভাইদের মানুষ করেছে এনিয়ে অনেক গল্প-উপন্যাস ছায়া-ছবি আছে। মেজ ছেলেদের বলা হয় খুব চতুর ও স্বার্থপর। ছোট ছেলে আদরে মানুষ হয়। অনেক সময় বৃদ্ধ বয়সের সন্তান বলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিও অপরিণত থাকে। ছোট ছেলের উপর অন্যান্য ভাইরা দাদাগিরি ফলায় বলে ছোট ছেলের ব্যক্তিত্বের যথাযথ বিকাশ হয় না। এবার অ্যাডলার যে মডেলটি করেছেন সেটা দেখা যাক :

বড় ছেলে : প্রথমদিকে অর্থাৎ আর একটি ভাই-বোন জন্মাবার আগে পর্যন্ত সে বাবা-মায়েব আদরের দুলাল। কিন্তু ভাইবোন জন্মাবার পরই সে অবিমিশ্র ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়। তখন বাবা-মায়ের আদর যত্ন ভাগাভাগি হয়ে যায়। এতে দুই ভাই বা দুই বোনের মধ্যে বা দুই ভাইবোনের মধ্যে ঈর্ষা সৃষ্টি হতে পারে। অন্যদিকে ভাইবোনের আবির্ভাবে বড় ছেলের মধ্যে দাদা হবার গর্ববোধ জেগে ওঠে। ভাই-বোনকে দেখার দাযিত্ব তার ওপর পড়ে। ভাই-বোন তাকে মান্য করে। এজন্য বড় ছেলে দায়িত্ব নিতে শেখে ও ছোট ভাই-বোনকে দেখভাল কবার মত তার দায়িত্ববোধ জন্মায।

বড় ভাই-এর ব্যক্তিত্ব : দায়িত্বশীল, স্নেহ বৎসল, নৈরাশ্যবাদী, রক্ষণশীল, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর ব্যাপারে ব্যর্থ।

দ্বিতীয় সন্তান : (মেজো ছেলে)। মেজ ছেলে-মেয়ে বা দ্বিতীয় সন্তান বাবা-মায়ের আদর ভালবাসা পায় জন্ম থেকেই। সে আরও স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ হয়। কারণ প্রথম সন্তানের জন্মের পর কয়েক বছর পেরিয়ে যায় ইতিমধ্যে। বাবা-মায়ের চাকরিতে উন্নতি হয়, আয় বাড়ে। পরবর্তীকালে তৃতীয় সন্তান হলে সে দাদা বা দিদির কাছ থেকে যেমন যত্ন পায় তেমনি ভাই বা বোনের কাছ থেকে পায় আনুগত্য। তাই তার জীবনে কোন ঘাটতি থাকে না। অ্যাডলার বলেন, দ্বিতীয় সন্তানের ব্যক্তিত্ব-বৈচিত্র্য হল, সে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, সামাজিক বিষয়ে আগ্রহী, তার মানিয়ে চলার ক্ষমতা বড় ও ছোটর থেকে বেশি। কিন্তু তার চরিত্রে থাকে বিদ্রোহ আর ঈর্ষা, অপরকে ছাড়িয়ে যাবার প্রবণতা।

কনিষ্ঠ সন্তান : ছোট ছেলেমেয়ে মানেই আদুরে ছেলে-মেয়ে। বাবা-মা ছাড়াও সে পায় দাদা-দিদিদের আদর। অনেক সময় দিদির বিয়ে হয়ে গেলে পায় জামাইবাবুর আদর। তাকে সাহায্য করার লোকও অনেক। সব সময় প্রশ্রয় পেতে সে অভ্যস্ত। সে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার অনেক সুযোগ পায়। অন্যদিকে ওর মধ্যে থাকে স্বভাবসিদ্ধ হীনম্মন্যতা বোধ। তার প্রবণতা থাকে সমস্যাশিশু হয়ে যাবার। কারণ পরিবেশের কিছুই তার উপযুক্ত মনে হয় না।

একমাত্র সন্তান : এক সন্তানের ব্যক্তিত্ব নিয়ে এ পর্যন্ত অনেক গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে। চিনে দ্বিতীয় সন্তানের জন্ম আইনত নিষিদ্ধ হওয়ায় গোটা সমাজ সেখানে নানা সমস্যার সম্মুখীন, কারণ সবাই সেখানে একমাত্র ছেলেমেয়ে। ভাইবোন কী তা তারা জানে না।

ভারতীয় পরিবারেও আমরা দেখেছি এক ছেলের মায়েরা অত্যধিক অধিকারপ্রবণ হয়। সারাজীবন ধরে ছেলের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে চায় ও ছেলের বউ-এর জীবন অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট করে দেয। এক ছেলের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাবা-মা গলা টিপে মেরে ফেলে।

এক মেয়ের বিবাহিত জীবনকে তারা নষ্ট করে দেয়। জামাইকে তার বাবা-মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখতে চায় নতুবা মেয়েকে দূর থেকে নিয়ন্ত্রিত করে। এবার অ্যাডলার সাহেব কী বলেন দেখা যাক : এক সন্তানের প্রবণতা বাবা-মায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামা। কারণ তার আর তো কোন ভাইবোন নেই। এক ছেলে সব সময়
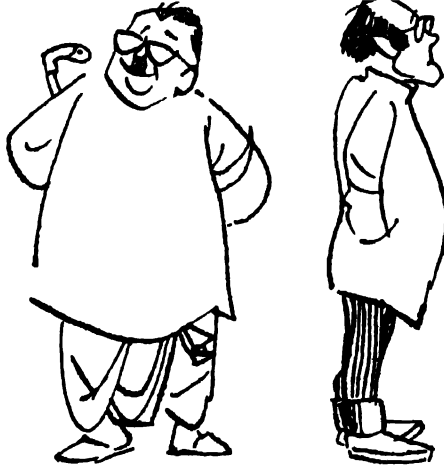
প্রৌঢ় ব্যক্তিত্ব

Pampered, সব সময়ই তাকে আতুপুতু করে রাখা হয়। অ্যাডলার এক ছেলের মধ্যে কোন ইতিবাচক গুণ দেখেননি। এক ছেলে সব সময় আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকতে চায়। সে প্রতিযোগিতায় নামতে ভয় পায়। সে সব সময় মনে করে সে ঠিক, অন্যেরা ভুল। ছোটবেলায় বাবা-মায়ের অত্যধিক প্রশ্রয় (Pampering) ছেলেমেয়েদের সর্বনাশ করে। তারা সমাজ সম্পর্কে অনাগ্রহী হয়ে ওঠে। তারা সমাজকে কিছু দেবে না। উল্টে চাইবে সমাজই তাদের সবকিছু দিক।

অ্যাডলারের মতে Pampered individuals are potentially the most dangerous of all people in society। অর্থাৎ Pampered ব্যক্তিত্ব সমাজের পক্ষে সবচেয়ে বিপজ্জনক।

যেহেতু ব্যক্তিত্ব গঠন শৈশব স্তরে হয়ে যায় সেহেতু আজকের সমাজে মধ্যবিত্ত পরিবারে শিশুরা অত্যধিক প্রশ্রয় পেয়ে বড় হয়ে ওঠে।

দশ

প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্ব

সমাজবদ্ধ জীব হিসাবে অধিকাংশ মানুষের ব্যক্তিত্ব সমাজের রীতিনীতি নিয়মকানুন ও সংস্কৃতির অনুগামী হয়ে গড়ে ওঠে। সভ্যসমাজের প্রথম নিয়মটি ছিল, নারী-পুরুষকে নগ্ন থাকা চলবে না। তাদের পোশাক পরতে হবে। সভ্যতার আলো যারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেনি। আন্দামানের জাড়োয়ারা এখনও পোশাক পরে না। কারণ তাদের সমাজে নগ্ন থাকাটাই প্রথা। কিন্তু সভ্যসমাজে যদি কেউ নগ্ন হয়ে ঘোরাফেরা করতে চায় তাকে আমরা ব্যতিক্রমী ব্যবহার বলব। পশ্চিমের সব দেশেই মেয়েরা নগ্ন হয়ে স্টেজে স্ট্রিপটিজ শো করে। সমুদ্রসৈকতে অর্ধনগ্ন হয়ে শুয়ে থাকে। যৌনজীবন যেকোন দেশের বয়স্ক নরনারীর জীবন চর্চারই অঙ্গ। কিন্তু এই যৌনতারও কিছু নিয়মকানুন আছে। একটি হল, শুধু বিবাহিত দম্পতিদেরই যৌন-সঙ্গমের বৈধ অধিকার দেওয়া আছে। দুই অবিবাহিত প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর মধ্যে যৌনসঙ্গম আইনত নিষিদ্ধ না হলেও তা সামাজিকভাবে নিন্দনীয়। কিন্তু বহু নারীপুরুষ তা মানে না। পশ্চিমদেশে অনেক নরনারী ইচ্ছামত বিবাহ বহির্ভূত সহবাস করছে। আইন অনুসারে অধিকাংশ দেশে, সমকামীত্ব নিষিদ্ধ। কিন্তু সবদেশেই নারী-পুরুষ সমকামীদের সংখ্যা বাড়ছে এবং তাঁরা প্রকাশ্যেই নিজেদের সমকামী বলে চিহ্নিত করতে গর্ববোধ করে। পৃথিবীতে অনাদিকাল থেকে লক্ষ লক্ষ নারী গণিকাবৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে গণিকাদের সামাজিক মর্যাদা দেওয়া হত এবং তাদের পেশা সমাজ স্বীকৃত ছিল। ইদানীং আধুনিক বিশ্বে গণিকাদের যৌনকর্মী বলে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে এবং গণিকারা দাবি করছে তাদের কাজকেও বৈধ শ্রম বলে গণ্য করতে হবে। গণিকারা পুরুষের অতৃপ্ত যৌনক্ষুধার নিবৃত্তি করছে। নিজেদের দেহ দেওয়াটা 'সার্ভিস' ছাড়া আর কিছুই নয়। তারা স্বেচ্ছায় অর্থের বিনিময়ে তাদের দেহ ভাড়া দিচ্ছে। কারও নিজ বাসস্থানের একটা অংশ যদি কেউ ভাড়া দেয় তাহলে তা অবৈধ বলে কেউ গণ্য করে না। তাহলে কেউ যদি তার দেহ ভাড়া দেয় তাহলে তা অবৈধ হবে কেন? তার নিজের দেহের ওপর তার কী কোন অধিকার নেই? এই সমস্ত নানা তর্কবিতর্ক তুলে সমস্ত বিষয়টিকে এখন লোকে নতুন করে ভাবছে।

যৌনকর্মীদের অনেকেই শোষণের শিকার। কিন্তু স্বেচ্ছায় যৌনকর্মী হয়েছেন দুটো পয়সা রোজগারের জন্য এমন হাজার হাজার নারী আছেন। তাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, হংকং, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যত দেশ ঘুরেছি সর্বত্র স্বেচ্ছা যৌনকর্মীদের দেখেছি। যারা ব্যক্তিগত জীবন ও যৌনকর্মীর জীবন পাশাপাশি চালিয়ে যাচ্ছেন। ২০০০ সালের

হিসাবে তাইলাণ্ডে ৬১ মিলিয়ন জনসংখ্যার এক মিলিয়নই যৌনকর্মী।

এখন যাঁরা প্রথাসিদ্ধ সামাজিক জীবনের আওতা থেকে বেরিয়ে এই জীবন বেছে নিচ্ছেন তাঁদের ব্যক্তিত্বের গঠন কেমন? ভার্জিনিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ক্লিফটন ডি. ব্রায়ান্ট (Clifton D. Bryant) এঁদের 'প্রথাবিরোধী (Deviant) ব্যক্তিত্ব' বলেছেন। শুধু গণিকাররা নয়, যৌনজীবনে প্রথাবিরুদ্ধ রীতিনীতির নানা ধরনের প্রাবল্য দেখা দিচ্ছে। যেমন যৌথ-যৌনতা বা Group sex. স্ত্রী বিনিময় (Wife swaping) মিশ্রকামিতা, একাধারে সমলিঙ্গ ও বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সঙ্গম (Heterosexuality)। এইগুলি যৌনজীবনে প্রথাবিরোধিতা। শুধু যৌনজীবন কেন, প্রথাবিরোধিরা জীবনের সবক্ষেত্রেই রয়েছে। চোর-ডাকাত, খুনী, ধর্ষণকারী সকলেই প্রথাবিরুদ্ধ কাজের সঙ্গে লিপ্ত বলে তাদের আচরণকে প্রথাবিরুদ্ধ আচরণ বলতে পারি। তবে এই ধরনের প্রথাবিরুদ্ধ আচরণ ঘৃণ্য বলে সমাজ মনে করে কিন্তু বহুক্ষেত্রে প্রথাবিরোধিতা বা বিদ্রোহকে লোকে প্রশংসা করে। আসলে প্রথা ভাঙ্গার ইচ্ছা সকলের মনেই লালিত হতে থাকে। কেউ যদি সাহস করে প্রথা ভাঙে তাহলে সে সকলের প্রশংসা পায়। তাদের Mavericks, Rebel এইসব নামে অভিহিত করা হয়। শিল্পে ও সাহিত্যে প্রথাভঙ্গকারীকে সব সময় প্রশংসা করা হয়। রাজনীতিতে প্রথাভঙ্গকারী বিদ্রোহীকে পুজো করা হয়। ব্রায়ান্ট বলছেন:

We like people who are daring, audacious, and such persons have been military leaders, such as General George Cuser, General Billy Mitchell, or General George Patton, political leaders such as Ardrew Sackson, or Harry Truman, industrialists and merchants such as Henry Ford or Clarance Saunders (the originator of the grocery supermarket) actors such as James Dean and Errol Flynn and musical composers such as John cage and Spike Jones. Americans have tended to value novelty and innovation, and stubbornness and conviction, and flair and eccentricty, even it deviant in terms of some set of standards. It has been said that the line between genius and insanity is thin, and also that the line between ingenuity and nonconformity (if not rebellion) is also slender.

শুধু আমেরিকানরা নয়, ভারতেও লোকে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ও খ্যাপাটে ধরনের ব্যক্তিদের পছন্দ করে। এই ব্যতিক্রমীরা কখনও প্রথাসিদ্ধ পথে চলেন না। তাদের খেয়ালখুশিমত পথে তারা চলেন এবং যেটা ভাল বোঝেন তেমন করেন। যেমন আধুনিককালে মেধা পাটেকর, ফিদা হুসেন, বালঠেকারে, শাবানা আজমি, তসলিমা নাসরিন প্রয়াত শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁদের প্রথাবিরুদ্ধ আচরণের দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ঔৎসুক্য সমর্থন ও বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তাঁদের এই নাটকীয় কাজকর্ম যেমন বৃদ্ধ হুসেনের হঠাৎ মাধুরী দীক্ষিত সম্পর্কে Obcession অথবা একদা মমতার গলায় ফাঁস লাগিয়ে Hysteric আচরণ, অথবা প্রয়াত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অত্যধিক পানাসক্তি এগুলি জনসাধারণের কাছে তাঁদের ব্যক্তিত্বকে আরও বর্ণময় করে তুলেছে। কিন্তু প্রথাবিরুদ্ধ ব্যবহার কী ব্যক্তিত্বসঞ্জাত না স্বেচ্ছাকৃত?

ব্রায়ান্ট প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে গোড়াতেই বলেছেন, ব্যতিক্রমী ব্যবহার কদাচ এলোমেলো, তাৎক্ষণিক, লক্ষ্যহীন, অপ্রত্যাশিত অথবা অনিয়ন্ত্রিত (Seldom haphazard, extemporancous, random, screndipitious or unrestrained) বরং এই ধরনের ব্যবহার পরিকল্পিত এবং পূর্বনির্ধারিত।

যারা চুরি করে, ডাকাতি, রাহাজানি, লুটপাট করে তারা আগে থেকে পরিকল্পনা করেই এসব করে। তাদের উদ্দেশ্য উপার্জন করা। এটাই তাদের পেশা। এ ধরনের পেশা যারা গ্রহণ করে তারা একটা বিশেষ পদ্ধতি বেছে নেয়। এই পদ্ধতি পুলিশের ভাষায় বলা হয় Modus operendi। তারা এই পদ্ধতির বাইরে যায় না। যেজন্য পদ্ধতি দেখে পুলিশ বলে দিতে পারে এই অপরাধ কারা করেছে। আমি দীর্ঘদিন লালবাজারে ক্রাইম রিপোর্ট করেছি। লালবাজারের প্রবাদপুরুষ গোয়েন্দা দেবী রায় চুরি ছিনতাই, প্রতারণার পদ্ধতি দেখে বলে দিতে পারতেন ওটা কার বা কাদের কাজ। একজন অপরাধী কেন হয় এর পিছনে অনেকে অনেক কারণ দর্শাবার চেষ্টা করেন। অনেকে সমাজব্যবস্থার কথা বলেন, আমি পুলিশদেরও বলতে শুনেছি, চাকরি বাকরি নেই, বেকাররা কী করবে বলুন। কিন্তু তাহলে দেশের আড়াইকোটি বেকার অপরাধী কেন হচ্ছে না? বেকারদের তুলনায় অপরাধীর সংখ্যা আর কতটুকু? তাছাড়া আমি অনেক অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলেকে অপরাধী হতে দেখেছি। পরিবেশ তাই অপরাধী হওয়ার একমাত্র কারণ হতে পারে না। বস্তির পরিবেশে থেকেও কত ছেলেমেয়ে পড়াশোনায় ভাল হয়েছে। তারা জীবনে কঠোর সংগ্রাম করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অপরাধী হবার পিছনে জিনের যেমন প্রভাব আছে তেমনি আছে সহজে বড় লোক হবার লোভ। পরিবেশের কাছ থেকে সে বিশেষ সাহায্য পায়নি। অথচ অন্তরে মূল্যবোধগুলি দানা না বাঁধায় তার ইদ বা অদসই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্ব অনুসারে (Abnormal Psychology) অপরাধীর প্রথাবিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। তবে উপার্জনের সহজ পথ একবার কেউ পেয়ে গেলে সহজ অর্থটাই তখন বড় উৎসাহ হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দিলেও মনোগত অস্বাভাবিকত্ব কাটিয়ে তুলে কাউকে সুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী করলে সে অপরাধ ছেড়ে দিতে পারে। কিন্তু কোন যৌনকর্মী যদি মনোগতভাবে অতি যৌনতায় (Hyper sex) ভোগে তাহলে তাকে অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দিয়েও গণিকাবৃত্তি থেকে সরিয়ে আনা যাবে না। বহু ভদ্রঘরের মেয়েদেরও দেখেছি Hyper sex হওয়ার জন্য স্বামীর সঙ্গে মিলনে তৃপ্ত হচ্ছে না বহু পুরুষের সঙ্গে যৌনসংসর্গ করে কামনা মেটাচ্ছে। এটিকেও আপনি প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্ব বলতে পারেন। কিন্তু তা কিন্তু উদ্দেশ্য বিহীন নয়। গ্রুপ সেক্স বা স্ত্রী বিনিময় এবং দুটি দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক সম্মতিতে একে অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে যৌনসঙ্গম করার অভ্যাস ওই Hyper sex-এর অন্তর্ভুক্ত। এর উদ্দেশ্য যৌন একঘেয়েমি কাটিয়ে চরম যৌনানন্দ লাভ। যেমন মানুষ সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয় ঈশ্বরকে লাভ করার তুরীয় আনন্দ পাবার জন্য। রাজনীতি ও সমাজসেবায় জীবন উৎসর্গ করে যেমন অনেকে চরম আনন্দ পায়।

প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্ব কী?

সভ্যসমাজের কতগুলি নিয়মকানুন ও মূল্যবোধ আছে। আছে প্রচলিত আইন ও দেশাচার। সুস্থ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব এই নিয়মকানুন ও মূল্যবোধগুলিকে মর্যাদা দিয়ে থাকে। কিন্তু

সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ প্রচলিত মূল্যবোধকে মানতে চায় না। তারা হয়ে ওঠে স্বেচ্ছাচারী তারা কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। কেউ ভদ্রতা, বিনয়, নমনীয়তা এবং এমনকি ফৌজদারি আইনও মানে না। তারা উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করে, মারদাঙ্গা করে, সমাজবিরোধিতে পরিণত হয়। এদের বলে প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্ব, এদের মধ্যে রাজদ্রোহী থেকে অপরাধী সকলেই পড়ে। এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তিত্বের মানুষ। কেন কিছু মানুষ ভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়?

কেউ বলেন এর জন্য দায়ী সমাজ ব্যবস্থা, সমাজের পরিবেশ। আমাদের ছাত্র অবস্থায় অনেক রাজনৈতিক দাদা বোঝাতেন সমাজতন্ত্র এসে গেলে আর চোর-ডাকাত থাকবে না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশে তাহলে এত অপরাধ হয় কেন? একদল বলেন, প্রথাবিরোধী ববহারের পিছনেও জিন কাজ করে। মনস্তত্ত্ববিদরা দেখেছেন পুরুষ অপরাধীদের মধ্যে কোষের মধ্যে একটি করে Y ক্রমোজম বেশি আছে। অর্থাৎ হওয়া উচিত XY। হচ্ছে XYY. এ বিষয়ে যাঁরা আরও জানতে চান তাঁরা চার্লস এইচ ম্যাককাঘিব (Charles H Mccaghy-এর Deviant Behaviour বইটি পড়তে পারেন। (Macmillan NY)। আগেও প্রথাবিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের উৎস সন্ধানের জন্য নৃতাত্ত্বিক কারণ খুঁজে বার করার চেষ্টা হয়েছে। করোটির গঠন থেকে খুঁজে বার করার চেষ্টা হয়েছে মানুষটির ব্যক্তিত্বের গঠন কেমন। জ্যোতিষীরা চেহারা দেখে জাতক বিচারের চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত বিচার বহুক্ষেত্রেই খাটে আবার খাটে না। লন্ডনের মাদাম তুসোতে বিখ্যাত খুনী ও বিখ্যাত জ্ঞানী ব্যক্তিদের অবিকল মূর্তি পাশাপাশি সাজানো আছে। মুখের গঠন দেখে খুনী ও জ্ঞানী ধরা মুশকিল। সমাজতত্ত্ববিদরা বলেন, কিছু মানুষ প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে যায় তাদের বোধশক্তি লোপ পাওয়ার জন্য। এটা বোধশক্তির বৈকল্য (Dysfunction)। তাঁরা আইন কানুন ও নিয়মবিধির অস্তিত্বই খেয়াল করেন না। এগুলি ভাঙার সামাজিক পরিণাম কী সে সম্পর্কেও তাঁর অজ্ঞ। মানসিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে এসব ভাবারতো অবকাশই নেই। পাগলে কী না বলে। তাঁরা বলেন ক্লেপ্টোমানিয়াকরা (যারা অলক্ষ্যে পরের দ্রব্য পকেটে পোরে) মানসিক রোগী। এই রকম চোর-ডাকাত খুনীদেরও মানসিক রোগী বলে ভাবতে হবে। অনেকে ড্রাগ খেয়ে ড্রাগের নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে মদ খেয়ে উত্তেজনার বসে অপরাধ করে বসে। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ব্যবহারের জন্য তারা দায়ী নয়, দায়ী মদ ও ড্রাগ।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কে তাদের মদ ধরতে বা ড্রাগ খেতে মাথার দিব্যি দিয়েছিল? আধুনিক বাণিজ্যিক দুনিয়ায় মদ এখন এক সামাজিক মেলামেশার উপাদান। ককটেল পার্টি না হলে সভ্যতাই অচল। সমাজের ওপর তলার লোকদের ককটেলে যেতেই হয়। সেখানে কেউ একটা গ্লাস নিয়ে সারাক্ষণ কাটিয়ে দিচ্ছে, কেউবা ঢকঢক করে গিলে আর সামলাতে পারছে না। কেউবা এক পেগেই আউট। মদ খাওয়াটা এখন দেশাচার বিরুদ্ধ নয়, কিন্তু মাতাল হওয়া নিঃসন্দেহে দেশাচার বিরুদ্ধ। তবু বহু লোক ককটেল পার্টিতে মাতলামি করেন। শেষে তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দিতে হয়। সাধারণ মানুষ যখন এই ব্যতিক্রমী ব্যবহার করেন (মাতলামো করা) তখন লোকে ছি-ছি করে। কিন্তু একজন কবি মাতলামো করলে লোকে ক্ষমা করেন। ব্যাপারটি হেসেই উড়িয়ে দেন। কিন্তু যিনি মাতলামো করেন, তিনি মাতাল হবেন জেনেই মদ খান। কিন্তু খান কেন? কারণ তিনি মদ্যপানে প্রচণ্ড আনন্দ

পান। কোন সতর্কবাণী তাঁর মনে থাকে না। তাছাড়া তাঁর দুর্বল ব্যক্তিত্বও এজন্য দায়ী হতে পারে। এত দুর্বল যেকোন সাধারণ প্রতিজ্ঞা রাখাও সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় মদ্যপ ব্যক্তিরা টাকা-পয়সার ব্যাপারে উদার হন এবং মানুষ হিসাবে সরল হন। এর পিছনে কারণ হল, মদ্যপরা মদের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। অপরিমিত অর্থব্যয় একটা অভ্যাসের ব্যাপার। মদ্যপরা অর্থব্যয়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। তাই সুস্থ অবস্থাতেও তাঁরা অর্থব্যয়ে পেছ-পা হন না। তাছাড়া মদ্যপদের ভেতরে ভেতরে অপরাধবোধ থাকে। এই অপরাধবোধ ঢাকতে তাঁরা সকলের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করেন। অন্যদিকের ত্রুটি ব্যক্তিগত ব্যবহার দিয়ে পুষিয়ে দেন। এসব কারণে অপরাধীদের ব্যক্তিগত ব্যবহার খুব ভাল হয়।

প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্বের অধিকারীদের মধ্যে বহু শ্রেণীবিভাগ আছে। কেন কিছু মানুষ সমাজ বিরোধিতার পথ বেছে নেয়? কেউ মাদক পাচারকারী হয়। কেউ আত্মহত্যা করে। আত্মহত্যার পিছনে একটা সাময়িক কারণ থাকে। কারণটা হয়তো তুচ্ছ। কিন্তু আত্মহত্যাকারী সেই স্ট্রেস সহ্য করতে পারে না। তার ব্যক্তিত্ব অপরিণত এবং সে প্রচণ্ড হতাশায় ভোগে। সেই সঙ্গে সামান্য প্ররোচনা পেলেই সে আত্মহত্যা করে বসে। প্ররোচনাটি হল তার হাতের কাছে আত্মহত্যার উপাদান তুলে দেওয়া। দেখা যায় গ্রামে চাষী পরিবারের নারী-পুরুষ ফলিডল খেয়ে আত্মহত্যা করে। যাদের রিভলবারের লাইসেন্স আছে তারা রিভলবার দিয়ে আত্মহত্যা করে। পুলিশ ও আর্মির লোকেরা জীবন অবসানের জন্য সার্ভিস রিভলবার ব্যবহার করে। আমি একজন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারকে ইলেকট্রিকের তার জড়িয়ে আত্মহত্যা করতে দেখেছিলাম। আত্মহত্যার প্রবণতা নিঃসন্দেহে একটি ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক।

প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্বের পিছনে আপাতকারণ যেমন থাকে তেমনি অন্তর্নিহিত কারণও আছে। দেবদাস মদ ধরেছিল, এর আপাতকারণ প্রেমে ব্যর্থতা। কিন্তু একজন সফল লোকও মদ্যপ হতে পারে। বরং এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশি এরা মদ্যপ হয়ে ওঠে কর্মজীবনের টেনসন কাটাতে বা কর্মজীবনের চাপ থেকে পালিয়ে গিয়ে ফ্যানটাসির জগতে বাস করতে।

অনেকক্ষেত্রে প্রথাবিরোধিতা সমাজে গ্রহণীয় আচরণ বলে গণ্য হয়। যেমন ইতর সমাজে খিস্তি-খেউড় প্রথাসিদ্ধ, ভদ্রসমাজে তা প্রথাবিরুদ্ধ। আবার আমি অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে খিস্তি করতে দেখেছি। এটা তাঁদের ব্যক্তিত্বের অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হত। এদের মধ্যে একজন ছিলেন আই.এ.এস. অফিসার। একজন সংবাদপত্রের চিফ রিপোর্টার ও আর একজন অভিজাত বংশীয় প্রয়াত এক মার্ক্সবাদী নেতা। এঁরা এত ওপরের তলার মানুষ হয়েও খিস্তি করতেন কেন? আমার বিশ্লেষণ অনুসারে এগুলি ছিল তাদের ব্যক্তিগত স্ট্রেস রিলিজের উপায়। তাছাড়া ব্যক্তিত্বকে স্বাতন্ত্র্য দেওয়ারও একটা পথ। তাঁরা যে অতিরিক্ত স্মার্ট এটি সাধারণের কাছে প্রমাণ করার জন্য তাঁরা কথায় কথায় অশ্রাব্য খিস্তি করতেন। কারণ সাধারণ মানুষের প্রবণতা হল অশ্লীল খিস্তি পছন্দ করা। এমনকি মেয়েরাও এমন ধরনের পুরুষালি খিস্তি যথেষ্ট উপভোগ করে থাকে।

ফ্যাশন আর এক ধরনের প্রথাবিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আমরা সবাই স্বাভাবিক মাত্রায় ফ্যাশন পছন্দ করি। প্রত্যেকেরই পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে এবং আমরা মনের অজান্তেই পোশাকের ডিজাইন ও রঙ পছন্দ করে বসি। দেখা যাবে অনেকে

একটা বিশেষ রঙ পছন্দ করেন। এক বিশেষ ধরনের শাড়ি অনেক মহিলার পছন্দ। গহনার নানা ডিজাইনের মধ্যে এক একজনের পছন্দ এক একরকম। ব্যক্তিত্ব অনুসারে এই ফ্যাশনপ্রীতি গড়ে ওঠে। কিন্তু অনেকে উগ্র প্রসাধন করেন ও আধুনিকতম ডিজাইনের পোশাক ব্যবহার করেন। পুরুষেরা গোঁফ, দাড়ি, চুলের ডিজাইন ফ্যাশন সম্মত করেন। মেয়েরা কেউ লম্বা চুল রাখেন কেউবা ববড করে ফেলেন। ইওরোপে মেয়েরা চুল ডাই করে অর্থাৎ নানারকম রঙ করেন। ফ্যাশন ব্যক্তিকে ব্যক্তি স্বাধীনতা সম্পর্কে এক অলীক ধারণা দেয়। ব্যক্তি ধারণা করে সেও কারও চেয়ে কম নয়। তার নিজের যোগ্যতা আছে। এটি আত্মপ্রকাশের একটি মাধ্যম। কিন্তু মাধ্যমটি ব্যক্তিকে নিরাপদ পথেই চালিত করে। খিস্তি খেউড় করাও আত্মপ্রকাশ আবার কেতাদুরস্ত সাজগোজ করা কিংবা ছেলেদের বড় চুল, মেয়েদের ববছাট প্রথাবিরোধিতা এবং আত্মপ্রকাশই এর গূঢ়ার্থ। শেষেরটি প্রথমটির মত অত উগ্র আত্মপ্রকাশ নয়। অথবা আত্মপ্রকাশের বাসনা তীব্র হলে এবং অন্য কোন মাধ্যম খুঁজে না পেলে একটি ছেলে ইভটিজিং করতে পারে, গাড়ি হাইজ্যাকিং করতে পারে, সন্ত্রাসবাদী হতে পারে। এমনকী রেপ করেও বসতে পারে। শেষেরটি হল নেতিবাচক প্রথাবিরোধিতা।

ছাত্রীরা যখন লুকিয়ে সিগারেট খেতে শেখে বা ড্রাগ ধরে সেটাও আত্মপ্রকাশের জন্য। এখানে অনুকূল পরিবেশে দলের মধ্যে পড়ে তারা প্রথাবিরোধিতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ছাত্ররা যে মাঝে মাঝে ভাঙচুর করে, পুলিশের ওপর ঢিল ছোঁড়ে এসব আত্মপ্রকাশের নেতিবাচক মাধ্যম। কিন্তু এই ধরনের প্রথাবিরোধিতা অনুকূল পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। যেমন হোস্টেলের ছাত্রদের মধ্যে পর্নোগ্রাফি পড়া, সমকামিতা, ধূমপান, মদ্যপান এবং প্রাগবিবাহ যৌন অভিজ্ঞতার প্রবণতা বেশি। কারণ এখানে তারা দল ও গোষ্ঠীর মধ্যে পড়ে গোষ্ঠী আচরণ আয়ত্ত করে এবং গোষ্ঠীর মধ্যে থেকে নিজের ব্যক্তিত্ব জাহির করার জন্য বেশী করে প্রথাবিরোধী হয়ে ওঠে।

প্রথাবিরোধী আচরণ প্রধানত অনুকরণ থেকে আসে। একটি ছেলে বা মেয়ে বাড়ির পরিবেশে প্রথাসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব নিয়েই বড় হয়েছে। কিন্তু সে স্কুল বা কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে শিক্ষা ভ্রমণে গেল। সেখানে শিক্ষক শিক্ষিকাদের পাহারা শিথিল হলেই তারা কিছু পাকা ছেলে ও মেয়ের প্ররোচনায় প্রথাবিরোধিতায় মেতে ওঠে। দেখা গেছে, এইসব শিক্ষও ভ্রমণে গিয়ে অনেকে প্রথম সিগারেট, মদ ও ড্রাগ খেতে শেখে। তাদের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতাও এইসব দূরভ্রমণ থেকে হয়।

বস্তির ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকে অপরাধে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে কারণ অপরাধীরা অনেকে বস্তীবাসী। বড়দের অপরাধ করতে দেখে ছোটরা অপরাধ করাটাকে আর প্রথাবহির্ভূত আচরণ ভাবে না। জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম বলেই ভাবে। চারপাশের পরিবেশ ছেলেমেয়েদের যথেষ্ট প্রভাবিত করে। ব্রায়ান্ট একটি উদাহরণ দিয়েছেন, আমেরিকার কতগুলি কলেজে দ্বি-কামিতার সপক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। দ্বি-কামিতা (Bisexual) অর্থে নারী ও পুরুষের মধ্যে স্বাভাবিক সঙ্গম। এর প্রয়োজন হয়েছিল, কেননা ওই কলেজগুলিতে সমকামিতা ও মিশ্রকামিতা (Homosexuality and Heterosexuality) খুব বেড়ে গিয়েছিল। কারণ তখন ওটাই ছিল ফ্যাশান এবং কলেজের সংস্কৃতির একটা অঙ্গ।[৩৬]

বন্ধুবান্ধবদের প্রভাব ও গণমাধ্যমের প্রভাব ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনে সাহায্য করে। বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও পলিটেকনিকগুলিতে র‍্যাগিং-এর এক অপ-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। র‍্যাগিং এক ধরনের প্রথাবিরুদ্ধ আচরণ। কিন্তু মজাটা এই যে, যারা র‍্যাগিং করে তারা আগের বছর নিজেরাই র‍্যাগিং-এর শিকার হয়েছে।

আমি যখন ১৯৬০ সালে প্রথম বিলেতে গেলাম তখন সেখানে 'টেডিবয়'দের সদ্য আবির্ভাব হয়েছে। কাগজপত্রে খুব লেখালেখি চলছে। আমিও তাদের নিয়ে কয়েকটি রিপোর্ট লিখেছিলাম। এক বিশেষ ধরনের পোশাক পরত। বিশেষ ধরনের চুলের স্টাইল ছিল। ওরা এক ধরনের শ্ল্যাং ব্যবহার করত। তারা দলবদ্ধ হয়ে ঘুরে মস্তানি করে বেড়াত। এদের দেখাদেখি বহু ছেলেমেয়ে টেডিবয় টেডিগার্ল হয়ে যেত।

আমেরিকায় এরপর এল হিপিরা। এদের মধ্যে কবি ও গাইয়ের দল যেমন ছিল তেমনি ছিল বখে যাওয়া স্কুল কলেজ ড্রপ আউটরা। এইসব প্রবণতা কিন্তু আসে অনুকরণ থেকে। পোশাকে ও আচরণে ওরা এক ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করত। আমেরিকায় এখন এক ধরনের মোটর সাইকেল আরোহী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে এরা আর এক অপসংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে। এদের নিজস্ব ভাষা আছে। যা ইংরাজি হলেও আমরা বুঝব না। ওদের পোশাকেও বৈচিত্র্য। যেমন ওরা পরে ইঞ্জিনিয়ার বুট, কাট অফ জ্যাকেট, পিঠে বড় বড় করে কিছু লেখা, পরনে ময়লা জিন্স, মাথায় স্ট্রোকার ক্যাপ, কানে দুল। এদের অনেকে সঙ্গে অস্ত্র রাখে। যেমন চেন, ছোরা, বন্দুক। একদল দাড়ি রাখে। হারলে ডেভিডসন বা ভি টুইন মডেলের বিরাট মোটর সাইকেল নিয়ে এরা দল বেঁধে মস্তানি করতে করতে রাস্তা কাঁপিয়ে যায়। এই যে মস্তানদের দলটি তৈরি হয়েছে তা সম্পূর্ণভাবে হলিউডের ছায়াছবিতে দেখানো আউট ল -এর অনুকরণে।

ওয়াটসন এই আউটলদের (Out law) সম্পর্কে বলেছেন এরা ঠিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতই নিষ্ঠাবান কিন্তু এই ধরনের প্রথাবিরোধিতা বা সমাজ বিরোধিতার সৃষ্টি হল কেন? কারণ বেকারি ও মূল সংস্কৃতিব প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্নতা তাদের সমাজ বিরোধিতার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশের পথ বাতলে দিয়েছে। আমাদের দেশেও এখন সর্বত্র মস্তানদের আধিপত্য দেখা দিচ্ছে। আশির দশকে পরিবর্তন পত্রিকায় আমি ধারাবাহিকভাবে লিখিয়েছিলাম মস্তান কাহিনী। লেখক ছিল পিনাকী মজুমদার। এইসব মস্তানদের জীবনী থেকে দেখা গেছে তারা অধিকাংশই স্কুল ড্রপ আউট। চাকরিবাকরি না পেয়ে তারা প্রথমে চায়ের দোকানে বসে গুলতানি করত। তারপর রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ব্যবহার করতে শুরু করে। তখন তারা অভয় পেয়ে ধীরে ধীরে সংগঠিত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। পুলিশের মধ্যে কর্মশৈথিল্য ও দুর্নীতি, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, সামাজিক অসারতা, বেকারি ও অর্থনৈতিক অবক্ষয়, সুস্থ সাংস্কৃতিক নেতৃত্বের অভাব এবং সিনেমা ও টেলিভিশনে রবীনহুড ধরনের দুর্বৃত্ত চরিত্রের স্টিরিওটাইপ এই সমস্ত মস্তানদের বেপরোয়া করে তোলে। বাজারে তোলা তোলা, রেল ইয়ার্ড থেকে স্ক্র্যাপ সরানো, ওয়াগন ভাঙার মাধ্যমে সস্তায় উপার্জনের সুবিধা মস্তানোক্র্যাসির জন্ম দিয়েছে।

এই মস্তানদের অনেকেই প্রেম করে ভদ্র পরিবারে বিয়েও করেছে। প্রথাবহির্ভূত ব্যক্তিত্বকে মেয়েরা যে পছন্দ করে এটা তারই প্রমাণ। এই মার্কামারা মস্তান ছাড়াও স্কুল-কলেজ ড্রপ

আউটদের বিরাট অংশ মস্তানদের মত অপরাধের পথে না গেলেও মস্তানরাই তাদের আদর্শ। তারা মস্তানদের মতই পোশাক পরছে। চুল, দাড়ি রাখছে। টাইট গেঞ্জি ও টি শার্ট ও জিন্স পরে মোটর সাইকেল নিয়ে ঘুরছে। সার্বজনীন পুজোর চাঁদা তুলছে। এরা শ্ল্যাং অর্থাৎ খিস্তিতে অভ্যস্ত। কলকাতার এই হাফমস্তান সমাজের নিজস্ব খিস্তির ভাষা চালু আছে। এরা দিনের বেশির ভাগ সময় রকে বা চায়ের দোকানে বসে আড্ডা দেয়। এরা অপরাধে লিপ্ত নয়, প্রত্যেকেই কর্মসন্ধানী। এদের মধ্যে অনেকে শিক্ষিত বেকারও আছে। কিন্তু এদের মধ্য থেকে যে কেউ পুরোপুরি সমাজ বিরোধীতে রূপান্তরিত হতে পারে। মনোবিদদের মতে সংস্কৃতিই ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলে। প্রত্যেক সামাজিক গোষ্ঠীর নিজস্ব উপসংস্কৃতি (Sub-culture) আছে। তেমনি প্রত্যেক পেশারও পেশাগত উপসংস্কৃতি আছে। এই উপসংস্কৃতি ব্যক্তির রুচি, ধ্যানধারণা ও চিন্তাকে প্রভাবিত করে। প্রভাবিত করে তার সামাজিক ক্রিয়াকর্ম (Social action) ও আচরণকে।

কোন সমাজে সুস্থ সাংস্কৃতিক ও নৈতিক আন্দোলন শক্তিশালী না হতে পারলে সেই সমাজে নেতিবাচক ব্যক্তিত্ব সংক্রামিত হয়ে ওঠে। দেখা দেয় প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্ব, সমাজ বিরোধিতা। সাধারণ মানুষ হতাশা ও অবসাদে ভেঙে পড়ে। হতাশা থেকেও আগ্রাসন ও হিংসার জন্ম হয়। ব্যক্তিত্ব গঠনের অনুকূল সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের জন্য তাই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন গড়ে তোলা তাই একান্ত প্রয়োজন।

ব্যক্তিত্বের বিপথগামিতা : কিশোর অপরাধী

কিশোর অপরাধকে আইনের পরিভাষায় বলা হয় Delinquency। অক্সফোর্ড ডিক্সনারি অনুযায়ী এর অর্থ wrong doing by young persons। আইন মোতাবেক ১৮ বছরের নিচে কোন কিশোর যদি অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয় তবেই তাকে কিশোর অপরাধী বা Delinquent বলা হয়। কিন্তু কিশোর অপরাধীর এই সংজ্ঞাটি পরিপূর্ণ নয়। তাহলে যারা ধরা পড়ে না তারা কী অপরাধী নয়? সে যাইহোক আমরা শুধু কিশোর অপরাধীদের ব্যক্তিত্ব নিয়েই আলোচনা করব। কারণ পৃথিবীর সব দেশেই কিশোর অপরাধ বাড়ছে। আমেরিকা ও জাপানের মত উন্নত দেশে কিশোর অপরাধের সংখ্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আমাদের দেশেও এই অপরাধের হার তুচ্ছ করার মত নয়। ইতালিতে তরুণদের একটা বিরাট অংশ ছোটখাটো অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। মনোবিদরা এই ধরনের অপরাধের নাম দিয়েছেন Microcriminality অর্থাৎ অণুঅপরাধপ্রবণতা। যেমন দোকান থেকে মাল সরানো, ভাঙচুর করা ইত্যাদিকে অণু অপরাধ বলা হয়।

কিশোর অপরাধী নিঃসন্দেহে প্রথাবহির্ভূত ব্যক্তিত্ব। কিন্তু এক একজনের মধ্যে এই ধরনের ব্যক্তিত্ব দেখা দেয় কেন? এর জন্য সামাজিক পরিবেশকে অনেকে দায়ী করেন। কেউ দায়ী করেন দারিদ্র্যকে। দারিদ্র্য সর্বগুণনাশী। নিঃসন্দেহে দরিদ্রদের মধ্যে কিশোর অপরাধের প্রবণতা বেশি। কিন্তু অবস্থাপন্ন পরিবারের মধ্যেও এই প্রবণতা বাড়ছে। তাছাড়া দেখা গেছে পরিবারের সব ছেলেমেয়ে অপরাধী হয়ে গেছে তা নয়। এক ভাই স্বাভাবিক, এক ভাই অপরাধী। আমি একটি পরিবারের কথা বলছি। কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবার। বড় ভাই প্রচণ্ড সংগ্রাম এবং পরিশ্রম করে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। ছোট ভাই এর মধ্যে

দেখা যায় অপরাধ প্রবণতা। সে প্রথমে আত্মীয় স্বজনদের প্রতারণা করতে শুরু করে। মিথ্যে কথা বলে টাকা ধার নিয়ে সরে পড়ে। এখান ওখান থেকে জিনিসপত্র সরায়। বাড়ির বাসনপত্র, মার ঘরের পাখা পর্যন্ত বিক্রি করে দেয়। তার মায়ের কাছে গচ্ছিত বিধবা পিসীর গহনা চুরি করে বেচে দেয়। ব্যবসা করার নামে ভিডিও, ভিসিপি নিয়ে এসে বেচে দেয়। বহুবার ধরা পড়ে মার খেতে খেতে বেঁচে যায়, কিন্তু স্বভাব শোধরায় না। কিশোর অপরাধীদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ করে আলাদা আলাদা ভাবে অপরাধের কারণ খুঁজে বার করা যায় কিন্তু যৌথভাবে অপরাধের কারণ খুঁজে বার করা দুরূহ। বলা যেতে পারে অপরাধ প্রবণতা জিনবাহিত। বিশেষ করে অণু অপরাধ দুষ্ট জিন থেকে সংক্রামিত হতে পারে। কিন্তু প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব আলাদা আলাদা ভাবে পরীক্ষা না করে এ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসা যায় না। মনোবিজ্ঞানীরা যাকে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য (Individual difference) বলেছেন তদনুযায়ী মনোবিজ্ঞানী এ. কমফর্ট কিশোর অপরাধীদের ব্যক্তিত্বকে ৬ ভাগে ভাগ করেছেন।[৩৭]

১. অসম্পূর্ণ সাইকোপ্যাথ (Inadequate Psychopath)। এদের সম্পর্কে আগে থেকে কিছু বলা যায় না এরা কখন কি করে বসে। জনতার ভিড়ের মধ্যে এরা অন্যের দেখাদেখি আচরণ করে। যেমন খেলা ভাঙার পর কলকাতায় যা হয়। সবাই দোকান লুঠ করছে, ভাঙচুর করছে। এরাও তাদের দেখাদেখি ভাঙচুর শুরু করল।

২. মারমুখী হামবড়া (Aggressive egocentric)। এরা অন্যকে দাবিয়ে রাখতে চায় অসহিষ্ণু স্বার্থপর। এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার দ্বারা এরা চালিত। এদের নেতৃত্ব মেনে না নিলে এরা অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। ভয় দেখায়, মারধর করে। এদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য এরা অনেক নিচে নামতে পারে।

৩. নীতিগত ভিন্নমুখী (Ethical aberrant)। এদের নীতির কোন বালাই নেই। চোখ দিয়ে, মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বলে। অন্যের মাথায় টুপি পরায়। চুরি জোচ্চুরিতে এদের জুড়ি নেই। তাদের নীতি তাদের কাছে। ধরুন, কারও পিছনে লাগতে হবে অথবা ঘুষ খেতে হবে। টাকা খেয়ে কোন অন্যায় কাজ করতে হবে, তখন তারা ওইসব অন্যায় কাজের সমর্থনে মনে মনে একটা যুক্তিতক্কো গপ্পো খাড়া করে।

৪. অলীক রাজ্যের অধিবাসী হামলাকারি (Fantasy delinquent)। এদের ভেতর নানা দ্বন্দ্ব থাকে। তার ফলে এদের ভেতর একটা ধ্বংসকারী আবেগ কাজ করে।

৫. নেশাগ্রস্ত সাইকোপ্যাথ (Addictive Psychopath)। এরা নিজেদের অসম্পূর্ণতা ঢাকার জন্য নেশা করে এবং নেশার বশে ক্রমাগত ধ্বংসাত্মক কাজের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে।

৬. প্যারানয়েড সাইকোটিক (Paranoid Psychotic)। এদের সমাজের প্রতি একটা তীব্র আক্রোশ থাকে। সেই আক্রোশ থেকে এরা অপরাধী হয়। যেমন ফুলনদেবী, বীরাপ্পন।

কিশোর অপরাধীরা ওপরের যেকোন একটা শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। কে কোন শ্রেণীতে পড়েছে তার কারণও খুঁজে বার করা যায়। সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের অধিকাংশই একদা কিশোর অপরাধী ছিল। এমনকি অপরাধী ব্যক্তিত্ব অনেকের ক্ষেত্রে শিশুবয়স থেকেই অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয়।

সুতরাং যেসব শিশুর মধ্যে অসততা (ক্রমাগত মিথ্যা কথা বলা, অন্যের জিনিস চুরি করা, গালাগাল, খিস্তি খেউড় করা), রাগ (রাগের বশে গালমন্দ, চিৎকার চেঁচামেচি, গালাগাল, কাউকে মারধর করতে যাওয়া), প্রবৃত্তির আধিক্য বা Impulsiveness (হঠাৎ হঠাৎ এক একটা অন্যায় কাজ করে বসা ও বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়া প্রভৃতি) লক্ষণ দেখা গেলে সতর্ক হওয়া দরকার। আমার পরিচিতদের মধ্যে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার দুটি ঘটনা জানি। দুটি ছেলেই ১৪/১৫ বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় এবং কিছুদিন পরে ফিরে আসে। দুটি ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে দেখেছি ছেলে দুটি বখে গিয়েছে। একটি ছেলে তো ড্রাগ অ্যাডিক্ট হয়ে গিয়েছিল। আর একটি ছেলের আর লেখাপড়া হল না। সে দু'একটা ছোটখাটো কাজ পেল। কিন্তু কোথাও সুবিধা করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত তার অকালমৃত্যু ঘটল।

কিশোর অপরাধীদের একবার আইনবিরুদ্ধ বা সামাজিক প্রথাবিরুদ্ধ কাজ করার পর যদি না মানসিক চিকিৎসা করা হয় তাহলে তারা নিজদের নৈতিক প্রতিবন্ধী বলে ভাবতে শেখে। তখন তারা স্কুল শিক্ষাকে আর যোগ্য বলে মনে করে না, মনে করে পড়াশোনা করে তার কী হবে। সুতরাং তারা তাদের সহপাঠীদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এর ফলে স্কুলের পরীক্ষাতেও তারা কম নম্বর পায়।

পশ্চিমী দেশগুলিতে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে নিম্নবর্গের মধ্যে কিশোর অপরাধ প্রবণতা বেশি। ভারতে তেমন কোন সমীক্ষা তথ্য আমার হাতে নেই। তবে আগেই বলেছি কোন একটা বিশেষ আর্থিক শ্রেণীকে এর জন্য দায়ী করা যুক্তিযুক্ত নয়। তবু নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে অপরাধ প্রবণতার কারণ তাদের মধ্যে সুযোগ সুবিধার অভাব, হতাশা এবং প্রতিকূল সামাজিক পরিবেশ। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত ও ধনী শ্রেণীর মধ্যে অপরাধ প্রবণতার কারণ গণমাধ্যম। সিনেমা ও টিভি ভীষণভাবে শিশু ও তরুণদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্রে ও টেলিভিশনে অপরাধের ছড়াছড়ি এবং জনপ্রিয় অভিনেতারা যখন অপরাধীর ভূমিকায় অভিনয় করে তখন কিশোরদের মধ্যে তাদের অনুকরণ করার প্রবণতা জাগে। অনেক মনোবিদ বলেছেন : যাদের বাবারা মদ খায় তাদের ছেলেমেয়েরাও বহুক্ষেত্রে মদ ধরতে শেখে। পশ্চিমে অনেক ছেলেমেয়েদের বাবাই প্রথম মদ খাওয়াতে শেখায়। সিগারেট খেতে শেখার পিছনেও বাবার সিগারেট খাওয়ার প্রভাব আছে। যাদের বাবা সিগারেট খাননা তাদের অধিকাংশের ছেলে সিগারেট খায় না। যদিও সিগারেটের নেশার পিছনে বন্ধুবান্ধবের প্রভাব কম নয়। সাধারণত যারা সিগারেট খায় তারা ধূমপায়ীদের ছেলেদের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করে। ড্রাগ ধরার পিছনেও পারিবারিক পরিবেশ দায়ী। একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, ড্রাগাসক্ত কিশোরদের অনেকের পরিবারে নানা গণ্ডগোল আছে এবং এই পারিবারিক অশান্তি থেকেই ছেলেমেয়েরা ড্রাগ ধরেছে।

যদিও আমার কাছে কোন সমীক্ষা তথ্য নেই তবু পশ্চিমবঙ্গে নকশাল হাঙ্গামার সময় আমাকে একাধিক পুলিশ অফিসার বলেছিলেন, ধৃত তরুণ তরুণীদের জিজ্ঞাসা করে জানা গেছে তাদের অনেকের পরিবারে বাবা-মায়ের মধ্যে বিরোধ আছে। জিমলার ও হফলার (১৯৫৫, ১৯৫৮) সমীক্ষায় দেখেছেন যে ২১৫ জন হিরোইন নেশাখোরদের অধিকাংশই বিচ্ছিন্ন পরিবার থেকে এসেছে। তারা অনেকে ছোটবয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কেউ

পালকপিতার কাছে মানুষ হয়। মনোবিদরা দেখেছেন যাদের বাবা-মায়ের মধ্যে সম্পর্ক ভাল তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ড্রাগের নেশা নেই বললেই চলে। সুতরাং সুস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব গঠনে বাবা-মা ও পরিবারের ভূমিকার কথা আবার এসে পড়ে। সুখী গৃহই সুব্যক্তিত্বের উৎস। তাই সন্তানের জন্ম দেওয়ার আগে বাবা-মাকে আত্মানুসন্ধান করতে হবে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত ভালবাসা আছে কি না। পরস্পরকে তাঁরা বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করেন কি না। নারীবাদীরা প্রতিবাদ করবেন হয়তো, সুস্থ সম্পর্কের বেশিরভাগটাই প্রকৃতিগত কারণে স্ত্রীর বুদ্ধিমত্তা সহনশীলতা ও উদারতার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু এখন সমান অধিকারের যুগে সবাই সমান সমান হিস্যা বুঝে নিতে চাইছে। তার ফলে সম্পর্কে চিড় ধরছে। মনে রাখতে হবে যে শুধু বিবাহিত জীবন টিকিয়ে রাখাটাই বড় কথা নয়। দাম্পত্য জীবনের মধ্যে সংহতি ও মাধুর্য আছে কি না সেটাই বড় কথা। সেটা যদি না থাকে উদ্বেগ ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে সন্তানের জন্ম হলে গর্ভাবস্থা থেকেই সন্তানের ব্যক্তিত্বে সেই উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়। তারপর সন্তানের শৈশব পরিবেশের ওপরেই তার ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। হয়তো দেখা যায় দুটি ভাই পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারল, আর এক ভাই পারল না। তখনই তার ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দিল।

সন্তান মানুষ করা সম্ভবত মানুষের এক দুরূহতম কর্মসাধনা। এ সম্পর্কে আপনি ও আপনার সন্তান গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি বলে বিশদ আলোচনা করলাম না।

প্রথাবিরোধিতা ও অভিভাবকের শাসন

অনেকে মনে করেন, অভিভাবকরা ছোটবেলা থেকে শিশুকে শাসন করেন না বলে শিশু প্রশ্রয় পেয়ে মাথায় ওঠে ও বড় হয়ে স্বেচ্ছাচারী ও প্রথাবিরোধী হয়ে ওঠে। আমাদের ছোটবেলায় কোন ছাত্র যদি দুষ্টুমি করত তাহলে মাস্টারমশাইরা তাকে প্রচণ্ড মারতেন। ক্লাশে পড়া না পারার জন্য আমার কোন কোন সহপাঠীকে নিষ্ঠুরভাবে মার খেতে দেখেছি। এখন স্কুলে মারধর প্রায় উঠেই গেছে। কিন্তু তার ফলে ছেলেমেয়েরা এখন যে আগের তুলনায় অবাধ্য ও প্রথাবিরোধী হয়ে উঠছে তা বলা যায় না। তেমনি উদার বা Permissive method ব্যবহার করলে ছেলেমেয়েরা সবাই গোল্লায় যাবে তার কোন মানে নেই। অভিভাবকেরা ছেলেমেয়েদের পরিবেশের যদি উন্নতি ঘটাতে না পারেন তাহলে মারধর করে সাময়িকভাবে তাদের নিরস্ত করা যায়। কিন্তু একটু বড় হলেই তারা বাবা-মায়ের শাসন অগ্রাহ্য করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আবার বহুক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে শেখে। যদি দেখা যায় কোন সমাজে দুর্নীতিপরায়ণ ও সাধুর একদর তাহলে লোকের প্রবণতা হবে দুর্নীতি করার। সমাজ যদি সততার পুরস্কার না দেয় মূল্যবোধের যদি কোন মর্যাদা না থাকে, অন্যদিকে যার টাকা আছে তাকেই যদি লোকে খাতির করে তাহলে একটা সামাজিক প্রবণতা দেখা দিতে পারে দুনম্বরি করে টাকা উপার্জনের। এক্ষেত্রে বজ্রআঁটুনি থাকলেও ফস্কা গেরো দিয়ে সবাই বেরিয়ে যাবে। স্কুল-কলেজে পাঠ্যপুস্তকে ভাল ভাল কথা লেখা থাকলেও চোরেরা ধর্মের কথা শুনবে না। কিন্তু সবাই তাহলে চোর হয় না কেন? এখানেও সেই ব্যক্তিত্ব।

অনেকের মনে মনে লোভ থাকে। কিন্তু অসৎ হতে গেলে ঝুঁকি নিতে হয়। সে ঝুঁকি নিতে পারে না। প্রথাবিরোধী হতে গেলেও বুকের পাটা চাই। চুরি করার সুযোগ থাকলেও সবাই চুরি করতে পারে না। প্রচুর মদ বিনা পয়সায় পেলেও বহু লোক মদ খায় না। সুন্দরী মহিলাকে একা পেয়েও কী সবাই তাকে রেপ করে? হাজারে কী লাখে হয়তো একজনকে এমন পাওয়া যায়। আসলে মানুষ সংযত থাকে ও সৎ থাকে ব্যক্তিত্বের ইতরবিশেষে। কোন ব্যক্তিত্ব ঝুঁকি নিতে চায় না। কেউ পুলিশের ভয় করে। কেউ সামাজিক নিন্দার ভয় করে। কেউ হয়তো এইডস হবার ভয় করে। কেউ ধর্ম ঈশ্বর বা নীতিবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবার কেউ হয়তো বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু খতিয়ে দেখে বিচার করে 'যেতে পারি, কেন যাবো?' কারও অর্থলোভই থাকে না। কারও বা লোভ থাকে কিন্তু সে বুদ্ধি দিয়ে তাকে প্রশমিত করতে জানে। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইসব কারণে প্রথাসিদ্ধ হয়ে থাকে। তাই তারা সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও প্রথাবিরোধী হয় না, স্বাভাবিক জীবনই যাপন করে।

যাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাস্তববাদ (Pragmatism) আছে তাঁরা পরীক্ষা ও ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ভাল-মন্দ বোঝার ক্ষমতা অর্জন করতে জানেন। আমি ছোটবেলায় কুসঙ্গেও মিশেছি আবার সৎ সঙ্গেও মিশেছি। কিন্তু আমার মনই বলে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত কোনটি আমি গ্রহণ করবো? কারণ বয়ঃসন্ধির পর থেকে বাবা-মায়েরা ছেলেমেয়েদের আর তাড়না করতে পারে না। তখন তাদের ছেড়ে দিতেই হয়। একটা বয়সের পর আমার বাউন্ডুলে হয়ে যাবার প্রচুর সুযোগ ছিল। কর্মজীবনেও আমি মদ্যপ, লম্পট, দুর্নীতিপরায়ণ, অপরাধীদের সঙ্গে মিশেছি আবার বহু সাধুর সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। সমস্ত ধর্মের ধর্মগুরুদের সান্নিধ্যে আসার আমার সুযোগ হয়েছে। দুই বিপরীত মেরুর মানুষের সঙ্গে মেলামেশার এই সুযোগ থাকার ফলে আমার ব্যক্তিত্ব গ্রহণ ও বর্জন করতে শিখেছে। আমার মত্ত বহু মানুষই এই গ্রহণ বর্জনের মধ্য দিয়ে নেতি নেতি করে একটা সত্যে এসে পৌঁছেছেন। এটাই ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা। সাহিত্যিক ও শিল্পীরা সবরকম মানুষের সঙ্গে মেশেন বলেই তাঁদের সৃষ্টি এমন জীবনমুখী হয়ে ওঠে। আসলে গজদন্তে মিনারের ওপর কোন ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে না। Trial and error-এর মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় সেটাই শক্ত সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব। চরিত্রহীনে শরৎচন্দ্র সতীশ ও উপেন এই দুটি চরিত্র দেখিয়ে বলতে চেয়েছেন চরিত্র বস্তুটিকে সাধারণ মানুষ যেভাবে বিচার করে আসলে সেটা ভুল। ভালমন্দ উভয়ের সঙ্গে মিশেও যে সচেতনভাবে ভাল থাকতে পারে সেই চরিত্রবান। সতীশ ছিল সেই অর্থে প্রকৃত চরিত্রবান। এটি তার সুদৃঢ় ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ছেলেমেয়েদের প্রতি তাড়না করা উচিত নয় আবার একদম চোখ বুজে থাকাও উচিত নয়। বাবা-মা যেসব শিশুর ওপর অত্যাচার করেন বড় হলে তারা ভাবে তাদের বাবা-মা তাদের ঠিকমত মানুষ করেননি। তাদের ব্যক্তিত্ব এর ফলে প্রথাবিরোধী হয়ে উঠতে পারে। বাবা-মাকে ঘৃণা করতে পারে এবং বাবা-মায়ের প্রতি ঘৃণা শেষ পর্যন্ত সমাজের প্রতি ঘৃণায় গিয়ে পৌঁছয়।

ব্যক্তিত্ব ও নৈতিকতার সংকট

আগে যে প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্বের কথা বললাম, তা হল কোন সমাজের প্রচলিত ও সর্বজনগ্রাহ্য নীতি-নিয়ম না মানা। আসলে সমাজ কতগুলি নৈতিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক ভাবনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন আগেই বলেছি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভারতীয় সংস্কৃতিতে একটি সর্বজনগ্রাহ্য মূল্যবোধ। কিন্তু এখন বহু ছেলে বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ নয়, আত্মসুখে ব্যস্ত। বিশেষ করে বৃদ্ধ বাবা-মাকে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্তরা বোঝা বলে ভাবতে অভ্যস্ত। এটি চিরাচরিত শ্রদ্ধাবোধের অবমূল্যায়ন। এখন যারা এটা করছে তাদের সংখ্যা বাড়ছে। তার ফলে যেটি ছিল প্রথাবহির্ভূত এখন সেটাই প্রথাসিদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ বৃদ্ধ বাবা-মাকে পরিবারে না রাখাই এখন প্রথা। আগে ঘুষ খাওয়াটা প্রথাবহির্ভূত ব্যক্তিত্ব ছিল এখন যাদের ঘুষ খাওয়ার সুযোগ আছে তাদের একটা বড় অংশ ঘুষ খাওয়ায় ঘুষ খাওয়াটা এখন প্রথার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে। সকলেরই ধারণা হয়ে গিয়েছে কিছু কিছু কাজ পয়সা না দিলে হয় না এবং সবাই বিনা বাক্যব্যয়ে পয়সা দেয়ও। যে বা যারা এইভাবে পয়সা নেয় তারা এটিকে স্বাভাবিক বলে মনে করে এজন্য ঘুষখোরদের ব্যক্তিত্বে কোন হীনম্মন্যতা থাকে না। বরং সৎ লোকই অনেক সময় মনে মনে আফসোস করে, আহারে আমি কেন মরতে এমন সৎ হতে গেলুম।

দ্বিতীয়ত, যদি ব্যক্তিত্ব অপরের আয়নায় দেখা আপনার প্রতিবিম্ব হয়, তাহলে বেশিরভাগ লোক যেমন, আপনি তেমন হতে না পারলে লোকে আপনাকে হেয় করবে। আপনাকে সংখ্যালঘু বলে মনে হবে। আপনি যেকোন সংখ্যালঘুর মত হীনম্মন্যতায় ভুগবেন। যদি বেশিরভাগ লোক কাজ হাসিল করার জন্য মিথ্যে কথা বলে, আপনি অনুরূপ পরিস্থিতিতে সত্যি কথা বললে আপনাকে লোকে বিদ্রূপ করে সত্যবাদী যুধিষ্ঠির বলবে।

যাঁরা ভাল স্কুল-কলেজে পড়েছেন তারা জানেন, এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সবাই ভাল ছেলে, সবাই পড়াশোনা করে। পড়াশোনা করাটাই এখানে দস্তুর। যে পড়াশোনা করে না, আঁতেলগিরি করে, ড্রাগ খেয়ে বেড়ায় তাকেই সবাই হেয় করে কিন্তু সাধারণ স্কুল-কলেজে যেখানে অধিকাংশ ছেলেমেয়েই পড়াশোনা করে এবং তাদের মেধাও নেই সেখানে দু-একটা ভাল ছাত্রছাত্রী এসে পড়লে তাদের পড়াশোনা নিয়ে সহপাঠীদের কাছ থেকে নানা বিদ্রূপ শুনতে হয়। যেন ভাল ছাত্র হওয়াটা অপরাধ। সেজন্য ভাল ছাত্রছাত্রীদের গুণগত মান বজায় রাখতে গেলে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশও উন্নত হতে হবে। নইলে এইসব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে হতাশা দেখা দেবে। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবেশে একটি ছেলেমেয়ে যদি দৈবাৎ ভাল হয়ে যায় তাহলে তার পাড়ার সবাই তার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ওঠে। এলিজাবেধ হারলক বলছেন, একটি সাধারণ স্কুলের মেয়ে বলছে, তুমি যদি ছেলেদের থেকে ঢ্যাঙা হও তাহলে সবাই তোমায় ক্ষ্যাপাবে কিন্তু তুমি যদি পড়াশোনায় খুব ভাল হও তাহলে আর রক্ষে নেই সবাই তোমার পিছনে লাগবে।

বুদ্ধিজীবী এবং প্রতিভাবানরা প্রায়শই ব্যক্তিত্বের সংকটে ভোগেন। কেননা, তাঁরা সংখ্যালঘু। অধিকাংশ লোকই মাঝারি ধরনের। মাঝারি ধরনের অসংখ্য লোক জীবনে সাফল্য অর্জন করে থাকে। তারা বড় বড় পদ অলঙ্কৃত করতে পারে। অত্যন্ত মেধাবীদের তারা পছন্দ করে না। তারা মনে করে জীবনে সাফল্যের জন্য বুদ্ধিজীবী পণ্ডিত হওয়ার দরকার নেই। পণ্ডিতেরা বাস্তবজ্ঞান বর্জিত। মনে মনে যোগ্যতর ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের

ঈর্ষাপ্রসূত বিদ্বেষ থাকায় তারা যোগ্যতর ব্যক্তিত্বকে নানাভাবে হেয় প্রতিপন্ন করে। প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীরা তাদের সহপাঠীদের থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। এটি সব সমাজেই হয়ে থাকে। মনোবিজ্ঞানী এস.এল.প্রিসলে বলেন প্রতিভাবান ছাত্ররা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে নয়তো তারই মত 'এক-ঘরে' কোন বন্ধুই তার সঙ্গী হয়। সমাজে সে কোন সম্মান পায় না। স্থান কাল পরিবেশে ভাল ছেলেমেয়েরা স্কুলের অধিকাংশ ছেলেমেয়ের কাছে উপেক্ষিত হতে পারে। অনেকে নিজেদের হীনম্মন্যতার জন্য ভাল অর্থাৎ মেধাবী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেশেনা। এজন্য ক্লাশের ফার্স্ট বয় বা সেকেণ্ড বয়কে প্রায়ই একা একা কাটাতে হয়। তখন নিঃসঙ্গতা ঘোচানোর জন্য তারা আরও বেশি করে বই-এর মধ্যে ডুবে থাকে। আর যতবেশি তারা বই-এর মধ্যে ডুবে থাকে ততবেশি তারা সমাজ বিচ্ছিন্ন এবং বাস্তবতাবর্জিত হয়ে ওঠে। বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, মেধাবী ছাত্ররা অনেকে বিপথে গেছে। তাদের মধ্যে কেউ ড্রাগ ধরছে। কেউ নিজের সুন্দরী স্ত্রী ত্যাগ করে অপরের স্ত্রীকে বিয়ে কবছে। কেউ অত্যন্ত মদ্যপ বা দুশ্চরিত্র হয়ে উঠছে। একদিকে অসাধারণ মেধা অন্যদিকে ব্যক্তিত্বের এই প্রথাবিরোধিতা, চরিত্রের এই অধঃপতন ঘটে কেন?

মনোবিজ্ঞানী এস.বি. কাকার তাঁর এডুকেশনাল সাইকোলজি বই-এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় এর উত্তর দিয়েছেন। মেধাবী ছাত্রদের অধিকাংশ সমস্যাই স্বাভাবিক এবং এগুলি তাদেব মৌলিক ইচ্ছা। এগুলি তাদের নিজস্ব প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। যদি ছাত্রজীবনে তাদের ওই ইচ্ছাগুলি পূরণ না হয় তাহলেই সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত পথে সে তার বাসনা চরিতার্থ করে। ছাত্র অবস্থায় তার ওপর পড়াশোনার চাপ বেশী থাকে, তাকে সকলের প্রত্যাশা পূরণের জন্য বেশী করে পড়তে হয়। সহপাঠীরা কদাচিৎ তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাবে মেশে। সকলেব সঙ্গে তার একটা দূরত্ব গড়ে ওঠে। এর ফলে মেধাবী ছাত্রদের অনেকের ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না। তারা একটু অস্বাভাবিক (Peculiar) হয়ে ওঠে। কিন্তু মেধাবী ছেলেমেয়ে মাত্রই যে প্রথাবহির্ভূত ব্যক্তিত্ব হবে তার মানে নেই। দেখা যায়, যাদের ১৪০-এর ওপর যাদের বুদ্ধাঙ্ক তারা যেমন পড়াশোনায় ভাল তেমনি আই কিউ এর দিক থেকেও তারা সুদৃঢ় মানসিকতার অধিকারী। তার সামাজিক আগ্রহ যেমন আছে তেমনি শেখাব ইচ্ছা আছে, সে যথেষ্ট পড়াশোনা করে। যদিও পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে তার যথেষ্ট অভিযোগ আছে কারণ তার মতে পাঠ্যবই অসম্পূর্ণ। প্রায়শই দেখা যায় তাদের বাবা মায়েরাও ভাল স্কুলে পড়েছে। তাদের গৃহপরিবেশ আনন্দময়। তবে অশিক্ষিত বাবা-মায়ের ছেলেমেয়েও দৈবাৎ প্রতিভাবান হতে পারে। মেধাবীদের মত প্রতিভাবান মাত্রই সৃজনশীল এবং মৌলিক। যাদের মধ্যে মৌলিকতা আছে মুখস্ত করা বিদ্যা তাদের আয়ত্ত হয় না। তারা স্বাধীনচেতা হয়। স্কুল-কলেজের বাঁধাধরা পাঠ্যসূচি ও গণ্ডীবদ্ধ জীবনে তাদের ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত বিকাশ হয় বলে তারা মনে করে না। এজন্য বাঁধাধরা শিক্ষা ব্যবস্থায় তারা অনেকেই মেধাবী বলে গণ্য হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ/আইনস্টাইন, চার্চিল বা বার্নাডশ স্কুলে মেধাবী ছাত্র ছিলেন না। এই অবস্থা পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে চোখে পড়ে।

প্রতিভাবান ও সৃজনশীল ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভাল ফল করতে পারে না কেন?

নিউইয়র্কের একটি মাধ্যমিক স্কুলে একবার ২৩৭ জন ফাইন্যাল ইয়ারের ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে একটি সমীক্ষা করা হয়। তাতে দেখা হয়, ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যের সঙ্গে তাদের

প্রাপ্ত নম্বরের কোন সম্পর্ক আছে কিনা। এতে দেখা যায় যেসব ছাত্র-ছাত্রী সৃজনশীল, স্বাধীনচেতা এবং উগ্রব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তারা কম নম্বর পাচ্ছে। এইসব ছাত্র-ছাত্রীর উদ্ভাবনী শক্তি আছে। তারা নিজেরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করে এবং তাদের নিজেদের মত করে কাজ করতে ভালবাসে। তারা চায়না লোকে তাদের ব্যাপারে নাক গলিয়ে তাদের কিছু উপদেশ দিক। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ এই সব ছেলেমেয়েদের নিজেদের খেয়ালখুশিমত চলা পছন্দ করে না। দেখা যায় যেসব ছেলেমেয়ে ভাল নম্বর পায় তারা নিয়মিত স্কুলে আসে, তাদের ওপর নির্ভর করা যায় এবং, তারা কঠোর পরিশ্রমী। তারা শিক্ষকদের কর্তৃত্ব মেনে চলে এবং তাঁরা যা বলেন সেটা করে। শিক্ষকদের কথার তারা কোন প্রতিবাদ করে না। স্কুল এই ধরনের বাধ্য ছেলেমেয়েদের বেশি নম্বর দিয়ে পুরস্কৃত করে।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষিতদের মধ্যেও দু'ধরনের ব্যক্তিত্ব তৈরি হচ্ছে। একজন প্রচলিত শিক্ষাধারণা অনুসারে বেশি নম্বর পাওয়া মেধাবী ব্যক্তিত্ব। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে এঁরাই সরকারি ও বেসরকারি উচ্চপদগুলিতে আসীন থাকেন। কিন্তু একথা মনে করার কারণ নেই যে বেশি নম্বর পেয়ে বড় চাকরি করছেন বলেই তাঁরা সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব হবেন। পরীক্ষার নম্বরের সঙ্গে নেতৃত্ব সুলভ গুণের সম্পর্ক নেই।

দেখা যায় রাজনীতিতে ও সমাজক্ষেত্রে, ব্যবসায়ে যাঁরা সাফল্য অর্জন করেছেন তাঁরা অনেকেই স্কুল-কলেজের ভাল ছাত্র ছিলেন না। সৃজনশীল কাজে নিযুক্ত শিল্পী সাহিত্যিব সাংবাদিক প্রমুখদের অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রী নন।

শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব

তবু শিক্ষার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। একজন শিক্ষিত ও একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিত্বের আকাশ-পাতাল ফারাক চোখে পড়ে। কারণ বিদ্যা মানুষকে আত্মবিশ্বাস এনে দেয়, পরিবেশের সঙ্গে বিভিন্ন অবস্থায় কীভাবে মোকাবেলা করতে হয় তা শেখায়। বিদ্যা তাকে যুক্তিবাদী করে তোলে এবং সর্বোপরি তাকে চারুবাক (Articulate) করে। এর ফলে শিক্ষিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

যদিও এই শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মানুষ পায় কিন্তু এইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মূল্যায়নই শিক্ষার পূর্ণ পরিচয় নয়।

শিক্ষা বলতে মনোবিদরা বোঝেন Learning। কেতাবি শিক্ষা ছাড়াও মানুষ তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও শিক্ষা লাভ করতে পারে।

শিক্ষা (Learning) বলতে এস.বি. কাকার বলেন : শিক্ষা হল ব্যক্তির বৃদ্ধি ও পরিবর্তনের একটি রূপ। Learning is a form of growth or change in a person কিন্তু ব্যক্তির বৃদ্ধি ও পরিবর্তন হলেই শুধু হলনা। বৃদ্ধি ও পরিবর্তন তো বয়সের ধর্ম, শুধু জৈবিক প্রক্রিয়া। শিক্ষা মানুষকে নতুন ধরনের আচরণবোধ শেখায়। শেখায় নৈপুণ্য (Skill), অভ্যাস (Habit), আচরণ (Attitude), আর বোঝাপড়া (Understanding)। অথবা এককথায় বলা যায় জ্ঞান ও উপলব্ধির ক্ষমতা। দেখা যায় শিক্ষা শুরু করার আগে আর শিক্ষার শেষে মানুষের আচরণে প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। প্রত্যেকটি সমাজই প্রত্যাশা করে সমাজের সবাই সমাজের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি মেনে চলুক। শিক্ষার মধ্য

দিয়ে সেই সংস্কৃতিই ছাত্রছাত্রীদের শেখানো হয়। শিশু জন্মসূত্রে তার যে জৈবিক প্রকৃতি পেয়েছে শিক্ষা তার ওই প্রকৃতিকে সংস্কৃতির অনুবর্তী করে তুলতে শেখায়।

শিক্ষার দুটো ভাগ। একটা প্রবৃত্তিগত শিক্ষা। যেমন সাঁতার শেখা, সাইকেল চড়া শেখা, এমনকী উপযুক্ত বয়সে প্রজনন ক্রিয়াশিক্ষা এগুলো কাউকে শেখাতে হয় না। প্রবৃত্তির বলে এমন বহুকিছু মানুষ নিজে নিজে শিখে যায়। যেটি সত্যিকারের শিক্ষা হল, কোন কাজ আধুনিকতম পদ্ধতিতে কীভাবে করতে হয় সেটা জানা। বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে কীভাবে খাপ খাওয়াতে হয় সেটা বোঝার ক্ষমতা। শিক্ষার অর্থ তাই জ্ঞান অর্জন। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় তখনই যখন সে যা শিখেছে সেটি হুবহু পুনরাবৃত্তি করতে পারে এবং কার্যক্ষেত্রে সেই জ্ঞানের প্রয়োগ করতে পারে। যে যতটা সাফল্যের সঙ্গে এটি করতে পারবে তাকে তত শিক্ষিত বলা যাবে।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে মানুষের প্রকৃত শিক্ষা কখনই যান্ত্রিক, অন্ধ বা প্রবৃত্তিগত নয়। শিক্ষা সবসময়ই উদ্দেশ্যমূলক এবং কোন না কোন লক্ষ্যের দিকে চালিত। প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তি তিনি, যিনি কোন বিষয় সম্পর্কে নানা চিন্তাভাবনার পর একটি সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারেন। সিদ্ধান্তটি আনতে হবে একদম ভেতরের থেকে। বাইরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নয়। একে মনোবিদরা বলেছেন Insight বা অন্তর্দৃষ্টি। অন্তর্দৃষ্টি সঞ্জাত এই শিক্ষাই ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। যখন কেউ কোন সমস্যাকে বই পড়া বিদ্যে থেকে আলাদা করে নিজের অন্তর্দৃষ্টির (Insight) আলোকে বিচার করে তাকে বিশ্লেষণ করতে পারে তখনই আমরা তাঁকে প্রকৃত শিক্ষিত বলতে পারি।

Human learning is not so mechanical, blind or habitual as explained by trial and error or conditioning theories. It is always purposeful and goal directed and is essentially based on one's cognitive powers.[৩৮]

প্রশ্ন করতে পারেন শিক্ষার উদ্দেশ্য কী? প্রধান উদ্দেশ্য জীবন ধারার পরিবর্তন আনা। মানুষকে আরও উন্নত মানুষে পরিণত করা। চিন্তাভাবনাকে যুক্তিনির্ভর এবং আচার আচরণকে পরিশীলিত করা। এককথায় ব্যক্তিত্বকে ক্রমশ উচ্চসংস্কৃতিবান করে তোলা।

তবে এক শ্রেণীর মনোবিদ বলেন যে শিক্ষার মধ্যে পরীক্ষা ও ভ্রান্তির কোন স্থান নেই। তার লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট। কিন্তু আর একদল মনোবিদ বলেন, নির্ভুল আচরণে পৌঁছনোর জন্য অনেককে ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এগুতে হয়। ভুল করতে করতেই মানুষ ঠিক সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছতে পারে। এ-কারণে ভ্রান্তিও শিক্ষারই একটা ধাপ। বহু বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত প্রথমে ভ্রান্তিতে ভরা ছিল। তারপর ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে তাঁরা নির্ভুল সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন। এঁদের মধ্যে পড়েন ই.এল. থার্নডাইক প্রমুখেরা। থার্নডাইক শিক্ষার কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সূত্রের কথা বলেছেন, যেমন সদাপ্রস্তুতির সূত্র (Law of readiness) কোন মানুষ যদি সর্বদা শিক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকে তবেই সে শিখতে পারে। আর একটি সূত্র হল অভ্যাস সূত্র (Law of exercise)। শিক্ষা নিয়মিত অভ্যাসের ব্যাপার। তৃতীয় সূত্রটি আরও গুরুত্বপূর্ণ। এর নাম প্রতিক্রিয়া সূত্র (Law of effect)। এটি হল কোন মানুষের শিক্ষার কী ফলাফল দাঁড়াল তার ওপরেই শিক্ষা নির্ভর করে। ধরুন শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষের রুচিকে পরিশীলিত ও আচরণকে ভদ্র ও সংযত করা। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি আদিম মানুষের মতই চট করে রেগে যেতে পারে আর রেগে গেলে রাগের মাথায় সে পশুর

মতই খুন করতে পারে। এই বই যখন লিখছি, তখন স্থানীয় কাগজে একটি খবর পড়লাম যে ত্রিপুরার গ্রামে একটি লোক রাগের মাথায় তার বউকে হত্যা করেছে। গ্রামে আকছার এই ধরনের ঘটনা ঘটে।

কিন্তু যখন শুনি তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রলোকরা স্ত্রীকে মারধর করছেন। ভদ্রতা ও বিনয়ের ধার না ধরে লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছেন, দুর্নীতি করছেন, তখন তাঁর ক্ষেত্রে শিক্ষা সুপরিণতি লাভ করেছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ Law of effect তাঁর ক্ষেত্রে কার্যকরি হইনি। তাঁর ব্যক্তিত্ব একজন অশিক্ষিত ব্যক্তিত্বেরই সমতুল। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে কেন শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও কিছু কিছু মানুষের মনে মানসিক পরিবর্তন আসে না। এই শ্রেণীর ব্যক্তিত্বের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটে না কেন? স্কুলের বহু পড়ুয়ার মধ্যে দেখা যায় একশ্রেণীর প্রথাবহির্ভূত ব্যবহার যেমন বেয়াদপি, অবাধ্যতা অমনোযোগিতা এমনকি অপরাধপ্রবণতাও। একে বলা হয় Delinquency এককথায় অবাধ্যতা। বয়ঃসন্ধির সময় এই ধরনের ব্যবহার অনেকের মধ্যে বেশী করে দেখা দেয়। তারা অনেকেই পড়াশোনা ছেড়ে দেয ও পেশাদার অপরাধীতে পরিণত হয়। কিন্তু স্কুল ড্রপ আউট বা কিশোর অপরাধীরা হল শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। শিক্ষার ইতিবাচক প্রভাবই কিন্তু সবচেয়ে বেশি। উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে ও ভাল সহপাঠীদের কাছ থেকে একজন ছাত্র যা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে সে আর কোথা থেকে তা পায় না, এমনকি তার বাড়িতেও নয়। স্কুলে না গিয়ে বাড়িতে বসে লেখাপড়া শিখেছে আর স্কুলে পড়েছে এ দুজনের ব্যক্তিত্ব পাশাপাশি রেখে বিচার করুন দেখবেন উভয়ের ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেক তফাত। যে স্কুলে পড়েছে মানুষজন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। জটিল পরিস্থিতি সম্পর্কে সে যতটা বুঝতে পারে অন্যজন অত পারে না। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সে বুঝতে পারে নিজেকে।[৩৯]

স্কুলে একজন ছাত্র কী ধরনের শিক্ষা পাচ্ছে তার ওপর তার ব্যক্তিত্বের ধরন গড়ে ওঠে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমদেশে গবেষণা করে দেখা গেছে যে কে কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছে তার ওপরেও তার ব্যক্তিত্ব নির্ভর করে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এই তফাতটা ধরা পড়ে। কারণ কলেজে উঠেই সাবজেক্ট আলাদা আলাদা হয়ে যায়। যেমন যারা আর্টসের ছাত্র তারা বিজ্ঞানের ছাত্রদের চেয়ে একটু উদার (Less rigid). চট করে তারা কিছু মেনে নিতেও নারাজ। তারা কম কর্তৃত্ববাদী। আমাদের দেশেও দেখেছি বাংলা ও সংস্কৃত ছাত্রদের সঙ্গে অর্থনীতি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রির ছাত্রদের পোশাক-পরিচ্ছদ চালচলন ও ভাবনা-চিন্তার মধ্যে যথেষ্ট ফারাক।

সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে, একজন শিক্ষিত ব্যক্তির একজন অশিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে জানার আগ্রহ অনেক বেশি। তার সহনশীলতাও বেশি। স্কুলের পড়াশোনা বা পাঠ্য বিষয়ের অতিরিক্ত বিভিন্ন বিষয়ে যেমন খেলাধুলো. গানবাজনা, আবৃত্তি, ছবি আঁকা, সাহিত্য প্রভৃতিতে যারা ব্যুৎপত্তি দেখায় তারা বাড়িতে বাবা-মা আত্মীয় স্বজনের কাছে একটা আলাদা স্বীকৃতি পায়। এই স্বীকৃতি তাকে আত্মবিশ্বাস এনে দেয়।

ছেলেমেয়েদের স্কুল নির্বাচনের সময় সর্বাগ্রে দেখতে হয় যে স্কুলকে যেন ছেলেমেয়েরা ভয় না পায়। তারা নির্ভয়ে তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে। "**Schools should be a place where children are not afraid to express the feelings they have**

where mistakes can be made without embarrassment, where tears and disturbances are no disgrace, where encouragement and sympathy are offered when needed There should be fun and laughter and perhaps even a bit of teasing School should be a place where children are sure of warm human understanding"[৪০] যেখানে ভুল করলে ছেলেমেয়েরা অপ্রস্তুতে পড়বে না। যেখানে কান্না আর পথের বাধা কোন অসম্মান নয়। যেখানে উৎসাহ আব সহানুভূতি যখনই প্রয়োজন তখনই পাওয়া যায়। স্কুলে থাকবে প্রচুব মজা, প্রচুব হাসিঠাট্টা, হই হট্টগোল কিছুটা তামাসাও। প্রত্যেকটি স্কুল নিশ্চিত হবে যে তারা ছেলেমেয়েদেব মধ্যে উষ্ণ মানবিক বোঝাপড়াব পবিসব তৈরি কবতে পাবছে।

এই বই-এ আগেই বলেছি একটি ভাল স্কুল একটি ছেলে বা মেয়েব কীভাবে ব্যক্তিত্বের পবিবর্তন ঘটাতে পারে। আমি গ্রামের স্কুল-কলেজ থেকে পড়েছি, আমার ছেলে সাউথ পয়েন্ট, ক্যালকাটা বয়েজ, প্রেসিডেন্সি, জে.এন.ইউ. থেকে পড়েছে—আমি হাজার পড়াশোনা করলেও আমাদের দুজনের ব্যক্তিত্ব কখনও একবকম হবে না। আবার ইংলন্ডেও যে ছেলেটি এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ কবেছে, আর যে অক্সফোর্ড থেকে পাস করেছে তাদের দুজনেব ব্যক্তিত্ব একরকম হবে না। আমাদের দেশে পাবলিক স্কুলে যেসব ছেলেমেযে পড়ছে, আবার সৈনিক স্কুলে যারা পড়ছে, আবার যারা রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলে পড়ছে, দেখা যাবে তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথাও বড় রকমের কোথাও সূক্ষ্ম তফাত রয়েছে।

স্কুল যে কীভাবে ব্যক্তিত্ব তৈরি করে তার একটা ছোট্ট পরীক্ষার বিবরণ দেই। আগেই বলেছি আমি একটি গ্রামের ছেলেকে ক্লাস ফাইভে সিউডি রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যায়তনে ভর্তি করে দেই। তফশিলি সম্প্রদায়ের এই ছেলেটির বাবা তার মাকে পরিত্যাগ করে। মা একজনের বাড়ি কাজ করে। ছেলেটি থাকে তাদের গরিব মামার বাড়ি। দাদামশাই রিকশ চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে।

ছেলেটি গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে পড়ত। যখন সে ক্লশ ফোর পাশ করে তখন সে ভাল করে বাংলায় নিজের নাম লিখতে জানত না। কিন্তু ফ্রি ছাত্র হিসাবে মিশনে থেকে পড়ার সুযোগ পাওয়ায় তার জীবনধারার অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে। ছেলেটি এখন মাধ্যমিক পাশ করে গেছে। তার হাতের লেখা অনেক ভাল হয়েছে। সে গুছিয়ে লিখতে শিখেছে। চেহারার মধ্যে বুদ্ধির ছাপ এসেছে। শিক্ষা এবং ভাল স্কুলিং তার পুনর্জন্ম ঘটিয়েছে। আবার এই ছেলেটি যদি পাবলিক স্কুলে পড়ত সে আরও অন্যরকম হয়ে যেত। চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে ইংরাজি বলত। তার পোশাক-আশাক চুল কাটার স্টাইলের পরিবর্তন হত। কলকাতার বিভিন্ন অনাথ আশ্রম থেকে প্রতিবছর বিদেশীরা বাচ্চা নিয়ে যান দত্তক নেবার জন্য। ইওরোপে ধনীপরিবারে তারা বড় হয়। সেখানকার নামী স্কুলে তারা ভর্তি হয়। স্কুলজীবন শেষ করার পর তাদের চেহারা দেখেই শুধু বোঝা যায় তারা ভারতীয়। শিক্ষা ও পরিবেশ তাদের ব্যক্তিত্বের আমূল পরিবর্তন ঘটায়।

প্রতিভাময় ব্যক্তিত্ব

বিশেষ দক্ষতা বা Talent শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বাইবেলে। এটি বিশেষণ নয়, বিশেষ্যপদবাচক শব্দ। বাইবেলের যুগে ট্যালেন্ট বলতে বোঝাত মধ্যপ্রাচ্যে চালু দামী

মুদ্রা। আমাদের দেশে যেমন মোহর, গিনি এইসব ছিল। ম্যাথুলিখিত সুসমাচারে প্যারাবেল অব দি ট্যালেন্টস বলে একটি নীতিমূলক গল্প আছে। যিশু এই গল্পটি তাঁর শিষ্যদের শুনিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি বিদেশযাত্রার আগে তাঁর তিন পাচককে কিছু ট্যালেন্ট ভাগ করে দিয়েছিলেন। প্রথম দুজন ওই ট্যালেন্ট লগ্নী করে দ্বিগুণ করে ফেলল। তৃতীয়জন তার ট্যালেন্ট খরচ না করে গুপ্তধন হিসাবে লুকিয়ে রাখল। তারপর প্রভু ফিরে এলে তাকে ওই গচ্ছিত ট্যালেন্ট ফেরত দিয়ে দিল। ভাবল প্রভু তার সততায় খুব খুশি হবেন। কিন্তু প্রভু প্রথম দুজন ভৃত্য যারা ট্যালেন্ট খাটিয়ে দ্বিগুণ করেছিল তাদের প্রশংসা করলেন আর যে ভালমানুষ সাজার জন্য ট্যালেন্ট ফেরত দিল তাকে খুব ধমকালেন।[৪১]

বার্ধক্যের বারাণসী পাড়ার পার্ক

মুদ্রা হিসাবে ট্যালেন্ট এখন আর চালু নেই। এখন তার অর্থ কোন ব্যক্তির অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ গুণ, যা সবার মধ্যে নেই। শুধু ওই ব্যক্তির মধ্যেই আছে। যেমন তীব্র কৌতুকবোধ, ক্ষুরধার স্মৃতিশক্তি, গভীরতর উপলব্ধিবোধ। (Sharpar wits, better memories, keener senses)। অথবা কোন বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা।

অক্সফোর্ড অভিধানে Talent-এর মানে দেওয়া আছে Power to do something well। জীবনের যেকোন ক্ষেত্রে অসাধারণ গুণের অধিকারীকে বিশেষ বা গুণীব্যক্তি বলা হয়। Talent ও Genius মোটামুটি সমর্থক হলেও Genius তাকেই বলব যিনি কোন একটা বিষয়ে আশ্চর্যরকম গুণের অধিকারী। Geniusকে বাংলায় যদি মহাপ্রতিভা বলি তাহলে অভিধাটি যথাযথ হয়। মহাপ্রতিভার সঙ্গে মিশে থাকে উদ্ভাবনী শক্তি আর অপরিসীম প্রজ্ঞা। বিজ্ঞানে প্রতিবছর যারা প্রথমশ্রেণী পাচ্ছে তারা সবাই Talented কিন্তু মহাপ্রতিভাবান বলব নিউটন, আইনস্টাইন, জগদীশচন্দ্র, সত্যেন্দ্র বসু, মেঘনাদ সাহা প্রমুখ বিজ্ঞানী ব্যক্তিত্বদের।

ফুটপাতে কাঠকয়লা আর খড়ি দিয়ে যে ছেলেটি ছবি আঁকে নিঃসন্দেহে সে গুণী। এই রকম হাজার হাজার গুণী ও বেশ কিছু প্রতিভাবান ছেলেমেয়ে আমাদের দেশে রয়েছে। কিন্তু চর্চা ও উৎসাহের অভাবে বহু গুণ ও প্রতিভা অকালে নষ্ট হয়ে যায়। আমি

ব্যক্তিগতভাবে প্রতিভায় বহু অপমৃত্যু দেখেছি। আমার ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সামান্য গুণ দেখলে তাদের উৎসাহিত করে গুণের সদ্ব্যবহার করানোর চেষ্টা করেছি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছি। এই ব্যর্থতার কারণ ব্যক্তিত্বের মধ্যে ক্রমাগত দ্বন্দ্ব থাকলে ব্যক্তি হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে গুণ বা প্রতিভার চর্চা করতে পারে না। শমিতা একজন গুণী মেয়ে। সে ভাল নাচতে পারত। গান গাইতে পারত। ভাল বক্তৃতা দিতে পারত। কিন্তু ছোটবেলায় তার বাবা-মারা যায়। তারপর কয়েকটি পারিবারিক কারণে সে নানা সংঘাতের সম্মুখীন হয়। তার পড়াশোনায় বাধা পড়ে। সে আর তার গুণের চর্চা করে না। কোন প্রতিযোগিতায় নামতে চায় না কেননা কোন ছুতোয় নাতায় এড়িয়ে যায়। আমি যখন তাকে দেখি তার বয়স তখন ২৪। তাকে তার বিশেষ গুণ সম্পর্কে অবহিত করেও তাকে উৎসাহিত করতে পারিনি কারণ মানসিক বাধা এখানে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্নতামুক্ত করার জন্য আচরণ-চিকিৎসা (Behaviour therapy) বা দীর্ঘ পরামর্শ (Counselling) দানের প্রয়োজন। কিন্তু তার সহযোগিতা ছাড়তো এটা সম্ভব নয়।

প্রতিভা জন্মগত। কিন্তু এটা ঠিক Parable of talent-এর গচ্ছিত অর্থের মত। আপনাকে যদি আজ এক লাখ টাকা দেই তা থেকে আপনি যদি এক টাকাও নষ্ট করে ফেলেন তাহলে আর এক লাখ টাকা থাকল না। অথবা টাকাটা ফেলে রেখে দিলে যতদিন যাবে মুদ্রাস্ফীতির ফলে তার দাম কমতেই থাকবে। অর্থনীতিবিদরা বলেন, তাকেই টাকা বলা যায় যে টাকা টাকার যথার্থ কাজ করে। (Money is what money does)। গুণ ও প্রতিভার উপযুক্ত ব্যবহার করতে হয় এবং নিরন্তর চর্চার দ্বারা তাকে বাড়িয়ে যেতে হয়। আমি সবসময় বলি, সাধারণ ছেলেদের চেয়ে ভাল ছেলেদেরই বেশি করে প্রাইভেট টিউটর দরকার। কারণ যারা গুণী ও প্রতিভাবান' তাদের একটু সাহায্য করলেই তারা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারে। সাধারণদের তার চারগুণ সাহায্য করলেও সামান্য (Marginal) ফল হয়।

এইজন্য অভিভাবকদের উচিত তাদের ছেলেমেয়েদের মধ্যে সামান্য গুণ দেখলেই ওই গুণের উপযুক্ত বিকাশের জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রতিভা বহুক্ষেত্রেই তার আত্মবিকাশের পথ নিজেই খুঁজে নেয়। শিশু রঙ তুলি কাগজ না পেলেও দেওয়ালে ছবি আঁকে। ওস্তাদের খোঁজে আলাউদ্দিন খান বালক বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে মাইহারে চলে এসেছিলেন। হতাশ হবেন না বইগুলিতে আমি অসংখ্য প্রতিভাবানের উদাহরণ দিয়েছি যাঁরা প্রতিবন্ধকতাকে কাটিয়ে উঠে তাদের প্রতিভা বিকাশের পথ নিজেরাই করে নিয়েছেন। কিন্তু যে নদী মরুপথে ধারালো হারা—অর্থাৎ কম নয়। প্রতিভার অপমৃত্যুর সংখ্যাও সবক্ষেত্রে এর কারণ কিন্তু দারিদ্র্য নয়। আমি শমিতার কথা একটু আগেই বলেছি, শমিতার বাবার মৃত্যু হলেও তার আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়নি। তার বাবার পেনসন, স্থাবর সম্পত্তি সর্বোপরি মায়ের চাকরি ছিল। কিন্তু সর্বোপরি মনস্তাত্ত্বিক কারণে তার গুণের যথাযথ বিকাশ ঘটল না। Talented teenagers গ্রন্থে তিনজন মনোবিদ আমেরিকার বিভিন্ন স্কুলের ২০৮ জন অসাধারণ চৌকশ (Outstanding) ছেলেমেয়ের ওপর গবেষণা করে দেখেছেন, তাদের একটা বড় অংশ তাদের সহজাত গুণের চর্চা ছেড়ে দিয়েছে। স্কুলের পড়া শেষ করার আগে গুণের চর্চায় যদি ভাঁটা পড়ে তাহলে পরবর্তী জীবনে তার পুনরুজ্জীবন ঘটানো

খুব মুশকিল। অবশ্য গুণীদের বুদ্ধিবৃত্তি সাধারণের থেকে বেশি হওয়ায় তারা সাধারণ পেশার ক্ষেত্রেও ব্যুৎপত্তি দেখাতে পারে। ধরুন, ছাত্রজীবনে যে ভাল গান করত সে গানের চর্চা ছেড়ে দিল, কিন্তু পরবর্তী জীবনে সে একজন ভাল ইঞ্জিনিয়ার হল। অবশ্য ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে সে সবার ওপরে যেতে পারবে কি না তা বলা যায় না। কারণ যাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে প্রতিভা আছে তারাই সেখানে শীর্ষস্থান অধিকার করবে। কিন্তু অন্য প্রতিভার লোক ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে মোটামুটি চালিয়ে যেতে পারবে। তবে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারীরা যাকেই স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে তোলে।

বিশেষ গুণ ও প্রতিভার উৎস কোথায় তা এখনও রহস্যাবৃত। প্রতিভা কী জিনবাহিত? তাহলে প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের ছেলেমেয়েরা অমন প্রতিভাবান হয় না কেন? আবার সাধারণ ব্যক্তির অনেকগুলি ছেলেমেয়ের মধ্যে একজন কী করে হঠাৎ প্রতিভাবান হয়ে ওঠে? এইসব প্রশ্নের উত্তর এই বইয়ের বিভিন্ন জায়গায় দিয়েছি।

প্রতিভার উৎস নিয়ে নানা মতভেদ আছে বলেই লোকে একে ভগবানের দান বলে মনে করেন। যদি ভগবানের নাম মুখে না আনতে চান তাহলে বলতে পারেন প্রতিভা এক আশ্চর্য রহস্যময় বস্তু। এ বস্তু যার মধ্যে নেই সে হাজার চেষ্টা করেও তা অধিকার করতে পারে না। কিন্তু প্রতিভার মাত্রাভেদ আছে। কিছু না কিছু সামান্য প্রতিভা নিয়ে সব মানুষই জন্মায়। তাকে আমরা ট্যালেন্ট বা বিশেষ গুণ বলি যেটি আমি সব সময় বলে থাকি : কোন নির্গুণ মানুষ হতে পারেনা। প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গুণ থাকে। যদি বাইরে থেকে বুঝতে না পারেন আত্মানুসন্ধান করুন। আত্মানং বিদ্ধি। প্রতিভা বা বিশেষ গুণ সর্বদা শুধু মেধা নির্ভর নয়। ভাল গান গাইতে পারা, ভাল ছবি আঁকতে পারাই নয়, জীবনের অসংখ্য দিকে কোন না কোন গুণের উন্মেষ হতে পারে। যেমন যে মেয়েটি ভাল রান্না করতে পারে বা বুদ্ধি-ভালবাসা ও স্নেহ দিয়ে একটি সুখী পরিবার গড়ে তুলতে পারে সেও গুণী। কিন্তু গুণ বা প্রতিভা চায় স্বীকৃতি, চায় উৎসাহ, চায় সমমর্মিতা।

কর্মক্ষেত্রেও কারও প্রবণতা বিকশিত হতে পারে। কেউ ভাল প্রশাসক হিসাবে স্বীকৃতি পান। ভাল শিক্ষক হিসাবে কেউ রাজকীয় সম্মান পান। এ সবই প্রতিভার বিভিন্ন দিকের স্বীকৃতি। তবে যার যেদিকে প্রতিভা নেই, তাকে সেইদিকে কৃতকার্য করে তোলা দুরূহ কাজ এবং শক্তির অপচয়। আমাদের ছোটবেলায় মাস্টারমশাই বলতেন : তোর লেখাপড়া হবে না যা লাঙল চষগে যা। যেন লাঙল চষার মধ্যে প্রতিভা নেই। যে চাষী অধিক ফসল ফলায় বা উন্নত জাতের বৃহৎ আনাজ ফলায় সেও কিন্তু প্রতিভাবান। সবাই যা পারে না কেউ কেউ যা পারে সেটাই প্রতিভা। কিন্তু যেটা আগেই বলেছি প্রতিভার সামাজিক স্বীকৃতি চাই। জাতির সংস্কৃতির মধ্যেই প্রতিভার জন্য আলাদা আসন পাতা থাকা চাই। আমাদের দেশে গুণ ও প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান নেই। যদি কেউ প্রচণ্ড লড়াই করে একটা জায়গায় উঠতে পারেন তখনই সমাজ তাকে স্বীকৃতি দেয়। যেমন গণ মাধ্যমে যার প্রচার হয় না তার মধ্যে হাজার গুণ থাকলেও সমাজ তাকে পাত্তা দেয় না। এস্কিমো সমাজ রঙের ব্যবহার জানে না। তাই সেখানে শিল্পীর মর্যাদা নেই। কেউ শিল্পী হতেও চায় না। আমাদের দেশে কজন অভিভাবক চান তাঁর ছেলেমেয়ে শুধু কবি হোক, অভিনেতা হোক, অথবা চিত্রশিল্পী হোক।

এগার

ব্যক্তিত্ব ও ভাবাবেগ

কোনও কোনও ব্যক্তিত্ব আছে যারা সামান্য দুঃখে বিহ্বল হয়ে পড়ে। দুঃখ, আনন্দ, ভালবাসা ও সমমর্মিতা প্রকাশের জন্য কেঁদে ফেলে। সামান্য হাসির কথাতেই হোহো করে হেসে ওঠে। এই আনন্দ দুঃখ বেদনার বহিঃপ্রকাশকে আমরা ভাবাবেগ বলি। আবার কেউ সামান্য কারণে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে আবার কেউ রাতে ভূতের ভয়ে একা ঘরে ঘুমতে পারে না। রাগ ও ভয় এই দুটোই ভাবাবেগের ফসল। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ স্বাভাবিক ব্যবহার করে। কিন্তু কোন কারণে বাইরের উদ্দীপকের সংস্পর্শে এলেই বহু মানুষ ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের মত প্রখর ব্যক্তিত্ব অনেক সময় বক্তৃতা দিতে গিয়ে ভাবাবেগে কেঁদে ফেলতেন। আমি আচার্য বিনোবা ভাবেকে বাংলার মাটিতে পা দেওয়ামাত্র হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখেছি। 'আমি প্রেমময় চৈতন্যের দেশের মাটিতে পা রেখেছি' একথা বলেই তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। সেটি ১৯৬১ সালের কথা। ইসলামপুরে তাঁর সেদিনের সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম।

যেকোন বিয়োগান্ত সিনেমা দেখলে আমি সিনেমা হলে বসে হাপুস নয়নে কাঁদি। যখন স্কুলে পড়তাম তখন একবার কার্শিয়াং-এ এন.সি.সি. শিবিরে গিয়েছিলাম। আমরা স্থানীয় হলে একটি পৌরাণিক ছবি দেখতে গিয়েছি। সিনেমা দেখে আমার মনে কোন ভাবাবেগ দেখা দেয়নি। কিন্তু আমার পাশে বসা সেনাবাহিনীর দুই জওয়ান দেখি ঘনঘন রুমালে চোখ মুছছেন। বহু লোকের ভূতের ভয় এমন যে রাত্তির বেলা একঘর থেকে আর একঘরে যেতে পারে না। বহু লোক তাদের মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। আমি প্রায়শই এমন লোকের সংস্পর্শে আসি যারা আমাকে অকারণে চোখ রাঙিয়ে কথা বলে। আবার আমিও অনেক সময় রেগে যাই। পরে রাগ পড়লে অনুশোচনা হয়। বহু মানুষ দুর্ব্যবহারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। কাউকে মানসিক যন্ত্রণা দেওয়া অপরাধের মধ্যে পড়ে। কিন্তু মানসিক যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করেও বহু লোক দিব্যি কাটিয়ে দেয়। কোন বিশেষ ভাবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেউ যদি অত্যধিক আবেগ প্রকাশ করে তাকে আমরা ভাবাবেগ বা Emotion বলি। এমন বহু ব্যক্তিত্ব আছে যারা সহজেই ভাবাবেগে আপ্লুত হয়। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে রাজ্যত্যাগ করেছিলেন। ভাবাবেগই নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে আজাদহিন্দ ফৌজ গঠন করে ভারত স্বাধীন করার প্রেরণা যুগিয়েছিল। সুভাষচন্দ্র যদি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের শিকার না হতেন তাহলে তিনি হয়তো দেশত্যাগ করতেন না। অপমানিত হওয়ার ফলে তাঁর ভাবাবেগই তাঁকে চালিত করে। সতরাং

ভাবাবেগ সব সময় নেতিবাচক নয়। তা ইতিবাচকও। সমস্ত ব্যবসায়ীর জীবনপঞ্জী ঘেঁটে দেখুন, ভাবাবেগেই তাঁদের ব্যবসা শুরু করতে প্ররোচিত করেছিল। প্রথম প্রজন্মের ব্যবসায়ী এই ভাবেই ভাবাবেগ বশে ব্যবসা শুরু করেন, পরে তা বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভাবাবেগ আছে। তবে উদ্দীপক থাকলেও সকলের ভাবাবেগ তাতে সমানভাবে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। রামবাবুর কাছে শ্যামবাবু কিছু টাকা পান। দেনা যতক্ষণ না শোধ হচ্ছে ততক্ষণ রামবাবু রাতে ভাল করে ঘুমতে পারেন না। আবার কোটি কোটি দেনা নিয়ে অমিতাভ বচ্চন কেমন নিরুদ্বিগ্নভাবে আরও বড় ব্যবসার ঝুঁকি নিচ্ছেন। কেউ মুরগি কাটা দেখলে আতঙ্কে শিউরে ওঠেন। আমি অনেক খুনীকে দেখেছি যাঁরা পনের-বিশটা লোককে খুন করেও দিব্যি নির্বিকার।

ব্যক্তিত্ব অনুসারে ভাবাবেগের তারতম্য ঘটে। এই তারতম্য অনুসারে কাউকে বলা হয় সেন্টিমেন্টাল, কাউকে বলা হয় র‍্যাশনাল। এখন প্রশ্ন হতে পারে ব্যক্তিত্ব ভাবাবেগের তারতম্য ঘটায়, না ভাবাবেগই ব্যক্তিত্ব তৈরি করে? এসব কথার উত্তর দিতে গেলে প্রথমে আমাদের প্রবৃত্তি (Instinct) ও ভাবাবেগ (Emotion) এই দুটো বিষয়ই জানতে হবে।

প্রবৃত্তিই ভাবাবেগের উৎস। প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হল এগুলি মানুষকে কষ্ট করে আয়ত্ত করতে হয় না। প্রবৃত্তি নিয়েই মানুষ জন্মায়। প্রবৃত্তি অনুসারে প্রাণী বিভিন্ন ব্যবহার করে। ডারউইন বলতেন, মানুষের যাবতীয় আচরণ প্রবৃত্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত। অর্থাৎ প্রবৃত্তি যা করার প্রেরণা দেবে মানুষ তাই করবে। উইলিয়াম জেমসের মতে প্রবৃত্তি শিক্ষাদীক্ষার ওপর নির্ভরশীল নয়। প্রত্যেক প্রবৃত্তির একটা উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্যটা চরিতার্থ করাই প্রবৃত্তির কাজ। উইলিয়াম ম্যাকডোগাল প্রমুখ বিজ্ঞানীরা বলেছেন, প্রবৃত্তি অনুযায়ীই লোকে আচরণ করে। কথায় আছে না, যার যেমন প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তি মানুষ উত্তরাধিকার সূত্রে পায় অথবা এটা তার মধ্যেই থাকে। প্রবৃত্তি একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে মানুষের লক্ষ্যকে চালিত করে। ওই লক্ষ্যবস্তুটি দেখামাত্রই তার মনে এক ধরনের ভাবগত উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। তখন এক বিশেষ ধরনের আচরণ করে বসে সে।

প্রত্যেকটি প্রবৃত্তির কতগুলি সুনির্দিষ্ট গন্তব্যস্থান আছে। যেমন পলায়নী প্রবৃত্তি বিপদ দেখলেই পালিয়ে যাওয়া শেখায়। অথবা লড়াই করে বাঁচতেও শেখায়। ইংরোজিতে বলে Fight or Flight। লড়াই করো না হয় পালাও। যৌনপ্রবৃত্তি আমাদের কামনা চরিতার্থ করতে শেখায়। ফ্রয়েড, অ্যাডলার ইয়্যুং প্রমুখেরা বলেন, সমস্ত কাজকর্মের মূলে এই প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি আমাদের যা করায় তারই তাড়নায় ওই কাজগুলি করি। যেমন জীবন প্রবৃত্তি (Eros), মৃত্যুপ্রবৃত্তি (Thantos), ইচ্ছাপ্রবৃত্তি প্রভৃতি হাজার রকমের প্রবৃত্তি আমাদের চালাচ্ছে। তখন আমরা বিভিন্ন ধরনের আচরণ করছি। অনেক আচরণ শিক্ষা সংস্কৃতি থেকে পাই। কিন্তু সব আচরণ বিধিই শিক্ষাপ্রসূত নয় তবে অনেক আচরণ পদ্ধতি আছে যেগুলো শিক্ষণীয়। এখন এই ধরনের প্রবৃত্তি সকলের মধ্যে সমানভাবে থাকে না। কারও মধ্যে কম থাকে কারও বেশি। তাছাড়া প্রবৃত্তি কতটুকু থাকবে সেটাও নির্ভর করে ট্রেনিং ও অভিজ্ঞতার ওপর।[৪২]

ম্যাগডোগালই বলেছেন, প্রবৃত্তিগত আচরণ নির্ভর করে ভাবগত অভিজ্ঞতার ওপর।

প্রতিটি প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ভাবাবেগ। যেমন পলায়নী প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে 'ভয়' ভাবাবেগ। ক্রোধ এই ভাবাবেগ জড়িয়ে আছে লড়াকু প্রবৃত্তির সঙ্গে। ম্যাকডোগাল সবশুদ্ধ ১৪টি আদিম প্রবৃত্তির কথা বলেছেন আর প্রতিটি প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ভাবাবেগেরও উল্লেখ করেছেন। যেমন পলায়ন (ভয়), লড়াকু (ক্রোধ), জুগুপ্সা (ঘৃণা), আগ্রহ (বিস্ময়), পিতৃত্ব বা মাতৃত্ব (স্নেহ), আবেদন (সংকট), গঠনকৌশল (সৃজনশীলতা), অধিকারকবোধ (মালিকানা), মিশুক প্রবৃত্তি (একাকীত্ব), যৌনতা ও সঙ্গমইচ্ছা (কাম), আত্মপ্রতিষ্ঠা (মানসিক শ্রেষ্ঠত্ববোধ), নতিস্বীকার বা আত্মগ্লানি (নেতিবাচক মনোভাব), জীবিকাসন্ধান বা খাদ্য অন্বেষণ (ক্ষুধা), কৌতুকপ্রিয়তা (বিনোদন ইচ্ছা)।

ওপরের তালিকায় দেখলেন প্রতিটি প্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িয়ে আছে তার অনুষঙ্গ। এই অনুষঙ্গই ভাবাবেগ। সুতরাং যখন আপনাকে যে প্রবৃত্তি চালনা করবে সেই প্রবৃত্তির অনুষঙ্গ হিসাবে ভাবাবেগ দেখা দেবে। যেমন যদি আপনার মধ্যে পলায়নী প্রবৃত্তি দেখা দেয় তার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেবে ভয় ভীতি। অথবা কোন অশ্লীল ছবি (উদ্দীপক) দেখে যৌনতা প্রবৃত্তির উদ্রেক হল। সঙ্গে সঙ্গে কাম নামক ভাবাবেগের উদ্রেক হবে। কামতাড়িত ব্যক্তিসত্তার তখন একমাত্র লক্ষ্য যেকোন ভাবে কামনা চরিতার্থ করা। এখন ব্যক্তির শিক্ষাদীক্ষা সংস্কৃতি ও সংযম ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে এই প্রবৃত্তিগুলি তার কতখানি বশে থাকছে। গীতার মূল বক্তব্য প্রবৃত্তিগুলিকে বশে রাখার প্রক্রিয়া অবহিত করানো। সে কথায় পরে আসছি। এখন ভাবাবেগের কথায় আসি।

আগেই বলেছি যে ভাবাবেগ প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত। ভাবাবেগ বা Emotion কথাটি এসেছে ল্যাটিন Emovere থেকে। তার মানে নাড়া দেওয়া বা উত্তেজিত করা। ভাবাবেগ আমাদের অনুভব বা চিন্তাভাবনাকে নাড়া দেয়, উত্তেজিত করে। এবং এর প্রভাব ব্যক্তির বাইরের আচরণে প্রকাশ পায়। যেমন ষাঁড়ে তাড়া করলে লোকে দৌড়য়। বাচ্চারা হলে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়য়। বয়স্করা হয়ত কাঁদে না। কিন্তু তারা চেঁচাতে পারে। তাদের চোখমুখে ভীতি ফুটে ওঠে। রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটে। একবার আমরা কিছু সাংবাদিক সাবমেরিনে চেপে বঙ্গোপসাগরের নিচে কয়েকঘণ্টা ভ্রমণ করেছিলাম। সেটা অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা। কিন্তু ভীতিপ্রদ। এতে এক একজনের এক একরকম প্রতিক্রিয়া হল। কারও মুখ থমথমে। কেউ অত্যধিক নার্ভাস হবার ফলে অসুস্থ হয়ে পড়ল। আবার কেউ একদম স্বাভাবিক। ভয় প্রবৃত্তি সকলের মধ্যেই আছে কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া সকলের ক্ষেত্রে সমান হয় না। খুব সাহসীরা অত সহজে ভয় পায় না। ধরুন কমান্ডো, প্যারাট্রুপার হতে গেলে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করে নেওয়া হয়। দেখা হয় এদের নার্ভ শক্ত কি না। আবার অনেকে সামান্য একটু বিপদে পড়লেই বেশি ভয় পায়। এটা মানসিক গঠনের ওপর নির্ভর করে।

আগেই বলেছি ভাবাবেগ প্রবৃত্তি নয়, প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ। প্রবৃত্তিকে চাপা না গেলেও ভাবাবেগকেও চাপা যায়। একজন লম্পট তার প্রবৃত্তিও চাপতে পারে না, তার ভাবাবেগকেও চাপতে পারে না। কিন্তু একজন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে চাপতে না পারলেও ভাবাবেগকে চাপতে পারেন। আবার একজন যোগী তার প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগ উভয়ই চাপতে পারেন।

প্রতারকরা ভাবাবেগকে চেপে বন্ধু ও হিতৈষীর মত মেলামেশা করে। তারপর প্রবৃত্তির

বশে কাজ হাসিল করে চলে যায়। এইজন্য বুদ্ধিমান লোকেরা বলে চট করে কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কারণ কার মনে কী আছে কে জানে? মিত্রভাবে ঘরে ঢুকে বহু দুষ্ট ব্যক্তি তার প্রবৃত্তি বশে সর্বনাশ করে চলে যায়।

ভাবাবেগ সম্পর্কে কয়েকটি জানার কথা হল :

১. ভাবাবেগ সার্বজনীন। ছেলেবুড়ো সবারই প্রবৃত্তি আছে এবং প্রবৃত্তির সঙ্গে ভাবাবেগও আছে। চার্লস মরিসের মতে ভাবাবেগ এক মিশ্র অভিজ্ঞতা যা দৈহিক পরিবর্তন ঘটায় এবং যা চারিত্রিক আচরণের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

২. ভাবাবেগ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। ভিন্নভিন্ন উদ্দীপক ভিন্নভিন্ন পরিবেশে ভিন্নভিন্ন ভাবাবেগের জন্ম দেয়। অন্ধকার বর্ষণমুখর রাতে পোড়োবাড়িতে যত ভূতের ভয় হবে, শহরে আলো ঝলমলে ঘরে অনেকের সঙ্গে থাকলে হাজার ভূতের গল্প শুনলেও সে অনুভব হবে না।

৩. কতগুলি ভাবাবেগ কিছু উদ্দীপক দিয়ে সহজেই জাগানো যায়। যেমন সিনেমা টিভির সাহায্যে মানুষের লড়াকু প্রবৃত্তিকে বাড়িয়ে ক্রোধ ভাবাবেগকে বাড়ানো যায়। তেমনি কামনা ভাবাবেগও বাড়ে যৌনদৃশ্যের অবতারণা করলে। বস্তুতপক্ষে টেলিভিশন এবং সিনেমা যৌনউদ্দীপক দিয়ে দর্শকদের আকর্ষণ করে থাকে।

৪. ভাবাবেগ হঠাৎ জেগে ওঠে। প্রশমিত হয় ধীরে ধীরে। দেশেপ্রেমের ভাবাবেগ হঠাৎ জেগে উঠে আবার ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়।

৫. ভাবাবেগ স্থানান্তরিত হতে পারে। দেখা যায় যেসব পুরুষ দজ্জাল স্ত্রীর সামনে মিনমিন করে তারা অফিসে গিয়ে অধস্তনদের ওপর হম্বিতম্বি করে।

৬. সমস্ত ভাবাবেগ থেকে অন্য ধরনের ভাবাবেগের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন বীরপুরুষ অর্জুনও অভিমন্যুর মৃত্যু সংবাদে হাউমাউ করে কেঁদেছিলেন। তারপর তাঁর শোক পরিণত হয়েছিল তীব্র ক্রোধে।

ভাবাবেগের পরিবর্তন ঘটে। যেমন ধরুন একজন বাসযাত্রী খুব আরাম করে যাচ্ছেন। তাঁর ভাবাবেগে দেখা দিয়েছে প্রশান্তি। হঠাৎ বাসটি সামনের একটি ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা খেল। যাত্রীটি ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। বেশ ব্যথা পেল সে। বাসভর্তি যাত্রীরাও সিট থেকে কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। সেই মুহূর্তে ভাবাবেগের পরিবর্তন হল। আতঙ্ক ফুটে উঠল সকলের চোখেমুখে। তারপর সবাই যখন আবিষ্কার করল তারা বেঁচে আছে, তারা বাস থেকে বেরিয়ে এল। সামনের ট্রাকটির বেশি ক্ষতি হয়নি। বাসটি দাঁড়িয়ে। বাসের যাত্রীদের আবার ভাবাবেগের পরিবর্তন হল। তাদের চোখেমুখে ফুটে উঠল রাগ। তারা সবাই রেগেমেগে ড্রাইভারকে মারতে ছুটে গেল। গিয়ে দেখল ড্রাইভার তার সিটে স্টিয়ারিং হাতে ধরে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। তার দেহ রক্তাক্ত। মনে হচ্ছে তার প্রাণ নেই। তখন যাত্রীদের ভাবাবেগের আবার পরিবর্তন হল। মুখে ফুটে উঠল করুণার অভিব্যক্তি। তারা ড্রাইভারকে নামিয়ে হাসপাতালে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের ভাবাবেগের দ্রুত পরিবর্তন হয়। যে মানুষ কৌতুকে হাসতে পারে, দুঃখে কাঁদতে জানে, সুন্দর ও নান্দনিক দৃশ্য দেখে আপ্লুত হয়ে বলে ওঠে বাঃ, আবার মন্দির, মসজিদ, গীর্জায় ধ্যানগম্ভীর পরিবেশে যার মনে পবিত্র ভক্তিভাব জাগে,

যে রণে রণহুংকার ছাড়ে আবার প্রিয়ার সান্নিধ্যে কোমলতায় সিক্ত হয় তাকেই একজন সুস্থ মানুষ বলা যায়। কিন্তু বিভিন্ন পরিবেশেও যার ভাবাবেগের পরিবর্তন হয় না বুঝতে হবে তার ব্যক্তিত্ব অসুস্থ এবং অস্বাভাবিক।

অনেক সময় মানসিক গঠনের ওপর নির্ভর করে একজন কতখানি প্রবৃত্তি নির্ভর হবে। অনেক সময় মানসিক শক্তির জোরে আমবা অবাঞ্ছিত ভাবাবেগকে দূরে সরিয়ে রাখি। যেমন যুদ্ধে এক বিপজ্জনক অপারেশনে যেতে একজন সৈনিকের হযতো খুব ভয় করছে। কিন্তু সে ভাবাবেগকে প্রকাশ হতে দেবে না। কর্তব্যের তাগিদে সে মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমরা মনে করবো সে অকুতোভয়। কিন্তু সে হয়তো ভয় পেয়েছিল। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করেনি। কর্তব্যের আহ্বানে যে কাজ পছন্দ নয় এমন কাজ আমরা করি, আমরা ভাবাবেগ প্রকাশ করি না।

আমি একবার তিলাইয়া সৈনিক স্কুলে এক প্যারাট্রুপারের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্লেন থেকে প্যারাসুট ধরে ঝাঁপিয়ে পড়তেই আপনার ভয় করে? তিনি অকপটে বলেছিলেন, করে না আবার। কিন্তু যখন এই কাজ বেছে নিয়েছি তখন মনের ভাব চেপে সাহস সঞ্চয় করে ঝাঁপিয়ে পডতে হয়। এমন সাহসী নিশ্চয়ই আছেন

ব্যক্তিত্ববর্ধক গোঁফ

যাঁরা প্যারাট্রুপিং করতে স্রেফ মজা পান। আবার বহু লোক আছে যারা মৃত্যুর ভয়ে কিছুতেই মিলিটারিতে যোগ দেবে না। এখন ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষা সংস্কৃতি ও সংযম ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে সে প্রবৃত্তিগুলিকে কতখানি বশে রাখতে পারছে। প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে পারলেই মানুষ তার মানবধর্ম পালন করল। কারণ পশুরা প্রবৃত্তিকে বশে রাখতে পারে না। গীতায় এজন্য প্রবৃত্তিকে বশে রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। অর্জুন যখন শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে কেশব, স্থিতপ্রজ্ঞ ও স্থিতধী ব্যক্তির আচরণ কী রকম?

শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন : যিনি দুঃখে অনুদ্বিগ্নচিত্ত, সুখে স্পৃহাশূন্য, অনুরাগ, ভয় ও

ক্রোধশূন্য যিনি তাকেই স্থিতধী বলা যাবে। (দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ) এই স্থিতধী সবাই হতে পারে না। তার জন্য যোগসাধনা দরকার, চিত্তসংযম দরকার। যখন প্রবৃত্তি মনের বশে থাকবে তখন আর ভাবাবেগ দেখা দেবে না। সেই মানুষ হবে শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন ও প্রসন্ন।

সংসারীদের মধ্যেও এমন ব্যক্তিত্ব আছে যিনি রাগেন না। বহু মানুষ কাম প্রবৃত্তি প্রতিরোধ করতে পারে না কারণ এটা বড় কঠিন কাজ। মুনিরাও ধ্যান ভেঙে উর্বশী মেনকার মত রূপসী নারীর পায়ে তপস্যার ফল বিসর্জন দিয়েছিল। কিন্তু যুক্তি বুদ্ধি ও শিক্ষাদীক্ষা প্রয়োগ করে মানুষ কামনাকে চেপে রাখে। যাকে বলে প্রবৃত্তির মাথায় মুগুর মেরে তাকে বার বার বসিয়ে দেওয়া আরকি! অনেক মানুষের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই প্রবৃত্তির তাড়না থাকে না। অনেকে খুব কম হাসে। এর মধ্যে বড় বড় রাজনৈতিক নেতাও আছেন যাঁরা হাসির কথা শুনলেও বলে ওঠেন হাসব না-না। এঁদের কৌতুক প্রবৃত্তিটা কম, নেই বললেই চলে। তাই হাসি আসে না। অনেকের দুঃখপ্রবৃত্তি কম। তাই তাঁরা কারও দুঃখে বিচলিত হন না। প্রতিদিনতো শত শত জরাগ্রস্ত লোক রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাচ্ছে মানুষ কিন্তু তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ জাগছে না। কসাই যখন ছাগল জবাই করে বা মুরগি কাটে তখন তার মধ্যে করুণা প্রবৃত্তি জাগে না। জাগলেও যুক্তি দিয়ে তাকে চাপা দেয়, কাজেই ভাবাবেগ আসার আর সময়ই পায় না। অথচ দেশে অসংখ্য প্রাণীপ্রেমিক আছেন। তাঁরা ল্যাবরেটরিতে গিনিপিগ কাটাও বন্ধ করে দিয়েছেন।

প্রত্যেকটি ভাবাবেগের অভিজ্ঞতা নানা ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। যেমন ভয় পেলে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসে, অপমানিত হলে আত্মসম্মানবোধে লাগলে প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা হয়। খুব রাগ হলে মাথা ঝিমঝিম করে। প্রেসার ও সুগার বেড়ে যায়। নাড়ির গতি বেড়ে যায়, মুখ লাল হয়ে ওঠে। গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। শরীরের ভেতরের পরিবর্তন হয় যেমন রক্তচলাচলের ব্যাঘাত ঘটে, হজমের গোলমাল হয়। আড্রেনাল গ্ল্যান্ডের মধ্যে গণ্ডগোল দেখা দেয়। হজম হয় না। শরীরতত্ত্ববিদরা বলেন . রাগ, ঈর্ষা, ভয়, যা মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে বড় বাধা। এগুলি নেতিবাচক, ভাবপ্রবণতা। ইতিবাচক ইমোশান হল বিনোদন, প্রেম-ভালবাসা, আগ্রহ, আনন্দ, সুখ। মানুষের শারীরিক ও মানসিক দুরকম বিকাশেই এরা সাহায্য করে। পরিমিত মাত্রায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় ইমোশানই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য দরকার। যেমন যার দেহে রাগ নেই তার মান-অপমান বোধও হয়তো নেই। সে একরকম অসাড় (Insensitive) ব্যক্তিত্ব। দীপ্তেন সান্যাল বলতেন : 'বাঙালি জাগো নয। বাঙালি রাগো।' অর্থাৎ সম্মিলিত ক্রোধ থেকেই বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ সুপরিকল্পিত পথে গেলে তা বিপ্লব। বিপ্লব মানে পরিবর্তন। যে ব্যক্তিত্বের মধ্যে একদম রাগ নেই (গীতা যাই বলুন) তাকে ছাগলে মুড়িয়ে খায়। সুতরাং রামকৃষ্ণদেবের কথায় ফোঁস করা দরকার। নির্বিষ সাপও ফোঁস করে এবং কামড়ায়। কিন্তু ভীতুলোকেরা ভয়ের চোটেই মারা যায়। সাপের কামড়ে মরে না। অতএব কৃত্রিম রাগ জমতে দিন। শুধু প্রকৃত রাগ বা রেগে যাবার প্রবণতা এবং রাগের মাথায় কিছু করে বসাটাই অন্যায়। বহু লোক রাগের মাথায় নিজের ছেলে-বউকে খুন করেছে। স্কুল মাস্টার ছাত্রকে গুরুতর ভাবে আহত করেছে।

নেগেটিভ ইমোশানের মধ্যে আছে ভয়। কিন্তু ভয় আছে বলেই ছোটবেলা থেকে

শিশুদের অবহিত করে দিতে হয়, যে ভয় করতে নেই। সাহসী বীরকেই লোকে পুজো করে। কিন্তু একটু ভয় থাকা ভাল নয় কী! ভয় আছে বলে শিশু একা একা পথে বেরোয় না। বাবা-মাকে শিশু ভয় না করলে তার স্বেচ্ছাচারী হবার প্রবণতা জাগে। এতদিনে বহুলোকের মধ্যেই আইন ভাঙার প্রবণতা দেখা দিত। এমনকি সামান্য ঈর্ষা থেকে মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে অন্যের সমকক্ষ হবার চেষ্টা করতে পারে। সুস্থ প্রতিযোগিতার জন্ম ঈর্ষা থেকে। সুতরাং নেতিবাচক ইমোশান অল্পমাত্রায় হলে ইতিবাচক হয়ে ওঠে। আবার ইতিবাচক ইমোশান বেশিমাত্রায় হলে ব্যক্তিত্বের পক্ষে তা ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। প্রেমের অতিরিক্ত ইমোশান মানুষকে পাগল করে তুলতে পারে। বহু হতাশ প্রেমিক আত্মহত্যা করে। প্রেমের আধিক্য সংসার ভাঙতে পারে। অতিরিক্ত স্নেহপ্রবণতা মানুষকে অধিকাবপ্রমত্ত (Possessive) করে তোলে। সন্তানের প্রতি অত্যধিক স্নেহপ্রবণ হলে সন্তান মানুষ হয় না।

অতিমাত্রায় জানার আগ্রহ অনেক সময় বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এই আগ্রহ বাড়তে বাড়তে অন্যের ব্যাপারে অহেতুক নাকগলানোতে গিয়ে পৌঁছতে পারে। অত্যধিক আনন্দপ্রবণ হলে মানুষ দুঃখকে সহজভাবে গ্রহণ করতে শেখে না। কারণ আনন্দ নিরানন্দ মিশিয়েই জীবন। আমি এমন ব্যক্তিত্ব দেখেছি যারা হইচই করে হেসে খেলে জীবন কাটিয়ে দেয়। এরা এই ধরনের জীবনে এমন অভ্যস্ত যে হঠাৎ কোন শক পেলে বিহ্বল হয়ে পড়ে। দুঃখের মোকাবেলা করতে তারা জানে না। ছোটবেলায় এক প্রতিবেশীর বাড়ি সেলাই-এর একটি কাজ দেখেছিলাম। চটের ওপর লালসুতোয় লেখা : দুঃখে যাদের জীবন গড়া তাদের আবার দুঃখ কিরে! ইমোশান সম্পূর্ণ ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যাপার। আগেই বলেছি সকলের ক্ষেত্রে ইমোশনের সমানভাবে বহিঃপ্রকাশ ঘটেনা, এমনকী সবার ভেতরে সমানভাবে ইমোশান জাগে না। যারা ইমোশান চেপে রাখতে পারে লোকে তাদের স্থিতধী বা প্রাজ্ঞ বলে প্রশংসা করে। যারা ইমোশান চাপতে পারে না তাদের ভাগ্যে ভাবপ্রবণ আখ্যা জোটে। কবি, প্রেমিক ও পাগলদের কেউ কেউ এক গোত্রের মধ্যে ফেলেন কারণ তারা কেউ ইমোশান চাপতে জানে না। কিন্তু যাবতীয় সাহিত্য, কাব্য, নাটক শিল্প ইমোশনেরই ফসল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ যদিও বলেছেন, কবিতা ইমোশান নয়, ইমোশান যখন শান্ত হয় তখনই ভাল কবিতার জন্ম। কিন্তু তার উৎসমুখ যে ইমোশান তা অস্বীকার করা যায় না। অনেক সময় সচেতনভাবে মানুষ যে ইমোশান চেপে রাখে মদের ঝোঁকে সেই সব চাপা ইমোশান প্রকাশ করে দেয়। অন্তরঙ্গ বন্ধু, সমব্যথী প্রেমিক প্রেমিকার কাছে মানুষ তাদের ইমোশান ব্যক্ত করে। আবার কমবেশী অনেকের মুখের মধ্যে তার ইমোশনের নানা অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। একে আমরা বলি অবাঙজ্ঞাপন (Nonverbal communication)। মূকাভিনেতা শুধু অভিব্যক্তি দিয়েই ইমোশান ফুটিয়ে তোলে। মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি কেউ আমার কথায় অসন্তুষ্ট অথবা প্রসন্ন হয়েছেন কিনা। দীর্ঘদিন পরে কোন আত্মীয় বা বন্ধুর বাড়ি গিয়েছি প্রথম অভ্যর্থনার সময় তাঁর চোখমুখ দেখে বুঝতে পারব তিনি খুশি না অখুশি। প্রেমিক প্রেমিকা কয়েকদিন আলাপের পরেই বুঝতে পারে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কিনা। বসের বাড়ি ইলিশ মাছ নিয়ে গেলে তার মিসেসের চোখমুখ দেখে বোঝা যায় তিনি খুশি না বিরক্ত। ক্ষমতাবান লোকেরা চট করে কিছু প্রতিশ্রুতি দেন না। বাজিয়ে দেখেন। মুখে কোন কথা বলেন না। কিন্তু তবু তাঁরা ইমোশান

চাপতে পারেন না। তাঁদের চোখেমুখে ঘৃণা, পছন্দ, প্রতিশ্রুতি, বরাভয় প্রকাশ পায়। যিনি সে ভাষা পড়তে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান।

মানুষ তার ইমোশান চাপতে পারলেও তার শরীরের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া চাপা যায় না। যেমন কেউ যদি অপরাধ করে সেটা চাপার চেষ্টা করে তাহলে তার দেহের ভেতরকার প্রতিক্রিয়া ধরতে পারলেই বোঝা যায় সে কিছু একটা চাপতে চাইছে। পলিগ্রাফ বা লাইডিটেক্টর দিয়ে দেহের অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের পরিবর্তন মাপা যায়। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত চাপ, হার্টরেট, ত্বকের উত্তাপ সবকিছু একটা গ্রাফপেপারের ওপর ছাপা হয়ে যায় অনেকটা ইসিজির মত। এই যন্ত্রটা দেহে লাগানোর পর ওই গ্রাফগুলি দেখে ধরা যায় যে সে সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে। প্রথমে তাকে দিয়ে সত্যি কথা বলানো হয়। যেমন জিজ্ঞাসা করা হয় তোমার বাবার নাম কী? বয়স কত? এর উত্তরে সে সত্যি কথা বলে। তখন তার কথা সত্যি কিনা মিলিয়ে নিয়ে তার গ্রাফ ধরে রাখা হয়। এইবার তাকে আসল প্রশ্ন করা হয় ও তার গ্রাফ নেওয়া হয়। যদি দেখা যায় তার স্বাভাবিক গ্রাফের সঙ্গে পরবর্তী বিবৃতির গ্রাফের অমিল অনেক বেশি তাহলে ধরে নেওয়া হয়, সে মিথ্যে বলছে। কারণ মিথ্যে কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ভাবগত স্ট্রেস তথা উদ্বেগ আসবে। অনেকে অম্লান বদনে মিথ্যে কথা বলে। তার বদনটা অম্লান থাকে বটে, কিন্তু মিথ্যে বলার সময় অন্তরটা অম্লান থাকে না। সেখানে ইমোশানের ওপরে একটা ভয়ভীতি প্রভাব বিস্তার করে। সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক পরিবর্তন হতে শুরু করে। পলিগ্রাফে সেটা উঠে যায়। ইমোশান ব্যাপারটির উৎস শরীরের ভেতর থেকে। এনড্রোক্রাইন গ্ল্যান্ড, অটোনমাস নার্ভাস সিস্টেম ও মস্তিষ্ক থেকেই ইমোশান নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই ফাঁকে আমাদের মস্তিষ্কের গড়নটা নিয়ে একটু আলোচনা করি। কারণ ব্যক্তিত্বের উৎসও এই ব্রেন বা মস্তিষ্ক। আমাদের যা কিছু ভাবের অভিব্যক্তি সব পরিচালনা হয় ব্রেন থেকে। ব্রেনের নির্দেশ ছাড়া আমাদের একটা আঙুল নাড়ানোরও সাধ্য নেই।

স্নায়ু আর মস্তিষ্ক নিয়ে কিছু কথা

ব্যক্তির বিভিন্ন সময়ের আচরণকেই আমরা ব্যক্তিত্ব বলি। আচরণ অনুসারে ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়, না ব্যক্তিত্ব অনুসারে আচরণ তৈরি হয় এ সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে গেলে আচরণের শরীরতত্ত্বগত কারণ জানতে হবে। কারণ আমরা যে আচরণ করি তার মধ্যে মন ও শরীর দুটোরই ভূমিকা থাকে।

আমাদের দেহ কতগুলি কোষ বা সেলের সমষ্টি। যেমন অস্থিকোষ, পেশীকোষ, দেহকোষ। প্রত্যেকটি কোষের মধ্যে লক্ষ লক্ষ অণু কোষ থাকে। প্রত্যেক কোষেরই কিন্তু বিশেষ বিশেষ ভূমিকা আছে ; তারা কেউ ফালতু নয়। এদের মধ্যে স্নায়ুকোষের কাজ হল সারা দেহের কোথায় কী হচ্ছে খবর চকিতে মগজের কনট্রোল রুমে পৌঁছে দেওয়া। এই স্নায়ুকোষ ও তার শাখাগুলির নাম নিউরোন। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে এক হাজার কোটি থেকে দু'হাজার কোটির মত নিউরোন আছে। নিউরোনগুলির চেহারা অনেকটা বহু হাত পা বিশিষ্ট কাঁকড়ার মত। এগুলি নানা সাইজের। প্রত্যেকটি নিউরণের মধ্যে লক্ষ লক্ষ RNA molecule থাকে। প্রত্যেকটি RNA আবার DNA থেকে জেনেটিক আদেশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ DNA অনুযায়ী কার কী চরিত্র হবে সেটা ঠিক হয়ে আসে। RNA সেই উপদেশ তামিল করে মাত্র। প্রত্যেকটি নিউরোনের একটি করে নিউক্লিয়াস, একটি কোষদেহ আর একটি কোষ-মেমব্রেন থাকে। মেমব্রেন দিয়ে নিউরনকে ঢেকে রাখা হয়।

মানবদেহের বিভিন্ন কোষ থেকে কতগুলি ছোট ছোট শুঁড়ের মত বস্তু বার হয় একে বলা হয় ফাইবার। এইসব ফাইবারের নাম ডেনড্রন। এদের কাজ হল অনুভূতিমূলক ইন্দ্রিয়গুলি থেকে বার্তা গ্রহণ করা এবং কোষ দেহে বার্তাগুলি পাঠিয়ে দেওয়া। দেহকোষ থেকে খবরগুলি নার্ভ ফাইবারের গতিপথ (এই পথকে বলা হয় অ্যাকসোন axon) ধরে পরিক্রমা করে। অনেকগুলি 'অ্যাকসোন' টেলিফোনের তারের মত সমান্তরালভাবে চলে। অ্যাকসোনের ওপর একটা ঢাকনি দেওয়া থাকে তাকে বলে myelin sneath-এর কাজ হচ্ছে বার্তাগুলিকে খুব তাড়াতাড়ি পাঠিযে দেওয়া। বার্তাগুলি দ্রুত পৌছে যায় 'মাসল গ্ল্যান্ড' বা নিউরোনে। নিউরোন বা নার্ভ টিস্যু দেহের সর্বত্র ছড়ানো। নিউরোনের আবার প্রকারভেদ আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয় জাত নিউরোন তথা সেনসরি নিউবোনের কাজ দেহ থেকে যাবতীয় মেসেজ 'স্পাইন্যাল'-কর্ডের' কাছে পৌছে দেওয়া। যার ফলে আমাদের দেহে অনুভূতি জাগে। আমাদের বস্তু সম্পর্কে ধাবণা হয়। এই সেনসরি নিউরোন শুধু স্পাইন্যাল কর্ড বা মেরুদণ্ডেব কাছেই খবর পৌছে দেয় না। বিভিন্ন নিউরোনের কাছেও পৌছে দেয।

নিউরোন যেমন খবব গ্রহণ করে তেমনি পাঠায়ও। এটি যেন একটি টেলিগ্রাম অফিস। খবর আসে বৈদ্যুতিক-বাসায়নিক শক্তিবোধের সাহায্যে (electro-chemical impulse)।

শরীরতত্ত্ববিদরা মানুষের স্নায়ুচালন প্রক্রিয়াকে (Nervus system) দুভাগে ভাগ করেছেন। একটি হল কেন্দ্রীয় নার্ভাস সিস্টেম। এর মধ্যে পড়ে মগজ আর মেরুদণ্ড।

মগজ : মগজই হল দেহের জি পি ও বা লালবাজারের কনট্রোল রুমের মত। শহরে যেখানে যা ঘটনা ঘটছে কনট্রোল রুমে এসে যাচ্ছে। দেখা যাক মগজ কীভাবে কাজ করে। মগজের তিনটি অংশ : সামনের অংশ, মাঝখানের অংশ আর পিছনের অংশ। সামনের অংশটি কপাল থেকে শুরু। এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ গুলি হল থ্যালামাস। (ডিমের মত এর গড়ন) হাইপথালামাস ও সেরিব্রাম (Thalames, hypothalmus and cerebrum)। সমস্ত অনুভূতিব স্পন্দন এই সামনের অংশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এছাড়া থ্যালামাসের হাতে নিজস্ব দুটো বিভাগ আছে ঘুম আর তৎপরতা। থ্যালামাস ঠিকঠাক কাজ না করলে আপনার ঘুমের কিছুটা ব্যাঘাত হবে। ভাল ঘুম না হলে মেজাজ ভাল থাকবে না। ক্লান্ত লাগবে। এর ফলে ব্যক্তিত্বের ওপর তার প্রভাব পড়বে। আবার আপনার এই সদা তৎপরভাব এটাও থ্যালামাসের অবদান। আপনি যে সব সময় সচেতন থাকেন যে কখন আঘাত আসতে পারে, কোনও কাজ পড়লে ঝটপট করে দেন। যাকে বলে always alert লোক আপনি। হাঁদারামের মত বাস্তাপার হন না। ঝুটঝামেলা দেখলে কেটে পড়েন। এসবই থ্যালামাসের দয়ায়। ওই বস্তুটি অকেজো হয়ে গেলে আপনার নড়তে চড়তেই ছমাস লেগে যাবে। হাঁদারামের মত আচরণ করবেন। একটা পাগলা কুকুর তেড়ে আসছে দেখেও পালাবার চেষ্টা করবেন না। আপনি অসতর্ক হয়ে নড়বেন।

থ্যালামাসের পিছনে বসে আছেন হাইপথালামাস। খাওয়া দাওয়া, তৃষ্ণা নিবারণ, ঘুমনো, তাপ নিয়ন্ত্রণ, যৌন কামনা, নিযন্ত্রণ ও পরিচালনা হয় এই হাইপথালমাস থেকে। যাবতীয় ভাবাবেগ ও অনুপ্রেরণাদায়ী আচরণগুলি এই অংশ থেকে চালিত হয়।

সম্মুখ মস্তিষ্কের সিংহভাগ জুড়ে থাকে সেরিব্রাম (Cerebrum) বা গুরুমস্তিষ্ক। মাথার খুলির ঠিক নিচ থেকেই এটি শুরু। একেবারে ভুরুর নিচে থেকে মাথার খুলির মধ্যভাগ পর্যন্ত গুরুমস্তিষ্কের বিস্তার। গুরুমস্তিষ্কের আবার দুটো ভাগ—বাম মস্তিষ্ক ও ডান মস্তিষ্ক।

বামমস্তিষ্ক দেহের বাম দিকটা পরিচালন করে। ডান মস্তিষ্ক ডানদিকের। সেরিব্রামের চারিদিকে এক ধরনের নিউরোন লাগানো থাকে। এর নাম Cerebral cortex বা গুরুমস্তিষ্কের আস্তরণ। এই Cortex-এর মধ্যে কতগুলি আলাদা আলাদা ভাগ আছে। যেমন কোনটা থেকে অনুভূতি সঞ্চালিত হয় (Sensory Projection area) কোনটা দৈহিক গতি উৎপাদনের এলাকা (Motor Projection area)। সেরিব্রামের কাজ অনুভূতিমূলক তথ্যাদি জমা রাখা এবং দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালানো। মগজের মধ্যে যত খবরাখবর আসে সেগুলিকে যথাযথপথে চালনা করা। এক কথায় চিন্তা, যুক্তি, সমস্যার সমাধান, সূক্ষ্ম বিচার। এসব কিছুর পিছনে আছে সেরিব্রামের অবদান।

মধ্য মস্তিষ্কের কাজ অনেকটা সামনের ও পিছনের মস্তিষ্কের মধ্যে সেতুবন্ধ ঘটানো। এরই সাহায্যে আমরা কানে শুনতে পাই, চোখে দেখতে পাই। এরই সাহায্যে আপনি বুঝতে পারেন কোন কথায় কান দেবেন কোন কথায় কান দেবেন না। কোন উদ্দীপকের সংকেতে সাড়া দেবেন কোনটা চেপে যাবেন, কোনটা প্রতিবাদ করবেন। পড়াশোনায় মনযোগ এনে দেয় এই মধ্যমস্তিষ্ক। যাদের এই মধ্য-মগজ মজবুত তাঁরা যাত্রার আসরেও ঘুমিয়ে নিতে পারেন। কুম্ভকর্ণের সম্ভবত মধ্যমস্তিষ্ক খুব কার্যকর ছিল।

পিছনের মস্তিষ্ক মানে একেবারে ঘাড়ের কাছে, মগজের পিছনের দিকটা। এর সঙ্গে স্পাইন্যাল কর্ডের যোগাসূত্র রয়েছে। এর তিনটে ভাগ . মেডুলা (medulla) বা মজ্জা। পনস (pons) আর 'সেরিবেলাম (Cerebellum) মেডুলার স্থান স্পাইন্যাল কর্ডের ঠিক ওপরে। মেডুলার দফতর হল হজম করানো। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ানো। রক্ত সঞ্চালন। ব্যক্তিত্ব যে কিছু পরিমানে অবয়ব সংস্থানের ওপর নির্ভরশীল সেটি বোঝা যায় যখন আমরা বলি মেরুদণ্ড সোজা করে চলো। অন্যায়ের কাছে নতিস্বীকার কোর না। এই মেরুদণ্ড বা স্পাইন্যাল কর্ড ব্রেনের নির্দেশ ছাড়াই হঠাৎ হঠাৎ স্বয়ং নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। কনডিশনাল রিফলেক্স তত্ত্বের জনক পাভলভের সেই কুকুরের গল্পটা সবাই জানেন। পাভলভ পরীক্ষা করেছিলেন একটি কুকুরকে নিয়মিত মাংস খাওয়ানো নিয়ে। কুকুরটিকে নিয়মিত মাংস দেওয়ার আগে একটি ঘণ্টা বাজত। তারপর তাকে মাংস খেতে দেওয়া হত। এইভাবে কুকুরটি ঘণ্টার শব্দের সঙ্গে মাংস অনুষঙ্গটি মিশিয়ে ফেলল। তারপর একদিন ঘণ্টা বাজিয়েও পাভলভ কুকুরটিকে মাংস দিলেন না। দেখলেন অভ্যাসবশত ঘণ্টার শব্দেই কুকুরের মুখে লালা ঝরছে। এটাই হল রিফলেক্স অ্যাকশন। এই অ্যাকশনের বশে কেউ আমাদের কপালে ঘুঁসি মারার ভান করলেই আমাদের চোখ আপনা আপনি বন্ধ হয়ে আসে। হঠাৎ যদি হাতে গরম ছেঁকা লাগে আমরা চকিতে হাতটা সরিয়ে নেই। স্পাইনাল কর্ডের কাজ হচ্ছে সমস্ত খবর মগজে পাঠিয়ে দেওয়া। যা সিদ্ধান্ত নেবার তা হেড অফিসই নেবেন। কিন্তু জরুরি অবস্থায় ব্রাঞ্চকেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়। স্পাইন্যাল কর্ড বা সুষুম্নাকাণ্ড জরুরি অবস্থায় এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। তাছাড়া মানুষের স্বাধীন সত্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এই মেরুদণ্ড।

যেহেতু মগজই হেড অফিস সে কারণে মানুষ কোন পরিস্থিতিতে কী রকম ব্যবহার করবে তা তার মগজের সিদ্ধান্তের ওপরেই নির্ভর করে। যদি কারও মগজের বিভিন্ন বিভাগ ঠিকঠাক কাজ না করে তাহলে সিদ্ধান্তগুলি নিতে ভুল হয়ে যায়। অব্যবস্থাচিত্ত ব্যক্তিত্ব (সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি করা বা উল্টোপাল্টা কাজ করা), ভাবাবেগ প্লুত ব্যক্তিত্ব

(আবেগের বশে কাজ করা) যাদের, বুঝতে হবে তাদের মগজ ঠিকমত কাজ করছে না। একটা ঘড়ি যদি ঠিকমত টাইম না দেয় তাহলে সে যেমন খুশি টাইম দেয় তেমন আরকি। এর কথা আর একটু বলি। মেরুদণ্ডের এক নং কাজ হল হাঁটাচলা করানো। অনিষ্ট কর উদ্দীপক থেকে অতিদ্রুত দেহকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। আগেই বলেছি এর জন্য তার মগজের অনুমতি নিতে লাগে না। আগুনের একটু ছেঁকা। লাগলেই মুহূর্তের মধ্যে আপনি আঙুল সরিয়ে নিলেন। এই সিদ্ধান্ত মেরুদণ্ডই নিল। দ্বিতীয়ত হাত-পা ছড়ানো বিভিন্ন অঙ্গভংগি (Pose Posture) মেরুদণ্ডই করায়। এছাড়া বারবার অভ্যাস করতে করতে যে কাজ রপ্ত হয়ে যায়, সেই কাজগুলি এখন আমরা খুব সহজেই করি। যেমন সাঁতার কাটা, সাইকেল চালানো, টাইপ করা এগুলি একবার রপ্ত হয়ে গেলে আর মগজের নিয়ন্ত্রণের দরকার হয় না।

মেরুদণ্ডের আর একটা বড় কাজ সংবেদন ও চেতনা যেমন স্পর্শ ও রূপের জ্ঞান মস্তিষ্কে পাঠানো।

তবে সব কিছু মিলিয়ে নার্ভাস সিস্টেম বা স্নায়ুতন্ত্র যে কত গুরুত্বপূর্ণ তা বলে বোঝানো যাবে না। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা, রক্তচলাচল, হজম, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারা চালিত হয়।

প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিত্ব

মনোবিদরা বলেন, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মানুষের প্রবৃত্তির একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। প্রবৃত্তির বশেই মানুষ নানা আচরণ করে। আবার বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে প্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে পারলে এই মানুষই তার প্রবৃত্তিমুখী ব্যক্তিত্বকে আবার সুপথে চালনা করতে পারে।

প্রবৃত্তি দুধরনের। সহজপ্রবৃত্তি আর অস্থায়ী সহজ প্রবৃত্তি। অন্ধ আবেগের বশে অথবা উদ্দীপকের দ্বারা উদ্দীপ্ত হয়ে মানুষ যা করে বসে সেটাই তার প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি সহজাত অর্থাৎ প্রবৃত্তি নিয়েই আমরা জন্মাই তাই প্রবৃত্তিগত আচরণ আমাদের শিখতে হয়না। দৈহিক ও মানসিক বিকাশের সঙ্গে প্রবৃত্তি-পরিণত হতে থাকে।

কতগুলি প্রবৃত্তি আছে যা জন্মগত নয়। এগুলি আমাদের বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ অবস্থায় দেখা দিতে পারে আবার লোপ পেতেও পারে। কতগুলি প্রবৃত্তি অমোঘ। যেমন ক্ষুধা। ক্ষুধা পেলে প্রাণী খাবেই। কিন্তু কতগুলি প্রবৃত্তি অমোঘ নয়। যেমন ক্রোধ, কাম। এগুলি মানুষ অনুভব নাও করতে পারে অথবা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে।

এবার মানবজীবনের কয়েকটি প্রবৃত্তির প্রভাব বিচার করা যাক।

১. **পলায়নী প্রবৃত্তি** ঃ ভাবাবেগ ভয়।

পলায়নী প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। অধিকাংশ মানুষই ঝুট-ঝামেলা থেকে দূরে সরে থাকতে চান। এইজন্যই দেখবেন যে সব কাজ করতে গেলে লোকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করতে হয়, অপ্রিয় হতে হয়, সেসব কাজে লোক পাওয়া যায় না। পুজো কমিটির সেক্রেটারি কেউ হতে চায় না। সেক্রেটারি যদিও হয়, ট্রেজারার হতে লোক পাওয়া খুব মুশকিল। কোন কাজে ঝুঁকি দেখলে লোকে পালায়। যেজন্য এখন অনেকেই সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায় না। কবি ও শিল্পীরা সমাজ থেকে দূরে সরে গিয়ে আপন মনে কাব্য ও শিল্পচর্চা করে দিন কাটিয়ে দেওয়াটা শ্রেয় মনে করেন। এ সমস্তই আসে অজানা ভয় থেকে।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশংকা করে কত লোক আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। এসবই জীবন থেকে পালিয়ে যাবার প্রবৃত্তি।

কলহপরায়ণ-মারকুটে প্রবৃত্তি : ভাবাবেগ ক্রোধ : আগেই বলেছি লড়াই ও পলায়ন Fight and Flight দুটোই মানুষের প্রবৃত্তি। যার ব্যক্তিত্বের মধ্যে দুর্বলতা বেশি সে পালিয়ে যাওয়া পছন্দ করে। আর যার ব্যক্তিত্বে বীরভাব বেশি সে মনে করে লড়াই করে বাঁচব অথবা মরব। তবু পালাব না। সাফল্য কখনও হাতের মুঠোয় আসে না। তা লড়াই করে ছিনিয়ে আনতে হয়। কলহপরায়ণ বা মারকুটে প্রবৃত্তি যাদের মধ্যে বেশি পরিমাণে থাকে, তারা ছুতোয়নাতায় ঝগড়া করে। ট্রামে-বাসে দেখবেন অনেক প্যাসেঞ্জার পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া করছে। হয় কণ্ডাক্টরের সঙ্গে না হয় পাশের যাত্রীদের সঙ্গে। ট্যাক্সিড্রাইভার, রিকশ চালক, দোকানদারদের মধ্যে অনেককে দেখছি খামাখা খদ্দেরের সঙ্গে ঝগড়' করতে। এই প্রবৃত্তির অনুষঙ্গ ক্রোধ। 'দেখা যায় মারপিঠ। লড়াই, দাঙ্গা, যুদ্ধ সমস্ত কিছুর পিছনে কাজ করছে মানুষের এই প্রবৃত্তি সঞ্জাত ক্রোধ

ঘৃণা ও বিরক্তি প্রবৃত্তি—ভাবাবেগ বিরক্তি : এই প্রবৃত্তির ভাবাবেগ হল বিরক্তি। আমরা যা পছন্দ করি না সেটি উদ্দীপক হিসাবে কাজ করলে সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তি বোধ আসে। আপনি যাকে পছন্দ করে না সেই লোকটিকে দেখা মাত্রই মনে ঘৃণা জাগে। তার প্রকাশ চোখ-মুখের অভিব্যক্তিতেই ফুটে ওঠে।

ঔৎসুক্য প্রবৃত্তি—ভাবাবেগ বিস্ময় : আমরা সবাই ঔৎসুক পৃথিবীর কোথায় এই মুহূর্তে কী হচ্ছে তা জানতে। ঔৎসুক অজানাকে জানতে। নতুনকে আবিষ্কার করতে। মানুষের ঔৎসুক্যের শেষ নেই। এই ঔৎসুক্য সংকীর্ণ হতে হতে শেষ পর্যন্ত বিকৃতিতে এসে পৌঁছায়। তখন মানুষ আড়ি পেতে দুজনের গোপন কথা শোনে। অপরের ব্যক্তিগত কেচ্ছা শুনতে ভালবাসে। ঔৎসুক্যের ভাবগত প্রকাশ হল বিস্ময়। আমরা পরিচিত জনের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করি : কেমন আছ? তারপুর অনেক দিন দেখা হয় না কোন বন্ধু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি আচ্ছা অনিমার খবর কী? উত্তরে শুনলেন আর বোল না ভাই সে এক কেচ্ছা। সঙ্গে সঙ্গে আপনার ইৎসুক্য বেড়ে যাবে। তাই নাকি? কী ব্যাপার বলতো? আর বোল না। বিয়ে হয়েছিল এক ভাল ছেলের সঙ্গে। কোন কিছুর অভাব ছিল না। দুটো বাচ্চাও হয়েছিল। তারপর একদিন দুটো বাচ্চাকে ফেলে বাড়ির ড্রাইভারের সঙ্গে হাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ের অভিব্যক্তিতে আপনার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। আপনি বলে ওঠেন, বল কী!

পিতৃমাতৃত্ব-প্রবৃত্তি ভাবাবেগ স্নেহ—এই প্রবৃত্তিটি পশু ও মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান। মানুষের মধ্যে পশুর সব প্রবৃত্তিই রয়ে গিয়েছে। তবে মানুষ বুদ্ধিমান প্রাণী বলে তার কিছু প্রবৃত্তি একান্তভাবে তার নিজস্ব। পশুর মধ্যে মাতৃত্ব প্রবৃত্তি আছে, যদিও তা স্বল্পস্থায়ী। পিতৃত্ব প্রবৃত্তি নেই। কারণ কিছু কিছু প্রাণী যূথবদ্ধ থাকলেও দাম্পত্য সংস্কৃতি পশুর মধ্যে নেই। সেখানে পুরুষের কাজ শুধু জন্ম দেওয়া। সন্তান পালন মায়ের দায়িত্ব। পশুপক্ষী শাবক শুধু মাকে চেনে। একটা বয়স পর্যন্ত মা তার শাবককে আগলে রাখে।

মানুষের জীবনে পরিবার ও দাম্পত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ পিতাকেও সন্তানের বাঁচা বাড়ার জন্য সমানভাবে দায়ী হতে হয়। অপত্যস্নেহ মা ও বাবা উভয়ের মধ্যেই সারা জীবন ধরে বহাল থাকে। যদিও

তুলনামূলকভাবে বাবার অপত্য স্নেহ মায়ের স্নেহের মত অত গভীর ও চিরস্থায়ী হয় না। তাহলেও স্বাভাবিক পারিবারিক জীবনে বাবাও মায়ের মত সন্তানের জন্য সমান উদ্বিগ্ন হন। শিশুকে বাবাও কোলে নিয়ে আদর করেন। শিশুকে ধীরে ধীরে বড় হতে দেখে বাবা মা উভয়েই সমানভাবে তৃপ্তি ও গর্ব অনুভব করেন। অপত্যস্নেহের ইমোশান ফুটে ওঠে আদর-ভালবাসা, আত্মতৃপ্তি, আনন্দ, গর্ব ও আত্মত্যাগের মধ্যে। সন্তানের জন্য বাবা-মা উভয়েই আত্মত্যাগ করতে প্রস্তুত থাকে। বাবা-মা নিজে না খেয়েও সন্তানকে খাওয়ায়। সন্তানের উন্নতির জন্য মা তার গহনা বিক্রি করেও তাকে লেখাপড়া শেখায়। সন্তান অসুস্থ হলে বাবা-মা বিনিদ্র রজনী কাটায়।

আবেদন প্রবৃত্তি ঃ ভাবাবেগ বিপন্নতা—এটিও প্রাণীগত প্রবৃত্তি। যে কোন প্রাণী বিপদে পড়লে, আক্রান্ত হলে ডাকে, গর্জন করে। আর্তনাদ করে। মানুষও আক্রান্ত হলে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করে। আর্মেরিকায় আক্রান্ত মহিলাদের উপদেশ দেওয়া হয় Cry Rape অর্থাৎ ধর্ষণকারী বলাৎকারের চেষ্টা করলে চেঁচান। বিপদের সময় চোখ মুখে বিপন্নতার ছবি ফুটে ওঠে। শুধু শারীরিক আক্রমণ নয় মানসিকভাবে কেউ বিপন্ন বোধ করলেও সে প্রভাবশালী ব্যক্তির শরণাপন্ন হয় ও তার কাছে আবেদন জানায় আমায় বাঁচান। এ সময় অনেকে কেঁদে ফেলে। কেউ কেউ প্রভাবশালীর পা জড়িয়ে ধরে। বিপন্নতা বোধ তাকে তখন অতিমাত্রায় ইমোশনাল করে তোলে।

সৃজন প্রবৃত্তি ঃ ভাবাবেগ সৃজন—মানুষের মধ্যে সৃজনশীলতা এক জন্মগত প্রবৃত্তি। বহু প্রাণীর মধ্যেও এই সৃজন প্রবৃত্তি দেখা যায়। যেমন পাখিরা বাসা করে। মৌমাছি মৌচাক তৈরি করে। ইঁদুর গর্ত করে। সব প্রাণীর মধ্যে অবশ্য সৃজনক্ষমতা থাকে না। তবে প্রত্যেক প্রাণীরই একটি পছন্দমত বাসস্থান (habitat) থাকে। মানুষ কিন্তু সভ্যতার প্রত্যুষ থেকেই ঘর তৈরি করতে শিখেছে। সেই আদিম সৃজন প্রবৃত্তি বিবর্তিত হতে হতে মানুষ গ্রাম ও নগর তৈরি করেছে। একটি নিজস্ব বাসস্থান প্রত্যেক মানুষের স্বপ্ন। এই বাসস্থানটি তার সাধ ও সাধ্য অনুসারে কেমন হবে সে সম্পর্কে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ধারণা আছে। তারই পছন্দ অনুসারে পেশাদার স্থপতিরা বাড়ির নকশা তৈরি করে। তাজমহল কেমন হবে নিশ্চয়ই তা শাজাহান কল্পনা করেছিলেন। তাঁর সেই কল্পনাকে স্থপতি অবয়ব দিয়েছেন মাত্র। এই সৃজনী প্রবৃত্তি জীবন চর্যার সমস্তক্ষেত্রেই পরিব্যাপ্ত। এই সৃজনী প্রবৃত্তির বশে মানুষ একে একে সমস্ত কিছু ব্যবহার্য বস্তু ও তার বাইরে নান্দনিক বস্তুগুলি তৈরি করেছে। একেই আমরা সংস্কৃতি বলি। আবার শুধু বস্তুগত সংস্কৃতি ও প্রয়োজনের সীমার বাইরে মানুষের চিত্তবৃত্তির যা কিছু আনন্দময় প্রকাশ তার মধ্যেও রয়েছে সৃজন চেতনা। যেমন সাহিত্য, নৃত্য গীত, অভিনয়, কলা— সমস্তই সৃজন চেতনার প্রকাশ। এই সৃজন প্রবৃত্তির বশেই মানুষ যেমন বাড়ি তৈরি করে তেমনি পরিবার তৈরি করে। সন্তান উৎপাদন ও বংশ বৃদ্ধি কিন্তু এই সৃজন প্রক্রিয়ারই একটি অংশ। সুখী দাম্পত্য ও সন্তান প্রতিপালন মানুষের সহজাত সৃজন প্রবৃত্তি। এমন কী পরিপাটি গৃহসজ্জা থেকে শুরু করে বন্ধুত্ব ও সামাজিকতা পর্যন্ত সৃষ্টিরই এক অভিব্যক্তি।

অধিকার প্রবৃত্তি : ভাবাবেগ মালিকানা—কোন কিছুকে অধিকার করা এবং কোন বস্তুর ওপর নিজের নিঃসপত্ন অধিকার ঘোষণা করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। শিশুকে দেখবেন খেলনা দেখলেই সে নিতে চাইবে এবং যতক্ষণ না সেটি অধিকার করতে পারবে

ততক্ষণ সে চিৎকার করতে থাকবে। সম্পত্তি নিয়ে লড়াই সেই আদিকালে শুরু হয়েছিল এখনও রয়েছে। এই যে পৃথিবীতে এত যুদ্ধ, সংঘর্ষ দাঙ্গা তার মূলে আছে অধিকার বোধ। মানুষ বলে, 'আমার বউ, আমার স্বামী, আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার জাতি, আমার দেশ। এই আমার আমার করাটা তার সহজাত অধিকার বোধ প্রবৃত্তিরই প্রকাশ।

সঙ্গলিপ্সার প্রবৃত্তি : ভাবাবেগ ঐক্যবোধ—বাইবেলে আছে সৃষ্টির আদিতে আদিম মানব আদম তার একাকীত্ব ঘুচিয়েছিল ইভের সঙ্গ পেয়ে। বেদেও রয়েছে সৃষ্টি কর্তা ব্রহ্মা একাকিত্বে অস্থির হয়ে উঠে নিজেকে বিদীর্ণ করেই তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করে নিলেন। সৃষ্টির মূলই আসঙ্গ লিপ্সা থেকে। প্রতিটি প্রাণীই জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হয়েছে। আদিম মানুষেরও একটা সমাজ ছিল। তারা প্রাকৃতিক নিয়মেই যুথবদ্ধ হয়ে বাস করত। তাই মানুষ এখন সমাজবদ্ধ প্রাণী। সে একা থাকতে চায় না। পারেও না। যেখানেই থাকুক সে তার পছন্দমত গোষ্ঠী খুঁজে নেয়। এই গোষ্ঠীবদ্ধতা কখনও গড়ে ওঠে শুধু নিরাপত্তার কারণে, কখনও আর্থিক কারণে অথবা কখনও বা শুধু মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্য। মানুষ যেজন্য ক্লাব, সংগঠন, সমিতি গঠন করে। এই অত্যধিক গোষ্ঠীবদ্ধতার ফলে মানুষ শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। গোষ্ঠীবদ্ধ হতে হতে সে—জাতপাতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যায়। আবার বিভিন্ন ব্যক্তিস্বার্থের তাগিদে সে কখনও সমমর্মীদের নিয়ে গোষ্ঠী ও উপদল তৈরি করে। সব রাজনৈতিক দলের মধ্যে এখন যেমন উপদল আছে আবার উপদলের মধ্যেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক গোষ্ঠী আছে। খবরের কাগজ ও সাহিত্য পত্রিকাকে কেন্দ্র করে লেখকদের সংকীর্ণ গোষ্ঠী গড়ে ওঠে, তারা আর কাউকে সেখানে ঢুকতে দিতে চায় না। গোষ্ঠীবদ্ধ ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে ঐক্য থাকে। যেমন কোন বিশেষ ঠাকুরের শিষ্যরা গুরুভাইদের পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করে। ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক গোষ্ঠীরা অন্য গোষ্ঠীর লোকদের কোন সুযোগ সুবিধা দিতে চায় না। সামাজিকতার প্রবৃত্তি কালক্রমে উৎকট গ্রুপবাজিতে পরিণত হয়।

যৌন প্রবৃত্তি ঃ ভাবাবেগ কাম—পশু ও মানুষের মধ্যে এই প্রবৃত্তি সমানভাবে বর্তমান। যে কোন প্রাণীরই যৌন প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু প্রাণীদের মধ্যে যৌন প্রবৃত্তি সব সময়ের

ইভ্‌টিজার

জন্য দেখা দেয় না। তা সুপ্ত থাকে। প্রত্যেক প্রাণীরই যৌন আকাঙ্ক্ষার একটি বিশেষ সময় চক্র আছে। প্রকৃতির বুকে পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণী পাশাপাশি ঘুরে বেড়ায়। এমনকি

যূথবদ্ধ প্রাণীদের ক্ষেত্রেও যূথের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণী একসঙ্গে সহবাস করে। কিন্তু এমন দেখা যায় না প্রতিদিনই পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণী সঙ্গম করছে বা পুরুষ স্ত্রী প্রাণীকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সঙ্গমেচ্ছা চিরন্তন। প্রাপ্ত বয়স্ক নরনারী যে কোন সময় সঙ্গম করতে পারে ও তার যৌন উত্তেজনা (Orgasm) যে কোন সময়ই জাগতে পারে। নারী নির্দিষ্ট সময় প্রকৃতিগত কারণেই ঋতুমতী হয় বলে যৌনক্রিয়ায় সাময়িক বাধা আসে কিন্তু পুরুষের প্রজনন ক্ষমতা যৌবন থেকে প্রাক বার্ধক্য পর্যন্ত অবিরাম ও নিরন্তর থাকে। নারীর কামেচ্ছার ধীরে ধীরে উদয় হয় ও অস্তও যায় ধীরে ধীরে কিন্তু পুরুষের কামেচ্ছা অতি দ্রুত জাগতে পারে। এ কারণে পুরুষ ও নারী সম্পর্ক অনেকটা খাদ্য খাদকের মত। সামাজিকতা, ভদ্রতা, বুদ্ধি ও কঠোর আইন দিয়ে পুরুষের এই সহজাত কামতাড়িত আক্রমণ স্পৃহাকে সংযত রাখা হয়। যৌবনবতী নারী প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মাত্রেরই উদ্দীপক। তেমনি যৌবনবতী নারীর কাছেও পুরুষ যৌনতার উদ্দীপক। একারণে বিজ্ঞাপনে নারী ও পুরুষকে যৌন প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়। এই যৌন উদ্দীপককে সহনশীল করে তোলার জন্য শিল্পে সাহিত্যে নাটকে চলচ্চিত্রে এর ওপর আর্টের প্রলেপ লাগানো হয়েছে। ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন একে দেবতার লীলা খেলা বলে চালানো হয়। এসবই আদিম যৌন প্রবৃত্তির সুসংস্কৃত (Sublimc) রূপ। যৌন প্রবৃত্তির ইমোশন হল কাম। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কাম সদাজাগ্রত। কামোদ্দীপক নরনারী উভয়ে উভয়ের কাছেই উদ্দীপক। কামপ্রবৃত্তির কতগুলি শারীরিক প্রলক্ষণ আছে। তার মধ্যে একটি হল যৌনাঙ্গে উত্তেজনা অনুভব করা। নিঃশ্বাস প্রশ্বাস দ্রুততর হওয়া। চোখমুখের অভিব্যক্তি বদলে যাওয়া। যারা এই উত্তেজনা বুদ্ধি ও সংস্কৃতি দিয়ে দমন করতে পারে না তাদের কামুক বলে। কামুকদের চোখ মুখের চেহারা পালটে যায়। অনেকে অশ্লীল মন্তব্য করে। ইভটিজাররা নানাধরনের মন্তব্য করে শিস দেয়। নারীর অঙ্গ স্পর্শ করার চেষ্টা করে। কামুক পুরুষ নানা ছুতোয় নাতায় নারীকে স্পর্শ করার চেষ্টা করে এবং সব সময় উপযুক্ত সময় খোঁজে কীভাবে সে তার দেহ উপভোগ করতে পারে। কামুক নারীর ক্ষেত্রেও সেই একই অভিব্যক্তি দেখা দেয়। এমনও দেখা গেছে কামুক নারী তার ছেলের বয়সী পুরুষকে দিয়ে তার যৌন ক্ষুধার নিবৃত্তি করেছে।

অহং প্রবৃত্তি : ভাবাবেগ আহ্লাদ—এখানে অহং শব্দটি ফ্রয়েডিয় অর্থে মানসিক স্তর হিসাবে ব্যবহার করছি না। অহং অর্থে নিজেকে জাহির করার প্রবৃত্তি। নিজেকে অন্যের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ভেবে তুমুল আত্মতৃপ্তি অনুভব করার প্রবণতা এক সহজাত প্রবৃত্তি। প্রত্যেক প্রবৃত্তিরই একটি ইতিবাচক ও আর একটি নেতিবাচক দিক থাকে। সংযতমাত্রায় ব্যবহার করলে সব প্রবৃত্তির চরিতার্থতা মানুষকে সম্পূর্ণ মানুষ করে তুলতে পারে কিন্তু মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেই তা নেতিবাচক হয়ে যায়।

প্রতিটি মানুষের মধ্যেই স্বাভাবিক মাত্রায় অহংবোধ দরকার। নিজেকে জাহির করা বা প্রকাশিত করা মানুষেরই একান্ত বৈশিষ্ট্য। সেজন্য সবার আগে দরকার আত্মবিশ্বাস। (লেখকেরা কেমন করে আত্মবিশ্বাস বাড়াবেন? গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে) আত্মপ্রতিষ্ঠার সহজাত প্রবৃত্তি আলেকজান্ডারকে ক্ষুদ্র ম্যাসিডনের অধিপতি থেকে দিগ্বিজয়ী করেছিল। এই প্রবৃত্তিই কলেজ ড্রপ আউট মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বিল গেটসকে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী করে তুলেছে। আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার নেতিবাচক পথ বেছে নিয়ে ঘৃণিত

চন্দন দস্যু বীরাপ্পন এখন হিরোতে পরিণত হতে চলেছে। সমাজে আর পাঁচজনকে ছাপিয়ে যাবার জন্যই প্রতিটি মানুষ প্রাণপণ চেষ্টা করে। কেউ বিলাসবহুল বাড়ি করে। গাড়ি করে, ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়। ঘনঘন পার্টি দেয়। নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পুরপিতা, বিধায়ক, সাংসদ ও মন্ত্রী হয়। কেউ বিদেশে অভিভাসন নেয়। কেউ মেধাবী ছাত্র হয়ে ভাল ফলাফল করে। অহংবোধের জন্যই মানুষ ভালভাল পোশাক পরে নিজেকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে চায়। মজাটা হচ্ছে সবাই চায়, সবাইকে শক্তি, অর্থ ও বিদ্যা বুদ্ধির জোরে দাবিয়ে রেখে নিজের বৈশিষ্ট্য প্রমাণ করতে। কিন্তু এই দাবিয়ে রাখাটা সহজসাধ্য নয়। যার মানসিক শক্তি আছে সে সমস্ত শক্তি দিয়ে এর প্রতিরোধ করেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। প্রত্যেকের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার পিছনে থাকে আলাদা আলাদা সংগ্রাম। যে সংগ্রাম করতে পারে না, অথবা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না, অথবা জোর দিয়ে কোন কিছু বলতে পারে না, সে প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে পড়ে। প্রবৃত্তি আমাদের প্রত্যেককেই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবণতা দিয়েছে। আত্মসন্তুষ্টি এবং গর্বিত ব্যক্তিত্ব অনেকের চোখে মুখেই ফুটে ওঠে। ঠিক তেমনি ভাবেই ফুটে ওঠে তার বিপরীত ভাবটিও, উদ্বেগ আর আত্মবিশ্বাসহীনতা।

আবার প্রয়োজনের তাগিদে বিভিন্ন মানুষের কাছে বশ্যতা স্বীকার করাও মানুষের সহজাত ধর্ম। শুধু মূল্যবোধের তাগিদে সমাজ আমাদের শেখায় পিতৃদেব ভবো, মাতৃদেবো

অধ্যাপকেব চেয়ে অভিনেত্রীর খাতিরের বহর

ভবো, আচার্য দেবো ভবো। বাবা মা ও গুরুকে শ্রদ্ধা করবে। কিন্তু বাবা মাকে শ্রদ্ধা করে না বহু ছেলে মেয়ে। বিশেষ করে নিজেরা দাঁড়িয়ে গেলে তখন আর বাবা-মাকে অনেক ছেলেমেয়েই পাত্তা দেয় না। অথচ স্যার গুরুদাস প্রতিদিন হাইকোর্টে যাবার আগে মাকে প্রণাম করে যেতেন। মায়ের মনে কষ্ট হবে বলে সীমান্ত গান্ধী আবদুর গফুর খান উচ্চশিক্ষার্থে বিলেতে যাননি। আমি বাবা-মাকে দেখার জন্য যৌবনে বিলেত থেকে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু এখনকার ছেলেমেয়েরা এসব নিয়ে চিন্তা করে না। সমাজে এখন বিদ্বানের কোন আলাদা মর্যাদা নেই। বিদ্যার সঙ্গে গ্ল্যামার না থাকলে সমাজ পোঁছে না। আমি যখন সাংবাদিক ছিলাম তখন অনেকে আমার গ্ল্যামারকে খাতির

করত। কিন্তু তারপর যেই সাংবাদিকতা ছেড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় যোগ দিলাম তখন সমাজের কাছে আমার মূল্য কমে গেল। কারণ এদেশে শিক্ষকদের কোন গ্ল্যামার নেই। তাই সামাজিক মর্যাদাও নেই। ছাত্রছাত্রীরাও পাস করে বেরিয়ে গেলে আর মাস্টারমশাইদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

কিন্তু তাই বলেকি সর্বক্ষেত্রেই মানুষ একইরকম ঔদ্ধত্য দেখাতে পারে? যদি বুঝতাম কেউ কাউকে আলাদা করে পাত্তা দিচ্ছে না, সবাই সমান, তাই যে যার নিজের মত করে আছে তাহলে বোঝা যেত, মানুষ একটা নীতি মেনে চলছে নীতিটা হল কাউকেই না মানার নীতি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, যেখানে স্বার্থ আছে সেখানে মানুষ নতি স্বীকার করছে। আমি মন্ত্রীদেব কাছে আই এ এস অফিসার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের ম্যানেজিং ডিরেক্টরদের নির্লজ্জভাবে খোশামোদ করতে দেখেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডেপুটি সেক্রেটারির কাছে গিয়ে বশংবদের মত আচরণ করছেন। কাজ উদ্ধারেব জন্য আমার মত সাধারণ মানুষকেও কত বড় বড় লোক এসে তোয়াজ করে গেছেন। তারপর কাজ ফুরলে আর তাঁরা এখন চিনতে পারেন না। ক্ষমতাবানদের কাছে নতজানু হওয়া মানুষেব সহজাত প্রবৃত্তি। রাজাদের প্রশস্তি করে কত কবি কাব্য লিখেছেন। কোন আমলেই শাসকেব স্তাবকের অভাব হয় না। পাকিস্তানে তো বার বার সামরিক শাসকরা গায়ের জোরে ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু কোন শাসকের কী অভাব হয়েছে বিচারক, আমলা, শিল্পপতি ও বুদ্ধিজীবীদের সমর্থন পেতে? ভারতে জরুরি অবস্থার সময় সংবাদপত্রগুলিকে হাঁটু গেড়ে বসতে বলা হয়েছিল, তারা এক ধাপ এগিয়ে হামাগুড়ি দিয়েছিল। দরকার পড়লে যে কোন ক্ষমতাবানের কাছে গিয়ে লোকে তাকে তৈলমর্দন করে। আবার সেই ক্ষমতাবানও তার প্রয়োজনে তার চেয়েও ক্ষমতাশালীর কাছে গিয়ে আত্মবিক্রয় করে বসে থাকে। প্রবৃত্তিগত কারনেই মানুষ এটা করে। যারা করে না তাদের সংখ্যা কম এবং যে কোনো প্রবৃত্তিকে যারা দমন করতে পারেন এঁরা তাদের দলে।

খাদ্য সংগ্রহের প্রবৃত্তি : ভাবাবেগ ক্ষুধা—এই প্রবৃত্তিতেও প্রাণী ও মানুষ সমান। তলিয়ে দেখতে গেলে প্রাণীর সঙ্গে মানুষের এখানে দারুণ মিল। তবে প্রাণী খাদ্য অনুসন্ধান করে বা শিকার ধরে। মানুষ জীবিকা গ্রহণ করে অর্থোপার্জনের জন্য। অর্থ উপার্জনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অন্ন-বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান। এর মধ্যে প্রথমেই পড়ে অন্ন। অন্ন সংস্থান হয়ে গেলে প্রয়োজন পড়ে খাদ্য বৈচিত্র্যের। এক ধরনের খাবার নয়, বিচিত্র খাবার। প্রাণীদের কিন্তু এত পছন্দ নেই। তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য হলেই হল' বাঘ প্রতিবারই একটা করে হরিণ মারবে। হরিণ ছাড়া সে বৈচিত্র্যের জন্য শিয়াল মেরে তার মাংস খাবে না। অথবা দিনে একটির বেশি হরিণ মারবে না। তার খাওয়া হয়ে গেলে সে অভুক্ত অংশ নষ্ট করবে না, কাক, শকুন হায়েনা তার অভুক্ত অংশ খাবে। কিন্তু এনিয়ে বাঘ কোন ক্রোধ প্রকাশ করবে না। তার যতটুকু প্রয়োজন তার বেশি সে খাবে না। কিন্তু মানুষ লোভে ও উপরোধে পড়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্য খায়। কাউকে ভাগ দিতে চায় না। তার লোভে পাপ হয়, পাপে হয় মৃত্যু।

মানুষের শেষতম প্রবৃত্তি কৌতুকপ্রিয়তা : ভাবাবেগ হাস্য— মজাদার কোন কিছুতে আগ্রহ। ক্রোধকে প্রশমিত করার জন্য অথবা ক্রোধ থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মানুষ নানা কৌতুকের অবতারণা করে। হাস্যরস নব রসের অন্যতম শ্রেষ্ঠরস বলে স্বীকৃত।

এটি প্রবৃত্তির ইতিবাচক দিক। অতিরিক্ত কৌতুক প্রবণতাকে আবার ছ্যাবলামো বলে ধরা হয়। কিন্তু পরিমিত কৌতুক প্রিয়তা মানুষের ব্যক্তিত্বকে আকর্ষণীয় ও রমণীয় করে তোলে। বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ, উইনস্টন চার্চিল, জর্জ বানার্ডশ প্রমুখ ব্যক্তিত্বের কৌতুকপ্রিয়তা বিশ্ববিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

এপর্যন্ত আমরা জানতে পারলাম কাউকে ভাবপ্রবণ বলাটা যথার্থ নয়, কারণ ভাবপ্রবণতা সমস্ত মানুষের মধ্যে থাকতে বাধ্য। তবে ভাবপ্রবণতাকে কোথায় নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে কোথায় তার প্রকাশ ঘটাতে হবে তা ব্যক্তির বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে। চতুর ব্যক্তিরা অনেক সময় ভাবপ্রবণতার অভিনয় করেন। কার্যোদ্ধারের জন্য তাঁরা মুখে ভাবপ্রবণতা দেখান কিন্তু তাদের প্রবৃত্তিকে তাঁরা প্রশমিত করার চেষ্টা কবেন না। এমন ব্যক্তিত্ব আছে যাঁদের মুখে মিষ্টি ঝরে পড়ে কিন্তু ভেতার ভেতার তাঁরা তখন ছুরি শানাচ্ছেন। অথবা বাইরে কামের ভাবপ্রবণতা দেখাচ্ছেন না বটে কিন্তু তাঁদের ভেতরকার কামপ্রবৃত্তি প্রশমিত হয়নি। তবে সৎ মানুষেরা ভাবাবেগ চেপে রাখতে পারেন না কিন্তু কুপ্রবৃত্তিকে নিবৃত্ত করতে পারেন।

কিন্তু যাঁরা ইমোশান বা আবেগকে চাপতে পারেন না ; সামান্য কিছুতেই আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন অথবা আবেগের বশে কাজ করা যাঁর স্বভাব তাঁদের আমরা আবেগপ্রবণ ব্যক্তিত্ব বলব। সাময়িকভাবে আবেগের বশে অনেকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠেন। যতবার পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধেছে ততবার দেখেছি জনসাধারণের একাংশ আবেগে আপ্লুত হয়ে সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সময় দেখেছি হাজার হাজার বাংলাদেশি মুক্তিযোদ্ধা শিবির গুলিতে এসেছে যুদ্ধ করবে বলে। শিকারপুরে এমন একটা শিবিরে গিয়ে দেখেছিলাম একদল তরুণ বালিশের অভাবে মাথায় ইট পেতে শুয়ে আছে। ১৯৬১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে টানা পাঁচ মাস আমি বাংলাদেশে ছিলাম। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা হাজার হাজার নারীকে রেপ করে। এই ধর্ষিতা নারীদের বীরাঙ্গনা আখ্যা দিয়ে তাদের বিয়ে করার জন্য আওয়ামি লিগ নেতারা তরুণদের কাছে আবেদন করেন। একদিন আদালত চত্বরে গিয়ে দেখি শত শত তরুণ শাদা কাগজে দরখাস্ত লিখছেন যে তাঁরা সবাই ধর্ষিতাদের বিয়ে করতে চান। এইসব ভাবপ্রবণতা ক্ষণিকের। ক্ষণিকের ভাবপ্রবণ ব্যক্তি চট করে মুগ্ধ হয়ে যান। দ্রুত প্রেমে পড়েন। চাপাচাপি করলে অসঙ্গত প্রস্তাবেও রাজি হয়ে যান। প্রত্যেককেই কথা দেন। পরে ভাবাবেগ কেটে গেলে তাঁরা আর কথা রাখেন না। প্রেমিক প্রেমিকাকেও কাটিয়ে দেন। ভাবাবেগপ্রবণ ব্যক্তির যে কোন ভাবাবেগ স্থায়ী প্রলক্ষণ হিসাবে দেখা দিতে পারে। যেমন হতাশা একটি ভাবাবেগ। স্থায়ী হতাশ ব্যক্তির জীবন দৃষ্টিই নেতিবাচক। তিনি সব কিছুর মধ্যেই শুধু নেতিবাচক দিক দেখবেন। আধ গেলা জল দিলে তিনি বলবেন গেলাসটা অর্ধেক খালি। ইতিবাচক ব্যক্তি হলে বলতেন গেলাসটা অর্ধেক ভর্তি। হতাশা সম্পর্কে আমি হতাশ হবেন না গ্রন্থমালায় ৬টি খণ্ডে এক হাজার পৃষ্ঠা ধরে আলোচনা করেছি। কাজেই এই বইতে তার পুনরাবৃত্তি না করে শুধু বলতে চাই, ভাবাবেগ দিয়ে যেমন আমরা সুন্দরকে উপভোগ করতে শিখি তেমনি আবার অতি কাছের জনকে ঘৃণাও করতেও শিখি। অতিরিক্ত ভাবপ্রবণতা থেকে আমাদের মনে অকারণে ভয়, ও সন্দেহ দেখা দিতে পারে। যেমন পাপের ভয়, শাস্তির ভয়। পাছে লোকে কিছু বলে এই মনে করে সৎকাজ করতে যদি

ভয় পান তাহলে এই ভয়ও ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা।

ভাবপ্রবণ ব্যক্তিত্ব : রামবাবু একজন ভাবপ্রবণ ব্যক্তিত্ব। একজন ভাল অধ্যাপক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম। তাঁকে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার চেয়ারম্যান হিসাবে মহারাষ্ট্রের একটি প্রত্যন্ত প্রদেশে পাঠানো হয়। কারখানাটি লোকসানে চলছিল। তাঁকে বলা হয় কারখানাটি চাঙ্গা করে তুলতে হবে। রামবাবু পদটি গ্রহণ করতে ইতস্তত করছিলেন। কিন্তু পদমর্যাদা বেশি ও প্রাপ্তিযোগও বেশি এই মনে করে তিনি ওই কারখানার প্রধানের পদ গ্রহণ করেন। পদে যোগ দিয়ে তিনি ব্যয় সঙ্কোচের জন্য ওভারটাইম বন্ধ করে দেন। কর্মচারীদের সময়মত অফিসে আসার জন্য সার্কুলার দেন। দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দেন ও কোম্পানির সেক্রেটারিকে নানা অভিযোগে পদত্যাগে বাধ্য করেন। এরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ইউনিয়ন তাঁকে ক্রমাগত ঘেরাও করতে থাকে। ও তাঁকে স্বৈরাচারী বলে অভিহিত করে পদত্যাগ দাবি করতে থাকে।

রামবাবু এসব ঝুটঝামেলা বরদাস্ত করতে পারেন না। আসলে তিনি কখনও বিরূপ পরিস্থিতিতে কাজ করেননি। তিনি কখনও জোর দিয়ে কিছু বলতে শেখেননি। আবার তাঁর মধ্যে সহনশীলতাও কম। কাজেই প্রচণ্ড চাপের মুখে কাজ করতে করতে তাঁর ব্যক্তিত্বে Stress ও anxiety (উদ্বেগ) দেখা দেয়। এই সময় তিনি যদি কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধু-বান্ধব বা পরামর্শদাতা পেতেন ও তাদের কাছে নিজের উদ্বেগের কথা বলে মন হাল্কা করতে পারতেন তাহলে তিনি নীরোগ থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি একটা দারুণ ভুল করে বসলেন। সবাইকে শত্রু মনে করে নিজেকে ঘরে বন্দী কবে ফেললেন। পরিচিতজনদের থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। তারপর তাঁর পত্নীর পরামর্শে তিনি পদে ইস্তফা দিয়ে দিল্লিতে পুরনো কাজে ফিরে গেলেন। কিন্তু ততদিনে তাঁর যা ক্ষতি হবার হয়ে গিয়েছে। তাঁর homeostasis-এর (দেহের আভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতা) উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। তাঁর প্রেসার ছিল না। প্রেসার হয়েছে। রাতে অনিদ্রা হচ্ছে। প্রায়ই মাথা ধরছে।

মনোবিদরা বলেন, যে প্রত্যেক মানুষের নিজের সম্পর্কে একটা ধারণা থাকে। আমি এই। আমি ওই। আমি কাউকে পরোয়া করি না। আমার ব্যক্তিত্ব এমন যে আমার সামনে কেউ ট্যাঁ-ফুঁ করতে পারবে না। অনেকেই ভাবেন অন্যরা কোম্পানিটাকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। পড়ত যদি আমার পাল্লায়, দেখিয়ে দিতাম। একে বলে Self concept অর্থাৎ আত্মধারণা। বলা বাহুল্য অধিকাংশের আত্মধারণা বাস্তবের মুখোমুখি হলে দেখা যায় সেটা ভুল ছিল। কাজেই বিপদের মুখে, সংকটের মুখে কে কী রকম ব্যবহার করবে তা আগে থেকে বোঝা মুশকিল।

এখন রামবাবুর মধ্যে একটা আত্মধারণা ছিল, যে তিনি এমন ভাবমূর্তি গড়ে তুলেছেন যে তাঁর মুখের ওপর কেউ কথা বলতে সাহস করবেনা। তাই তিনি পেশাদার জনসংযোগের ওপর নির্ভর করেননি। ভাবেননি দিল্লির বুদ্ধিজীবী মহল আর মহারাষ্ট্রের সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী এক নয়। কাজেই তাঁর আত্মপ্রত্যয় এখানে অলীক প্রমাণিত হল। তা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। তখন তাঁর মধ্যে repression দেখা দিল। তিনি নিজেকে স্বেচ্ছায় সরিয়ে নিলেন।

সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার প্রধান উপায় হল ধারণাকে সব সময় নমনীয় রাখা। আত্মবিশ্বাস যেন বাস্তবকে অনুসরণ করেই গড়ে ওঠে।

যেমন এক ভদ্রলোক তার বাড়ি রঙ করার জন্য তিনজন মিস্ত্রি ডাকলেন। প্রথম মিস্ত্রি বলল আমি একাজটা দৈনিক মজুরিতে করব। তবে কতদিন সময় লাগবে বলতে পারছি না। আমার ধারণা পনেরো দিনের মধ্যে কাজটা শেষ হতে পারে। লাগলে আর দুতিন দিন বেশি লাগতে পারে। আবার দুতিন দিন আগেও হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় মিস্ত্রি বলল : আমি ফুরনে বা Contract এ কাজটা সাতদিনেই তুলে দেব।

তৃতীয় মিস্ত্রি বলল : এটা এমন কোন শক্ত কাজ নয়। এরকম অনেক কাজ আমি তিনদিনে তুলে দিয়েছি। তবে আমার রেটটা একটু বেশি। ভদ্রলোক সব শুনে প্রথম মিস্ত্রিকে নিয়োগ করলেন। কারণ তার আত্মধারণা বাস্তব সম্মতা। সে মুখেই বলে রেখেছে যে পনেরো দিনের মধ্যে কাজটা তুলে দেবে কিন্তু দেরি হতেও পারে। অন্যদের আত্মধারণা বাস্তবসম্মত নয়। তিনদিনে এত বড় বাড়ি রঙ করা মুশকিল। এমনকী সাতদিনেও তোলা সম্ভব নয়। বরং চটজলদি কাজ তোলার জন্য কাজের কোয়ালিটি নিম্নমানের হতে পারে। সুতরাং আত্মপ্রত্যয় এমন হওয়া উচিত যা বাস্তবগ্রাহ্য ও বাস্তবসম্মত। এটা মনে রাখা উচিত অধিকাংশের আত্মধারণা কল্পনা প্রসূত, তার কদাচিৎ ট্রায়াল হয়ে থাকে। অধিকাংশই গজদন্তমিনারে বসে রাজা-উজির মারেন।

সুব্যক্তিত্ব হবে বাস্তব নির্ভর এবং সর্বদা বাস্তব পরিস্থিতির অনুগামী। বিশেষ করে বাইরের চাপের মুখে পড়েও কেন্নোর মত নিজেকে গুটিয়ে না রাখা।

যদি কেউ আপনার শত্রুতা করে তাহলেও চট করে তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করবেন না। কারণ তার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করলে আপনার সঙ্গে তার একটা মানসিক দেওয়াল উঠে যাবে। আপনি তার মনোভাব আর জানতে পারবেন না। দুদেশের সম্পর্ক যথেষ্ট খারাপ হলেও দেখবেন দুটো দেশ কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করে না। পাকিস্তানেও এত কিছুর মধ্যে ভারতীয় দূতাবাস ও উপদূতাবাস রেখে দেওয়া হয়েছে। এই দূতাবাস না থাকলে ভারত সরকার পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানতে পারত না। পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি।

নিজের ক্ষমতা যাচাই করে তবেই প্রতিশ্রুতি দিন এই কাজটা পারব। মনে রাখবেন একটি গাড়ির সর্বোচ্চ গতি যতটা চালক কখনই সেই চূড়ান্ত গতিতে গাড়ি চালায় না। যদি ৯০ কিঃ মিঃ গতি হয় তাহলে ৭০ কিঃ পর্যন্ত চালানো হয়। রাস্তার অবস্থা দেখেই গাড়ির গতি তোলার নিয়ম। তেমনি যে কাজটা আপনি তিনদিনে শেষ করতে পারবেন লোককে বরং বলুন চারদিনে শেষ করব। একটা দিন হাতে রাখুন। যদি তিনদিনে শেষ করেন তাতে আপনার আত্মবিশ্বাসই বাড়বে। কিন্তু আত্মধারণার সঙ্গে আত্মবিশ্বাসের সংঘাত হবে যদি প্রতিশ্রুতিমত তিনদিনের মধ্যে কাজটি শেষ করতে না পারেন।

সুব্যক্তিত্বের পক্ষে মস্ত বড় উদ্দীপক ভালবাসা। শিশু অবস্থা থেকে শিশুর মনে মাতৃভক্তি জাগালে শিশু উদ্যোগী হয় মাকে খুশি করতে। সে বোঝে বিরোধিতা করার চেয়ে ভালবাসার মূল্য অনেক। জেদি শিশুকে বশ করার জন্য তাকে খেলনা কিনে দেওয়া বা খাবার দেওয়া মানে শিশুর ব্যক্তিত্বকে প্রথাবিরোধী করে তুলতে সাহায্য করা। শিশু উপলব্ধি করবে ভালবাসার চেয়ে বিদ্রোহের মূল্য বেশি। ভালবাসার মূল্য যে সবচেয়ে বেশি সেটি মাকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়। যৌবনে সে তখন উপলব্ধি করে প্রেমের মূল্য।

নিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ

অনেকে আছেন ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণ না করতে পেরে লোকের সামনেই ঝগড়া করেন। কেঁদে-কেটে একসা করেন। একবার একটি পরিবারে এক বন্ধুর জন্মদিনে এক ঘরোয়াপার্টিতে গিয়েছি। ছোট্ট পার্টির আয়োজন হয়েছে কলকাতার এক ক্লাবে। ডিনার সার্ভের আগে হাসি ঠাট্টা হচ্ছে। হঠাৎ কি নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে তার স্ত্রীর কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। একটু একটু করে পরস্পরের বাদানুবাদ তীব্র ঝগড়ায় গিয়ে পৌঁছল। শেষে অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ। বন্ধুর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে স্বামীকে নানাভাবে দোষারোপ করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত কেউ ভাল করে খেল না। সমস্ত পার্টি মাটি। মেয়েদের ক্ষেত্রে এমন ভাবাবেগের হঠাৎ হঠাৎ বান ডাকে। তখন আর তারা নিজেদের সামলাতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী, প্রেমিক প্রেমিকা, মা ও ছেলের সম্পর্কের মূল সেতু ভাবাবেগ। কিন্তু তার আধিক্য ঘটে গেলেই সেতুর ওপর দিয়ে জল গড়াতে থাকে।

মনে রাখতে হবে ভাবাবেগ প্রকাশ্য হলে ব্যক্তির ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। আপনি আপনার এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন কিন্তু আপনার তৃতীয় বন্ধুর কথা উঠতেই বন্ধুটি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন। ইমোশান চাপতে পারলেন না। এতে কিন্তু তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট হল। অনেকে ঈর্ষায় এমন আচ্ছন্ন (obcesscd) হয়ে থাকেন যে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে লোকের কাছে গালমন্দ করে বেড়ান। প্রাণভরে গালাগাল দিয়ে কাউকে ছোট করে নিজেকে বড় করা যায় না। আবার নিজেকে অকারণে বড় করেও কাউকে ছোট করা যায় না।

এ সম্পর্কে একজন মনোবিদের কথা উদ্ধৃত করছি।

'A person who dwels on his bad "bad luck" or who attacks others indirectly by cutting or sarcastics Jokes makes people feel uncomfortable The old saying "laugh and the world laughs with you, weep and you weep alone." exprersses the attitude of most people toward such emotional fashion."[৪৩]

যে ব্যক্তিত্ব শুধু পবছিদ্রান্বেষী, ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাবাবেগের দ্বারা চালিত, সে কিন্তু ক্রন্দনশীল ব্যক্তিত্ব। তার জন্য পৃথিবী কাঁদে না। সে একা বসেই অরণ্যে রোদন করে। আর যে হেসে যায় গোটা পৃথিবী তার সঙ্গে হাসে। ভাবাবেগকে প্রশমিত করার একমাত্র উপায় হল সামাজিক মেলামেশা। আমার নিজের জীবনের নীতি ঃ সকলের সঙ্গে পরিচিতি, কিছু লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সামান্য লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা। অন্তরঙ্গ মানুষ একজন বা দুজনই যথেষ্ট। এক্ষেত্রে স্বামী বা স্ত্রীর মত অন্তরঙ্গ বন্ধু পরিণত বয়সে আর দ্বিতীয় কেউ হতে পারে না। আমাকে এক জার্মান ডিপলোম্যাট বলেছিলেন, ইস্কুল জীবনের পর আর বন্ধু গড়ে ওঠে না। তখন বন্ধু তৈরি করে নিতে হয়। তৈরি করা বন্ধুত্ব আবার ঠুনকো হয়। সামান্য স্বার্থের আঘাতে ভেঙে যায়। বিশেষ করে অফিসের সহকর্মী বন্ধুরা শরৎ আকাশের পলকা মেঘের মত। সুন্দর কিন্তু ক্ষণিকের অতিথি।

যাইহোক, ইমোশানের যত্রতত্র বহিঃপ্রকাশকে লোকে অপরিণত ব্যক্তিত্ব বলে মনে করে। যেমন অত্যধিক স্পর্শকাতরতা : সামান্য ঘটনাকে টেনে লম্বা করে। আমি এরকম অনেক ব্যক্তিত্ব দেখেছি। আমার এক সহকর্মীর ব্যক্তিত্বে কিছু গোলমাল ছিল। আমি চাকরিতে জয়েন করার দিন ভদ্রলোক আমার ঘরে কী একটা কাজে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আগের

দিনই আমার আলাপ হয়েছিল। আমি শুনলাম এক সময় তিনি বিদেশে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন। ওই প্রতিষ্ঠানে আমার এক পরিচিত ব্যক্তিও কাজ করতেন। আমি তাঁকে বললাম : আপনি অমুককে চেনেন? তিনি বললেন : হ্যাঁ। পরের দিন তিনি আমার ঘরে ঢুকে কী একটা কথা বলে চলে গেলেন। এর কিছুদিন পরে তিনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলেন। প্রথম অভিযোগ, তিনি বিদেশে একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন জেনেও আমি তাঁর ব্যাপারে কোন কথা জানার আগ্রহ প্রকাশ না করে কেন শুধু আমার পরিচিত ভদ্রলোককে চেনেন কি না এটা জানতে চাইলাম। দুনম্বর অভিযোগ, তিনি আমার ঘরে ঢোকামাত্র আমি কেন তাঁকে বসতে বলিনি।

এর দুবছর পরে তাঁর আরও একটা অভিযোগ : কলকাতা থেকে এক বিশেষজ্ঞ এসেছিলেন আমাদের বিভাগে। সহকর্মী ভদ্রলোক যখন তাঁর সিটে ছিলেন না তখন কলকাতার ভদ্রলোক এসে পৌঁছন। একারণে ওই সহকর্মীর সঙ্গে বিশেষজ্ঞের আলাপ করিয়ে দিতে দু'ঘণ্টা দেরি হয়ে যায়। সহকর্মী আমায় যাচ্ছেতাই ভাবে বললেন : আপনি আমায় আলাপ করিয়ে দিলেন না ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে। আপনার সাধারণ ভদ্রতা নেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই ধরনের ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে ভদ্রলোক অজস্র অভিযোগ তুলতেন এবং বেশ রূঢ়ভাবে আমাকে কথা শোনাতেন। প্রথম প্রথম আমার খুব খারাপ লাগত। তারপর এই ব্যক্তিত্বের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ঘাটাঘাঁটি করতে গিয়ে এইধরনের ব্যক্তিত্বের কারণ জানতে পারলাম। এটি ব্যক্তিত্বের অপরিণতি। যার ফলে ভেতরের ইমোশান (এক্ষেত্রে ঈর্ষা, অপছন্দ, ঘৃণা) কে মানুষ চেপে রাখতে পারে না।

কেউ প্রশ্ন তুলবেন ইমোশান চেপে রাখা মানে কী অবদমন নয়? আমার হয়তো কাউকে দেখে ইমোশান জাগছে ঘৃণার? তবুও কী বাইরে শ্রদ্ধার ভাব ফুটিয়ে তুলতে হবে? কারও পোশাক আশাক দেখে তার প্রতি কামভাব জাগছে অথচ চেপে রেখে তার প্রতি কী মাতৃভাব জাগাতে হবে? (পরদারেষু মাতৃবৎ?) একজন সমাজ-বিরোধীকে দেখে ভয়ভাব জাগছে। তখন কী বাইরে বীরের মত ভাব করব? মনোবিদরা বলেন, ইমোশান চেপে রাখা দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। অনেকের মধ্যে এর ফলে নানা বাতিক দেখা দেয়। কেউ দাঁতে নখ কাটতে থাকে। কারও চোখ পিটপিট করে। কেউ শুচিবায়ু গ্রস্ত হয়ে পড়ে। পেটে এক মুখে আর এক এর চাইতে মনোভাব প্রকাশ করে ফেলার মধ্যে স্বস্তি পাওয়া যায়না কী? অনেকে রেগে দু কথা শুনিয়ে দেন অথবা কামভাব জাগলে কামউত্তেজনা নিরসনের জন্য হস্তমৈথুন করেন। তার মধ্য দিয়ে ভেতরের বিষবাষ্প বেরিয়ে যায়। জাপানে একসময় পুলিশের মধ্যে প্রথা ছিল প্রথাটি বড় মজার। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে যদি কারও রাগ থাকে তাহলে রাগ প্রশমিত করতে হলে ওপরওয়ালা অফিসারদের ছবি আঁকা কতগুলি বালির বস্তা রাখা হত। অধস্তনেরা বালির বস্তায় ঘুঁসি মেরে তাদের ক্রোধভাব প্রশমন করত। ব্যাচেলর ছেলেরা তাদের ঘরে সুন্দরী চিত্রতারকাদের পোস্টার সেঁটে রাখে। তেমনি মেয়েরাও যৌন আবেদন যুক্ত পুরুষের পোস্টার তাদের পড়ার ঘরে রেখে দেয়। বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে সহজ মেলামেশার মধ্যে দিয়েও কামভাব ধীরে ধীরে তরলীকৃত হয়ে আসে। যারা লাজুক মুখচোরা প্রকৃতির, তারা মেয়েদের সঙ্গে বা ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারে না। তাঁরা ধর্মের আশ্রয় নেয়। ধর্ম তাদের সংযম শেখায়। শেখায় কামনাজয়ী

ব্রহ্মচর্যের সাধনা। এজন্য অনেক ছেলে-মেয়েকে অল্পবয়সে গুরুর দীক্ষা নিতে দেখেছি। প্রাক বিবাহিত জীবনে ছেলেমেয়েদের প্রেম অথবা অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব জীবনদায়ী ওষুধের মত। তবেভাবাবেগকেও নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যই সংযম দরকার।

প্রেমের কথা আগেই বলেছি, কিন্তু ধরেবেঁধে তো প্রেম হয় না। হিসেব করেও প্রেম হয় না। ওটা হয়ে যায়। প্রেমের লক্ষণ হল, দুজনের অদর্শনে পরস্পরের কথা মনে হচ্ছে কিনা। যেই দেখা হচ্ছে তখন মনের মধ্যে এক নিরবিচ্ছিন্ন প্রশান্তি আসছে কিনা। প্রেমিক প্রেমিকা যখন একান্তে বসে কথা বলে তখন এক ঘণ্টাকে পাঁচ মিনিট বলে মনে হচ্ছে, না কখন কথা শেষ হবে বলে মনে হচ্ছে? এই নিভৃত আলাপে পুরুষ ও নারী যখন তাদের পরস্পরের উদ্বেগ ও ক্লান্তি (Stress and Strain) প্রশমনের জন্য কথা বলে এবং পরস্পরের কাছ থেকে নির্ভেজাল সহমর্মিতা (empalty) আদায় করতে পারে তখনই ব্যক্তিত্বের ক্লেদগ্লানি ধুয়ে মুছে গিয়ে তার মধ্যে ঔজ্জ্বল্য ফিরে আসে।

কিন্তু প্রেম ব্যর্থ হলে, একজন বিশ্বাসঘাতকতা করলে, অথবা কোন কারণে প্রেমে ছেদ পড়লে তা কিন্তু আরও গভীর টেনশনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন ব্যক্তিত্বের ওপর তার চরম আঘাত পড়ে। প্রেমে ব্যর্থ দেবদাস মদ ধরে ক্ষয় রোগে মারা গিয়েছিল। অনেকে আত্মহত্যা করে মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি খোঁজে। তাছাড়া প্রেম এক সূক্ষ্ম ইমোশনাল সম্পর্কের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। পুরুষ ও নারীকে বুঝতে হয় যে প্রেম একটা খেলা নয়, অথবা যৌন কামনা মেটাবার সহজ উপায় নয়। এ ব্যাপারে এক্সপেরিমেন্টের কোন স্থান নেই। সূক্ষ্মবিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত ভাবগত সম্পর্ককে দেহগত সম্পর্কে পরিণত করলে এবং দেহ উপভোগ করার পর আবার অন্যদেহের সন্ধান করাটা প্রেম নয়, সেটা কাম চরিতার্থ করার মাধ্যম মাত্র। এ ধরনের ঘটনা আকছার ঘটে। কিন্তু মনের উপর এর যেমন দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব পড়ে তেমনি ব্যক্তিত্বের ওপরেও পড়ে। আসলে ব্যক্তিত্ব তো মনেরই আঁয়িনা। প্রেমজ সম্পর্ক ছাড়াও অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব প্রত্যেকের জীবনেই দরকার। একজন দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু জীবনে অত্যান্ত প্রয়োজনীয়। না উৎসবে, ব্যসনে, দুর্ভিক্ষে বা রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় সাহায্যের জন্যই যে উপকারী বন্ধুর দরকার তা নয়। তেমন বন্ধু কেউ না কেউ জুটে যায়। জীবনে চলার পথে কত লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। এর মধ্যে আপদে বিপদে বহুলোক আপনাকে সাহায্য করে। অন্তত আমি আমার বিপদে বহু নতুন বন্ধুকে পেয়েছি। তারপর তারা একদিন যেমন আসে একদিন তেমন চলে যায়ও। কিন্তু তেমন বন্ধুর কথা বলছি না। বলছি সেই একজন দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথা যার কাছে বা যাদের কাছে আপনি প্রাণ মন খুলে সুখ দুঃখ বেদনার কথা বলতে পারেন। কারণ মনের কথা বলার উপযুক্ত পাত্র না পেলে আপনার ব্যক্তিত্ব অস্বাভাবিক হয়ে যাবে। আপনি ক্রমাগত ডিপ্রেসনে ভুগতে থাকবেন। খ্রীস্টানদের মধ্যে এক স্বাস্থ্যকর প্রথা আছে। যে কোন খ্রীস্টান গির্জায় গিয়ে পাদ্রীর কাছে কনফেশন বা তাঁর কৃতকর্ম স্বীকার করে আসতে পারেন। এটা তাঁর মনের কথা প্রকাশের একটা পথ। এতে তিনি হালকা বোধ করেন।

এটা না করতে পারলে মানুষ নানাধরনের অসুখে ভোগে। আমার কাছে বহুমানুষ মনের কথা লেখেন। আমি তাঁদের পরামর্শ দি। আমার পরামর্শ যদি তাঁরা নাও মানেন তবু ওই যে আমার কাছে তাঁদের জীবনের গোপন কথাগুলো বললেন তাতেই তাঁদের মানসিক চাপ কমল। একটা কথা মনে রাখবেন আমাদের দেহের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যাঙ্গের মত ব্যক্তিত্বেরও

শৈশব দশা থেকে পরিণত দশা থাকে।—অর্থাৎ অপুষ্ট ব্যক্তিত্বের কুঁড়ি ধীরে ধীরে ফুল হয়ে ওঠে। সব ফুল সমান ভাবে বিকশিত হয় না। কোন ফুল অকালে ঝরে যায় আবার শিউলি

হে প্রভু আমায় ক্ষমা করুন। আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়েছিলাম

ফুলের পরিণত হওয়া মাত্রই ঝরে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ মানে প্রতিটি পাপড়ি নিয়ে বৃন্তটির গাছে ফুটে থাকা। তারপর সময় হলে সব ফুল ঝরে যায়।

ভাবগত সম্পর্ক বা emotional relations ব্যক্তিত্বের এক একটা পাপড়ি। আমাদের সম্পর্কের এখটা দিক হল পারস্পরিক ভাবগত সম্পর্ক (inter personal emotional relations)। যেমন আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের বাবা-মা, দিদিমা, ঠাকুমা, দাদামশাই, ঠাকুর্দা, মাসি, পিসি, কাকা, জেঠা, কাকিমা, জেঠিমা, মামা, মামীর সঙ্গে সম্পর্ক। গড়ে ওঠা বন্ধু-বান্ধবী ও প্রেমিক-প্রেমিকারা কথা আগেই বলেছি, এবার আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা বলি। পশ্চিমে একান্নবর্তী পরিবার নেই, আত্মীয়রাও নেই। দিদিমা তবুও আছেন। রাশিয়ায় দেখেছি অনেক পরিবারে মেয়ের মা মানে শাশুড়ি-মা মেয়ে জামাইর সংসারে থাকে। মেয়ের বাচ্চা মানুষ করে আবার চলে যায়। কিন্তু ঠাকুর্দা-ঠাকুমা নেই। তাঁদের কেউ কেউ খৃষ্টমাসে একবার আসেন। আমাদের দেশে নেই নেই করেও অনেক পরিবারে ঠাকুমা ঠাকুর্দা আছে। কাকা জেঠাও অনেক পরিবারে আছে। অথবা দুতিন ভাই পাশাপাশি বাড়ি করেছেন। অথবা পুজোর সময় কিংবা উৎসব অনষ্ঠানে বড় পরিবারের সবাইর এক সাথে মেলার রেওয়াজ আছে।

শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে ভারতীয় পরিবার আদর্শ পরিবার। শিশু যখন দেখে তাকে ঘিরে অনেক স্নেহশীল মুখ তখন তার মধ্যে বিশ্বাস বোধ (Confidence) গড়ে উঠতে থাকে। সে ভাবে পৃথিবীতে সে অবাঞ্ছিত নয়। আদর ভালবাসা এবং প্রশংসার মধ্য দিয়ে তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়বোধ গড়ে ওঠে। এই পারিবারিক পরিবেশ তার ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে। তাছাড়া সমবয়সী কাজিন ভাইবোনদের ঘন ঘন সাহচর্য পারিবারিক বৃত্তের মধ্যেই নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারে। ছোটবেলা থেকে যদি কেউ ভাবে সে প্রত্যাখ্যাত

তাহলে তার আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠতে পারে না। ভারতীয় পরিবারে একটা বড় সুবিধে, যে বয়সে বড় নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে কোন বালকও উপযুক্ত পরামর্শ পেতে পারে। অনেক সময় বাবা মাকে যা বলতে পারে না সে তার মাসি মেসো বা কাকা কাকিমাকে অক্লেশে বলতে পারে। মনোবিদরা সমীক্ষা করে দেখেছেন যারা খুব মিশুকে ও সামাজিক হয় তারা অধিকাংশই ছোটবেলা থেকে আত্মীয়-স্বজনের সাহচর্যে বড় হয়ে উঠেছে। এজন্য দেখবেন নিউক্লিয়ার পরিবারের একমাত্র সন্তানেরা যারা বহুতল বাড়ির ফ্ল্যাটে মানুষ হয় এবং সব সময় বাবা মায়ের ছত্রছায়ায় থাকে, আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পায় না, তারা পড়াশোনায় ভাল হতে পারে কিন্তু তারা Introvert বা অন্তর্মুখী ব্যক্তিত্ব হয় ও নানা ভাবাবেগজনিত সমস্যায় ভোগে।

সাহেবের মেজাজ এখন কেমন?

ঘরে ঢুকবার আগে অধঃস্তন অফিসাররা বড় সাহেবের বেয়ারাকে একবার জিজ্ঞাসা করে নেন সাহেবের মেজাজ এখন কেমন? এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে মানুষের মেজাজ অর্থাৎ mood-এর তারতম্য হয়। রোজ ঘুম থেকে উঠে সাহেবের এক এক রকম মেজাজ থাকে। যদি তাঁর রাতে ভাল ঘুম না হয়, তাঁর যদি ড্রিঙ্কসের মাত্রা বেশি হয় যায়, হজমের গোলমাল হয়, বিছানায় স্ত্রীর সহযোগিতা যদি না পান, অথবা সকালে উঠে যদি কোষ্ঠ কাঠিন্য হয় তাহলে সকাল থেকেই তাঁর মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে থাকতে পারে। একজন অফিসযাত্রী কেরাণীর বউ যদি ঠিক সময় অফিসের ভাত না দিতে পারেন এবং কেরাণী বাবু অত্যাধিক ভিড়ের জন্য পরপর কয়েকটা বাস মিস করেন তবে অফিসে তাঁরও মেজাজ ভাল থাকে না।

নানাবিধ তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে মানুষের মেজাজ বিগড়তে পারে। একবার শিলচর থেকে কলকাতায় ফিরছি। ভোর সাতটা পঁচিশে প্লেন। শেষ রাতে উঠে এসেছি। প্লেন ছ ঘণ্টা লেট। বেলা দুটো পঁচিশে কলকাতায় পৌঁছলাম। ব্যাগেজ আসতে এক ঘণ্টা লাগল। প্রিপেড ট্যাক্সির লাইনে আরও এক ঘণ্টা। সারা দিন খাওয়া হয়নি। প্লেনে যা খেতে দিল আমার কাছে তা অখাদ্য অতএব খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। বাড়ির সামনে গাড়ি আসতে এক মিনিট বাকি, তখন থেকে ট্যাক্সিকে বলছি ওই যে লাল গম্বুজ দেখছ, ওইটা আমার বাড়ি। কিন্তু ড্রাইভার তা না শুনে আমার বাড়ির বিপরীত দিকের বাড়ির গেটে গাড়ি দাঁড় করাল। কিছুতেই আমার বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল না। আমাকে মালপত্র টেনে রাস্তা পার করতে হল। এক্ষেত্রে আমার শান্ত মেজাজ বিগড়ে গেল। ইচ্ছা করছিল ঝগড়া করি। কিন্তু ঝগড়া করার মতও মেজাজ ছিল না তখন। তাই কিছু না বলে গাড়ি থেকে নেমে গেলাম। ঠাণ্ডা মেজাজের মানুষেরা (লোকে যাদের ভালমানুষ বলে তুচ্ছ করে) সাধারণত নানা ধরনের ব্যতিক্রমী আচরণের শিকার হয়। তাদের সঙ্গে লোকে খারাপ ব্যবহার করে। তাদের ওপর বেশি করে মানসিক নির্যাতন হয়। আবার যারা সব সময় চড়া মেজাজে থাকেন তাদের লোকে ভয় করে। তাদের ঘাঁটাতে চায় না। প্রাণীজগতে দেখবেন ষাঁড়ের মেজাজ সব সময় তিরিক্ষি, কাউকে দেখলেই শিঙ নেড়ে ভয় দেখায়, তাই ষাঁড়কে লোকে ভয় পায়। কিন্তু গরু ছাগল নিরীহ প্রাণী। গরুর শিঙ থাকলেও কদাচিৎ সে তা ব্যবহার করে। তাই পড়ে পড়ে গরু ছাগল মার খায়।

মেজাজ আসে ক্রোধ থেকে। এই ক্রোধ অবশ্যই ভাবাবেগ। ভাবাবেগ প্রবৃত্তিগত কারণেই আসে। ক্রোধ প্রবৃত্তি প্রত্যেকের মধ্যেই কম বেশী আছে। কেউ প্রকাশ করতে পারে অথবা কেউ পারে না। কেউ ইচ্ছো করেই বহুক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশ করে না। যেমন্ আমি এটা কী আমার দুর্বলতা? উদ্দীপক সত্ত্বেও আমি ক্রোধ প্রকাশ করি না কেন? কারণ আমি জানি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্রোধ প্রকাশের মূল্য নেই। যেখানে আমি জানি, রেগে গেলে প্রতিপক্ষ আমায় ভয় পাবে ও প্রতিনিবৃত্ত হবে সেখানেই ক্রোধ প্রকাশ করব। যত্রতত্র নয়। অন্যত্র রেগে গেলেও মেজাজকে নিয়ন্ত্রণে রাখব, কেননা তা না রাখলে উত্তেজনা বাড়বে, স্নায়ুর ওপর অযথা চাপ পড়বে। তাছাড়া ভারতবর্ষের মত দেশে যেখানে কোন কিছুই সুষ্ঠভাবে চলে না, প্রতিকারের বৈধ পথ নেই বললেই চলে। ঘুষ না দিলে যেখানে যথাসময়ে কাজ হয় না, সেখানে মেজাজ দেখাতে গেলে সব সময় রেগে টঙ হয়ে থাকতে হবে। এতে আমার ক্ষতি। তবু মেজাজ শান্ত রাখার জন্য অবিরাম সাধনা করে যেতে হয়। অন্যের জন্য নয়; শুধু নিজের স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে। কারণ প্রতিবার মেজাজ খারাপ করা মানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে রসক্ষরণের মাত্রা স্বাভাবিক থেকে কমে যাওয়া। হিপোক্রিটের মতে রক্তপ্রবাহের মধ্যে thyroxin-এর পরিমাণ কমে গেলে মানুষ নার্ভাস হয়ে পড়ে।

কড়া মেজাজের ভিত্তি তৈরি হয়ে যায় ছোটবেলায়। শিশু চেঁচানো বা কাঁদা মাত্র বাবা মা সঙ্গে সঙ্গে তার বায়না পুরণ করলে শিশু বোঝে এই চেঁচানিই তার অস্ত্র।. পরবর্তীকালে পরিবার জীবনে দেখা যায় বাবা-মা ছেলেমেয়েদের ওপর মেজাজ দেখাচ্ছেন। অফিসে বস অধঃস্তনের ওপর মেজাজ দেখাচ্ছেন এই কারণে তিনি অধঃস্তনের কোন কাজ অনুমোদন করছেন না। আমি একবার এক পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আচ্ছা আপনি এই কথা অমন কড়া ভাবে না বলে একটু পোলাইটভাবে তো বলতে পারেন।

ভদ্রলোক বললেন : খেপেছেন, ওরা এই ভাষাতেই অভ্যস্ত। ভদ্রতা করলে দেখবেন আর হুকুম তামিল করছে না।

আসলে এই কড়ামেজাজের অফিসারের কড়া কথা শোনা পুলিশ ও মিলিটারি কালচারের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। যার জন্য বলা হয় মিলিটারি মেজাজ। মনোবিদরা এর নাম দিয়েছেন শর্তাধীন প্রত্যুত্তর বা Conditional response.

এই ধরনের মেজাজ শর্তাধীন এই কারণে যে ওই পুলিশ অফিসার বাড়ি ফিরে বউ ছেলেমেয়ের কাছে মিলিটারি মেজাজ নাও দেখাতে পারেন। তখন তিনি একদম স্নেহশীল পিতা ও প্রেমিক স্বামী। আবার দজ্জাল স্ত্রী স্বামী ও শাশুড়ির কাছে দাপট দেখিয়ে কর্মক্ষেত্রে গিয়ে শান্ত ও মিষ্টি স্বভাব দেখিয়ে সহকর্মীদের মন-জয় করতে পারে। তবে বহু মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে কড়া ও খিটখিটে মেজাজ চিরস্থায়ী বাসা বাঁধতে পারে। এঁরা সবসময়ই কড়া মেজাজে থাকেন। এঁদের বলা হয় রাশভারি মেজাজের। খিটখিটে মেজাজের। এই ধরনের মেজাজ অনেকের চরিত্রের মধ্যে স্থায়ীভাবে ঢুকে যায়। তখন সে লোকটি স্বভাব দুর্মুখ বা স্বভাব বদ মেজাজী হয়ে ওঠে। এই মেজাজের উৎস শৈশব অথবা বয়ঃসন্ধি। একটি শিশু খুব ঠাণ্ডা মেজাজের। খুবই হাসি খুশী। বাবা মা তাকে খুব ভালবাসে। বছর পাঁচেক পরে তার একটা ভাই হল। বাবা মায়ের মনোযোগের অনেকটা ছোট শিশু পেতে

লাগল। প্রথম শিশু এতে নিরাপত্তার অভাব বোধ করল। তার মধ্যে দেখা দিল ঈর্ষা। সে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠল। দেখা গেল তার ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হচ্ছে। সে জেদী এবং বদমেজাজি হয়ে উঠছে।

আদালতে যিনি ফাঁসির হুকুম দেন, ঘরে তিনিই আসামী

আবার বয়ঃসন্ধির সময় কোন ছেলে বা মেয়ে ইস্কুলে হয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ভাল করে মিশতে পারল। সে বাবা মায়ের কড়াশাসনে মানুষ। তার সমবয়সী বন্ধুরা যৌনতা নিয়ে আলোচনা করে। অনেকেই যৌন অভিজ্ঞতার কথা বলে। কিশোর বয়সে বন্ধুদের আড্ডায় সে প্রথম শোনে যে বাবা মায়ের যৌন সংসর্গের ফলে তার জন্ম। সে এটা বিশ্বাস করতে পারে না। কারণ একথাতো বাবা মা তাকে বলেনি। শিক্ষকেরাও না। বরং তারা বলেছে যৌনতা একটা অসভ্য কথা। যৌন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিয়ে আলোচনাও প্রথা বিরোধিতা। উলটো কথা শুনে বাবা মায়ের প্রতি তার প্রথম ঘৃণা বোধ শুরু হয়। বিশেষ করে বাবার প্রতি ঘৃণা হয়। বাবা মাকে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখলেই সে রেগে যেতে থাকে। ছি-ছি তাহলে যা শুনেছিল তাই সত্যি। তার বাবা মা নিজেরাই যৌন সংসর্গের মত নোংরা কাজে লিপ্ত।

এর ফলে কিশোর বয়স থেকে সে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আবার বিদ্রোহের অভিব্যক্তি কড়া মেজাজ ও ঔদ্ধত্যের নিরন্তর প্রকাশে। এরপর থেকে তার মেজাজ টঙ হয়ে থাকে।

বিয়ের পর স্বামীর ঘরে এসে বহু শান্তস্বভাবের মেয়েও কলহ পরায়ণ হয়ে ওঠে। স্বামী যদি তাকে প্রত্যাশিত যৌন সুখ না দিতে পারে তাহলে তার মেজাজ খারাপ হতে পারে। যদি স্বামী সমাজে ও সংসারে উপযুক্ত মর্যাদা না পায়, স্বামীর ব্যক্তিত্বে যদি ঘাটতি থাকে, স্বামী যদি বাবা মায়ের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল হয় তাহলেও স্ত্রীর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে সে নরম টার্গেট অর্থাৎ শাশুড়িকে বেছে নেয়। শাশুড়ির অধীনতা সে মেনে নিতে পারে না। নিজের হতাশা প্রশমিত করার জন্য সে শাশুড়ি ছাড়াও আরও নরম লক্ষ্য বেছে নেয়। স্বামী এবং বাড়ির কাজের লোকদের প্রতি সে মেজাজ দেখাতে শুরু করে। মেজাজের পরিবর্তন এবং তদনুযায়ী ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক ঘটনা। যে কোন বদমেজাজী ব্যক্তিত্বের পিছনে যেমন শারীরিক কারণ থাকতে পারে তেমনি মনস্তাত্ত্বিক কারণও থাকে। যেমন এক ভদ্রলোকের অভদ্র ব্যবহার ও চড়া মেজাজের

কারণ অনুসন্ধান করতে করতে বার করলাম তিনি বিবাহিত, স্ত্রী-পুত্র ছেড়ে অল্প বয়সে বিদেশে পড়ে আছেন। যৌন অবদমনের ফলে তিনি হতাশগ্রস্ত। ক্রমাগত বদলির চেষ্টা করছেন বদলি হতে পারছেন না। অতএব তার হতাশাজনিত আক্রমণাত্মক মনোভাব ব্যক্তিত্বের মধ্যে তৈরি হয়ে রয়েছে। এবার তিনি নরম লক্ষ্য খুঁজছেন মেজাজের বহিঃপ্রকাশের জন্য। তাই যখনই কোন বদমেজাজি ব্যক্তিত্ব দেখবেন তখনই ভাববেন এই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের উৎস কোথায়? কারণ আচরণবাদ বলে, প্রত্যেক আচরণের পিছনে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দুটো কারণ থাকে।

তবে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা আগে থেকে সচেতন থাকেন, এ কারণে মেজাজ খারাপ করেন না। তাঁরা সহ্য করেন। মনোবিদরা এজন্যই বলেন : সহনশীলতাই মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিমা। কিন্তু এই বিমার প্রথম প্রিমিয়াম শৈশবেই দিতে হয়।

সহ্য করতে হয় হতাশা, ভয়, ঈর্ষা ও হিংসা এই চার নেতিবাচক কুৎসিত ভাবাবেগকে।

বাবামায়েরা ছেলেদের নীরোগ, স্বাস্থ্যবান ও বিদ্বান করে গড়ে তুলবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের মানসিক স্বাস্থ্য গড়ে তোলার কথাটা একদম ভাবেন না। আমি অনেক অভিযোগ পাই, স্বামী নয়তো স্ত্রী-পরস্পরের প্রতি দুর্ব্যবহার করে থাকেন। তাঁদের মেজাজ সপ্তমে চড়েই থাকে। আপনি বাইরে থেকে দেখে অথবা সামাজিক পরিবেশে দুচার কথা বলে বুঝতেই পারবেন না এই মহিলা স্বামীব সঙ্গে এমন রুক্ষ আচরণ করেন। অথবা অনেক নিপাট ভদ্রলোককে দেখেও ধরতে পারবেন না তিনি স্ত্রীর গায়ে হাত তোলেন। আসলে তাঁদের এই মেজাজি ব্যক্তিত্ব সামাজিকতার আড়ালে চাপা থাকে। নরম টারগেট পেলেই সেটি আপনা আপনিই প্রকাশিত হয়। এই ব্যক্তিত্বের জন্ম কিন্তু শৈশবে, তার বিকাশ কৈশোরে।

সবল ব্যক্তিত্বের সন্ধানে

শুষ্কং কাষ্ঠং এই কাটখোট্টা শব্দটিকে কবি কালিদাস নাকি মোলায়েম করে লিখেছিলেন নীরস তরুবর। তা শুকনো কাঠকে আপনি নীরস তরুবর বলে যতই মোলায়েম করার চেষ্টা করুন না কেন। শুকনো কাঠ, শুকনো কাঠই। তেমনি এই পৃথিবীর মনুষ্য সমাজের একটা বড় অংশ মোটা দাগের লোক, তাদের বলা যেতে পারে স্থূলবুদ্ধি, নীরস (dull) বিবর্ণ ও দ্যুতিহীন। এদের বিপরীতে আছেন ঝকঝকে ধারালো সুরসিক বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব। রবার্ট ব্যারন ও ডন বিরনে (Robert A. Baron. Donn Byrne) তাঁদের Social Psycholoay বইতে যাকে বলেছেন 'সবল ব্যক্তিত্ব' (Robust Personality)।

মনোবিদরা পাঁচধরনের ব্যক্তিত্ব প্রলক্ষণকে সবল ব্যক্তিত্ব বলে উল্লেখ করেছেন। প্রলক্ষণগুলি হল : বহির্মুখীনতা (extra version), মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা (agreeableness). স্থির লক্ষ্যে অবিচলতা (Williingness to achieve)। মানসিক ভারসাম্য (emotional stability) অভিজ্ঞতা ও সংস্কৃতি গ্রহণে উদারতা। সবল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন করে পুরুষ ও মহিলা ব্যক্তিত্বের উদাহরণ দিচ্ছি।

১. সোমক রায়—বয়স ৪২। শিক্ষাগত যোগ্যতা বি. ই. (সিভিল) এম বি.এ। একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের মার্কেটিং ম্যানেজার। ঠিকানা : ফ্ল্যাট ৭/১০ আহুজা অ্যাপার্টমেন্ট কলকাতা ১৬। উচ্চতা ৫ ফুট দশ ইঞ্চি। ওজন ৭০ কেজি। বিবাহিত। স্ত্রী সুদীপা ফ্যাসন

ডিজাইনার। এক ছেলে রাহুল (১০)। মেয়ে মৌমিতা (৬)।

২. চন্দ্রানী দত্ত। বয়স ২৭, অবিবাহিতা। এম.এ ইংরাজি (যাদবপুর)। একটি স্পনসর্ড কলেজের অধ্যাপিকা। উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি। ওজন ৬০ কেজি। ঠিকানা : ৭৩, ব্রজেনশীল স্ট্রিট। কলকাতা—৪।

৩. সুনন্দ নাগ, বয়স ২৫। এম এস সি ফিজিক্স। বর্তমানে বিজ্ঞান কলেজে গবেষণারত। উচ্চতা ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি। স্থায়ী ঠিকানা : নাগকেশর, বাঁকুড়া। এরা তিনজন বিভিন্ন পটভূমি থেকে এসেছেন। কিন্তু এদের মধ্যে মিল এই যে এঁরা প্রলক্ষণ মিলিয়ে তিনজনই সবল ব্যক্তিত্বের মানুষ।[৪৪]

এঁরা তিনজনই খুব আলাপী। অপরিচিতের সঙ্গে যেচে আলাপ করেন। খুব কথা বলতে পারেন। আড্ডায় বসলে ওঁরাই বৈঠক মাতিয়ে রাখেন। ওঁদের প্রত্যেকের গল্পের স্টক প্রচুর। যে কোন প্রসঙ্গ উঠলেই তা নিয়ে কথা বলতে পারেন। কারণ ওঁদের ঔৎসুক্য এবং আগ্রহ অপরিসীম। খবরের কাগজ ও ম্যাগাজিন খুঁটিয়ে পড়েন। প্রয়োজনীয় তথ্য প্রয়োজনমত ছেড়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেন। শেষতম খবরগুলি জানেন। খেলাধূলো সম্পর্কে আগ্রহ প্রচুর। ক্রিকেট সম্পর্কে প্রচুর খবরাখবর রাখেন। নিয়মিত টিভির খবর ও আলোচনা শোনেন। ডিসকভারি চ্যানেল দেখেন।

সোমক পাড়ার পুজো কমিটির সভাপতি হয়েছেন। তাঁর আপত্তি ছিল, কিন্তু পাড়ার সবাই সোমকদাকে চায়।

একালের রোমিও জুলিয়েট

চন্দ্রানী সোস্যাল অ্যাকটিভিস্ট। সে হেল্পেজ ইণ্ডিয়ার সঙ্গে জড়িত। বৃদ্ধদের জন্য অনেক কাজ করেছে।

সুনন্দ কবিতা লেখে। একটি লিটল ম্যাগের সঙ্গে সে জড়িত। তাদের জন্য অবসর সময়ে সে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করে দেয়। রিসার্চের কাজটা এগিয়ে আসছে বলে সে ইদানীং

আগের মত সময় পাচ্ছে না কিন্তু সম্প্রতি পত্রিকার কোন মিটিঙ সে এখনও মিস করেনি। তিনজনেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা টার্গেট আছে। যেমন সোমকের টার্গেট হল, হিন্দুস্থান লিভারের মত বনেদী কোম্পানিতে মার্কেটিং ম্যানেজার হিসাবে যোগ দেওয়া। চন্দ্রানী আর এক বছর পরে বিয়ে করবে। তার সঙ্গে এখনও কারও ইমোশনাল সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তার পুরুষ বন্ধুদের একে একে বিয়ে হয়ে গেছে। বান্ধবীদের তো বাচ্চাও হয়ে গেছে। কিন্তু চন্দ্রানীর টার্গেট ও নিজে একটা ফ্যাশন ডিজাইনের কোম্পানি খুলবে। পাঁচবছর চাকরি করে সে দু লাখের মত জমিয়েছে। এই টাকা লগ্নি করতে সে রাজি। দরকার একটা ভাল অফিস। তারই সন্ধানে আছে সে। সুনন্দর উদ্দেশ্য সবার আগে পিএইচডি শেষ করা। তারপর সে কলকাতা যাদবপুর বা কল্যাণীতে একটা লেকচারারের পোস্ট চায়। যদিও সে পার্টি করে না বলে পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাবে কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু তার কেরিয়ব খুব ভাল বলে এটাই তার জোর। তারপর বছর তিনেক পরে সে স্টাডি লিভ নিয়ে আমেরিকায় যেতে চায় পোস্ট ডক্টরেট করতে। তার প্রেমিকা সর্বানী বি এড করে ঝাড়গ্রামের একটি ইস্কুলে আছে। দুজনেই এখন বিয়ে করার কথা ভাবছে। ছুটি ছাটায় দুজনে মিলিত হয়। থিতু হয়ে না বসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে রাজি।

ওরা তিনজনই দায়িত্বশীল। কেউই দায়িত্ব এড়াতে চায় না। সোমক দশ লাখ টাকার বিমা করিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া এই ফ্ল্যাটটি সে স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে করেছে। ছেলেমেয়েদের ভাল স্কুলে পড়াচ্ছে। চন্দ্রানী বাবা মায়ের কাছে থাকে। কিন্তু বাড়িতে প্রতিমাসে মায়ের হাতে দুহাজার করে তুলে দেয়। সুনন্দ নাগের বাড়ির অবস্থা খারাপ নয়। বাবা তাকে দুহাজার করে পাঠাচ্ছিলেন। কিন্তু সুনন্দ যেই ইউজিসি স্কলারশিপটা পেতে শুরু করল তখনই সে বাবাকে বলেছিল আর টাকা পাঠাবার দরকার নেই।

এদের প্রত্যেকেরই মানসিক ভারসাম্য বজায় রয়েছে। কিছুদিন আগে সোমকেরই ভুলের জন্য কোম্পানি একটা বড় অর্ডার মিস করল। তার বস ইচ্ছে করলেই এই ব্যাপারটা নিয়ে বেশিদূর না এগুলেই পারত। কিন্তু কোম্পানির কাছে সাধু সাজার জন্য সে এম ডির কাছে রিপোর্ট করে দিল সব দায়ভার সোমকের ওপর চাপিয়ে। এই নিয়ে বোর্ডের মিটিঙে ঝাড়া দুঘণ্টা ধরে আলোচনা। সোমককে একটা ওয়ার্নিং দিল। চোখ ফেটে জল আসার মত অবস্থা। কিন্তু সোমক মনে মনে তার ভুল স্বীকার করে সংশোধনের জন্য তৈরি হল। তার ব্যবহারের মধ্যে তার মনের দুঃখ ধরা পড়ল না। এমনকি, মনটাকে হাল্কা করার জন্য দুদিন ছুটি নিয়ে বউ ছেলেমেয়ের সঙ্গে দীঘা গিয়ে খুব হইচই করে এল।

চন্দ্রানীর সঙ্গে তার দাদা সুমনের একদিন খুব কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। ব্যাপারটা রাত করে বাড়ি ফেরা নিয়ে। ফ্যাশান ডিজাইনার হিসাবে চন্দ্রানীকে প্রায়ই ফ্যাশন শোয়ে যেতে হয়। ফিরতে প্রায়ই রাত হয়। সুমন ও সুমনের বউ নিচের তলায় থাকে। তাদেরই দরজা খুলে দিতে হয়। এই নিয়ে সুমনের বউ গজর গজর করে। একদিন তো বলেই ফেলল। তোমার যখন রাত বিরেতে কাজ, তখন তুমি এবার থেকে একটা ডুপ্লিকেট চাবি কাছে রেখো। প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কিন্তু যেভাবে বলল কথাটা তার মধ্যে যথেষ্ট অপমানকর ইঙ্গিত আছে। চন্দ্রানীর একবার মনে হল দুকথা শুনিয়ে দি। কিন্তু পরক্ষণেই

ভাবল কথায় কথা বাড়ে। সে সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলল, বেশ তো কাল থেকে তাই করব বউদি। কী করবো বলো, চাকরিটাই এমন যে এই পুজোর মুখে ফ্যাশন শো গুলো পড়ে যায়। আর রাত এগারটার আগে শেষ হয় না। পরদিন সত্যি সত্যি চন্দ্রানী একটা ডুপ্লিকেট চাবি করিয়ে নিল।

সুনন্দ নাগ তার এক বন্ধুকে এক হাজার টাকা ধার দিয়েছিল। সেও এক বছর হয়ে গেল। বন্ধুটি দিল্লিতে চাকরি পেয়েছিল। তাব অবস্থা তখন এমন যে দিল্লি যাবার গাড়ি ভাড়াও তার কাছে ছিল না। বলেছিল, প্রথম মাসের মাইনে পেয়েই তোর টাকা শোধ করে দেব।

কিন্তু দিল্লি গিয়ে ইস্তক বন্ধুটি আর চিঠি দেয়নি। এরপর এক বছর পার হয়ে গেছে। সুনন্দ খুব আঘাত পেয়েছিল বন্ধু বিশ্বজিতের এই ব্যবহারে। কলেজ থেকে তারা দুজনে এক সঙ্গে পড়ে আসছে। দুজনে খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। টাকা দেয় না দিক, কিন্তু দিল্লিতে ভারত সরকারের একটা ভাল চাকরি পাবার পর কেমন কাটাচ্ছে তা নিয়ে একটা চিঠিও তো আশা করতে পারে সে। তারপর হঠাৎ একদিন কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে গিয়ে দেখে তাদের এক পুরনো বান্ধবী পিউ এর সঙ্গে বিশ্বজিৎ কফি খাচ্ছে। তাকে দেখে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল সুনন্দ।

আরে বিশু না, তুই এখানে? কবে এলি? আরে পিউ তুই কেমন আছিস?

পিউ একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসল : এই চলে যাচ্ছে।

বিশ্বজিৎ বলল : আমার এখন কলকাতায় পোস্টিং হয়েছে। এসপ্ল্যানেড অফিসে বসি।

কবে এসেছিস?

মাস দুয়েক। তুই ভাল? তোর থিসিস এগুচ্ছে?

চলছে।

কফি খাবি?

বিশ্বজিৎ ও পিউর একান্ত কথায় যদি ব্যাঘাত হয় সেকথা মনে করেই সুনন্দ বলল, না তাড়া আছে। এখানে এক বন্ধুকে খুঁজতে এসেছিলাম। পেলাম না। পরে দেখা হবে।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজের মনে খুব এক চোট হেসে নিল সুনন্দ। মাত্র এক হাজার টাকা যে মেরে দিতে পারে, তাও উপকারী বন্ধুর, তাহলে ভারত সরকারের কত লাখ টাকা মারবে সে সারা জীবনে। এ অঙ্ক কষতে ক্যালকুলেটর লাগবে একটা। বেশ কৌতুক অনুভব-করল সুনন্দ। এই সব ব্যাপারে ভাবপ্রবণ হবার মত সময় নেই তার। সবশেষে ওদের মধ্যে আরও মিল ওদের কারও মধ্যে ধর্ম ও ভাষার গোঁড়ামি নেই। ওরা কেউই মনে করে না ধর্ম নিয়ে বড়াই করার কিছু আছে। ধর্ম হল প্রত্যেকের ভেতরকার ব্যাপার। সব ধর্মের ব্যাপারটা হরে দরে সেই এক। যারা মনে করে একমাত্র আমার ধর্ম আমার ভাষা আমার জাতি দুনিয়া শাসন করবে তারা মানুষের আসল শত্রু।

যাদের কথা বললাম তাদের কারও কোন ব্যাপারে গোঁড়ামি নেই। অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ওরা যে কোন নতুন এক্সপেরিমেন্ট করতে পারে। আসলে নিজের ওপর যদি নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে নিজেকে নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যেতে পারে মানুষ।

ব্যক্তিত্বের কথা বললাম তারা কেউই কোন ছোটগল্পের নায়ক নায়িকা নয়, বাস্তব জগতের মানুষ। আপনি একটু চোখ কান খোলা রাখলেই দেখবেন, সবল ব্যক্তিত্বের মানুষ

ইতিহাস থেকে উঠে আসছে না, আপনার চারপাশেই রয়েছে। সাফল্যের চাবিকাঠি এই সবল ব্যক্তিত্বদের হাতে।

সবল ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পিছনে যেমন জিনের প্রভাব কাজ করে তেমনি কাজ করে পরিবেশ। তবে জিন ও পরিবেশ প্রতিকূল হলেও নেহাত আত্মসচেতনতার জোরে মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে ক্রমাগত বদলাতে পারে। সবল ব্যক্তিত্ব অনেকটা সুনামের মত। অর্জন করা সোজা কিন্তু টিকিয়ে রাখা কঠিন। আপনি সংজ্ঞা মিলিয়ে সুব্যক্তিত্ব তৈরি করলেন কিন্তু দেখা গেল হঠাৎ এমন একটা পরিস্থিতি এল যে ব্যক্তিত্বের আগাগোড়া বদল হল। এটাই ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা। ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে সঙ্গতি (Consistency) থাকলে এটা হয় না। একজন ভাল লোক সবসময়ই ভাল লোক। কিন্তু একজন খারাপ লোক কখনও ভাল, কখনও খারাপ অথবা সব সময় খারাপ।

তবে মনোবিদ ওয়াল্টার মাইকেলের মতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিবেশের বা অবস্থার ওপর মানুষের মেজাজ নির্ভর করে। এটা ব্যক্তিত্বের পক্ষে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু তা বলে ব্যক্তিত্বের সঙ্গতি থাকবে না কেন? চরিত্র মানে তো এই সঙ্গতি।

এতো গেল সবল ব্যক্তিত্বের কথা। তাহলে দুর্বল ব্যক্তিত্ব কাদের বলব? সবল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ যার মধ্যে নেই সেটাই দুর্বল ব্যক্তিত্ব। যেমন গুজগুজে ভাব, লাজুক ভাব, ভাল করে গুছিয়ে কথা বলার অক্ষমতা, কথা বলার মধ্যে অস্পষ্টতা বা জড়তা, অশুদ্ধ উচ্চারণ, কমিউনিকেশন বা জ্ঞাপনের যাবতীয় সমস্যা। চট করে ধরতে না পারা। নিবুর্দ্ধিতা, দুর্বল মেধা, অত্যধিক ভাবপ্রবণতা যেমন সামান্য কারণে চোখে জল আসা, নিষ্ঠুরতা, সংকীর্ণতা, ঈর্ষা, তিরিক্ষি মেজাজ, দীর্ঘসূত্রতা, গদাইলস্কর চালে চলা, কুঁড়েমি, হামবড়া ভাব, অবিনয়, ঔদ্ধত্য, নোংরা পোশাক পরা, শারীরিক অপরিচ্ছন্নতা, মুদ্রা দোষ, কৌতুক বোধের অভাব, ঔৎসুক্যহীনতা, ঔদাসীন্য। অত্যাধিক ভাবাবেগ, কথা দিয়ে কথা না রাখা। নেশার বশ হওয়া, সাধারণ জ্ঞানের অভাব, মূল্যবোধের অভাব ইত্যাদি।

ভারতীয়দের জীবনে দুর্বল ব্যক্তিত্বের আরও কতগুলি দিক আছে কারণ ভারতীয়রা আরও কতগুলি গুণকে সুব্যক্তিত্বের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করে। তার মধ্যে একটি হল শুদ্ধ উচ্চারণে শুদ্ধ ইংরাজিতে ও মাতৃভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, (বিদেশী ডিগ্রি হলে আরও ভাল), স্মার্ট চেহারা ইত্যাদি। ব্যক্তিত্বের মধ্যে কতগুলি আচরণ বা আদব কায়দা মানুষ চেষ্টা করে অর্জন করতে পারে। শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞান চেষ্টা করে আয়ত্ত করা যায়। যে কোন মানুষই বুদ্ধি ও মাথা খাটিয়ে গরিব থেকে বড়লোক হতে পারে। কিন্তু ব্যক্তিত্বের কতগুলি দিক, যেমন মেজাজ, ঈর্ষাপরায়ণতা, অত্যাধিক ভাবপ্রবণতা, অন্তর্মুখীনতা, দীর্ঘসূত্রতা, কুঁড়েমি, উদ্যমের অভাব, অহংকার বা উচ্চম্মন্যতা, অনুদারতা প্রভৃতি মানুষ তার শৈশব পরিবেশের মধ্য দিয়ে শেখে।, শৈশব ও বয়ঃসন্ধির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সবল ও দুর্বল ব্যক্তিত্ব নিজের অজান্তেই তৈরি হয়ে যায় বলে মানুষে মানুষে এত তফাত। কেউ সৎ বা কেউ অসৎ হয়ে জন্মায় না। যদি জিনতত্ত্ব মেনেও নেই, তবু পরিবেশের প্রভাব প্রখর হলেও জিনের প্রভাব চাপা পড়ে যায়। তা নইলে আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্য থেকে এত ব্যক্তিত্বশালী মানুষের জন্ম হত না।

মনোবিদরা বলেন, দুর্বল ব্যক্তিত্বের জন্ম বঞ্চনা বা deprivation থেকে।

মনোবিদ জেরসলিড (Jerslid) বলেন : যে কোন ইমোশোন এর ক্ষেত্রে যে কোন বঞ্চনাই ব্যক্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর। যেমন ভালবাসা ও প্রেমের কথা আগেই বলেছি। ছোটবলায় ও বয়ঃসন্ধির সময় কেউ যদি বাবা মায়ের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তাহলে তার ব্যক্তিত্ব দুর্বল হতে পারে। আবার যৌবনে প্রেম না আসলে জীবনে অপরিপূর্ণতা থেকে যায়। মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্যই আগে বাবা মায়েরা যৌবনে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে দিতেন। এখন বিয়ের বয়স পিছিয়ে গিয়েছে। কিন্তু ভালবাসার চাহিদাতো থেকেই যায়। এই বয়সে প্রেমিক-প্রেমিকা না থাকলে সেটা ভালবাসার বঞ্চনা হয়ে দাঁড়ায়। সে সব ছেলেমেয়েদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যায়, সময়মত বিয়ে হয় না। তারাও জীবনে প্রেম ও কামের বঞ্চনা অনুভব করে। এর ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের ওপর নানা ধরণের বঞ্চনা কীভাবে ঘটে তার কথা আরও কিছু বলা যাক।

ঔৎসুক্যের ক্ষেত্রে বঞ্চনা : আগেই বলেছি ঔৎসুক্য বা জানার ইচ্ছা মানুষের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা দেয়। শিশু যে গল্পের বই পড়ে, কুইজ করে, গানবাজনা শেখে, ছবি আঁকে তা সবই অজানাকে জানার আগ্রহ থেকে। এমনকী সে বাবা মায়ের কাছে অসংখ্য প্রশ্ন করে। কোন কারণে শিশুর এই ঔৎসুক্য যদি বাধা পায় অথবা উৎসহ না পায় তাহলে শিশু নিজেকে বঞ্চিত মনে করে।

অনেক ক্ষেত্রে ছেলে বা মেয়ে ছবি আঁকতে ভালবাসে কিন্তু বাবা মা পারতপক্ষে চান না ছেলে বা মেয়ে শিল্পী হোক। তাকে সাধারণ লাইনে পড়াতে চান। কিন্তু বড় হয়ে তার মনে সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা থেকেই যায়। আজকাল এটা হামেশাই হচ্ছে। ছেলে বা মেয়ের ঝোঁক হিউম্যানিটিজের ওপর, তাকে জোর করে বিজ্ঞানে ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে বঞ্চনা— মনোভাবের সৃষ্টি হচ্ছে। এই বঞ্চনার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনে দেখা দেয় ক্রোধ এবং সেই ক্রোধ শেষ পর্যন্ত নরম টার্গেটগুলির ওপর গিয়ে পড়ে। বাড়িতে বাবা-মা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অথরিটি তথা অধ্যক্ষ, উপাচার্য এরা সব সময় নরম টার্গেট।

কর্মজীবনে অসন্তুষ্টির কারণ অধিকাংশেরই জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কর্মজীবনটা মেলে না। এ সম্পর্কে একজনের অভিজ্ঞতার কথা শুনুন।

আমি যখন একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করতাম তখন আমার এক সহকারী প্রায়ই দেরি করে অফিসে আসত। তার ওপর তার কাজ শেখার কোন আগ্রহ ছিল না। একদিন তাকে বললাম, এই চিঠির কপিগুলি তুমি কাল অমুক অফিসারকে নিজের হাতে দিয়ে দেবে কারণ আমি কাল আসব না। সে আমার মুখের ওপর বলল : স্যর। আমি আপনার স্টেনো। এটা আমার কাজ নয় বেয়ারার কাজ। আমি আর তাকে জোর করিনি। পরে অবস্থা থিতিয়ে গেলে একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম: আচ্ছা তোমার কাজে মন নেই কেন? সে বলল : স্যার, কী হবে কাজ করে? আমাদের চাকরিতে কোন উন্নতি নেই। একবার স্টেনো মানে সারা জীবন স্টেনো।

আমি বুঝলাম তার জব স্যাটিসফ্যাকশন নেই। স্টেনো ও কেরানিরা চায় অফিসারের মর্যাদা। কিন্তু সবাইতো উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপযোগী যোগ্য হয়ে ওঠে না। যে যা হাতে পায় সে চাকরি নিয়ে নেয়। পরে হতাশায় ভোগে। এবং পরিণামে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব জন্মে যায়। সে প্রথাবিরোধী ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। একদা আমরা একদল ছাত্রছাত্রীকে নিয়ে একজায়গায় এক্সকারসানে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যার পর রোজ ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্লাস

করতাম। ছেলেমেয়েদের বললাম। তোমরা কে কী হতে চেয়েছিলে। তোমাদের কী স্বপ্ন ছিল সেটা প্রত্যেকে নিজের মত করে বলো।

আমি দেখলাম প্রায় অর্ধেকেই জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়র হতে চেয়েছিল। কিন্তু কেউই জয়েন্ট এন্ট্রান্সে চান্স পায়নি। তখন অগতির গতি মাসুকমিউনিকেশন পড়তে এসেছে। দেখলাম যারা প্রথম থেকে কেরিয়র বেছে নিয়েছিল তাদের মধ্যে কোন হতাশা নেই। তাদের ব্যবহারে স্বাভাবিকতা আছে। কিন্তু যারা ডাক্তার হতে চেয়েছিল এবং হতে না পেরে এই বিভাগে এসেছে তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে নানা প্রথাবিরোধী মনোভাব রয়েছে।

শৈশব ও বয়ঃসন্ধির সময়কার বঞ্চনা মনেব অগোচরে ব্যক্তিত্বেব ওপর কতখানি ছাপ ফেলে যায় সে সম্পর্কে আমি আমার নিজের ব্যক্তিত্বের একটা ত্রুটির কথা বলি এবং এই ত্রুটিগুলি ঢাকার জন্য কী ব্যবস্থা নিয়েছি সে কথাও বলি।

ছোটবেলায় আমি খুব মর্বিড পরিবেশের মধ্যে মানুষ হয়েছি। আগেই বলেছি। এর সঙ্গে ছিল চরম দারিদ্র্য। আমি হতাশ হইনি প্রথম খণ্ডে আমার শৈশবের স্বপ্নও যন্ত্রণার কথা লিখেছি তাই সেকথা লিখলাম না। আমি স্কুল ও কলেজে ইংরাজি ও অঙ্কে খুব কাঁচা ছিলাম। তাই সব সময় মনে হত আমি পরীক্ষায় ফেল করে যাবো। তাছাড়া আমার খুব ইচ্ছা করত আমি ওই রুগ্ণ পরিবেশ থেকে পালিয়ে কলকাতায় কোন হস্টেলে থেকে পড়ি। কিন্তু আমায় কে পড়াবে? একবার আমার এক আত্মীয় হাওড়া শিবপুরে তাঁদের বাড়িতে রেখে আমায় পড়াতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে তিনি এই প্রস্তাব বাতিল করে দেন। ততক্ষণে আমি হাওড়ায় যাবার জন্য মানসিকভাবে তৈরি ছিলাম।

তারপর অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে আমি জীবনে আমার সাধ্যমত প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছি। কিন্তু তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। কিন্তু শৈশবের কতগুলি deprivation বা বঞ্চনা আমার ব্যক্তিত্বের ওপর কতগুলি স্থায়ী প্রভাব ফেলেছে। প্রভাবগুলি এই : আমার ব্যক্তিত্বের মধ্যে anxiety cyndrom বা উদ্বেগ লক্ষণ গড়ে উঠেছে। যেমন কোথাও যেতে গেলে মনে হয় আমি নির্ঘাৎ ট্রেন বা প্লেন ফেল করব। সেজন্য আমি সব সময় স্টেশনে বা এয়ারপোর্টে এক ঘণ্টা বা দুঘণ্টা আগেও পৌঁছই। আমি ট্রেনে উঠলে কখনও মাঝস্টেশনে নামি না, কারণ আমার মনে হয় আমাকে ফেলে রেখে এই বুঝি ট্রেন ছেড়ে দেবে।

আমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখি আমি পরীক্ষা দিচ্ছি। ঘণ্টা পড়ে যাচ্ছে অথচ আমি কিছুই লিখতে পারছি না। অথবা বিদেশ এসেছি অথচ পাসপোর্ট ফেলে এসেছি।

আমার প্রায়ই মনে হয় আমি বুঝি আবার আগের মত গরিব হয়ে যাবো। গরিব থাকা যে কী গ্লানিকর জীবন সে একমাত্র গরিবের ছেলেমেয়েরাই জানে। আমার স্কুলে আমার মত গরিবরা কেউ পড়া শেষ করতে পারেনি। স্কুলেই ড্রপ আউট হয়েছে। একমাত্র তাদের মধ্যে আমিই স্কুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ দরজাটিও সম্মানের সঙ্গে ডিঙোতে পেরেছি।

আমার ব্যক্তিত্বের আরও ক্ষতি হতে পারত, কিন্তু হয়নি তার কারণ আমি আমার ক্ষমতার অতীত কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে মনে স্থান দিই নি। আমি ছাত্রজীবনে কিছুটা রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম। সে সময় মনে হত আমি রাজনীতি করবো, মন্ত্রী হবো। কিন্তু পরে ভেবে দেখলাম আমি হিন্দি বলতে পারি না। ইংরেজি বলতে পারি না, তদুপরি আমায় এখনই চাকরি করে পরিবার প্রতিপালন করতে হবে আমি রাজনীতি

করলে ক্যাডার হয়ে থাকব, নেতা হতে পারব না।

১৯৬১ সালে আনন্দবাজারে চাকরি পেলাম। সন্তোষকুমার ঘোষ বললেন, তুমি বিলেত থেকে সাংবাদিকতায় ট্রেনিং নিয়ে এসেছ, তুমি হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে জয়েন করো। ইংরেজি কাগজে কাজ করলে স্কোপ অনেক বেশি। কিন্তু আমার ইংরেজি তখনও ইংরেজি খবরের কাগজে কাজ করার মত সড়োগড়ো হয়নি কিন্তু কাজ চালিয়ে দিতে পারতাম। তবু তাঁর প্রস্তাবে রাজি হইনি। সারাজীবন বাংলা সাংবাদিকতায় থেকেছি। তবে সারাজীবন ধরে চেষ্টা করে গিয়েছি ইংরেজি বলতে ও লিখতে শেখার। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে ইংরেজিতে কাঁচা। কিন্তু তারা কাঁচাই থেকে যায়। ছাত্রজীবনের পর আর ইংরেজির চর্চা করে না। কিন্তু আমি চল্লিশ বছর ধরে প্রায় প্রতিদিনই সক্রিয় ভাবে ইংরেজি চর্চা করে এসেছি। সাহিত্য নয়, শুধু ভাষার বিভিন্ন ধরনের প্রয়োগের দিকটি।

এইভাবে শৈশব ও কৈশোরের বঞ্চনাকে সচেতনভাবে পরবর্তী জীবনে কাটিয়ে ওঠা যায়। ছাত্রজীবনে নানা কারণে অনেকের শিক্ষায় অসম্পূর্ণতা থেকে যায়। কিন্তু সেই অসম্পূর্ণতাকে যদি আমরা ব্যর্থতা মনে করে সারাজীবন হাহুতাশ করে কাটাই তাহলে আমরা প্রত্যেকে রুগ্‌ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হবো। নিজেদের বঞ্চিত বলে ভাবব। এর ফলে ব্যক্তিত্বের মধ্যে শারীরিক, সামাজিক ও ভাবগত নানা সংঘাত দেখা দিতে পারে। যেমন কেউ রোগা হয়ে যেতে পারে, অস্থির ও চঞ্চল হয়ে উঠতে পারে, চুপচাপ হয়ে যেতে পারে, ঔদাসীন্য বা ঔদ্ধত্য দেখা দিতে পারে। এছাড়া নানা সাইকোসোমাটিক অসুখ দেখা দিতে পারে।

ব্যক্তিত্বের মধ্যে বঞ্চনার অনুভব থাকলে সামাজিক মেলা-মেশায় বাধোবাধো ভাব থাকতে পারে। সে মানুষ তখন আর কারও সঙ্গে সহযোগিতা করতে চায় না। সকলের প্রতি সে বিরূপ হয়ে ওঠে। কারও দুঃখ আর তাকে নাড়া দেয় না। সে তখন আর আনন্দ করতে পারে না। উদ্বেগ, বদমেজাজ, নিরাপত্তার অভাব সব সময় তাকে ঘিরে থাকে। বাঙালি যে ব্যবসামুখী নয় তার কারণ তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিরাপত্তার অভাব আছে, আর তার মধ্যে ঝুঁকি নেবার প্রবণতা কম। এটা হয়েছে তার সামাজিক পরিবেশ তাকে ছোটবেলা থেকে শেখায় চাকরি করতে। ব্যবসায়ী হবার স্বপ্ন তাকে দেখানো হয়না। বড় হয়ে সে চাকরিই খোঁজে। চাকরি না পেলে বাধ্য হয় ব্যবসা করতে। এমনও হয়েছে। চাকরি নেই বলে তাকে মূলধনী ঋণ দিয়ে সমাজ বাধ্য করছে ব্যবসায়ী হবার জন্য। কিন্তু সে তো মনে প্রাণে ব্যবসায়ী হতে চায় না। কারণ তার মানসিকতা ঝুঁকি না নেবার। ব্যবসা মানেই ঝুঁকি। এই মানসিকতা থেকে উত্তীর্ণ না হতে পারলে ব্যবসাকে সে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারে না। এইভাবে বহু বাঙালি তরুণ ব্যবসায়ে ব্যর্থ হয়েছে।

এলিজাবেথ হারলক বলছেন :

The older child or adolescent may push himself in intellectual and scholastic pursuits to gain acceptance by parents and teachers, or he may be so disturbed that he is unable to function and thus appears to be retarded. He may experience physical complaint which interfere with health and growth or he may develop nervous mannarisms especially speech

disorders. As he grows older, he may turn to delinquency as a substitute for emotional satisfaction.

মনের চাহিদার অভাব না মেটার ফলে যে ভাবগত বঞ্চনাবোধের (emotional deprivation) উৎপত্তি হয় সেটা চাপা দিয়ে বাবা মায়ের স্বীকৃতি পাবার জন্য বয়ঃসন্ধিকালে ছেলে মেয়েরা অনেকেই স্কুলের পড়াশোনায় মন দেয়।

আর যারা সেটা না পারে তারা এত বিপন্ন হয়ে পড়ে যে তারা স্বাভাবিক কাজকর্মে মন দিতে পারে না এবং মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। তার শরীরে নানা অসুখ দেখা দিতে পারে। অনেক সময় তার দেহ মনের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। অনেক সময় স্নায়ুরোগ দেখা দিতে পারে। যতই সে বড় হতে থাকে ততই সে অবাধ্যতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কারণ তার ব্যক্তিত্ব তখন মানসিক সন্তুষ্টির জন্য বিকল্প পথ খোঁজে।

তাহলে ভাবাবেগের প্রাবল্য থেকে নিজেকে বাঁচাবার উপায় কী? স্বাভাবিক অথবা সবল ব্যক্তিত্ব আমরা কীভাবে অর্জন করবো? আমাদের সবার মধ্যেই তো কিছু না কিছু বঞ্চনাবোধ রয়েছে।

একটা উপায় তো আমি যেভাবে বঞ্চনাবোধকে প্রতিরোধ করেছি সে কথা বলেছি। উপেক্ষা করে এবং নিজেকে সৃজনকর্মে নিয়োগ করে। আমি লেখালেখি করি। আর কিছুদিনের মধ্যে সম্পূর্ণভাবেই লেখালেখি নিয়ে থাকব। বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে চিঠি লেখেন। আমার অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করি। তাছাড়া আমি গল্প উপন্যাস প্রবন্ধও লিখি। আবার কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আপনিতো এত বছর ধরে লিখে তেমন নাম করতে পারেননি। আপনি কোন বড় ধরনের পুরস্কার পাননি। আপনার বই বিক্রি হয়, কিন্তু তাতে কী হল, আপনি তো আর সাহিত্যের রথীমহারথীদের কাছে কোন কল্কে পেলেন না। আপনার মধ্যে এজন্য কী বঞ্চনা বোধ নেই? বড় কঠিন প্রশ্ন। বঞ্চনাবোধ নেই তা বলি কী করে। আমার যে কখনও কখনও এ নিয়ে ইমোশান হয় না তা বলব না। কিন্তু সেটাকে আমি যুক্তি দিয়ে এইভাবে প্রশমিত করি।

১. আমার কাজ লিখে যাওয়া। এই লেখার আনন্দতেই লিখি। লেখা এক গুরুতর পরিশ্রমের কাজ। আমি সে কাজটা করে আনন্দ পাই বলেই আমি লিখি।

২. আমার লেখার প্রকাশকের অভাব নেই এবং এই যুগে যেখানে বই পড়ার রেওয়াজ কমে আসছে সেখানে আমার বই প্রকাশ করে কোন প্রকাশক ডাহা লোকসান খান না। এটাই আমার আত্মতৃপ্তি।

৩. পাঠকরা যে আমার লেখা পছন্দ করেন তার অজস্র প্রমাণ যে আমি এ পর্যন্ত তাঁদের লেখা প্রায় হাজার খানেক চিঠি পেয়েছি। প্রায়ই তাঁরা আমাকে অভিনন্দিত করে চিঠি লেখেন।

৪. যাঁরা ঈর্ষাপ্রসূত হয়ে আমার অগ্রগতি রোধ করতে চান তাঁরা শক্তিশালী। তাঁদের প্রতি ক্ষোভ থাকলেও আমি তাঁদের করুণা করি। কারণ ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তিত্বকে করুণা করা ছাড়া আর কিছুই থাকে না।

৫. আমি কৃতনিশ্চয় আমার কাজটা আমি আন্তরিকতার সঙ্গে করছি।

এইসব কথা যখন ভাবি তখন আমি ভীষণ নৈতিক বল সঞ্চয় করি। আমাকে খুব কম লোকই সাহায্য করেছেন, বিরোধিতা করে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন

বহুলোক। কিন্তু আমার শত্রুদের আমি ঘৃণা করি না। আমি আমার একটি বই শত্রুদের উৎসর্গ করেছি। এটা আমার উদারতা নয়, বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি। এর ফলে আমার মনে আর কোন নেতিবাচক ভাবাবেগ প্রশ্রয় পায় না। আমি দুঃখ পাই, কিন্তু ক্ষণিকের দুঃখ। তাই যে কোন সাধারণ মানুষ আমারই প্রক্রিয়ায় তাঁদের ভাবাবেগকে সংহত করতে পারেন। অবদমন নয়, তাতে শরীর ও মনের ক্ষতি হয়। যেটা দরকার সেটি হল যুক্তিসিদ্ধকরণ (rationalisation) ও মহত্তীকরণ (sublimation)।

যুক্তি দিয়ে নেতিবাচক ইমোশানকে রুখতে হবে। ভাবতে হবে আমি হা হুতাশ করে বসে থাকলে আমার ক্ষতি। আমি ছেড়ে দিলে আমার লোকসান। আমি আত্মহত্যা করলে কারও কিছু এসে যাবে না। আমার বেঁচে থাকাটা আমার জন্যই দরকার। আমার কিছু করাটা আমার জন্যই প্রয়োজন। প্রতিটি মানুষ তার প্রবৃত্তির তাড়নায় ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটায়। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ক বাবু লোভ নামক প্রবৃত্তির তাডনায় ঘুষ খান, খ বাবু ঈর্ষা নামক প্রবৃত্তির তাড়নায় আমার যাতে ভাল হয় এমন কিছু করেন না। আমি প্রায়ই শুনি কোন কোন লোক অন্যের কাছে আমার নামে গালমন্দ করছেন। অথচ আমি তাঁদের চিনিই না। কিন্তু আমি কী করব। আমি কী তার পিছনে গুণ্ডা লেলিয়ে দেব? তাতে আমার কী লাভ হবে? উলটে হ্যাপা সামলাতে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তার চেয়ে আমি আরও ভাল লেখার চেষ্টা করব। আরও পাঁচটা বই পড়ে জ্ঞান বাড়াবো। একটা দরজা বন্ধ হলে আর একটা দরজা খোলার চেষ্টা করবো। কারণ আমাকে লিখতেই হবে। আমার লেখা প্রকাশ করতেই হবে। গ্রামে আমার সমাদর না হলে জেলায় যেতে হবে। জেলায় সমাদর না হলে রাজ্যে যেতে হবে। সেখানে সমাদর না হলে অন্যরাজ্যে যেতে হবে। তা না হলে বিদেশে। বহু ব্যক্তি এদেশে তেমন স্বীকৃতি পাননি। কিন্তু বিদেশে গিয়ে তাঁদের ব্যক্তিত্বের উল্লেখযোগ্য প্রসার হয়েছে।

আমার কলেজ জীবনের অনুজপ্রতিম বন্ধু ডঃ অমিয় মুখার্জি ভারতে একটি মফঃস্বল কলেজের ডেমোনসট্রেটরের চাকরি ছাড়া আর কিছুই জোটাতে পারেনি। সত্তরের দশকে সে ইংলন্ড চলে যায়। আজ সে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন একজন বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ। সারা পৃথিবী সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক ব্যক্তিত্ব।

আমার প্রসন্ন থাকা, সুখে দুঃখে অবিচলিত থাকা, ছোট-খাটো অপমানকে হেসে উড়িয়ে দেওয়া আমার শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্যই দরকার। ব্যক্তিত্বকে এইভাবে তৈরি করতে গেলে স্পর্শকাতর হলে চলে না। এ সম্পর্কে এলিজাবেথ হারলকের মন্তব্য শুনুন:

স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিত্বের অর্থ ইমোশনকে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করা; একেবারে চেপে রাখা নয়।

এই ব্যাখ্যা আমি জানি না। ইমোশানকে সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করা মানে প্রতিক্রিয়ার আতিশয্য। দুঃখে অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। রাগে লোকে চিৎকার চেঁচামেচি করে। রাগ ও অপমানের ফলে আমি একটি ছেলের মধ্যে ভাবাবেগের যে আতিশয্য দেখেছিলাম তাতে করে আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়। একবার এক লেকচারের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস বয়কট করে। ওই লেকচারার ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক ভাল কাজ করেছিলেন। অন্তত তাঁর আন্তরিকতার অভাব ছিল না। ক্লাস বয়কটের ফলে তিনি মনে দুঃখ পান।

তিনি ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের মিটিং ডাকেন। সেখানে খুব আবেগপ্রবণ হয়ে তিনি ছাত্রদের ভর্ৎসনা করতে থাকেন। সামনের বেঞ্চের একটি ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলতে থাকেন, তোমাকে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে হবে কী অভিযোগ তোমার আমার বিরুদ্ধে? বারবার মানসিক চাপ সৃষ্টি করায় ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে প্রথমে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর কান্নার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল। ঠিক মৃগী রোগের লক্ষণ ফুটে উঠল ওর সারা দেহে। ছেলেটি এরপব জ্ঞান হারাল। তখন ডাক্তার ডাকতে ছুটল ছেলেরা।

আর একবার একটি ছেলের মধ্যে ধারণা হল তার পড়াশোনার প্রতিদ্বন্দ্বী আর একটি ছেলেকে আমি বেশি সুযোগ দিচ্ছি। ছাত্রজীবনে এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বোধ অনেকের মধ্যে জাগে। এখানেও ঈর্ষা প্রবৃত্তি। কিন্তু ইমোশনের বহিঃপ্রকাশেব ক্ষেত্র রাগ। কথায় কথায় ছেলেটি এত রেগে গেল যে আমার টেবলের ওপর সজোরে একটা ঘুসি মেরে বসল। তারপর ক্লাসে গিয়ে কাঁদতে লাগল ও পাগলের মত আচরণ করতে লাগল। এখানে দেখুন দুর্বল ব্যক্তিত্ব, প্রবৃত্তি ও ইমোশনের সামাল দিতে পারছে না। স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব হলে কখনই একজন অধ্যক্ষের কাছে কোন ছাত্র এইরকম ভাবে ক্রোধে হিতাহিত শূন্য হয়ে গলা চড়িয়ে কথা বলবে না ও টেবলের ওপর ও ভাবে ঘুঁসি মারবে না।

ইমোশানের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হয় সংযত আচরণ দিয়ে। প্রথমে সেটা অবদমনের পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর তাকে যুক্তি দিয়ে যুক্তিসিদ্ধকরণ করতে হয়। সবশেষে ভেবে চিন্তে একটা জীবন দর্শন গড়ে তুলতে হয়, যা দিয়ে আমরা বাইরের দুঃখ কষ্ট যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করতে পারি একে বলি সাবলিমেশন। মহতীকরণ এই Sublimation এর উদাহরণ দিচ্ছি। আমাদের দেশে বিভিন্ন সম্মেলনে বা সভাসমিতিতে অতিথি হয়ে যাওয়ার যাদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা জানেন, এসব ক্ষেত্রে মিস ম্যানেজমেন্টের চূড়ান্ত হয়। আমি খুব কম সম্মেলনেই দেখেছি আমন্ত্রিত অতিথিদের থাকার জায়গার ও যাতায়াতের ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এ নিয়ে নামী লেখকরাও উদ্যোক্তাদের ওপর চোটপাট করেন। কারণ ভি আই পি-রা আরাম পেতে পেতে এমন অভ্যস্ত যে সামান্য ত্রুটিও তাঁদের ক্রোধ উদ্রেকের ব্যাপারে উদ্দীপকের কাজ করবে। একারণে পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মত মানুষও ব্রেকফাস্ট টেবিলে মনোমত খানা না পেলে আর্দালি বেয়ারাদের ওপর হম্বিতম্বি করতেন। আশির দশকে দিল্লিতে এক বাঙালি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বাড়ি এক পাচক ছিল। মাংসে নুন বেশি হয়ে গিয়েছিল বলে ওই মন্ত্রী রাত দুপুরে মারতে মারতে পাচককে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। ওই পাচকের ভাই আমার চেনা। তার মুখ থেকেই ওই কাহিনী শোনা।

একবার ধুবড়ি বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে আমার এক বিখ্যাত কবি বন্ধু (তিনি বর্তমানে প্রয়াত বলে তার নাম লিখলাম না) তাঁর থাকার জায়গা পেতে দেরি হচ্ছিল বলে চিৎকার চেঁচামেচি করে সিনক্রিয়েট করলেন। আমি তো খুব অপ্রস্তুত কারণ আমি তাঁকে আমন্ত্রণ করে ওখানে নিয়ে গেছি। শেষ পর্যন্ত তিনি একটি ভাল হোটেলে জায়গা পেলেন। সবাইকে পছন্দ সই জায়গা দেওয়ার পর আমার স্থান হল এক নিকৃষ্ট হোটেলে। কিন্তু আমি ভেতরে ভেতরে ক্রুদ্ধ হলেও বাইরে রাগ প্রকাশ করিনি। শেষে র‍্যাশনালাইজেশন করার একটা সুযোগ হয়ে গেল। ওই কবির পথে এক ভক্ত জুটে গিয়েছির। ভক্তও কবির সঙ্গে পাশের ঘরে জায়গা করে নিল। তারপরের দিন কবির দামী ক্যামেরাটা ঘর থেকে উধাও। কবির সন্দেহ ওই ভক্তের কাজ এটা। আমি মনে মনে ভাবলাম। ভাগ্যিস, আমি ওই ভাল হোটেলে

জায়গা পাইনি। তাহলে আমারও কিছু না কিছু চলে যেতে পারত।

একবার গোয়ালিয়ারে এক সম্মেলনে গিয়ে দেখি সেই একই অব্যবস্থা। কিন্তু পশ্চিম-বঙ্গের এক সাহিত্যিক আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। তিনিও অব্যবস্থার শিকার। কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন উত্তাপ নেই। হাসিমুখে তিনি সব কিছু উপভোগ করছেন।

আমি সমীরণ দত্তগুপ্ত নামে এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেট ভদ্রলোককে চল্লিশ বছর ধরে চিনি। মাঝে মাঝে নানা দরকারে তার কাছে যাই। তিনি একজন ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। গীতা পুরাণ, ভাগবত তাঁর কণ্ঠস্থ। একদিন শুনলাম তিনি গয়ায় গিয়ে একটা জায়গায় পড়ে যান। কোমরের হাড় ভেঙে যায়। কলকাতায় নিয়ে এসে তাঁকে পায়ে ট্রাকসন দিয়ে রাখা হয়। খুবই অস্বস্তিকর এবং যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা। কিন্তু ৭৬ বছরের সমীরণ বাবুর মুখে বিরক্তির চিহ্ন নেই। তিনি হাসতে হাসতে বলছেন। বেশ আছি। এ এক অভিজ্ঞতা।

ইমোশনকে এইভাবে সাবলিমেট করাটাই হল ভাল থাকার বড় উপায়। বিরূপ ও প্রতিকূল অবস্থায় পড়লে ইমোশান প্রকাশ করা সমস্যা সমাধানের উপায় নয়। আবার চেপে যাওয়াটাও সমাধান নয়। সর্বোত্তম পথ সাবলিমেশন, অর্থাৎ উড়িয়ে দেওয়া। কিস্যু হয়নি। অথবা সবটাই মজা। সবটাই অভিজ্ঞতা। ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্য। গীতার কথা : যা হচ্ছে তা ভালর জন্যই হচ্ছে।

সাবলিমেট করার আর একটা উপায় হল, বিশ্বাস। ভগবানে বিশ্বাস রাখতে পারলে সবচেয়ে ভাল। কারণ ঈশ্বর বিশ্বাসীরা মনে করেন, ঈশ্বর মঙ্গলময়। আল্লাহ্ পরম কারুনিক। God is good. তা না মানলেও একটা অবাঙমানস গোচর কোন সত্তায় বিশ্বাস করা যায়। তিনি সব কিছুর নিয়ন্তা। আমি কী করে সব কিছু সাবলিমেট করি তার পদ্ধতি বলি। আমাকে কেউ প্রচণ্ড অপমান করলে (প্রায়ই করে থাকে) আমি তাকে ঘুঁসি মারি না (মারতে ইচ্ছে করে)। আমি চুপ করে তখন অন্য কিছু ভাবতে থাকি। মনটাকে দ্রুত সরিয়ে নি। যেটুকু কানে আসে মনে দুঃখ পাবার পক্ষে তা যথেষ্ট। আমি সেই রাত্তিরটা গান শুনে সিনেমা দেখে, বই পড়ে, কাটাই। তারপর এক ঘুম দিলে আগের দিনের কথা আর মনে থাকে না।

অথবা কেউ কড়াভাষায় চিঠি লিখলে বা চিঠিতে অপমান করলে চিঠিটা আমি সঙ্গে সঙ্গে ছিঁড়ে ফেলি। অথবা তাড়াতাড়ি এর একটা যুৎসই জবাব লিখে ফেলি। কিন্তু চিঠিটা আর পোস্ট করি না। ওই উত্তরটা লেখার সঙ্গে সঙ্গে রাগটা পড়ে আসে। আমি জীবনে যত আঘাত পেয়েছি প্রতিটি ক্ষেত্রে তার প্রত্যাঘাত করতে গেলে আমাকে এই নিয়েই থাকতে হত। আমি আর অন্য কাজ করতে পারতাম না। যদি কোন ইমোশানে আপনি ভেঙে পড়েন তাহলে এমন চিঠি লিখুন যে চিঠি কোনদিনই ডাকে দেবেন না। কিন্তু তাতে আপনার ভাবাবেগ প্রশমিত হবে। অথবা শুধু ডায়রি লিখুন। প্রিয়জনের শোকে চোখে যদি জল আসে, চিৎকার করে কাঁদুন। হিপোক্রিটিস বলেছেন জমে থাকা ভাবাবেগকে সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিতে হবে। যেমন স্টিম ইঞ্জিন থেকে অতিরিক্ত স্টিম বার করে দেওয়া হয়। প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে ড্যামগুলি পূর্ণ হয়ে গেলে জল ছেড়ে দেওয়ার নিয়ম। তাতে যদি গ্রাম প্লাবিত হয় হোক। কিন্তু জলের চাপ সহ্য করতে না পেরে ড্যাম ফেটে গেলে সারা রাজ্য প্লাবিত হয়ে যেতে পারে।

হিপোক্র্যাটিস এজন্য বলছেন : নিয়মিত ব্যায়াম করুন, স্টিম বাথ নিন।

এই সঙ্গে আমার বক্তব্য : যোগ ব্যায়াম ও ধ্যান করুন।

খাদ্যাভ্যাস বদলান। কামোত্তেজক খাদ্য পরিহার করুন। বিশেষ করে যে সব পুরুষ বা নারী একা থাকেন, তাদের কায়িক পরিশ্রম করা দরকার।

হিপোক্রিটিস যে 'ক্যাথারসিস এর কথা বলেছেন সেটি দুভাবে করা যায়। দেহের দিক থেকে ও মনের দিক থেকে। ডাক্তাররা বলেন, ভাবনা চিন্তা থেকে মনকে মুক্ত রাখার একটা উপায় হল, কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখা। ফাইবার বিশিষ্ট খাদ্য খাওয়া, বেশি করে সবুজ আনাজ-পাতি খাওয়া। ব্যায়াম করা আর প্রচুর জল খাওয়া। পশ্চিমের মনোবিদরা বলেন, মনকে তাজা রাখার উপায় হল ছটা। ১. কাজকর্ম না হয় খেলাধূলা অথবা কাজ ও ব্যায়াম চর্চা। ২. হাসা। কথায় কথায় হো হো হো করে হাসুন। আজকাল লোকের এমনিতে হাসি হাসে না তাই লাফিং ক্লাব হয়েছে। এমনিতে হাসি না আসে লাফিং ক্লাবে ভর্তি হন। অথবা টিভিতে হাসির দৃশ্য দেখে খুব জোরে জোরে হাসার অভ্যাস করুন। ৩. কাঁদুন। না অবাক হবেন না, কান্না পেলে কাঁদবেন। ছিঁচকাদুনে হবার দরকার নেই। নিজের শোক দুঃখে ছাড়াও অপরের জন্যও কাঁদতে শিখুন।

৪. যদি বিবাহিত হন তাহলে যেন স্ত্রী সঙ্গমটি নিয়মিত হয় এবং সেটা যেন দুজনকেই সমান আনন্দ দেয়। বিবাহিত দম্পতির মধ্যে নিয়মিত রতিক্রিয়া সুস্থ আনন্দময় জীবনের জন্যই দরকার। অথচ জীবনের এই অপরিহার্য এবং গুরুত্বপূর্ণ দিকটি নিয়ে আমাদের দেশে ঢাকঢাক গুড়গুড়ের অন্ত নেই। যেটা অশোভন অসঙ্গত এবং মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর সেটি হল প্রাকবিবাহ ও বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলন। না, আমি পিউরিটান বা গোঁড়া নীতি বাদী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে একথা বলছি না। বলছি সমাজতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে।

মানসিক ক্যাথারসিসের কথা আগেই বলেছি। আগেই বলেছি ; মনের কথা মনের ভেতর চেপে রাখবেন না। অন্তরঙ্গ বন্ধুকে বা কোন হিতৈষীর সঙ্গে আলোচনা করুন। তবে খবরদার যাকে তাকে দুঃখের কথা শোনাতে যাবেন না। লোকে বলবে কাঁদুনি গাইতে এসেছে। যারা সবাইকে ডেকে নিজেদের দুঃখের কথা বলে বুঝতে হবে তাদের ব্যক্তিত্ব অপরিণত। সাধারণত অত্যধিক স্ট্রেসের ফলে অনেক উচ্চশিক্ষিত বিচক্ষণ মানুষও এমন নার্ভাস হয়ে পড়েন।

আর কিছু না পারেন একটি কবিতা লিখুন।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব তাদেরই বলা যায়, সমাজ যাদের খুব আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। যারা তাদের পরিচিত মহলে শুধু ব্যক্তিত্বের জোরেই জনপ্রিয়। সব সময় যাদের কাছে মানুষ আসছে। আর যার বাড়িতে কেউ আসে না, যার বন্ধু-বান্ধব নেই, বন্ধুচক্র নেই, যার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে কেউ আগ্রহী নয়, তাকে বিকর্ষক ব্যক্তিত্ব বলা যায়।

প্রত্যেক দেশেই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের তালিকায় থাকেন চিত্রতারকারা। এঁদের দেখতে ভিড় হয়। এদের অটোগ্রাফ নেবার জন্য লোকে পাগল হয়ে যায়। অথচ এঁরা ব্যক্তিগত ভাবে কারও যে উপকার করেছেন তাও না। এদের ব্যক্তিগত চরিত্র যে অনুকরণীয় তাও বলা যায় না। তবু লোকে তাদের জন্য পাগল। এঁদের ঠিক পরের ধাপেই আছেন রাজনৈতিক

নেতারা। তারপর খেলোয়াড়রা, তারপর জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী ও জনপ্রিয় লেখকেরা।

আবার এসবের বাইরে, সাধারণ মানুষের মধ্যেও জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব আছে। পাড়ার হাবুলদাকে সবাই পছন্দ করে। অফিসের সহকর্মীদের মধ্যে একজন সবার প্রিয় হয়ে যায়। কাজের বাড়ির ভিড়ে কোন পুরুষ ও মহিলাকে দেখবেন সবাই ডাকাডাকি করছে। আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বই জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। এই জনপ্রিয়তার কোন সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়না। চেহারা, বিত্ত, বিদ্যা উচ্চাবণ, চরিত্র বল, সুব্যক্তিত্বের যত লক্ষণ আছে তার সব কটি জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের নাও থাকতে পারে। তবে তাঁদের ব্যক্তিত্ব গুণ নির্ভর। একটা দিকে সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে হয় আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বকে। অথবা এমন একটা ভাবমূর্তির সৃষ্টি করতে হয় জনমানসে, যা জীবনের চেয়ে বড় : larger than life অথবা জনসাধারণের সুপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছার পূরণ করে থাকে আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব মাপা হয় অনুরাগীর সংখ্যা দিয়ে। তাঁরা যেখানে যান লোকে তাদের আসুন আসুন করে। অথচ এর পিছনে কোন স্বার্থ নেই। এমনকী জনপ্রিয় বা আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের যে সব সময় গ্ল্যামার থাকবে তার কোন মানে নেই। অমিতাভ বচ্চন বা হৃত্বিক রোশনের গ্ল্যামার আছে কিন্তু জগৎ মোহিনী বালিকা বিদ্যালয়ের মিনতি দিদিমনি ছাত্রী ও শিক্ষিকা সবার মধ্যে এত জনপ্রিয় কেন? অথবা বসন্ত চৌধুরী সুন্দর অভিনয় করতেন। তাঁর পুরুষালি চেহারা ছিল। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন তবু তিনি উত্তমকুমার হতে পারেননি কেন? এর উলটোটাও আছে, যাদের সঙ্গ কেউ চায় না। যাদের সঙ্গে কেউ মেশে না। তারাও সবার সঙ্গে মিশতে চায় না। এরা যে বাজে লোক তা নয়। বরং এদের মধ্যে অনেক ভাল লোক আছে। কিন্তু তবু এরা নিঃসঙ্গ। এদের বলা হয় সমাজ বিচ্ছিন্ন বা Social isolate আকর্ষণী ব্যক্তিত্ব ও সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বের মাঝামাঝি এক ধরণের ব্যক্তিত্ব আছে। তারা হল প্রান্তেবাসী (fringers)। এঁদের কিছু কিছু বন্ধুবান্ধব জুটে যায়। কিন্তু কেউ বেশীদিন টেকে না। এদের সবসময় আশংকা এই বুঝি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। এদের মনে সব সময় ভয় থাকে, কেউ হয়তো তার নামে বন্ধুদের কাছে লাগালো; সঙ্গে সঙ্গে যেকটা বন্ধু ছিল। তারাও সরে গেল।

আর একদল আছেন যাদের বলা হয় আরোহণকারী বা climber. এরা একটা গ্রুপের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছেন। এখন চান বিভিন্ন গ্রুপের স্বীকৃতি। ধরুন তিনি মধ্যবিত্ত সমাজে জনপ্রিয়, এবার তিনি চাইবেন ধনীদের সমাজের কক্ষে পেতে। কিন্তু তাদের মধ্যেও স্বীকৃতি পাবেন কিনা, পেলেও মধ্যবিত্ত সমাজে স্বীকৃতি হারাবেন কি না, তা নিয়ে তাঁর মনে দ্বন্দ্ব থাকে।

অনেকে স্বেচ্ছায় নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন। তারা Voluntary isolate বা স্বেচ্ছা-বিচ্ছিন্ন। কেউ কেউ সমাজে মিশতে চান, কিন্তু সমাজই তাঁকে পাত্তা দেয় না। এঁরা লাজুক প্রকৃতির, নিজেরা একা থাকতে ভালবাসেন। সমাজকে তাঁদের দেওয়ার মতও কিছু নেই। এরা তখন বিচ্ছিন্নতাবোধে ভোগেন। বিচ্ছিন্নতাবোধের প্রাবল্য গৃহবধূদের ক্ষেত্রে বেশী। কারণ বিয়ের পর বাড়ির কাজের চাপে বউরা সামাজিক মেলামেশার সুযোগ পায় না। অনেকের স্বামী শ্বশুর শাশুড়ি বাইরে বেরুনো পছন্দ করে না।

বয়স্ক লোকেরা স্বাস্থ্যের জন্য বেরুতে পারেন না। তাদের আজ একটা কাল একটা লেগেই আছে। তাছাড়া বুড়োদের সঙ্গে কেউ কথা বলতে চায় না। এমনকি পরিবারের লোকেরাও তাদের অবহেলা করে। মনে মনে প্রার্থনা করে কবে বুড়ো ও বুড়িটা টেঁসে

যাবে। প্রত্যেক বয়সেই সমাজ বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু নারী-পুরুষ থেকে যায়। বাচ্চাদের খেলার সময়ও দেখবেন, কাউকে কাউকে অন্য বাচ্চারা খেলতে নিচ্ছে না। আবার কেউ স্বেচ্ছায় খেলা না করে মাঠের এক কোণে বসে খেলা দেখছে।

গ্রুপের স্বীকৃতিই সামাজিক স্বীকৃতি। এই গ্রুপ নানা ভাবে হতে পারে। পাড়ার দুর্গোপুজো কমিটি, ড্রামাটিক ক্লাব, স্পোর্টস ক্লাব, রোটারি ও লায়নস ক্লাব থেকে শুরু করে ক্যালকাটা ক্লাব, বেঙ্গল ক্লাব সবই সামাজিক মিলন ক্ষেত্র। ব্যক্তিত্ব তার পরিপূর্ণ তা পায় মিলনের মধ্যে। যারা কোন ক্লাবের সদস্য নয়, পাড়ার পুজো কমিটি ও ক্লাবেও থাকেনা। তাদের বিচ্ছিন্নতা কাটানো মুশকিল।

গ্রুপ তখনই একজনকে প্রত্যাখ্যান করে যখন দেখে তার কাছ থেকে আর পাবার কিছু নেই। যারা তাস খেলে তাদের সঙ্গে তাস খেলায় অনভিজ্ঞদের বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে নাও পারে। যারা মদ খায় তারা মদের গ্লাসের ইয়ার চায়। যে মদ খায় না বরং মদ্যপদের কটাক্ষ করে তাকে মদ্যপরা কখনও তাদের গ্রুপে নেবে না। আবার ব্যক্তিত্বের সব রকম গুণ আছে কিন্তু ভাল কথাবার্তা চালাতে পারে না তার সঙ্গ গ্রুপের লোকেরা পছন্দ করে না।

মনোবিদরা বলেন, সমাজ গোটা ব্যক্তিত্বকে ধরে ব্যক্তিকে স্বীকৃতি দেয়, কোন বিশেষ গুণের জন্য দেয় না। আপনি একজন শিল্পী। সমাজ আপনাকে তার গ্রুপে নেবে শিল্পী বলে নয়, সমাজ দেখবে লোকটি ইণ্টারেস্টিং কিনা। ভাল কথাবার্তা বলতে পারে কি না। ওকে দিয়ে ক্লাবের কাজ হবে কিনা নিদেনপক্ষে দুএকটা বিজ্ঞাপন যোগাড় করে দিলেও সেটা অবদান বলে গণ্য হবে। তবেই লোকে তাকে দলে নেবে।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁরা সবার সঙ্গে মিশতে চান কিন্তু আপনার সঙ্গে খুব কম লোকই হয়তো মিশতে চান। আপনি চান সকলের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কর কিন্তু আপনি চাইলে কী হবে। লোকে আপনার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়। কেউ কেউ আছেন চট করে অপরিচিতকে বন্ধু করে নিতে পারেন। কারও বা বন্ধু করতে দেরি হয়। দেখা যায় ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা চট করে বন্ধু করে নিতে পারে। মেয়েরা সামান্য আলাপেই আপনি থেকে তুইতে নেমে আসতে পারে।

বার বার এই প্রশ্নটা মনে হতে পারে, আচ্ছা আমি তো সকলের বন্ধু হতে চাই কিন্তু তারা আমাকে বন্ধু মনে করে না কেন? আবার মনোবিদদের কাছে এর উত্তর খুঁজতে হয়, এলিজাবেথ হারলক বলেন, Whether a person is accepted or rejected and the degree of acceptance he enjoys depend in part on the group and on the kind of people available for him to associate him অর্থাৎ লোকে আপনাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করবে কি করবে না, করলে কতখানি করবে তা নির্ভর করে ওই লোকদের গোষ্ঠীর ওপর। গ্রুপই ঠিক করে দেয় আপনাকে তারা দলে নেবে কি না।

যারা হুল্লোড় বাজ, হইচই করতে অভ্যস্ত তারা কখনই চুপচাপ বুদ্ধিজীবী পড়ুয়াদের দলে নেবে না।

যারা লাগাম ছাড়া, বেপরোয়া, তাস দাবা পাশা খেলতে অভ্যস্ত, ছেলেমেয়েরা মিশে ফুর্তি করে তারা এই ধরনের ব্যক্তিত্বের বাইরে কাউকে আমল দেবে না।

বড়লোকরা তাদের গ্রুপে মধ্যবিত্তদের নেবে না। টাকা-পয়সা খরচ করতে অপারগ বা অনিচ্ছুক কৃপণ স্বভাবের, যারা শুধু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে কিন্তু পালটা নিমন্ত্রণ করে

না এমন ব্যক্তিত্বকে তারা কেউ দলে নিতে চায় না।

তবু প্রতিটি মানুষ চায় সামাজিক স্বীকৃতি। এই সামাজিক স্বীকৃতি পাবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে দলে দলে মানুষকে ক্ষমতাসীন দলে নাম লেখাতে দেখেছি। কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি এখন রাজনৈতিক দলের দখলে। এমনকী অনেক পুজো কমিটিও রাজনৈতিক দল নিয়ন্ত্রণ করছে। সাধারণ মানুষ মোটামুটি অরাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন। কিন্তু শুধু সামাজিক স্বীকৃতির জন্য তাঁরা ক্ষুদে নেতাদের সঙ্গে তাল রেখে চলেন।

সামাজিক স্বীকৃতির জন্য দরকার হয় সম্মানের। তবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় সম্মান শুধু বিদ্যার ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতির উপর। অর্থাৎ সরকার থেকে ওই ব্যক্তিকে কোন পুরস্কার-টুরস্কার দিয়েছে কিনা অথবা গণ-মাধ্যমে তাব প্রচার হচ্ছে কি না। তা নইলে ওই ব্যক্তির পয়সাকড়ি কেমন আছে এবং তিনি পাড়ার ক্লাবে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অকাতরে চাঁদা দিচ্ছেন কি না।

সামাজিক স্বীকৃতি অর্জনের পথে পরিবারের ছেলেমেয়েরা অনেকখানি সাহায্য করে। যে বাড়িতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবা মায়ের সংঘাত হয় না পাড়ায় ওই পরিবারকে ভাল পরিবার বলা হয়। কিশোর ও তরুণ বয়সে ছেলেমেয়েরা সহজেই পাড়ার সমবয়সীদের সঙ্গে মেশে ও পরস্পরের বাড়ি যাওয়া আসা করে। তারাই পরিবারের জনসংযোগ অফিসার। পাড়ার নানাবিধ অনুষ্ঠানে যে পরিবারের ছেলেমেয়ে যত বেশি সক্রিয় অংশ নেয় এবং তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে ওই পরিবার সমাজে তত বেশি জনপ্রিয় হয়। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বাবা-মায়েরাও অনুষ্ঠানে অংশ নেন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। এইভাবে সামাজিক মেলা-মেশার মধ্য দিয়ে কয়েকটি পরিবার মিলে সম্প্রীতির সেতু গড়ে ওঠে। ব্যক্তির ওপর সামাজিক স্বীকৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যার সামাজিক স্বীকৃতি যত বেশি তার ততবেশি আত্মবিশ্বাস। ওই আত্মবিশ্বাসের জোরে তারা সবসময় হাসিখুশি থাকে। তারা মিশুকে স্বভাবের হয়। তারা সচরাচর কোন বদ্ধমূল ধারণা আঁকড়ে পড়ে থাকে না। যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝালে তারা বোঝে। যদি কেউ গোঁ ধরে বসে থাকে এবং যার ধ্যানধারণাকে এক চুল নাড়ানো যায় না বুঝতে হবে তার আত্মবিশ্বাস দৃঢ় নয়। সে মনে করছে তার মত পরিবর্তন কবলে লোকে তাকে নমনীয় বলবে।

যারা অসামাজিক, নিজেকে গুটিয়ে রাখে, বুঝতে হবে তারা সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। প্রশ্ন হতে পারে সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি বলেই কী সে সমাজ বিচ্ছিন্ন, না সমাজ বিচ্ছিন্ন বলেই সে সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি। এ দুটোই সত্যি হতে পারে। ক বাবু একজন বিদগ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তি তিনি অসামাজিক নন। কিন্তু পাড়ার লোকেরা তাকে সমীহ করে, তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হতে চায় না নিজেদের হীনম্মন্যতা থেকে। তারা ভাবে, উনি গম্ভীর মানুষ, তায় পণ্ডিত। ওর সঙ্গে আড্ডা দেওয়া যায় না। ক বাবুকে সবাই এড়িয়ে চলে দেখে ক বাবুও সবাইকে এড়িয়ে চলেন। এইভাবে অচিরে ক বাবু সমাজ— বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত হন।

ক বাবুও তখন ভাবেন তিনি সবার থেকে একটু আলাদা। আর সবাইও তাঁকে আলাদা বলেই ভাবে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ক বাবু বিচ্ছিন্নতাবোধকেই স্বাভাবিক বলে মেনে নেন। সমস্ত সমাজ আজ নানাভাবে গোষ্ঠী বিভক্ত বলে যারা কোন গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন না, তাদের পক্ষে সামাজিক জীবন যাপন করা দুরূহ হয়ে ওঠে।

এমন অনেক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা এক একটি নির্জন দ্বীপে বাস করেন। আগেই বলেছি যে ছাত্র জীবন থেকে যার বন্ধু নেই, গোষ্ঠী নেই মধ্য জীবনেও তার বন্ধু হয় না। বৃদ্ধ বয়সে তার অবস্থা আরও করুণ হয়। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্বকে নিজের মধ্যে বাস করার শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।

কেমন করে সামাজিক হবেন?

বন্ধুত্বের সম্পর্ক emotion বা ভাবাবেগের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এটি দুজনের পরস্পরকে পছন্দ অপছন্দের প্রশ্ন। পারস্পরিক রুচি ও চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে জড়িত। পাঠ্য বই মিলিয়ে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না। কারণ উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক মিলগুলি উভয়ের মনের আয়নায় ফুটে ওঠে। তারপর আমরা মস্তিষ্কের কাছে তার অনুমোদন চাই। মস্তিষ্ক অনুমোদন করে বলে, এ তোমার বন্ধু। তুমি ওকে গ্রহণ করো। তবু মস্তিষ্কের বাইরে হৃদয় বলে একটা বস্তু আছে। যদিও শরীর তত্ত্ব মতে হৃদয়ের কাজ হল শুধু রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে ঠিক রেখে শরীরে সর্বদা ভাল রক্ত যোগান দেওয়া ও দূষিত রক্তকে বার করে জীবন প্রবাহের কুলুকুল শব্দকে অব্যাহত রাখা তা নিতান্তই এক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া। কবি বলেন, হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ুরের মত নাচেরে, সেটি আতিশয্য বশে। কারণ হৃদয় কখনও নাচতে পারে না। মস্তিষ্কই শুধু অনুভব করতে পারে।

স্বীকৃতির আকাঙ্ক্ষা প্রবৃত্তি থেকে উদ্ভূত। আমার প্রবৃত্তিই চাইছে দেশ, সমাজ নিদেন পক্ষে আমার পাড়ার লোক, আমার ছেলেমেয়ে, আত্মীয় স্বজন, আমার বউ আমাকে স্বীকৃতি দিক। স্বীকৃতি কী? স্বীকৃতি মানে ব্যক্তিসত্তার প্রতি সম্মান, প্রীতি ও সহানুভূতি। এইজন্য হিন্দুরা চণ্ডীর মন্ত্রে বলে দ্বিযো জহি। আমার শত্রুকে সংহার কর। কারণ শত্রু আমার মনুষ্যসত্তাকে, আমার অহংকে অস্বীকার করে।

প্রেজুডিস কেন জন্মায়?

আপনি একজন নবীন লেখক, কোন বিখ্যাত পত্রিকায় লেখা নিয়ে গেলেন। আপনার লেখা পড়েই দেখা হল না। কারণ আপনাকে পত্রিকা গোষ্ঠীর কেউ চেনে না। আপনি চাকরিতে আন্তরিকভাবে কাজ করছেন, প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন, কিন্তু আপনার প্রমোশান হল না। কারণ আপনার বস আপনাকে দেখতে পারে না।

এই 'দেখতে নারির' পিছনে যখন কোন যুক্তিসিদ্ধ ব্যাখ্যা থাকে না তখন তাকে আমরা প্রেজুডিস বলতে পারি। কিন্তু সত্যিই কী তার পিছনে কোন ব্যাখ্যা নেই? 'প্রতিষ্ঠিত শিল্পী সাহিত্যিকদের মধ্যেও একটা নিরাপত্তাবোধের অভাব থাকে। তাঁরা সব সময় মনে করেন, প্রবীণের শাসন নাশন এমন কেউ এসে পড়লে তাদের প্রতিষ্ঠার ভিত নড়ে উঠবে। তাই যে আগন্তুকদের তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখেন তাঁদের প্রকাশের পথ রুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। নির্বাচনের ভার যাঁদের ওপর থাকে তাঁরাও শর্তহীন আনুগত্য পছন্দ করেন এবং গোষ্ঠীভুক্ত না হলে, নবীনকে অথবা প্রতিষ্ঠিত অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে চান না। বিশেষ করে প্রতিভাই প্রতিভাবানের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। যাঁদের মাঝারি প্রতিভা তাঁদের পক্ষে আত্মপ্রকাশ সহজতর প্রতিভাবানদের চেয়ে। কারণ প্রকৃত প্রতিভাবান, সত্যিকারের কাজের লোক এবং নেতৃত্ব সুলভগুণ যার মধ্যে আছে এমন ব্যক্তিকে প্রকাশের পথ করে দিতে অনেকেই ভয় পায়। এটি মানুষের কায়েমী স্বার্থরক্ষা করার এক সহজাত প্রবৃত্তি। প্রেজুডিসকে

ভিত্তি করে সাম্প্রদায়িক দলের জন্ম হচ্ছে। ইংলন্ডে কট্টর জাতীয়তাবাদী দলের আবির্ভাব হয়েছে যাদের পয়লা নম্বর দুষমন এশিয়ান অভিবাসীরা। জার্মানীতে আবার ফ্যাসিস্ত দলের আবির্ভাব হয়েছে। ভারতে সাম্প্রদায়িক দলগুলির তো এখন রমরমা। সংকীর্ণতম সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী তালিবানরা এখন আফিগানিস্তানকে কবজা করেছে ও পাকিস্তানের রাজনীতি তারাই নিয়ন্ত্রণ করছে। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির পুনরাবির্ভাবের আশঙ্কায় সবাই শঙ্কিত।

এতো গেল রাজনীতির কথা। সাহিত্যে শিল্পে সংস্কৃতির জগতে চরম গোষ্ঠীবাজি এখন এমন অস্বাস্থ্যকর রূপ নিয়েছে যে যোগ্যতা আর সে জগতে ঢোকার একমাত্র মাপকাঠি নয়। এই লেখকও সারাজীবন ধরে কিছু মানুষের ব্যক্তিগত প্রেজুডিসেব শিকার। ওকে আমার পছন্দ নয়, কিন্তু কেন নয়? কী অপরাধ? তার উত্তর কেউ দেয় না। সম্ভবত প্রেজুডিসের কোন উত্তর হয় না। কারণ প্রেজুডিস আসে প্রবৃত্তি থেকে এবং অন্ধভাবাবেগ তাকে তাড়িত করে। একমাত্র ব্যক্তির মনঃসমীক্ষণ করলে তার মনের গহন থেকে প্রেজুডিসের কারণ টেনে আনা যায়।

হিন্দুদের মধ্যে জাতপাতকে কেন্দ্র করেই কত প্রেজুডিস। মুখুজ্যে কুটিল অতি বন্দ্যোকাটি শাদা। তার মধ্যে বসে আছে চট্ট হারামজাদা। ঘোস বোস মিত্তির কুলের অধিকারী। তাই শুনে দে দত্ত যান গড়াগড়ি। আরও শুনেছি কায়স্থরা বুদ্ধিমান, বদ্যিরা ক্লিকবাজ, এস সি, এস টি মানে সোনার চাঁদ, সোনার টুকরো, সর্দারজীদের মাথায় কিছু নেই, জাঠরা রগচটা। চাষা (চাষ করে অর্থে) ভোঁতা বুদ্ধির লোক। বাঙাল মনুষ্য নয়, উড়ে এক জন্তু। লম্ফ দিযে গাছে ওঠে লেজ নেই কিন্তু। এক একটি জাতিকে হেয় করার জন্য কত রকম যে প্রবাদ মুখে মুখে চাউর আছে তা সমাজতাত্ত্বিকদের গবেষণার বিষয়। শুধু বাঙালিদের মধ্যে নয় সব জাতির মধ্যেই অন্য সম্প্রদায় ও জাতি সম্পর্কে এই ধরনের প্রেজুডিস প্রচলিত আছে। যেন স্কচদের সম্পর্কে রটিয়ে দেওয়া হয় তারা ভীষণ কৃপণ। ইহুদিদের তো সাবা ইউরোপের মানুষ চোখে দেখতে পারে না। আমাদের দেশে যেমন মারোয়াড়িদের বিরুদ্ধে ভেতরে ভেতরে রাগ আছে। এই রাগের পিছনে আছে তাদের আর্থিক সমৃদ্ধি। অসমিয়ারা বাঙালিদের দেখতে পারে না এই কারণেই। হিটলার এই প্রেজুডিসের বশে কয়েক লক্ষ ইহুদিকে খতম করে দিয়েছিল। পৃথিবী জুড়ে জাতি দাঙ্গার পিছনে রয়েছে এই প্রেজুডিস। ভারতে শত শত বছর ধরে এক এক রাজার আমলে বৌদ্ধ ও হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হয়েছে। আবার হিন্দু রাজা বৌদ্ধদের ওপর অত্যাচার করেছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নির্বিচারে হিন্দু মুসলমান পরস্পরকে খুন করেছে ; কাশ্মীর থেকে লক্ষাধিক হিন্দুকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এসবই প্রেজুডিসের ফল।

প্রেজুডিস শুধু জাতপাতের মধ্যে আবদ্ধ নেই, তা ছড়িয়ে পড়েছে ব্যক্তি মানুষের বিরুদ্ধেও। যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা। ওই লোকটিকে আমার পছন্দ নয়। অতএব ওকে কোথাও সুযোগ দেবো না। এক শ্রেণীর মানুষ মনে করেন তাঁদের ওপর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে বৈষম্য হয়ে এসেছে, এখন তার শোধ নেওয়ার সময় এসে গেছে। তফসিলি উপজাতিদের মধ্যে উগ্রপন্থার কারণটাও এখানে। আমি তিন বছর উত্তর পূর্বাঞ্চলে থেকে উপজাতিদের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে উগ্রপন্থা এক আর্থ সামাজিক বঞ্চনারই মনস্তাত্ত্বিক পতিক্রিয়া। তাদের মধ্যে মূলপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার

প্রবণতাও মনস্তত্ত্বগত। আমেরিকার নিগ্রো সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও হিংসার প্রকাশ দেখে এলিজাবেথ হারলক বলছেন:

There are individual differences in the way people react to projudice. Some withdraw from the social group, some develope aggresive defence reactions, and some turn their tiostility, against society in general and engage in antisocial acts. Few accept discrimination as a challenge to show others their true worth.

প্রেজুডিসের বিরুদ্ধে লোকে নানাভাবে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। কেউ সামাজিক গোষ্ঠী থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়। কেউ আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে নিজেদের প্রতিহত করে। কেউ গোটা সমাজের সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ আচরণ করে। খুব কম লোকই বৈষম্যকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে অন্যের কাছে প্রমাণ করে যে যোগ্যতায় তারাও কম নয়।

কিন্তু কম হলেও তফশিলি জাতি উপজাতিদের মধ্যে অনেক মানুষকেই খুঁজে পাওয়া যায় যাঁরা যোগ্যতা দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে জাতপাত কখনও উন্নতির পথে অন্তরায় হতে পারে না। সুযোগ পেলে সবাই তাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে।

প্রেজুডিস দূর করুন

একথা সরাসরি ভাবে কেউ বলে না প্রেজুডিস দূর করুন। বরং সবাই বলে জলবসন্ত, পোলিও, কলেরা, হেপাটাইটিস বি দূর করুন। বড়জোর অনেকে বলেন: সাম্প্রদায়িকতা দূর করুন। সাম্প্রদায়িকতাও এক ধরনের প্রেজুডিস। কিন্তু একমাত্র প্রেজুডিস নয়—প্রেজুডিসের ক্ষেত্র জীবনে ব্যাপক। প্রেজুডিস হল কোন বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে পূর্বনির্ধারিত বদ্ধমূল নেতিবাচক ধারণা। যেমন রহমান বিপজ্জনক লোক, কারণ ও মুসলমান। আবার রাম হিন্দু-তাই মুসলমানদের জাত শত্রু। আমাদের দেশে নিম্নবর্গের মানুষেরা কোন সামাজিক স্বীকৃতি পাননি। হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রমকে পরবর্তী কালে অপব্যাখ্যা করে সমাজে স্থায়ীভাবে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সামাজিক বৈষম্যকে নিম্নবর্গের মানুষেরা মেনে নিতে বাধ্য হন। এখন চাকরিতে সংরক্ষণের ফলে (এই প্রসঙ্গে বলতে দ্বিধা নেই, আমি এই সংরক্ষণের পক্ষে তবে এই সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে আবার যে সুবিধাবাদী শ্রেণী তৈরি হচ্ছে তার পক্ষে নই) তফশিলি সম্প্রদাণের মধ্যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। প্রথমভাগে আছেন, ভদ্র বিনয়ী ও অনুগত (submissive) ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে আছেন প্রচণ্ড বর্ণহিন্দু বিদ্বেষী সংকীর্ণমনা উদ্ধত ও রাগী এক শ্রেণীর তফশিলি মধ্যবিত্ত। এঁদের ব্যক্তিত্ব অনেকটা কালা পাহাড়ের মত। এঁরা সব কিছুর মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের ছায়া দেখেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় মনোভাবেরই জন্ম বৈষম্য ও প্রেজুডিস থেকে। যাঁরা অত্যধিক বিনয়ী তাঁরা বংশ পরম্পরায় এমন আচরণ দেখিয়ে আসছেন।

আমাদের সমাজে ছেলে ও মেয়ে সম্পর্কে অভিভাবকদের প্রেজুডিস চোখে পড়ে।

ছেলেরা উগ্রমেজাজের হলে কেউ কিছু মনে করে না বরং বলা হয় পুরুষদের নাকি একটু রাগী হওয়াই ভাল। কিন্তু মেয়েরা হবে বাধ্য, মৃদুভাষী, সাতচড়ে রা কাড়বে না।

ছেলেদের একটু চরিত্রদোষ থাকলে তাতে কিছু এসে যায় না কিন্তু মেয়েদের হতে হবে বিশ্বস্ত। পতিই তাদের পরম গুরু। ছেলে আরামপ্রিয় ও কুঁড়ে হলে সাতখুন মাপ। তার মা, বোন, দিদি, বউ তার খিদমত খাটার জন্য সব সময় তৈরি, কিন্তু বউকে একটু বেলা করে ঘুম থেকে উঠলে বা সবার আগে ঘুমিয়ে পড়লে চলে না। তা প্রথাবিরোধী হয়ে যায়। বহু চাকরিতে ছেলেদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় আবার যে সব চাকরিতে মেয়েদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয় যেমন রিসেপশনিস্ট, সেলস গার্ল, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ এয়ার হস্টেস সেসব ক্ষেত্রে মেয়েদের যোগ্যতার চেয়ে যৌন আবেদনটাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

পুরুষশাসিত সমাজে এই লিঙ্গ বৈষম্যের ফলে মেয়েদের মধ্যে চাপা হতাশা দেখা দেয়। হীনম্মন্যতার ফলে তাদের চাপা বিক্ষোভ ক্রোধ উত্মা ও বিষাদের মধ্যদিয়ে প্রশমিত হয়। একটা বয়সের পর তারা খিটখিটে স্বভাবের হয়ে ওঠে। অনেকের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। যে সমস্ত মহিলা চাকরি করে তাদের আবেগপ্রবণতা প্রশমিত করার নানা উপায় থাকে কিন্তু গৃহবধূর ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতাবোধ ভীষণভাবে কাজ করে।

যাঁদের মধ্যে সৃজনী প্রতিভা আছে তাদের অনেক বাধার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের দাবিয়ে রাখা যায় না। তবে ব্যক্তিস্বার্থ ছাড়াও জাতি ও সম্প্রদায়গত প্রেজুডিস বা বদ্ধমূল ধারণা গড়ে ওঠে কতগুলি কুসংস্কার থেকে। বিশেষ করে পারিবারিক জীবনে শিশুকাল থেকে যারা নানাকারণে হতাশ হয়ে পড়ে তারা তাদের হতাশা প্রকাশের বিচিত্র এবং বিকৃত পথ খুঁজতে থাকে। একটা পথের নাম আক্রমণ বা aggression মানুষ যে সামান্য কারণে এবং অকারণে অন্যের শত্রুতা করে সেটি হল এই aggression. ক বাবু নানা কারণে হতাশ এবং উদ্বেগ তাড়িত সেজন্য তিনি রেগে আছেন। কাউকে মারধর করে বা, খুন করে তাঁর এই রাগ নিরসন সম্ভব নয়, কারণ তিনি যে ভদ্রলোক এবং বড় চেয়ারে বসে থাকা ম্যানেজার বা সম্পাদক বা ডিরেক্টর। সুতরাং কীভাবে তিনি এই রাগ সামলাবেন? অফিসে অধঃস্তনদের সঙ্গে হম্বিতম্বি করে, বাড়ি গিয়ে বউ এর ওপর চোটপাট করে আর না হয় অধস্তন বা ঊর্ধতনের (যেখানে তাঁর ক্ষমতা নেই) পিছনে লেগে। সেটাও যদি সম্ভব না হয় তাহলে তিনি জাত-পাত ও বর্ণ বিদ্বেষী হয়ে উঠবেন। হয়ে উঠবেন সাম্প্রদায়িক কিংবা লিঙ্গ বিদ্বেষী। বহু লোক সুন্দরী নারী দেখলেই আড়ালে তাদের চরিত্র নিয়ে কটাক্ষ করেন। কাউকে খেটে বড়লোক হতে দেখলেও লোকের কাছে বলে বেড়ায় তিনি কালো টাকা করেছেন। আমি সারাজীবন তিল তিল করে সঞ্চয় করে আজ থেকে পনেরো বছর আগে একটা বাড়ি করেছিলাম কেউ কেউ আমার দিকে কটাক্ষ করে ফিসফিস করে দুচারজনক বলেছেন, কী করে উনি বাড়ি করেছেন আমরা সব জানি। এই ধরনের নিন্দুকেরা যে প্রেজুডিস গড়ে তোলেন তার জন্ম অবচেতন মন থেকে। তাঁদের শৈশব অভিজ্ঞতা, বাবা মায়ের শিক্ষার অভাব, স্কুলে উপযুক্ত শিক্ষকের কাছে প্রথম পাঠ না পাওয়া সব কিছুই প্রেজুডিস তৈরিতে সাহায্য করে।

প্রেজুডিস হল রুগ্ণ মনের প্রতিচ্ছবি। কিন্তু প্রেজুডিস সমাজের ভীষণ ক্ষতি করে। প্রেজুডিসের শিকার ব্যক্তিরাও নিগৃহীত হতে হতে শেষ পর্যন্ত হতাশ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। এইভাবে আবহমান কাল ধরে এক বিষাক্ত সামাজিক বাতাবরণ তৈরি হয়। আমেরিকায় কালো মানুষদের বিরুদ্ধে, দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের বিরুদ্ধে এমন বাতাবরণ তৈরি

হয়েছিল। আমাদের দেশেও এমন সামাজিক বাতাবরণ তৈরি হওয়ার ফলে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণের লোকদের মানুষই মনে করেনি।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বিদ্বেষের অবসান হয়েছে। আমেরিকায় নিগ্রোদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ অনেকটা প্রশমিত। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অর্থনৈতিক ভাবে সমাজের সব শ্রেণী সমানভাবে অগ্রসর না হবে ততদিন প্রেজুডিস কমবে না। ভারতে ৪০ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে। এরা অধিকাংশই তফশিলি জাতি-উপজাতি অথবা দরিদ্র মুসলমান শ্রেণী। এঁদের ব্যক্তিত্বকে সুপরিণত করার প্রথম শর্তই হল শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি। বাবা-মা বহুক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের সামনে কোন বিশেষ জাত ধর্ম ও ভাষাভাষীর নিন্দা করেন। ছেলেমেয়েরাও ছোটবেলা থেকে এই বিদ্বেষ শেখে।

ছেলেমেয়েদের সামনে কখনও কোন জাতপাত নিয়ে কথা বলবেন না। কোন ধর্মের নিন্দা করবেন না। বরং ছোটবেলা থেকে তাদের রামায়ণ মহাভারত কোরাণ বাইবেলের গল্প শোনান।

নিম্নবর্গের মানুষ ও গরিব মানুষদের সম্পর্কে শিশুদের সহানুভূতিশীল করে গড়ে তুলুন।

জাতি ধর্ম ও জীবিকা, নির্বিশেষে সমস্ত বয়স্ক ব্যক্তিকে (আপনি) বলে সম্বোধন করতে শেখান।

মেয়েদের কখনও বলবেন না তুমি মেয়ে, এটা পারবে না। ছেলেদের মত মেয়েরাও সমস্ত কাজ সমান দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে। কিন্তু কতগুলো কাজ মেয়েরা আরও ভাল করতে পারে।

নিজে গোষ্ঠীতন্ত্রের শিকার হলেও আপনি ক্ষমতা পেলে যেন নিজের গোষ্ঠী তৈরি করবেন না। যোগ্যতার ভিত্তিতে সকলের জন্য দরজা খোলা রাখবেন। সংকীর্ণতা অপরকে যত জব্দ না করে সংকীর্ণ মানুষটি তার চেয়ে অনেক ক্ষতি করে। সংকীর্ণ মানুষের চিন্তার প্রসারতা লোপ পায়। স্তাবকরা তার প্রশংসা করলেও সাধারণ মানুষ তাকে ঘৃণা করে। আপনি কী চান? কিছু স্বার্থপর মানুষের স্তাবকতা না অসংখ্য মানুষের ভালবাসা? মনে রাখবেন : Projudice is a form of displaced hostility or of repressed aggression directed against a scapegoat group in order to resolve or avoid one's own grievances

প্রেজুডিস স্থানচ্যুত শত্রুতার এক রূপ। কারও নিজের রাগ বা অভিযোগ প্রশমিত করার জন্য একদল বলির পাঁঠা খুঁজে বার করে তাদের ওপর কোপ মারে।[৪৫]

প্রেজুডিস বৈষম্যের জন্ম দেয়, সামাজিক অনৈক্য ডেকে এনে। মানুষের চিন্তার প্রসারতাকে সঙ্কুচিত করে ও সুদূরপ্রসারী ঘৃণার সৃষ্টি করে।

অনেক সময় পারিবারিক বৃত্তের মধ্যেও বৈষম্যের সৃষ্টি হতে পারে। দেখা যায় চার ছেলেমেয়ের মধ্যে বাবা হয়তো একটি মেয়েকে বেশি পছন্দ করছেন, মা পছন্দ করছেন ছোট ছেলেকে।

অনেক সময় ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে অনেকে বৈষম্যে বলে ভুল বুঝতে পারেন। বিচারকেরও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের মানুষ থাকতে পারে। কিন্তু তা বলে বিচারকের আসনে বসে তিনি ইচ্ছামত রায় দিতে পারেন না। এটি ব্যক্তিত্বের দুর্বল দিক।

বারো

অসুস্থ ব্যক্তিত্ব

মানুষের শারীরিক অসুস্থতা চট করে ধরা যায়। গুরুতর অসুস্থ হলে সে শয্যা নেয়। হাসপাতালে ভর্তি হয়। তাকে দেখে ডাক্তারবাবুরা কেন সাধারণ মানুষও বুঝতে পারে যে সে অসুস্থ। তবে ছোটখাটো অসুস্থতা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তাছাড়া লোকে সেটা চেপে রাখে। যাঁদের মাথার যন্ত্রণার ব্যামো আছে সেটা নিয়েই তারা কাজ করেন এবং বুঝতে দিতে চান না যে তাঁর খুব মাথা ধরেছে। তিনি ব্যথা চেপে স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যান। যাঁরা প্রেসার ও ডায়াবেটিসের রোগী তাদের দেহে যে কোন সময় রোগলক্ষণ দেখা দিতে পারে। যেমন মাথাধরা, দুর্বলতা বোধ, হাত পায়ে ঝিনঝিন করা। প্রস্ট্রেটের রোগী প্রায়ই অস্বস্তি অনুভব করেন। কিন্তু এসব অসুখ সত্ত্বেও তাঁরা স্বাভাবিক কাজকর্ম করে যান। অপরিচিতরা জানতেও পারে না। তেমনি ছোটখাটো মানসিক অশান্তি, উদ্বেগ চেপে অনেকে স্বাভাবিক কাজ করেন। প্রচণ্ড রাগে ও উত্তেজিত হন না আবার প্রচণ্ড শোকেও ভেঙে না পড়ে কর্তব্যকর্ম করে যান এমন বহুলোক আছেন। কিন্তু যখন মনের ওপর আঘাত এমন মারাত্মক রকমের হয়ে ওঠে, যখন মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় তখন আমরা বলি লোকটা পাগল হয়ে গেছে। তখন সেই মনোরোগীকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কিন্তু পরিমিত ধরণের মানসিক বিক্রিয়ার ফলে এ যুগে অসংখ্য মানুষ নানা মানসিক সমস্যায় ভুগছেন যার ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের ওপর আঘাত পড়ছে। এর ফলে ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটছে না। ধরুন, একটি গোলাপ গাছে সুন্দর গোলাপ হল কিন্তু তা ভাল করে ফুটল না। তার গন্ধও ছড়ালো না। কেননা, ওই ফুলের মধ্যে কীট বাসা বেঁধেছে। কীট ওই ফুলটির পূর্ণ বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি করছে। ফুলটি অকালে ঝরে যাচ্ছে। তেমনি নানা বাইরের কারণে ও ভেতরের কারণে ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটল না। কিন্তু বাইরের লোক বুঝল না। কারণ তারা তো আর কীটটিকে দেখতে পাচ্ছে না। ব্যক্তিত্ব নিয়ে সাধারণ মানুষ অত মাথা ঘামান না। তাঁরা দেখেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভাল রোজগার করছে কি না। প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ভাল বিয়ে হয়েছে কি না। তাদের ছেলেপুলে হয়েছে কি না। তারা সুস্থ আছে কি না। *তাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধি হয়েছে কি না ইত্যাদি।*

ব্যক্তিত্বের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ অজ্ঞ। এমনকি আপনিও আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে অসচেতন। আপনি ও আপনারা পরিবারের কারও সামান্য জ্বরজারি হলেই ডাক্তারের কাছে ছোটেন। কিন্তু আপনার বহু অসুখের কারণ জানতে চান না। হয়তো তার কারণ মানসিক। আমার পরিচিত একটি ছেলের হঠাৎ মাথায় দাদের মত একটি

চর্মরোগ হল। ছেলেটি সব সময় মাথা চুলকোয়। আমি যখনই তাকে দেখি, তখনই সে মাথা চুলকোচ্ছে। আমি তাঁকে কলকাতার এক বিখ্যাত চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠালাম। ডাক্তারবাবু তাঁকে দেখে বললেন, এটি আপনার মানসিক কোন স্ট্রেস থেকে হচ্ছে। কথায় কথায় জানা গেল ছেলেটির বিয়ে নিয়ে এক সমস্যা হয়। বিয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তার ডিভোর্স হয়ে যায়। সেই ঘটনা থেকে তার এই সাইকোসোমাটিক অসুখটি হয়েছে। আমার এক আই পি এস অফিসার বন্ধু আছেন। এক কালে সি বি আইতে উচ্চপদে থেকে তিনি নাম করেছেন। কিন্তু তার আগে বেশ কিছুকাল তাঁর কোন পোস্টিং হয়নি। তিনি এক রকম বাড়ি বসে বেতন পাচ্ছিলেন। এতে তাঁর মনের ওপর এত চাপ পড়ে যে তাঁর ব্লাড প্রেসার ভীষণ ভাবে নেমে যায়। হতাশ হবেন না দ্বিতীয় খণ্ডে আমি বহু বিখ্যাত মানুষের মনোবেদনার উদাহরণ দিয়েছি। কিন্তু এই বেদনা বুকে চেপে তারা কাজ করে গেছেন। সংসারে থাকতে গেলে এমন বহু মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। আবার যাঁরা অন্যকে যন্ত্রণা দিয়ে আনন্দ পান তাঁরা আবার নিজেরা বিভিন্নভাবে যন্ত্রণার শিকার হন। সুতরাং ভাববেন না শয়তানরা সুখে আছে অথবা থাকবে। মনোবেদনার গভীরতা ও মানসিক যন্ত্রণা লোকের ভেতরে ভেতরে হয়। সেটা শয়তান ও মহাপুরুষরাই চেপে রাখতে পারে। আমার মত সাধারণ মানুষরা কাউকে না কাউকে এটা ব্যক্ত করে আরাম বোধ করে। যন্ত্রণা পাওয়া নয়, অন্যকে যন্ত্রণা দেওয়ার প্রবৃত্তি অসুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। অসুস্থ ব্যক্তিত্ব যে প্রথা বহির্ভূত আচরণ করে সে কথা আগেই বলেছি। সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব যেমন কবি সাহিত্যিক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, বড় বিজ্ঞানী ও প্রতিভাধর ব্যক্তিরা প্রথা বহির্ভূত আচরণ করে থাকেন। কেউ প্রচুর মদ্যপান করেন। কেউ প্রচুর নারী সঙ্গ করেন। কেউ বাউণ্ডুলে হয়ে সারাজীবন ঘুরে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু তাঁদের ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যক্তিত্বকে অসুস্থ বলা যাবে না। কারণ তাঁদের ব্যক্তিত্ব অসুস্থ হলে তাঁরা সুস্থ কিছু সৃষ্টি করতে পারতেন না। এজন্য বলা হয় পাগল, প্রতিভাধর ও প্রেমিকরা অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকেন। প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের একটি স্টিরিও টাইপ হয়ে গেছে। যেমন শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক কবিরা মদে চুর হয়ে থাকবেন। অভিনেতা ও সাহিত্যিকরা বার বার বিয়ে করবেন, সব সময় মহিলা পরিবৃত থাকবেন। খামখেয়ালিপনা করবেন। অফিসে কাজকর্ম বেশি করবেন না। এমনকি প্রায়ই অফিস কামাই করবেন। ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন। ছেলের ওষুধ আনতে যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চাইবাসা কিংবা মৌভাণ্ডার চলে যাবেন। একমাস পরে ফিরবেন। প্রতিভাবান কবি সাহিত্যিকদের ব্যক্তিত্বের এই স্টিরিও টাইপ বাঙালি সমাজে, স্বীকৃত। সামাজিক প্রশ্রয় আছে বলেই তাঁরা লাইসেন্স নিয়ে থাকেন। কিন্তু যদি একজন রাজনীতিবিদ অথবা একজন অধ্যাপক এমন খামখেয়ালিপনা করেন তাহলে কিন্তু সমাজ তার স্বীকৃতি দেবে না। কারণ সমাজের কাছে বাকী সব ব্যক্তিত্বের স্টিরিও টাইপ আলাদা। এমনকি আমেরিকার মত যথেচ্ছ-সমাজে ক্লিন্টনের মত ব্যক্তিত্বের ব্যভিচার সেখানকার সমাজ সহ্য করেনি। সেখানে এটি অসুস্থ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ বলেই গণ্য হয়েছে। প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের বহুমুখী তাড়নার সঙ্গে সমঝোতা করতে না পেরে তাদের যে কোন একটির কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে থাকাটাকে আমরা অসুস্থ বা দুর্বল ব্যক্তিত্ব বলব। প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগ জীবনে অপরিহার্য এবং তাকে ইতিবাচক দিকে চালিত করা যায়। যা ছিল তাড়না তা চালনা শক্তি (Drive) হিসাবে পরিগণিত হতে পারে। ধরুন, কাম একটি

প্রবৃত্তি। তার তাড়না নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে মানুষ কামুক লম্পট ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। অথচ সেই কাম নিয়ন্ত্রিত পথে গেলে সেটি হয়ে ওঠে চালনা শক্তি বা drive. তা মানুষকে বড় কিছু করতে প্রণোদিত করে। রূপকথার রাজপুত্র রাজকন্যাকে পাবার জন্য দৈত্যনিধন করে। কাম থেকেই বিশ্বসৃষ্টির উৎপত্তি এবং কামনাই জীবনের চালনা শক্তি।

ব্যক্তিত্ব কেন অসুস্থ হয়

ব্যক্তিত্বের উৎস এবং পরিবেশের সঙ্গে তার সংঘাতের কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি। এবার ছড়িয়ে ছিটিয়ে লেখা বিভিন্ন অংশের একটা সারাংশ উপস্থিত করা যাক।

শারীরিক কারণ : ছোটবেলা থেকে দেহের কোন কোন ক্রনিক অসুখ-বিসুখ হলে ব্যক্তিত্বের গোলমাল দেখা দিতে পারে। যেমন দীর্ঘমেয়াদী মাথা ধরা। হজমের গোলমাল, রক্তাল্পতা, প্রায়ই নানা অসুখে ভোগা। আবার ব্যক্তিত্বের গোলমাল থেকেও সাইকোসোমাটিক নানা অসুখ হতে পারে। যে কোন বয়সে মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে তা থেকে ব্যক্তিত্বের দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। যাঁদের সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা আছে।

আত্মবিশ্বাস বা Self confidence-এর অভাব থেকে ব্যক্তিত্বের অসুস্থতা দেখা দিতে পারে। আপনি যদি সব সময় অসন্তুষ্ট থাকেন, বিষাদগ্রস্ত থাকেন, নিজেকে যদি শ্রদ্ধা করতে না পারেন এবং হীনম্মন্যতা বোধ করেন তাহলে আপনার ব্যক্তিত্ব পীড়িত হতে বাধ্য।

আত্মপ্রত্যাখ্যান বা Self rejection হল নিজেকে ছোটভাবা এবং বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে না পাওয়া। আত্মপ্রত্যাখান মানে হল নিজের কাছে নিজে হেরে যাওয়া। যখন নিজের সীমাবদ্ধতার জন্য প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে না পেরে মানুষ হাল ছেড়ে দেয় তখন তাকে বলি হাল ছেড়ে দেওয়া মনোভাব।

বারবার পৃথিবীতে এমন কোন লোক নেই যে সারা জীবন ধরে যত চেষ্টা করেছেন সব চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয়েছেন। এমন লোক অবশ্য আছেন যিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন কিন্তু বারবার চেষ্টা করে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। কিন্তু ব্যর্থ হবার পর হাল ছেড়ে বসে থাকলে ওই সাফল্য আসতনা। সেই লোকটি আর কেউ নয় এই বইটির লেখক। আমার জীবনে যেটুকু সাফল্য এসেছে তাতে আমি খুশি। কিন্তু ব্যর্থতায় ভেঙে পড়লে এইটুকুও পেতাম না।

যাঁদের প্রত্যাশা বাস্তব বর্জিত তাদের ব্যক্তিত্ব অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারণ আপনি যদি নিজেকে বিরাট কিছু ভেবে বসেন এবং বাস্তবে আপনি যদি তা না হন, তাহলে কিন্তু ব্যক্তিত্বের মধ্যে হতাশা জমাট বাঁধে। অনেক সময় বাবা-মা ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেবার জন্য অথবা স্রেফ আবেগের বশে তাদের তোল্লাই দেন। তারপর ক্লাসে একবার যদি ভাল রেজাল্ট করে তাহলে তা কথাই নেই। সবাই মিলে তাদের ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বড় করে দেয়। আমি মাধ্যমিকে স্ট্যান্ড করা ছাত্রকে সারা বছর ধরে সংবর্ধনা নিতে দেখেছি, সে আত্মপ্রত্যয়ে এত ভরপুরে হয়ে উঠেছে যে উচ্চমাধ্যমিকের জন্য ভাল মত প্রস্তুতি নেয়নি। তারপর পরীক্ষায় ভীষণ খারাপ ফল করে হাহুতাশ করেছে। তার আত্মবিশ্বাস

কমে গিয়েছে ফলে ব্যক্তিত্ব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এলিজাবেথ হারলক হাল ছেড়ে দেওয়া মনোভাব বা Self rejection-এর পিছনে দশটা কারণ দিয়েছেন। কারণগুলি হল :

১. সমাজের বিরূপ মনোভাব।

২. সবটা তলিয়ে দেখার অপারগতা।

৩. ছোটবেলায় উপযুক্ত ট্রেনিং না পাওয়া (অত্যধিক আদরে আদরে বাঁদর হয়ে যাওয়া ও শৃঙ্খলাপরায়ণতা না শেখা)।

৪. বারবার ধাক্কা খাওয়া। (বারবার ফেল করা, বা চাকরি না পাওয়া)।

৫. মোটিভেশন বা প্রেষণার অভাব। (যাদের উৎসাহ দেবার মত কেউ নেই)

৬. পরিবেশের প্রতিকূলতা। (গরিব পরিবারে জন্ম। বাড়িতে পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ না থাকা)

৭. মানিয়ে চলতে না পারা ছেলেমেয়েদের একজন বলে নিজেকে ভাবা। খারাপ ছেলেদের আদর্শ করা।

৮. ভাবাবেগ জনিত মানসিক চাপ, প্রেমে ব্যর্থতা, বাব-মায়ের মৃত্যু, বন্ধুর বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি।

৯. ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা যেমন ভাল মেধা না থাকা।

১০. অবাস্তব উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

মনোবিদদের মতে এক শ্রেণীর অসুস্থ ব্যক্তিত্ব সমাজ স্বীকৃতি পায়। প্রত্যেকের মধ্যেই ব্যক্তিত্বের কম-বেশি দুর্বলতা থাকে। দোষে-গুণে মিলিয়ে মানুষ। তাই ব্যক্তিত্বের কয়েকটি সবল দিক দুর্বল দিকের ভারসাম্য রক্ষা করে। যেমন একজন কর্মী খুব কাজের লোক। তাকে না হলে কোম্পানি অচল। মালিকের তার ব্যক্তিত্বকে খুব পছন্দ। তার কেরিয়র ভাল। ভীষণ বুদ্ধি। সমস্ত কিছু তলিয়ে দেখতে জানে। ভাল কাজ করে। নেতত্ব সুলভ গুণ আছে। অন্যদিকে সে ভীষণ মদ্যপ ও অনেক মহিলার সঙ্গে তার গোপন কোথাও প্রকাশ্য সম্পর্ক। তাছাড়া তার মেজাজও অধঃস্তনেব প্রতিরুক্ষ। কিন্তু মালিকের কাছে অত্যন্ত ভদ্র। মালিকের কাছে তার নামে অনেক অভিযোগ সত্ত্বেও মালিক তাকে বহাল রেখেছেন সোজা অঙ্ক কষে কারণ-এই লোকটির দ্বারা তাঁর ব্যবসা ভাল হচ্ছে। তাদের পণ্যের বিক্রি বাড়ছে। সুতরাং ওই ব্যক্তির চরিত্রের দুর্বলতা তার চরিত্রের অন্য ইতিবাচক দিকগুলির কাছে পরাজিত হল।

কিন্তু জনসাধারণের যেখানে তাদের নিজস্ব কোন সরাসরি স্বার্থ জড়িয়ে নেই সেখানে তারা কারও চরিত্রে বেচাল দেখলে তার নিন্দা করবে। রাজনৈতিক কারণে বা ধর্মান্ধতার বশেও রুগ্ণ ও বিকৃত ব্যক্তিত্বের সামাজিক সমর্থন মিলে যায়। যেমন দুর্নীতির দায়ে জয়ললিতার জেল হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সমর্থকদের কাছে তাঁর ব্যক্তিত্ব সমান আকর্ষণীয়। তাঁর জনপ্রিয়তায় এতে চিড় ধরেনি। ধর্মান্ধদের কাছে যদিও আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায় তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। একবার এক বিখ্যাত গুরুকে প্রতারণার দায়ে লালবাজারে পুলিশ ধরে আনল। আমি দেখেছিলাম তাঁর ভক্তরা লালবাজারে গুরুর জন্য খাবার নিয়ে আসছেন। গুরুর নামে কত অপবাদ। কিন্তু শিষ্যদের কাছে তাঁর ভাবমূর্তি অম্লান। রুগ্ণ ও বিকৃত ব্যক্তিত্বের প্রতি সমাজের অস্বীকৃতি সব সময় একই সুরে বাধা থাকে না। যেমন পয়সাওয়ালা লোকদের অনেকেই রুগ্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়।

রাজনৈতিক নেতাদের অনেকেরই ব্যক্তিত্বে নানা অসঙ্গতি থাকে। উচ্চপদে আসীন ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবন কদাচ তাদের উন্নতির পথের অন্তরায় হয়।

জেনকিনস ছ'ধরনের রুগ্ণ ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন। এগুলি ব্যক্তির শৈশবকাল ও বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। এর মধ্যে কয়েক ধরনের ব্যক্তিত্বের লক্ষণ তুলে ধরছি।

১. **মেজাজি ব্যক্তিত্ব**। ঘন ঘন মুডবদল হওয়া। ক্ষণং তুষ্টা, ক্ষণং রুষ্টা। তুষ্টা-রুষ্টা ক্ষণে ক্ষণে। এখন বেশ ভাল মুডে কথা বলছেন। কিছুক্ষণ পরেই চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন।

কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারেন না। টিভি দেখছেন তো সমানে নব ঘোরাচ্ছেন। কোন চ্যানেল জুৎসই লাগছে না। তারপর ধুত্তোর বলে খবরের কাগজ নিয়ে বসলেন। সেটাও কিছুক্ষণ পরে ফেলে দিয়ে ক্যাসেটে গান শুনতে বসলেন। তারপর গান বন্ধ করে গায়ে জামা গলিয়ে এই ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে গেলেন। ফিরলেন তিন চার ঘণ্টা পরে। এঁরা hyperactive হাইপার অ্যাকটিভ বা অতি সক্রিয়। এক কথায় ছটফটে।

২. **আত্ম-প্রত্যাহার (Withdrawal)** : এই লক্ষণ দেখা দিলে মানুষ ঘরকুনো হয়ে যায়। কোথাও বেরুতে চায় না। কারও সঙ্গে মিশতে চায় না। আমার স্কুল জীবনের এক অন্তরঙ্গ বন্ধু কয়েকটি মানসিক বিপর্যয়ের পর সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ছেড়ে দিয়েছে। আত্মপ্রত্যাহার পর্যায় একবার শুরু হয়ে গেলে লোকে আর নতুন করে সম্পর্ক তৈরি করতে পারে না।

৩. **উদ্বেগের আতিশয্য (Over anxious Reaction)** ঃ এই অবস্থায় সব কিছুর জন্যই মানুষ বড্ড বেশি উদ্বিগ্ন হয়। ছেলে দেরি করে বাড়ি ফিরলে মা চারিদিকে টেলিফোন করতে থাকেন। মেয়ের বিয়ের ঠিক মুখে উদ্বেগের আতিশয্যে বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন। অনেক সময় অতি উদ্বেগ বশে বর কনের উদরাময় দেখা দিতে পারে। এজন্য বিয়ের দিন বরকনেকে উপোস করে থাকতে হয়। আমি একটি পরিবারে পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়ি যাবার সময় বাড়ির গিন্নিকে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখেছিলাম। অতি উদ্বেগ তাড়িত মায়েরা বাচ্চাদের ইস্কুলে দিয়ে ইস্কুলের সামনে লোকের বাড়ির বারান্দায় সারাদিন বসে থাকেন। অথচ তাঁরা বাসে করে বাচ্চাদের পাঠাবেন না। অতি উদ্বেগের তাড়নায় মানুষ নিজে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। কোন কাজ করলে কাজটা ঠিক কি না তার জন্য লোকের অনুমোদন খোঁজে। ধরুন, আপনি অনেকক্ষণ ধরে বাছাই করে একটা শাড়ি কিনলেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত না দুচার জনকে দেখিয়ে অনুমোদন আদায় করতে পারছেন ততক্ষণ শান্তি নেই। অতি উদ্বিগ্ন ব্যক্তিরা আত্মসচেতন এবং আত্ম অভিমানী। কেউ যদি সামান্যতম সমালোচনা করল তো হয়ে গেল। আপনার চোখ ফেটে জল আসবে। আপনি কাজটা আর করবেন না নয়তো ঝগড়া করবেন। পরিবারে উপার্জনকারী ব্যক্তি যাঁরা সংসার চালাতে পারেন না তাদের মেজাজ তিরিক্ষি থাকে। যেসব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনায় ভাল নয় তারা প্রথাবিরোধী ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠে। তারা কথায় কথায় মারপিঠ করে।

অবাধ্য কিশোরেরা প্রায়ই এক একটা গ্রুপ করে। তারা দল বেঁধে ঘোরাফেরা করে এবং গ্রুপ হিসাবেই অন্য গ্রুপকে আক্রমণ করে। এরাই শেষ পর্যন্ত মস্তানে পরিণত হয়।

প্রশ্ন হতে পারে অসুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ তো বুঝলাম। এক কথায় ব্যক্তিত্ব অসুস্থ হয়ে পড়ে কখন?

উত্তরটি কঠিন নয়। ব্যক্তি যখন কতগুলি সমান্তরাল সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে না তখন ব্যক্তিত্বের সংকট সৃষ্টি হয়ে যায়। তখন যে কোন মানুষের মধ্যে দেখা হয় অপূর্ণাঙ্গতা (Immurity), প্রত্যাগমন (Regression), নিষ্ঠুরতা (Crnclty), সমাজ বিরোধিতা (antisocial behaviour)।

৩. **অপূর্ণাঙ্গতা** : কোন কোন মানুষের প্রলম্বিত শৈশব থাকে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া মনোবৃত্তি: বয়ঃসন্ধির সময় এটা প্রবল হয়। তখন মনে হয় বাড়িতে থাকলে কিস্যু হবে না। বাড়ির কেউ আপনাকে পছন্দ করে না। তখন আপনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যাবেন। পরে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে বাড়ি ফিরে আসবেন এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য বলবেন এক সন্ন্যাসী ফুল শুঁকতে দিয়েছিল। তারপর আর মনে নেই। পরিণত বয়সে পলায়নী মনোবৃত্তি প্রবল হতে পারে। তখন আর বাস্তব জগতের দুঃখ কষ্টের সঙ্গে মোকাবেলা করতে ইচ্ছা করে না। অনেকে গুরুর দীক্ষা নেন ও পূজা আর্চা ধর্মকর্ম নিয়ে কাটিয়ে দেন।

৪. **আক্রমণাত্মক মনোভাব** : এ নিয়ে আগেই বলেছি। এই শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব কথায় কথায় কলহপ্রবণ হয়ে উঠবে। মেয়েরা নানা কারণে হতাশ। তাই তাদের মধ্যে মানসিক অসুস্থ হওয়ার প্রবণতা বেশি। অধিকাংশ মহিলাই চল্লিশোর্ধ্বে মনোপজের পর থেকে ঝগড়াটে হয়ে ওঠে।

অপূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের মানুষদের বাড়ি ও পরিচিত পরিবেশ সম্পর্কে এক অলীক রোম্যান্টিক ধারণা গড়ে ওঠে। নতুন কর্মস্থলে গিয়ে যখন তার পরিবেশকে বিরুদ্ধ বলে মনে হয় তখন ওই অলীক ধারণা তাকে গৃহমুখী করে তোলে।

অপূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের যুবকেরা নিজেরা জীবনে আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হয়েই বাবা-মায়ের ভরসায় বিয়েতে রাজি হয়ে বসে। চাকরি বাকরি যোগাড় না করে তারা ঝোঁকের বসে প্রেমিকাকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। মনোবিদরা একথাও বলেছেন, বিয়ের আগে যে সব মেয়ে গর্ভবতী হয়ে পড়ে তারাও অপূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব। তাদের কোথাও ভাবাবেগগত নিরাপত্তার অভাব আছে। অর্থাৎ কেউ হয়তো বাবা মায়ের যথাযথ ভালবাসা পায়নি এবং বঞ্চনা বোধে ভুগছে। সাধারণত দেখা যায় মাতৃহীনা মেয়েরা যাদের অনেক ভাইবোন একটি বোন হয়তো মনে করছে সে বাবা মায়ের ভালবাসা যথাযথ ভাবে পাচ্ছেনা, নিরাপত্তার অভাব বোধ থেকে যে কোন পুরুষের কাছ থেকে ভালবাসা পেলেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার দৈহিক আত্মসমর্পণও দুর্বল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। অপূর্ণাঙ্গ বুদ্ধি বাড়ে না। বুদ্ধাঙ্ক উনিশ কুড়ির পর কারও বাড়েনা কিন্তু অভিজ্ঞতা'র সঙ্গে সঙ্গে বিচক্ষণতা তথা কোন পরিস্থিতিতে কি করতে হবে, কোথায় কি বলতে হবে সেই ক্ষমতা সুপরিণতি লাভ করে। অপূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি কোন দায়িত্ব নিজে না নিয়ে সব সময় অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায়। কারণ তার আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠেনি বলে সে যে কোন দায়িত্বকে ভয় পায়। শৈশবে এদের মা সব কাজ করে দেয়। যেমন ভাত খাইয়ে দেয়। জুতো পরিয়ে দেয়। বাবা মাই শিশুকে অপূর্ণাঙ্গ (immature) করে তোলে। তারা শিশুকে দায়িত্ব নিতে শেখায় না। সম্পূর্ণভাবে তাদের ওপর নির্ভর করে তোলে। এরফলে বড় হলে সে নিজে

জামা-কাপড় পরে নিজের হাতে খায়, কিন্তু মানসিক দিক থেকে মায়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। সে বাইরে কোথাও গেলে হোমসিক হয়ে যায়। আমি দুজনকে জানি যারা আমেরিকায় পড়তে গিয়ে হোমসিক হয়ে ফিরে এসেছে। এর মধ্যে একজন ছেলে। সে যে দিন গিয়ে পৌছয় তার পরের দিনই প্লেনে উঠে বাড়ি ফিরে আসে। আর একটি মেয়ে কলকাতার। সে অবশ্য পনের দিনের মত ছিল। কিন্তু পৌছে ইস্তক কান্নাকাটি শুরু করেছিল। অপূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের কাউকে কাউকে আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে বাড়ি চলে আসতে দেখেছি।

অপরিচিত পরিবেশের সঙ্গে মোকাবিলা করার অপারগতা থেকে হোমসিক নেস গড়ে ওঠে।

৪. **প্রত্যাগমন** : প্রত্যাগমন হল ফেলে আসা দিনগুলিতে মনে মনে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। বাস্তব যখন কারও কাছে দুঃসহ হয়ে ওঠে তখন সে অতীতে ফিরে যেতে চায়। কারণ অতীত তার কাছে নিরাপত্তার প্রতীক। বাংলাদেশ থেকে যখন উদ্বাস্তুরা ভারতে এসে তীব্র সংকটের মুখে পড়ল, তখন অনেকের মধ্যেই প্রত্যাগমন স্পৃহা দেখা দিয়েছিল। কারণ তাঁদের ব্যক্তিত্ব এতদিন গ্রাম বাংলার নিশ্চিন্ত নিরুপদ্রব জীবনের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। ফলে ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গতা আসেনি। তাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে এসে ছেড়ে আসা গ্রামের স্বপ্নে বিভোর থাকলেন এবং অনেকে বানিয়ে বানিয় ফেলে আসা ঐশ্বর্যের কথা শোনাতেন। বড়-লোকের মানুষ না হওয়া ছেলেরা তাদের অতীতের গল্প শুনিয়ে থাকে। অনেক অসফল ব্যক্তি তাদের সফল বড়লোক আত্মীয়দের কথা শোনায়। বিশেষ করে বৃদ্ধেরা তো অতীতের কথা বলার সুযোগ পেলে আর ছাড়ে না। তাদের কাছে অতীত সব সময় বর্তমানের চেয়ে মধুময় সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।

৫. **নিষ্ঠুরতা** : প্রতিটি শিশুই ছোটবেলায় নিষ্ঠুর থাকে। তারা খেলনার পিস্তল দিয়ে সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলতে চায়। তারা ছাগ বলি কিংবা মুর্গি কাটা দেখে পুলক অনুভব করে। অপূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের বয়স্ক ব্যক্তিরা কোন ছুতোয় নাতায় হিংসাত্মক কাজ কর্মের মধ্যে ঢুকতে পারলে আনন্দ পায়। একটা পকেটমারকে মারার জন্য কিংবা ডাকাতকে গণপ্রহার দেবার জন্য বেশ কিছু লোক ছুটে আসে। দাঙ্গার সময় অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করার জন্য লোকের অভাব হয় না। তাই বলে সবাই এসব কাজে অংশ নেয় না। কিন্তু অপূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের মানুষদের মধ্যে রিরংসাবৃত্তি সামান্য উদ্দীপক পেলেই প্রকাশ্য হয়ে ওঠে।

এই ধরনের ব্যক্তিত্ব তাদের বউদের পেটায়। ছেলেমেয়েদের নৃশংসভাবে মারধর করে। তারা সর্বদা মারমুখী হয়ে থাকে। একটু সামান্য কারণেই মারধর করে।

১৯৭৪ সালে লিণ্টন স্ট্রিট ডাকঘরে খাম পোস্টকার্ড কিনতে গিয়ে দীর্ঘ কিউতে দাঁড়াতে হয়েছিল। দেখি একটি লোক লাইনে না দাঁড়িয়ে এক মহিলার মাধ্যমে খাম পোস্টকার্ড কিনছে। আমি তাঁকে বলি লাইনে দাঁড়ান। এই কথা বলতেই লোকটি মারমুখী হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে। তারপর দুচার কথায় বচসা হতেই লোকটি আচমকা আমায় আক্রমণ করে বসে। আমি সামান্য আহত হই। ঘটনাটি আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছিল। লোকটি আদালতে ক্ষমা চাওয়ায় বিচারকের অনুরোধে আমি তাকে ক্ষমা করে দেই। কিন্তু আমি

বুঝতে পারি, লোকটি একটি অপরিণত ব্যক্তিত্ব। নয়তো স্বাভাবিক মানুষ এ ধরনের অপরিণামদর্শিতা দেখায় না।

বয়স্ক ব্যক্তিরা অপরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলে সব সময় যে দৈহিক হিংসার মধ্য দিয়ে, নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করে তা নয়। তারা গালাগাল খিস্তি খেউড় ও অপমানসূচক কথাবার্তা ও আচরণের মধ্য দিয়ে তাদের মনোভাব প্রকাশ করে।

হম্বিতম্বি বা শাসানো নিষ্ঠুরতারই একটি প্রকাশ। দেখে নেবো। ঠ্যাং ভেঙে দেবো। বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। শুনিয়ে শুনিয়ে এসব কথা বলাকে ইংরাজিতে bully বলে। এই bully-র ই আর একটা নিষ্ঠুররূপ teasing. টিজিং এর ঠিক বাংলা প্রতিশব্দ নেই। একে বলা যেতে পারে খ্যাপানো। যেমন কাউকে একটা অপমানজনক নাম দিয়ে ডাকা। অথবা প্রকাশ্যে টিটকিরি মারা। এটি যখন বিকৃত যৌন ক্ষুধার রূপ নিয়ে মেয়েদের ওপর বর্ষিত হয় তাকে বলে ইভ টিজিং। কলকাতা, মুম্বই দিল্লিতে ইভ টিজিং একটি নিয়মিত অপরাধ। আত্মপ্রত্যাখ্যাত ব্যক্তিত্বরা যারা প্রচলিত সমাজ সিদ্ধ রীতিনীতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না তারাই অপরিণত ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয় এবং অপরকে আঘাত দিয়ে আনন্দ পায়। ইভ টিজিং এর মাধ্যমে বিকৃত যৌন কামনা চরিতার্থ হয়।

সুন্দরী মেয়েদের দেখে স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের দুতিনজন যুবক নিজেদের মধ্যে হয়তো যৌন আবেদন মূলক দুচারটি মন্তব্য করতে পারে। কিন্তু ইভ টিজাররা সেটা প্রকাশ্যেই করে এবং সুযোগ পেলে মেয়েদের গায়েও তারা হাত দেয়।

ইভটিজারদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে এরা অনেক সময় এক বিশেষ ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ছেলে যারা অঢেল পয়সার অধিকারী। তাদের বাবা-মায়েরা এত ব্যস্ত যে শিশু অবস্থায় তারা সন্তানকে উপযুক্ত সাহচর্য দিতে পারেনি। অথবা অত্যধিক আদর দিয়ে ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটতে দেয়নি। তারা কেউই পড়াশোনায় ভাল নয়, একারণে তাদের নিজেদের সম্পর্কে যথেষ্ট হীনম্মন্যতা ও ভাবগত (emotional) নিরাপত্তার অভাব বোধ রয়েছে। অনেক মেয়ে কামনা উদ্রেককারী পোশাক পরে রাস্তায় বার হয় এবং অতি সহজেই ইভ টিজিং এর শিকার হয়। কারণ ওই পোশাক ইভটিজারদের কাছে উদ্দীপকের কাজ করে।

নিষ্ঠুরতার মধ্যে গৃহ হিংসা বা domestic violence-এর কথা আগেই বলেছি। বধূ নির্যাতন এর মধ্যে পড়ে। বউকে মারধর করা ও তাকে শেষ পর্যন্ত হত্যা করার ঘটনা প্রায়ই ঘটে। কিন্তু এর উলটো ছবি অর্থাৎ পুরুষ নির্যাতনেব ঘটনাও আছে। ব্যাপারটি লোকে হেসে উড়িয়ে দেন, কারণ সামাজিক স্টিরিও টাইপ অনুসারে নাবী অবলা, তাই নারীর পক্ষে পুরুষ নির্যাতন অসম্ভব। কিন্তু পুরুষ নির্যাতনের বহু ঘটনা আমার নজরে এসেছে। এর মধ্যে একটি ঘটনার কথা বলি। স্বামী স্ত্রী দুজনে ডাক্তার, বিয়ের পর আরও উচ্চতর ডিগ্রির জন্য তাঁরা কানাডায় যান। সেখানে গিয়ে স্বামী আবিষ্কার করেন স্ত্রী উগ্রমেজাজের এবং স্বামীকে মানসিক নির্যাতন করে সে আনন্দ পায়। স্ত্রীর মানসিক নির্যাতনের মাত্রা বাড়তে থাকে এবং প্রায়ই স্ত্রী উগ্রচণ্ডী মূর্তি ধারণ করে স্বামীকে কিল চড় ঘুসি মারতে থাকে। স্বামী সহ্য করে দুটি কারণে। এক সে মেধাবী ছাত্র, পড়াশোনা নিয়ে থেকেছে ও বাবা মায়ের ওভার প্রটেকশনে মানুষ হবার পর বিদেশে গিয়ে ঘর সংসার করার ব্যাপারে সে কিছুটা নিরাপত্তার অভাব বোধ করেছে। দ্বিতীয়ত, স্ত্রীর গায়ে

পালটা হাত দিলে স্ত্রী বধূ নির্যাতনের অভিযোগ আনতে পারে এই ভয়ে সে নির্যাতন চেপে গেছে। এইভাবে তাদের দিন উদ্বেগের মধ্যে কাটছিল। এর মধ্যে ওদের একটি সন্তান হয়। ছেলেটি ভেবেছিল সন্তান হলে বুঝি বউয়ের মেজাজ পালটে যাবে। কিন্তু তা পালটায় না। স্ত্রী মাঝে মাঝেই উন্মাদের মত আচরণ করতে থাকে এবং প্রায়ই তাকে মারধর করতে থাকে।

অবশেষে একদিন স্বামীকে না জানিয়ে স্ত্রী তার শিশু সন্তানকে নিয়ে বিদেশ থেকে পালিয়ে কলকাতায় তার বাবা-মায়ের কাছে চলে আসে। এখানে যতদূর জানা গেছে মেয়েটির শৈশব অত্যন্ত মানসিক সংঘাতের মধ্যে কেটেছে। তার বাবা-মায়ের সম্পর্ক ভাল ছিল না তার ফলে সে ছোটবেলা থেকে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তায় ভোগে ও তার ব্যক্তিত্ব পীড়িত হয়ে পড়ে। যে স্বামীকে মারধর করে মায়ের ওপর তার বাবার আচরণের বদলা নিতে চায়।

মনে রাখতে হবে শৈশবে যে শিশু বাবা মায়ের ভালবাসা পূর্ণমাত্রায় পায়নি অথবা কোন কারণে সহপাঠীদের বৈষম্য ও টিজিং এর শিকার হয়েছে তারা বড় হয়ে অপরের সঙ্গে একই ধরনের ব্যবহার করে। এর কারণ তার মধ্যে আত্ম-প্রত্যাখ্যান বা Self rejection এর ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়। তখন সে এমন কিছু আচরণ প্রকাশ করে যা অন্যকে আহত করে বা অন্যের ক্ষতি করে। অর্থাৎ তার মধ্যে অন্যকে আঘাত দেবার নিষ্ঠুর প্রবৃত্তি জাগে। ওই মেয়েটি বিদেশে তার হাতের কাছে একটি নরম লক্ষ্য পায় তার গোবেচারা স্বামীকে।

সাফাই গাওয়া

মানুষ যখন কোন ব্যাপারে অপারগ হয় তখন তার অহংবোধ যাতে ঘা না খায় তার জন্য নিজের সপক্ষে কতগুলি যুক্তি খাড়া করে। এই যুক্তিগুলি যে সব সময় কাল্পনিক তা নয় কিন্তু দুর্বল। যাঁরা হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন, তাঁরাও সমাজের ওপর বা রাষ্ট্রের ওপর দায়িত্ব চাপান। ব্যক্তিত্ব গঠনে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেকখানি। সাবেক সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির যত ত্রুটিই থাক তারা অন্তত দেখিয়ে দিয়েছিল রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে সবাইকে সমান সুযোগ দিতে পারে এবং চরম দারিদ্র দূর করতে পারে। কিন্তু ব্যক্তির দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। আপনি যদি আপনার আত্মোন্নতির জন্য সক্রিয় না হন তাহলে কারও বাবার ক্ষমতা নেই আপনার উন্নতি করে। আমি উদাহরণ দিচ্ছি। আমি দুটি খুব গরিবের ছেলেকে বেছে নিয়েছিলাম তাদের লেখাপড়া শিখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করব। একটি ছেলের প্রথা বিরোধী ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল। সে ছিল জুভেনাইল ডেলিনকোয়েন্ট। লোককে প্রতারণা করত। তাকে আমি হাতের কাজ শিখিয়ে স্বনির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিলাম। বারাকপুরে কর্মযোগী নিত্যানন্দ মহারাজকে ধরে তাদের পলিটেকনিকে ইলেকট্রিকের কাজ শেখার কোর্সে ভর্তি করে দিলাম। ছেলেটি প্রায়ই ক্লাসে যেত না। আমি বললাম কেন যাও না? সে বলল, আমার ট্রেনভাড়া নেই। আমি তাকে কোয়াটারলি ট্রেনের টিকিট কেটে দিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছুদিন পরে ছেলেটি পড়া ছেড়ে আবার সমাজ বিরোধিতা করতে লাগল।

আর একটি গ্রামের তফসিলি সম্প্রদায়ের ছেলে। যার কথা আগেও একবার বলেছি তার মা লোকের বাড়ি কাজ করে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত গ্রামের ইস্কুলে পড়েছিল। গ্রামের এই প্রাথমিক ইস্কুলগুলিতে ছেলেমেয়েরা চার বছরে কিছুই শেখে না। ছেলেটি কোন রকমে বাংলায় তার নামটা সই করতে শিখেছিল। বীরভূমের রামকৃষ্ণ সেবা প্রতিষ্ঠানে বিনা পয়সায় হস্টেলে থেকে ছেলেটির পড়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। ছেলেটি মাধ্যমিক পাস করল। মহারাজরা তাকে বলেছিলেন সে ওখানে থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করে পলিটেকনিকেও পড়তে পারে। কিন্তু ছেলেটি ক্লাস এইট থেকেই ঝোঁক দিচ্ছিল যে আর পড়বে না। আমার চাপাচাপিতে মাধ্যমিক পাস করল। তারপর পড়া ছেড়ে দিল। ছেলেটিকে দু একটা ছোটখাটো কাজের অফার দেওয়া হল সে নিল না। সে বাঁধা ধরা চাকরি চায়। সরকারি চাকরি হলেই ভাল। স্ট্রাগল করতে একটুও রাজি নয়। তার বক্তব্য হচ্ছে : আমি গাঁয়ে পড়েছিলুম। রিকশ চালাতাম। ভালই থাকতাম। আমাকে তোমরা কেন হস্টেলে রেখে মাধ্যমিক পাস করালে? এখন আমার সব দায়িত্ব তোমাদের নিতে হবে। আসলে মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত ঘর থেকে আসা ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার ফলে সে নিজেকে অনবরত তুলনা করেছে তার গরিব অশিক্ষিত বাবা মায়ের সঙ্গে অন্যদের বাবা মায়ের। এর ফলে তার মা বাবার প্রতি ঘৃণা বোধ জেগে উঠেছে। তার ব্যক্তিত্ব ক্রমশ রুগ্ণ হয়ে পড়ছে। এতো হিতে বিপরীত ঘটনা। এখন সে নিজের সপক্ষে যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছে। কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে দুর্বল যুক্তি।

এখানে রাষ্ট্র ও সমাজের ভূমিকাটা এসে পড়ে। নিম্নবর্গের মানুষদের শুধু শিক্ষা দিলেই চলবে না—শিক্ষার সঙ্গে জীবিকাকে যুক্ত করতে হবে। তা না হলে শিক্ষাই বুমেরাং হয়ে দেখা দেবে। কারণ শিক্ষা যেমন চেতনা আনে, চেতনা জন্ম দেয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার। একটি মাধ্যমিক পাশ ছেলে এখন সিনথেটিক জামা প্যান্ট ও বাটার জুতো ছাড়া পরবে না। তার হাতে নগদ টাকা চাই। সে সিগারেট খাবে। রেস্টুরেন্টে বসে চপ-কাটলেট খাবে। এদিক-ওদিক ঘুরবে। কিন্তু তার পরিবেশ ভিন্ন। মা লোকের বাড়ি থেকে কাজ করে দিন গুজরান করে। সে স্বামী পরিত্যক্তা। অশিক্ষিত ক্ষেত মজুর বাবা হতাশায় সদা ক্রুদ্ধ। এই দুই ভ্যালু সিস্টেমের মধ্যে সংঘাতের একমাত্র সমাধান বৃত্তিমূলক শিক্ষা। সেই সঙ্গে স্বনির্ভর হবার শিক্ষা। কিন্তু কোন ইস্কুল আলাদা করে পিছিয়ে পড়া ছেলেদের কথা চিন্তা করে না। তারা ভাল ছেলেদের আরও ভাল করার চেষ্টা করে। কত ছেলে ফার্স্ট ডিভিশনে গেল জয়েন্ট এন্ট্রান্স পেল সেটা দিয়েই স্কুলের শ্রেণী নির্ধারণ হয়। সুতরাং থার্ড ডিভিশনে পাস করা ছেলেমেয়ে এবং ফেল করা ছেলে মেয়েরা রুগ্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। অথচ এরা সকলেই মানবসম্পদ। আমি বিশ্বাস করি না এই লাখ লাখ সাধারণ ছেলেমেয়েদের সমাজকে কিছুই দেবার নেই। বিশ্বাস করি না তারা সবাই নিম্নমানের এবং ব্যবহারিক জীবনেব সঙ্গে সমঝোতা করতে অপারগ। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এমন কোন ফর্মুলা নেই যা সর্বরোগহর। সকলের জন্য সমান প্রযোজ্য। প্রতিটি মানুষ আলাদা, তাই তাদের সমস্যার সমাধানের পথও আলাদা আলাদা। এজন্য চাই যথার্থ কাউনসেলিং। আমি কৃতনিশ্চয় যে স্কুলে মাস্টার মশাইরা যদি সঠিক কাউনসেলিং করেন তাহলে দুর্বল ব্যক্তিত্বের ছেলেমেয়েদের সকলেরই দুর্বলতা কাটিয়ে দেওয়া যায়।

যাক যে কথা বলছিলাম, অহংকে বাঁচানোর জন্য মানুষের সাফাইর অন্ত নেই। যারা পড়াশোনায় সুবিধে করে উঠতে পারেনা তারা পরীক্ষায় ভয় পায়। দেখবেন তাদের অনেকে

সুদর্শন ডাক্তারকে দেখলেই রোগীর আস্থা বাড়ে

পরীক্ষার আগে অসুস্থ হয়ে পড়ে। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি যারা অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা অধিকাংশই সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ; অন্তত একটা বিষয়ে খুব কাঁচা। যারা বড় রকমের অসুস্থ হয় সেটা দুর্ঘটনা। কিন্তু ছোটখাটো অসুস্থতা হয় পরীক্ষাভীতির জন্য। এই অসুস্থতাটা তখন পরীক্ষা না দেবার একটা ছুতো হয়ে দাঁড়ায়। একে মনোবিদরা বলেছেন 'আত্মরক্ষার কলাকৌশল'। আমাদের অহং যাতে অপারগতার জন্য হেয় প্রতিপন্ন না হয় সেটি বাঁচানোর জন্যই এই কলাকৌশল।

আবার পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট না হলে ছাত্রছাত্রীরা নানাভাবে এই Defense mechanism গড়ে তোলে—

* জ্বর গায়ে পরীক্ষা দিয়েছি তাই পরীক্ষাটা খারাপ হয়ে গেছে।

* বাবা-মায়ের অবস্থা খারাপ ছিল, প্রাইভেট টিউটর রাখতে পারিনি তাই ভাল রেজাল্ট হয়নি।

* আমি তো লিখেছিলাম ভাল কিন্তু অমুক অধ্যাপক ইচ্ছে করে নম্বর খারাপ করে দিয়েছে।

মানুষ কদাচ অকপটে নিজের ভুল-ত্রুটি অক্ষমতা স্বীকার করে। যারা নিজের ভুল স্বীকার করে এবং নিজের ব্যর্থতার দোষ অন্যের ঘাড়ে না চাপায় তারাই স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব। কোন প্রতিষ্ঠানের অবনতির জন্য কখনও এক নম্বরকে দায়ী করা হয় না। বলা হয় তাঁর অধস্তনরা তার সঙ্গে ঠিকমত সহযোগিতা করতে পারল না বলে তিনি কাজটায় সফল হলেন না।

কোন মানুষ যখন ব্যর্থ হয় অথবা কোন ব্যক্তির তুলনায় নিজেকে যখন সে হীন বলে মনে করে, তখন সে এমন কোন মানুষ বা বিষয়কে আক্রমণ করে বসে যার সঙ্গে

মূল বিষয়ের কোন যোগ নেই।

ক খ এর তুলনায় নিজেকে বঞ্চিত বলে ভাবে। অথচ ক, খ কে সেটা বলতে পারছে না। একদিন অন্য একটা ব্যাপারে তার সঙ্গে তার বসের কথা কাটাকাটি হল। ক তখন বলল তার সঙ্গে বৈষম্যমূলক ব্যবহার করা হচ্ছে। শুধু বলা নয় সে টেবিলে প্রচণ্ড ঘুঁসি মেরে বসকে জানিয়ে দিল। আমি চ্যালেঞ্জ করছি, আমি যথেষ্ট ভাল কাজ জানি। এই ঘুঁসি মারাটা আসলে খ এর বিরুদ্ধে তার ঈর্ষামিশ্রিত ঘৃণা। কিন্তু আঘাত খেল বেচারা টেবল।

অনেক হতাশ ব্যক্তি দেওয়ালে মাথা ঠোকে। চোরের ওপর রাগ করে লোকে ভাতের থালা ফেলে দেয়। হঠাৎ একটা কুকুরকে লাথি মারে।

অনেক সময় নিজের অক্ষমতা ঢাকার জন্য লোকে রাজা-উজির মারে। অথবা এমন এক স্বপ্নের জগতে বাস করে যেখানে কল্পনায় নিজেকে সফল লোক বলে মনে করে। এই ধরনের লোকরা মিথ্যে কথা বলে। এই মিথ্যে কথা শুধু নিজেকে জড়িয়ে নানা ধরনের গল্প চাউর করে যাতে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। একে বলে গুল মারা। অনেক সময় কোন অতৃপ্ত কামনা কল্পনার সাহায্যে পূরণ করার জন্যও লোকে গুল মারে। যেমন, আমাকে জেনারেল ম্যানেজারের পদ অফার করেছিল আমি নিই নি। আমি বড় সাহেবকে মুখের ওপর বলে দিয়েছি আমাকে দিয়ে আপনি অন্যায় কাজ করাতে পারবেন না ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি যখন একটি বাংলা সংবাদপত্রে চাকরি করতাম সেখানে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়া অপরাধ বলে গণ্য হত। মালিকপক্ষের প্রতিনিধি স্বরূপ একজন সাংবাদিক চিহ্নিত করতেন কে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, কে নয়। তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্য সবাই প্রমাণ করার চেষ্টা করত তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয়। তারা একই পদে সারাজীবন থাকতে পারলেই বরং খুশি হবে।

অনেক ব্যর্থ লোক সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। আমি যা পেয়েছি তাতেই সুখী। আর কিছু চাই না। বড়লোক হবার মোটেই ইচ্ছা নেই। আমার কোন চাহিদাই নেই। আসলে প্রত্যেক লোকেরই বড়লোক হবার ষোল আনা ইচ্ছা আছে। তবে বেশির ভাগ লোকই চায় বেশি পরিশ্রম না করে যাতে সহজে বড়লোক হওয়া যায়। এমনকি অন্যের ক্রোড়পতি বনার দৃশ্য দেখতে রাত নটার সময় কোটি কোটি লোক টিভির সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। কারণ কৌন বনেগা ক্রোড়পতি মার্কা প্রোগ্রামে দেখা যায় কত সহজে দুচারটে সহজ সহজ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কত লোক অন্তত কয়েক লাখপতি হয়ে ফিরে আসছে। বহু লোক ভাণ করে সে দারুণ সুখী এবং সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে তার কোন দুঃখ নেই, হতাশা নেই। আমি যখন হতাশ হবেন না বইটা বার করলাম। তখন নাম শুনে বহু লোক বলেছিলেন (এখনও বলেন) এ বই তাঁদের পড়ার দরকার নেই। তারা হতাশ নন।

একথা ঠিক নিজেকে তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট মনে করাটা সুখী জীবন যাপনের একটি সহজ পথ। কিন্তু দেখতে হবে আপনি প্রকৃত সুখী না লোকের কাছে আত্মসম্মান বজায় রাখার জন্য সুখী সাজছেন। কথামালার গল্পের সেই শৃগাল যে বার বার লাফ দিয়ে দ্রাক্ষাফলের লাগাল পায়নি। তখন তার অহংকে সান্ত্বনা দেবার জন্য সে বলে, দ্রাক্ষাফল অতি টক। না খেয়েছি ভালই হয়েছে। কিন্তু এটা কী তার মনের কথা? শৃগাল কি সত্যিই দ্রাক্ষাফলের লোভ মন থেকে বিসর্জন দিয়েছিল?

অহংবোধকে লোকের চোখে হেয় হতে না দেওয়ার আরও অনেক প্রতিরক্ষা কৌশল লোকে ব্যবহার করে। যেমন কর্মজীবনে যাঁরা স্বীকৃতি পান না, তাঁরা বিভিন্ন ক্লাব সমিতি অ্যাসোসিয়শন নিয়ে মেতে থাকেন। আমবা ঠাট্টা করে বলি অসফল সাহিত্যিকরাই নানা সাহিত্য সমিতির কর্মকর্তা হন। কারণ সফল সাহিত্যিকদেব লেখাব বাইরে সময় নষ্ট কবার মত সময় নেই। তাঁরা বড়জোর বার্ষিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে বক্তৃতা দিয়ে আসতে পারেন। একথা সমস্ত পেশাদাব সংগঠনের ক্ষেত্রেই খাটে। ব্রিফলেস উকিল, ব্যর্থ ব্যবসায়ীদের অনেকেই রাজনীতিতে চলে আসেন। কারণ যে পেশার জন্য নিজেকে তৈরি করেছে সেই পেশায় কল্কে না পেলে তার অহং এ আঘাত লাগে। তখন সে ঘাটতি পূরণের জন্য আর একটি সহজ দিক বেছে নেয়, যেখানে কাজে মশগুল থেকে সে ব্যর্থতার হতাশাকে ভুলে যেতে পারে।

এছাড়া নিজের কোন ব্যর্থতা বা অপারগতার ফলে তাকে যাতে হেয় প্রতিপন্ন না হতে হয় সেজন্য অনেকে আগে থেকেই কতগুলি কট্টব মনোভাব ব্যক্ত করে। কেউ রাতাবাতি বিপ্লবী ও উগ্রপন্থী সাজে। কেউ প্রমাণ করার চেষ্টা করে সে একজন উন্নাসিক-বুদ্ধিজীবী। কেউ রাতারাতি দাড়ি গোঁফ রাখতে শুরু করে। কেউ রাতারাতি ধর্মপরায়ণ হয়ে ওঠে। টিকি দাড়ি রাখে। টুপি পরে, ফোটা তিলক কাটে। কেউ গ্রহের ওপর দোষ চাপিযে নানা আংটি পরে। রত্নধারণ করার জন্য ধারকের চেয়ে জ্যোতিষী ও গ্রহরত্ন বিক্রেতাদের প্রচুর উপকার হয়। ভারতে গ্রহরত্নেব ব্যবসায় এখন কোটি কোটি টাকা নিয়োজিত। গ্রহরত্ন পরে মানুষের অহংবোধ এতে পরিতৃপ্ত হয়। তার ব্যক্তিগত অপরাগতার জন্য সে গ্রহকে দায়ী করে এবং রত্নধারণ করে মনে মনে একটা ফ্যানটাসি তৈরি করে যে দুষ্টগ্রহদের সে এখন বন্দী করে ফেলেছে। তার আর কোন ভয় নেই। অহংবোধকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করার আর একটা উপায় হল ইচ্ছে করে ভুলে যাওয়া। ধরুন যে প্রেমিক বা প্রেমিকা প্রথম প্রেমের ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়েছেন তিনি যত দ্রুত সম্ভব ওই স্মৃতিকে ভুলে যেতে চান। তাঁর কাছে স্মৃর্তি শুধু বেদনা। আবার অনেক সময় দেখা যায় বহুকাল আগে এক বন্ধু আপনার মনে দুঃখ দিয়েছিল। দীর্ঘদিন পরে তার প্রসঙ্গ উঠল। আপনি তার নামটা মনে করতে পারলেন না। আসলে আমরা ভুলতে চাই বলেই অনেক সময় তা ভুলে যাই।

ব্যক্তিত্বকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার আর একটা কলাকৌশল আক্রমণকারীকে উলটে হেয় করা। স্কুল-কলেজে কোন শিক্ষকের সঙ্গে কোন ছাত্রের সংঘাত হল। সংঘাতের কারণ শিক্ষক ছাত্রটির ব্যবহারেব সমালোচনা করেছেন, তাকে খুব বকেছেন। ফলে ছেলেটির অহং আহত হয়েছে। এবার সে অহংকে যথাযথ রাখার জন্য মাস্টার মশাইকে উলটে হেয় প্রতিপন্ন করবে। যদি দেখেন, কেউ কোন ব্যক্তির অসাক্ষাতে সেই ব্যক্তির নিন্দা করছে সঙ্গে সঙ্গে বুঝবেন, ওই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দ্বারা তিনি একদা আক্রান্ত হয়েছেন অথবা হতে পারেন। তখনই তিনি তাকে হেয় প্রতিপন্ন করাব চেষ্টা করছেন।

কীভাবে অন্য ব্যক্তিত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয় তার কতগুলি পবিচিত স্টিরিও টাইপ আছে। যেমন :

১. মেয়েরা হলে চরিত্র দোষ দেওয়া হয়। বলা হয় আরে ওই—কত লোকের সঙ্গে —তার ইয়ত্তা নেই।

২. মেয়েরা উঁচুপদে গেলে বলা হয় তার যৌন আবেদনই তাকে সাহায্য কবেছে।

৩. ওর বসের সঙ্গে ওর যে একটা গোপন সম্পর্ক আছে তা কি তোমরা জানো? ওর উন্নতির কারণ এটাই।

৪. পুরুষ মানুষ হলে বলা হয় তেল দিয়ে উঠেছে। আমি তেল মাখাতে পারলে আমিও উঠতাম।

: লাক ভাই লাক, স্রেফ লাকের জোরে করে খাচ্ছে।

৫. খুব বাজে লোক। অহংকারী। কাউকে মানুষ মনে করে না। আমি একদিন ওর কাছে গিয়েছিলাম আমাকে কোন সাহায্যই করল না।

৬. ওর বউ ওর সঙ্গে থাকে না। আর ওর ছেলেটাও বাবার মত হয়েছে।

৭. শ্বশুরের জোরে উঠেছে। আমার যদি অমন শ্বশুর থাকত, আমিও উঠতাম।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। নিজের ব্যর্থতাকে চাপা দেওয়ার এ এক বিধিদত্ত কলা কৌশল। এই অবমূল্যায়ন ছাড়া ব্যর্থ ও অপারগ ব্যক্তিত্বের টিকে থাকা অসম্ভব।

মানুষ বোঝে না তার অপারগতার জন্য, ব্যর্থতার জন্য মূলত সেই দায়ী। অফিসে উন্নতি করতে গেলে বসকে খুশিতে রাখতে হয়। আপনি কখনও জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে ঝগড়া করে টিকে থাকতে পারেন না। আপনি কখনও আশা করতে পারেন না, আপনি বসের সঙ্গে ক্রমাগত ঝগড়া করবেন, তার নামে কর্তৃপক্ষের কাছে নালিশ করবেন অথচ বস আপনাকে দুধের বাটি দেবে। বস কাজের লোক এবং অনুগতকেই প্রমোশনের জন্য নির্বাচিত করবে।

দ্বিতীয়ত, আনুগত্য ব্যাপারটি এমন যে সেটি মনে মনে রেখে দিলে হয় না— কায়মনবাক্যে সেটা প্রকাশ করতে হয়। একে খোশামোদ বলে অভিহিত করা ঠিক নয়। আনুগত্যের মধ্যে সন্দেহ ও দ্বিধা রাখলে সেটা আর আনুগত্য থাকে না। কিন্তু যে শুধু তার জনসংযোগ জ্ঞানের অভাবে প্রমোশন পেল না অথবা তার কর্মদক্ষতা দেখাতে পারল না তার পক্ষে এই ব্যর্থতা মেনে নিতে গেলে নিঃসন্দেহে মনের ওপর চাপ পড়ে। কিন্তু প্রতিরক্ষা কৌশল জানা থাকলে জ্যোতিষ মতে সময় খারাপ যাচ্ছে জানতে পারলে অথবা বসকে আচ্ছা করে গালাগাল দিতে পারলে তখন অহং আবার তার শক্তি ফিরে পায়। অনেকে অহংকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য 'শো-অফ' করে। স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এটা হামেশাই দেখা যায়। পড়াশোনায় যারা ভাল হয় না, দেখবেন তারা চুলে উত্তম ছাট দিচ্ছে। টেরি বাগাচ্ছে। দামী দামী জামা কাপড় পরছে। মেয়েরাও উগ্রভাবে সাজগোজ করে শো-অফ করে তাদের ব্যক্তিত্বের নানা ঘাটতি ঢাকার জন্য।

পশ্চিমদেশে চখরা বখরা জামা পরে, কান বিঁধিয়ে, হাতে উল্কি কেটে অনেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কেউ এমন আচরণ করে যাতে করে সকলের দৃষ্টি তাদের ওপর যায়। অপরকে হাসির খোরাক জোগানোর জন্য সে ক্লাউনের মত আচরণ করে। সব কিছুই নজর কাড়ার জন্য।

মানুষের এই প্রতিরক্ষা কৌশলের উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের অসম্পূর্ণতাকে দূর করা। সেটি করা যায় এক : নিজেকে লোকের কাছে বড় করে দেখিয়ে। দুই : অন্যকে নানাভাবে হেয় করে। যখনই দেখবেন কেউ নিজের সাফল্যের কথাই সাতকাহন করে বলছে, আপনার কথা শুনছে না তখনই বুঝবেন লোকটি ইগো দুর্বলতায় ভুগছে। যদি সে নিজেকে বড় না করে দেখায় ; তাহলে সে অন্যকে ছোট করে। আমি ইগো সমস্যায় ভোগা এক ভদ্রলোককে

বলতে শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ সারা জীবনে সাত-আটটির বেশি পাতে দেবার যোগ্য কিছু লেখেননি। এই ভদ্রলোক কিন্তু হেঁজিপেঁজি লোক নন। বাংলার সংস্কৃতি জগতের এক গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব। কমিউনিস্টরা যেমন এক সময় রবীন্দ্রনাথকে বুর্জোয়া কবি বলে হেয় করেছিল। এক শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি যেমন নিজেদের সাম্প্রদায়িক চরিত্র ঢাকার জন্য বলেন, বঙ্কিমচন্দ্র একজন সাম্প্রদায়িক লেখক।

আজকাল তরুণ-তরুণীদের মধ্যে মদ্যপান এবং ড্রাগের নেশা ছড়িয়ে পড়েছে। সিগারেট ও মদ যারা খায় তারা প্রধানত নিজেদের অহংবোধকে তাজা রাখার জন্যই খায়। সিগারেট এক ধরনের শো-অফ। মদ সমাজেব শাসনকে চ্যালেঞ্জ জানাবার একটি প্রতীক। অবশ্য পরিণত বয়স্কদের কাছে মদ্যপানের উদ্দেশ্য বিভিন্ন। সামাজিক মেলামেশার অঙ্গ, নয় সংস্কৃতির অংশ, সাময়িকভাবে ক্লান্তি ও অবসাদকে দূরে রাখার প্রক্রিয়া ও হতাশ ব্যক্তির কাছে নিজেকে কিছুক্ষণ ভুলে থাকার এক অমোঘ ওষুধ।

কিন্তু তরুণ-তরুণীরা ড্রাগকে গ্রহণ করে সমাজ ও অথরিটির বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদের অঙ্গ হিসাবে। প্রতিবাদ কেন? কারণ তারা মনে করে তাদের ব্যক্তিগত ক্রটি বিচ্যুতির জন্য অথরিটি (বাবা-মা শিক্ষক, আত্মীয় স্বজন ও সরকার) দায়ী। এরই জন্য তাদের অহং বিকশিত হতে পারছে না। কিন্তু তারা মনে করে একটা দারুণ কিছু সাহসিকতার কাজ দেখিয়ে তারা প্রমাণ করবে যে 'হাম কিসিসে কম নেহি'। সেজন্য তারা ড্রাগ খায়। যারা ইতিবাচক ভাবে অহং বোধকে পতন থেকে রক্ষা করে, তারা পাহাড়ে ওঠে, সাইকেলে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে, বাড়ি থেকে চলে গিয়ে মুম্বই, দিল্লি মাদ্রাজে গিয়ে জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করে।

'To most Psychaiatrists the increase in marijuna smoking represents not so much a search for new thrillis as the traditional of youngsters against adult authority [৪৫]

'অধিকাংশ মনোবিদের মতে মরিজুয়ানা খাওয়াটা শুধু উত্তেজনা লাভের জন্য নয়, এটি বয়স্ক প্রবীণ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তরুণের বিদ্রোহ।

মদ্যপান এবং ড্রাগ গ্রহণের ফলে সাময়িকভাবে লোকে নানা মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। কিন্তু আগেই বলেছি এটা সাময়িক এবং এব ধ্বংসাত্মক পরিণতি সম্পর্কে সবাই অবগত। কিন্তু তবু লোকে মদ ও ড্রাগ ধরছে এই কারণে যে মানুষের অহংবোধ বিভিন্ন কারণে নাড়া খেলে তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য মনের ভেতরেই চেষ্টা চলছে। চেতন মনের বাইরেই এটা ঘটে থাকে। মাদক এখানে মানসিক পেন কিলারের কাজ করে। তবে মানসিক পেন কিলার সব ধরনের ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করে না।

এক বিশেষ ধরনের ব্যক্তিত্ব মানসিক পেন কিলার গ্রহণ করে। J G Gilbert এবং D N Lombard ড্রাগ নেশাখোর যুবকদের মধ্যে এক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে এই নেশাখোরদের চারিত্র লক্ষণ হল এরা : দায়িত্ব জ্ঞানহীন, অনির্ভরশীল, আত্মকেন্দ্রিক, সামাজিক রীতিনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ, কোন লক্ষ্য অর্জনের প্রতি একাগ্র চিত্ত নয়। যখনই সে কিছু চায় তখনই তার সেটা পেতে ইচ্ছা করে। সে অধৈর্য এবং বিরক্তি উৎপাদক। অথরিটির বিরুদ্ধে প্রয়োজন হলে দারুণভাবে সোচ্চার।

অবশ্য ওপরের চারিত্র লক্ষণ যাদের, তারা সবাই যে মদ ও ড্রাগ ধরবে এমন কথা

নেই। ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মদ এবং ড্রাগ এখনও মানসিক দুঃখ মেটাতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না। এদেশে অপরাধীদের মধ্যেই ড্রাগের প্রচলন বেশি। এটির একটা কারণ ড্রাগ বিক্রির সঙ্গে তারা জড়িত থাকায় সহজেই তাদের হাতে ড্রাগ আসে। যা তাদের জীবিকা সেটাই তাদের জীবন নষ্ট করে।

ব্যক্তিত্বের কতগুলি নেতিবাচক দিক একালের তরুণ সমাজের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রকট হয়ে উঠছে। মুশকিল হচ্ছে এদেশে সামাজিক মনস্তত্ত্বের চর্চা খুবই সীমিত। একারণে বহু বৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ বাকি। আমি শুধু আমার দেখা কতগুলি কেস স্টাডি এখানে দিলাম।

দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ঃ রূপক বিবাহিত। তার বাবা ব্যবসায়ী। তার বাবা তাকে বিয়ে দিয়েছেন। রূপকের দুই ছেলে এক মেয়ে। সে আলাদা ব্যবসা করে। বাবার কাছ থেকেই সে ব্যবসার মূলধন যোগাড় করেছে। ব্যবসা থেকে তার আয় ভালই। কিন্তু সে সংসার খরচের জন্য বাড়িতে এক পয়সাও দেয় না। তার ছেলেমেয়ে অসুস্থ হলে ডাক্তার ওষুধের খরচও বাবাকে করতে হয়।

২. রুমি দিল্লির জে এন ইউতে ভর্তি হয়েছে। হস্টেলে থাকে। রুমির বাবা মা কলকাতায়। রুমির পিসতুতো দাদা সমর দিল্লিতে একটি ফার্মে কাজ করে। রুমির বাবা মা সমরকে ডেকে বলল, তুই দিল্লিতে আছিস বলেই আমি রুমিকে দিল্লিতে পাঠাচ্ছি। তুই একটু মাঝে মাঝে বোনের খোঁজ নিবি। মাস ছয়েক গেল। সমর একবারও রুমির খোঁজ নেয়নি বা রুমিকে ফোন করেনি। এর মাঝে রুমি একদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তবু সমরের আর পাত্তা পাওয়া যায়নি।

৩. যুধাজিৎ ও শম্পা দুজনেই ছাত্রছাত্রী। থাকে শিলচর শহরে। পরীক্ষায় পাস করার পর যুধাজিৎ দিল্লি গিয়ে নিজের চেষ্টায় একটি চাকরি দেখে নিল। শম্পাকে স্যার কলকাতায় চিঠি লিখে পাঠালেন কয়েকজনের কাছে। তাদের মধ্যে একজন শম্পাকে একটি ভাল চাকরি দিল। শম্পা কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত। যতবার কর্ম পরিবর্তন হয়েছে যুধাজিৎ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্যারকে জানিয়েছে। একবার যুধাজিতের বাবা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে অটো নিয়ে স্যারের সঙ্গে দেখা করে যুধাজিতের চিঠি দিলেন। কি না যুধাজিৎ আই আই এম বাঙ্গালোরে একটি ভাল চাকরি পেয়েছে সে খবরটা স্যরকে না দেওয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। অন্যদিকে শম্পা চাকরি পাওয়ার পর স্যারের সঙ্গে আর যোগাযোগ করেনি। একবার সরস্বতী পুজোর সময় স্যার কলকাতা গিয়ে শম্পাকে ফোন করলেন। শম্পা মুখে খুব আনন্দ দেখাল। স্যার বললেন, তোমাকে অনেকদিন দেখি না, তুমি আজ দুপুরে আমার সঙ্গে খাবে। শম্পা রাজি হল। স্যারের স্ত্রী রান্নাবান্না করে অপেক্ষা করছেন। শম্পা আর আসে না। বেলা দুটোয় শম্পার ফোন এল : স্যার, আসতে পারছি না। আমার বস আমাকে ছুটির দিনে অফিসে যেতে বলেছেন, আমি অফিসে যাচ্ছি। তারপর থেকে দুবছরের মধ্যে শম্পার সঙ্গে স্যারের আর কোন যোগাযোগ হয়নি।

৪. শেখর এক সরকারি অফিসে সেক্রেটারির পি. এ। যখনই কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজের চাপ আসে তখনই সে কামাই করে।

৫. রবীন নবীন ও হিমু তিনভাই। বাবা নেই। নাগেরবাজারে তার বাবা বাড়ি করে ক্যান্সারে মারা যান। মা খুব কষ্ট করে সংসার চালিয়ে তিন ছেলেকে মানুষ করে। দুছেলের

বিয়ে হয়ে যায়। দুছেলেই বিয়ের পর বৃদ্ধ মাকে রেখে আলাদা বাসায় চলে যায়। শুধু অবিবাহিত্রা ছোট ছেলে মায়ের কাছে থাকে। ইতিমধ্যে মায়ের হার্ট অ্যাটাক হয়। ছোট ছেলে দাদাদের খবর দেয়। কিন্তু আসছি আসছি করে কেউ আসেনি।

৬. সঞ্জিত বাবার একমাত্র ছেলে। একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে চাকরি করে। তার বাবা নাগপুর থাকেন। মা আর ছেলে ও একটি রাতদিনের কাজের মেয়ে বাড়িতে। কিন্তু সঞ্জিত বাড়ির কোন কাজ করতে চায় না। এমনকি রাতের বেলা ঘরের জানালাগুলি বন্ধ করতে ও তার নিজের ঘরগুলি ঝাড়পোছ করতেও তার আপত্তি। কারণ তার নাকি সময় নেই।

ওপরে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার ছটি উদাহরণ দিলাম। আরও অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা আসে দুর্বল ব্যক্তিত্ব থেকে। দায়িত্বজ্ঞানহীনতা শৈশবের পারিবারিক পরিবেশ থেকে জন্ম নিতে পারে। অত্যাধিক প্রটেকশন দিয়ে সন্তানকে মানুষ করলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জন্মায় না। যদি অহং ঠিকমত বিকশিত হতে না পারে অথবা কোন কারণে অহংবোধ যদি আক্রান্ত হয় তাহলেও মানুষ দায়িত্বহীন হয়। দায়িত্বহীনতা প্রথম দিকে প্রচ্ছন্ন Withdrawal বা প্রত্যাহার হিসাবে দেখা দেয়। অনেক ক্ষেত্রে তা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে ব্যক্তি সামান্যতম দায়িত্ব নিতে ভয় পায় ও শেষ পর্যন্ত নেশার কাছে আত্মসমর্পণ করে এক কল্পনার জগতে বাস করতে থাকে।

আত্মহত্যার প্রবণতা

এই বই-এর প্রথম দিকে বলেছি মৃত্যু একটা প্রবৃত্তি। সব মানুষই কোন না কোন সময় অথবা বহু সময় মৃত্যু কামনা করে। আবার সব মানুষই মৃত্যুকে ভয় করে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের এই পরস্পরবিরোধী কামনাকে নিয়ে একদা লিখেছেন। মরণরে তুহুঁ মম শ্যামসমান। আবার লিখেছেন, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে। অস্বাভাবিক পথে নিজেকে হত্যা করার নাম আত্মহত্যা। হিন্দুরা আত্মহত্যাকে পাপ বলে মনে করেন। কেন পাপ সে কথা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বলেনি। পাপ এই কারণে যে জীবনকে পূর্ণ বিকশিত হতে না দেওয়া ও তার সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেওয়া প্রকৃতির রীতির বিরুদ্ধে। মানুষ প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রতিটি মানুষের জীবন অনন্ত সম্ভাবনা পূর্ণ। প্রত্যেকেরই সমাজে কিছু না কিছু ভূমিকা আছে। অনেক সময় দেখা যায়, একজন দরিদ্র ও জীবনে ব্যর্থ ব্যক্তি এক প্রতিভাধর সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। চার্লস ডিকেন্স, জর্জ বার্নাডশ থেকে শুরু করে মেঘনাদ সাহা, ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার সকলেই দরিদ্র বাবা মায়ের সন্তান। বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণের পিতামাতা বিখ্যাত কেউ ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, প্রথম জীবনে কৃতিত্ব দেখাতে না পারলেও শেষ জীবনে বহু মানুষ বিখ্যাত হয়েছেন। যৌবনে ব্যর্থ হয়ে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে কৃতী হয়েছেন। তাছাড়া কোন মানুষের জীবনে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ থাকতে পারে না। সুখ দুঃখ চক্রাকারে আসে।

কিন্তু তবু সাময়িকভাবে হতাশ হয়ে লোকে আত্মহত্যা করে। অনেক সময় লোকে হঠাৎ আত্মহত্যা করে বসে। তার কিছুক্ষণ আগেও লোকে জানতে পারে না। আবার অনেক সময় অনেক দিন ধরে আত্মহত্যার জন্য পরিকল্পনা করে কেউ কেউ। আত্মহত্যার কারণ

ব্যর্থতা। আত্মহত্যা তাই Self rejection : আত্মপ্রত্যাখ্যান। আমি আমাকে শাস্তি দিলাম বা প্রত্যাখ্যান করলাম। অনেক সময় রোগ যন্ত্রণা ও মানসিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে লোকে আত্মহত্যা করে।

আত্মহত্যা অসুস্থ ব্যক্তিত্বের চরমতম প্রকাশ। মনোবিদরা বলেন, এমনকী যারা মুখে আত্মহত্যার কথা বারবার বলেন বুঝতে হবে তাদের ভেতরে ভেতরে আত্মহত্যার প্রবণতা আছে। হয়তো আত্মহত্যা করার মত তাঁদের সাহস নেই। কিন্তু যে Self rejection থেকে এই প্রবণতার উৎপত্তি তার বীজ ওর মধ্যেও আছে। কাজেই যিনি বলছেন, আমি একদিন গলায় দড়ি দিয়ে মরবো তিনি আত্মপ্রত্যাখ্যাত এবং অসুস্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। এই ধরনের উক্তিকে খুব হাল্কাভাবে নেওয়া উচিত নয়। যারা সমাজ ও পরিবেশের সঙ্গে সমঝোতা করতে ব্যর্থ হন এবং হাল ছেড়ে দিয়ে বসে থাকেন তাদের মধ্যেই আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। বয়ঃ সন্ধির সময়টায় ছেলেমেয়েদের ভাবাবেগ প্রবল থাকে। ১৪ থেকে ১৮ বছরই হল আত্মহত্যার দুঃসময়। এমন কোন ব্যক্তি নেই যার স্কুলে পড়ার সময় একটা না একটা আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। আমি যখন স্কুলের পড়ি তখন আমার দুজন সহপাঠী আত্মহত্যা করে।

বয়ঃসন্ধিকালে প্রধানত তিনটি কারণে ছেলেমেয়েরা আত্মহত্যা করে। পরীক্ষায় ফেল করলে। ফেল করার ফলে তার মধ্যে ব্যর্থতার চেয়ে একটা লজ্জা ও ভয় কাজ করে। বাবা মা হয়তো তাকে এই ব্যর্থতার জন্য বকাবকি করবে। দুই : এই বয়সে কোন ছেলে বা মেয়ের 'প্রেমে' পড়ে যদি অন্যপক্ষের কাছ থেকে সাড়া না আসে তাহলে সে নিজেকে প্রত্যাখ্যাতভাবে এবং যুক্তি দিয়ে ভাবাবেগকে রোধ করার মত বৌদ্ধিক ক্ষমতা তার জন্মায় না। তৃতীয়ত নানা কারণে প্রিয়জনের (প্রধানত বাবা মা ও শিক্ষক) কাছ থেকে তীব্র অপমানিত হলে তার আত্মপ্রত্যাখ্যান স্পৃহা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। বেশ কয়েকবছর আগে মধ্য কলকাতার এক অভিজাত গার্লস স্কুলের একটি মেয়েকে শিক্ষিকা তীব্র ভর্ৎসনা করায় মেয়েটি বাড়ি গিয়ে কাপড়ে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করে। মেয়েটির অপরাধ ছিল সে অন্যের খাতা থেকে ওয়ার্ক এডুকেশন এর টাস্ক নকল করেছিল। এই খবরটি পত্রিকায় তোলার জন্য মেয়েটির বাবা আমার কাছে কয়েকবার এসেছিলেন বলে ঘটনাটা মনে আছে।

মহিলাদের ক্ষেত্রে মনোপজের পর (৪৫—৫৪) এক সংকটজনক সময়। এই সময়ে তার যৌন আকর্ষণ কমে যায়। অনেকের মধ্য কামশীলতা আসে এবং দাম্পত্যজীবন অর্থহীন হয়ে ওঠে। তার ওপর ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যায়। মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। ছেলে বউ নিয়ে আলাদা হয়ে যায়। অনেকের জটিল স্ত্রী-রোগ দেখা দেয়। এই অবস্থাটা যেন দাম্পত্যজীবনের এক চরম পরীক্ষা। মহিলারা মুখে বার বার আত্মহত্যার কথা বলে। তাদের মেজাজ সব সময় তিরিক্ষি হয়ে থাকে। তাদের সমস্ত হতাশা বোধ এবং লক্ষ্য তার স্বামীর ওপর গিয়ে পড়ে।

পুরুষের জীবনের সংকটজনক সময় ষাটের পর। অর্থাৎ অবসর নেওয়ার পর। আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি পেনসন পান না। তাদের সারা জীবনের জমা টাকা ছেলেমেয়েদের

বিয়ে ও বাড়ি করতে গিয়ে ব্যয় হয়ে যায়। এ সময়টায় ডাক্তার ওষুধের পিছনে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। ছেলেমেয়েরা বহু ক্ষেত্রে বাবা মায়ের সুচিকিৎসা ও দেখাশোনার ভার নেয়না। অনেকের স্বামী ও স্ত্রী মারা যায়। এই অবস্থায় ব্যক্তিত্বের মধ্যে যথেষ্ট দুর্বলতা দেখা দেয়। আত্মপ্রত্যয়ের অভাব থেকে আত্মপ্রত্যাখানের প্রবণতা জেগে ওঠে।

প্রৌঢ়ত্ব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত আত্মপ্রত্যাখ্যানের প্রবণতা রোধ করার একমাত্র উপায় হল আধ্যাত্মিক চিন্তায় বেশি করে আত্মস্থ থাকা। মনে রাখতে হবে পরিবেশ সব সময়ই ব্যক্তিত্বের পথের কাঁটা। সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার পথে পরিবেশই বাধার সৃষ্টি করে। সামাজিক পরিবেশ বৃদ্ধদের প্রতিকূল। কারণ বর্তমানে বৃদ্ধদের কোন সামাজিক সম্মান নেই। তাদের আর্থিক নিরাপত্তার জন্য কোন সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা আমাদের দেশে গড়ে ওঠেনি। বৃদ্ধদের পক্ষে কোন সামাজিক বাতাবরণ তৈরি হয়নি। তাছাড়া পারিবারিক জীবনে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক গুলি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিকূল পরিবেশের জন্য বৃদ্ধদের যৌবন থাকতেই সচেতন থাকতে হবে।

* যৌবন থেকে বৃদ্ধদের সম্মান দেবার জন্য সামাজিক আন্দোলনের সামিল হন। কারণ আপনিও একদিন বৃদ্ধ হবেন।
* সঞ্চয় ও জীবন বিমার মাধ্যমে বৃদ্ধ বয়সের জন্য সঞ্চয় করুন।
* নিজের অর্থে তৈরি করা বাড়ি কখনও জীবদ্দশায় ছেলেমেয়ের নামে লিখে দেবেন না।
* বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত স্বনির্ভর থাকার চেষ্টা করুন। যৌবন থেকে স্বাস্থ্যের ওপর নজর দিন। যৌবনকালে ব্যায়ামের অভাব, ওবেসিটি বা মেদবৃদ্ধি, অত্যধিক মদ্যপান ও ধূম্রপান, বহুগামিতা ও যৌন যথেচ্ছচার অধিক রাত্রি জাগরণ, অর্থনৈতিক দুর্নীতি, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

তেরো

বি-স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব (Abnormal Personality)

আমরা এ পর্যন্ত অসুস্থ ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। আগেই বলেছি আমাদের সকলের ব্যক্তিত্বই কম-বেশি অসুস্থতার শিকার। কারণ আমরা কেউই সচেতনভাবে ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করি না। ব্যক্তিত্ব যেন স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা বনফুল। আমরা একে জল সার কিছুই দিই না। তা প্রকৃতির দেওয়া জলেই বড় হয়ে ওঠে।

কিন্তু প্রকৃতি যে সব সময় সুগন্ধি ফুল গাছ সৃষ্টি করবে তা নয়, বিষাক্ত গাছও সৃষ্টি করে। ব্যক্তিত্ব অসুস্থ হলে সময়মত তার প্রতিকার না করলে তা থেকে বি-স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি হতে পারে। মনোবিদরা এই বি-স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের নাম দিয়েছেন সাইকো নিউরোসিস বা মনো-স্নায়বিক রোগ। আর একটি হল সাইকোসিস বা কঠিন মনোবিকার।

সাইকোনিউরোসিস ছোটখাটো মনের অসুখ। এঁরা বাস্তব বিচ্যুত নন। সাধারণের মতই জীবন নির্বাহ করেন। আপনি যদি মনঃস্তত্ত্ব কিছুটা না জানেন তাহলে সাইকোনিউরোটিক রোগীকে ধরতে পারবেন না। কিন্তু একজন সাইকোনিউরোটিক স্বাভাবিকভাবে উৎপাদনশীল কাজকর্ম করতে পারেন না। তার কাজে ভুল হতে পারে। কাজের গতি কমে যেতে পারে। অথবা তিনি কাজকর্ম দুম করে ছেড়ে দিতে পারেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লোকের কাছে স্বাভাবিক। কিন্তু মনোবিদদের কাছে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। এই ধবনেব লোককে কোন দায়িত্বপূর্ণ কাজ দিলে তিনি সব ভণ্ডুল করে দিয়ে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবেন।

এম এ ব্রাউনের মতে : সাইকো নিউরোটিক হল সেই ব্যক্তি যার ব্যবহার সমাজ স্বীকৃত ব্যবহারের ব্যতিক্রম। কারণ উদ্বেগ ও একাকীত্ববোধ ও হীনম্মন্যতাবোধের ফলে তাঁর আচার-ব্যবহারের এই ফারাক।

অসুস্থ ব্যক্তিত্বের কথা বলতে গিয়ে আগেই বলেছি অহংবোধের পরিতৃপ্তির জনাই আমরা কাজকর্ম করি। একবার যদি কোন কারণে এই অহংবোধে চিড় ধরে তাহলেই বিগড়ে গেল। তখন সে নিউরোটিক হয়ে গেল। যদি আপনার সাইকোনিউরোটিক ব্যক্তিত্ব হয়ে যায় তখন আপনার মধ্যে কী কী লক্ষণ ফুটে উঠবে তার বিবরণ দিচ্ছি। এগুলি মিলিয়ে নিন।

১. প্রতিটি মানুষ ভালবাসার কাঙাল। কিন্তু তা বলে সবাই আপনাকে ভালবাসবে তা হতে পারে না। আপনি যদি সাইকোনিউরেটিক হন তাহলে ভালবাসার আকাঙ্ক্ষার

নিবৃত্তি হবে না। যত আপনি ভালবাসা পাবেন ততই আপনার চাহিদা বেড়ে যাবে। সাইকোনিউরেটিক স্ত্রী স্বামীর ভালবাসায় ও সাইকোনিউরেটিক স্বামী স্ত্রীর ভালবাসায় সন্তুষ্ট হবে না। কিসে যে আপনি সন্তুষ্ট হবেন তা আপনিই জানেন না।

২. আপনি যদি সাইকো নিউরোটিক হন তাহলে আপনি সামান্য হতাশায় দারুণভাবে ভেঙে পড়বেন। কেঁদে কেটে একসা করবেন। চিৎকার-চেঁচামেচি করবেন। বলে বেড়াবেন সবাই আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আপনি যদি স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন, তাহলে হতাশায় আপনি দুঃখ পাবেন বটে কিন্তু সেটা প্রকাশ হতে দেবেন না। আবার দ্বিগুণ তেজে চেষ্টা করে যাবেন।

৩. আপনি শুধু লোকের কাছে প্রত্যাশা করবেন সে আপনাকে ভালবাসুক। তার সমস্ত মনোযোগ আপনাকে দিক কিন্তু তার পরিবর্তে আপনি অন্যকে ভালবাসা ফিরিয়ে দেবেন না। আপনি শুধু পেতেই অভ্যস্ত, দিতে নয়। আপনি চাইবেন বাবা মা স্ত্রী স্বামী সবাই আপনার জন্য জীবন উৎসর্গ করুক। কিন্তু আপনি কিছুই করবেন না তাদের জন্য। আপনি চাইবেন প্রতিবেশীরা আপনাকে খাতির করুক কিন্তু বিনিময়ে আপনি তাদের জন্য চিন্তা করবেন না। আপনি আত্মকেন্দ্রিক, অহংকারী ও আত্মম্ভরী ব্যক্তিত্ব। দেওয়া এবং নেওয়ার ওপরেই বিশ্বসংসার দাঁড়িয়ে। দিবে আর নিবে মেলাবে মিলিবে, যাবেনা ফিরে। কিন্তু আপনার জীবন দর্শন যদি নেবে আর নেবে কভু না মিলিবে, দেখিবে না ফিরে, তাহলে বুঝতে হবে আপনি সাইকোনিউরোটিক।

৪. আপনার কি সবার বিরুদ্ধে রাগ? চাপা আক্রোশ? আক্রোশ সব সময় সরাসরি প্রকাশ পায় না। তা অন্যদিকে চালিত হয়। যেমন আপনার রাগ মালিকের ওপর কিন্তু তা প্রকাশ করতে ভয় পান। তখন মালিকের সেক্রেটারির বিরুদ্ধে আপনার আক্রোশ প্রকাশ পাবে। বলবেন মালিক ভাল ওর পি.এ.টাই খারাপ।

৫. আপনি কী হীনম্মন্যতায় ভুগছেন? আপনি কি লোকের কাছে বলে বেড়ান অমুক আপনার নখের যুগ্যি নয়? আপনি অল থ্রু ফার্স্ট ডিভিশনে পাস করে এসেছেন। আপনি কাউকে পরোয়া করেন না। হীনম্মন্যতা থেকেই উচ্চম্মন্যতা জন্মায়। আর যদি দেখেন যে, লোকের কাছে আপনার কৃতিত্ব জাহির করার প্রবণতা জাগছে তখনই বুঝবেন যে আপনি সাইকো নিউরোটিক পেসেন্ট হয়ে উঠছেন।

৬. আপনি কী সব সময় খিটখিটে হয়ে উঠছেন? স্বামী যদি একটা কিছু খুঁজে না পেয়ে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে ওগো আমার গামছাটা দেখেছ? আপনি খেঁকিয়ে উঠলেন, চোখ আছে দেখতে পাওনা। ওইতো যেখানে থাকে সেখানেই রয়েছে। অফিসে গিয়ে বসের সঙ্গে অকারণে ঝগড়া করলেন। তাকে যেন তেন প্রকারেন অপদস্থ করেই আপনার আনন্দ। আপনি ট্রামে বাসে, বাড়িতে, বাজারে সব সময় ঝগড়া করেন। আপনার ধারণা সবাই আপনাকে ঠকাচ্ছে। আর আপনি এক প্রতিবাদী চরিত্র। আপনি অন্যায় সহ্য করতে পারেন না। এক এক সময় মনে হয়, হিমালয়ে গিয়ে একাবাস করাই আপনার পক্ষে যুক্তিযুক্ত। এরকম মনের অবস্থা হলে বুঝতে হবে আপনি সাইকো নিউরোটিক।

৭. আপনার কী ইচ্ছে করে সব সময় আপনি যা বলবেন তাই হবে। আপনার অফিসার

একটা সাজেশান দিচ্ছে, সেটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। কিন্তু আপনি বললেন, আমি যেটা বলছি সেটাই হবে। আপনার মেয়ে একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চায়। বেজাত। কিন্তু সে স্মার্ট, উচ্চ শিক্ষিত, ভাল চাকরি করছে। আপনার মেয়ে ডানাকাটা পরী নয়। আপনি বললেন, এ বিয়ে হবে না। হলে Over my dead body. আপনি সাইকোনিউরোটিক।

আপনার ভয়ে বাড়ির সবাই থরোহরি কম্পো। কাজের লোক আপনার মুখের চোটে টিকতে পারে না। বাসনে যদি একটু কালির দাগ লেগেই থাকে অমনি আপনি চেঁচিয়ে পাড়া মাত করেন। এই অবস্থা হলে বুঝতে হবে আপনাকে সাইকো নিউরোটিক রোগে ধরেছে।

মনোবিদদের মতে নিউরোটিকরা সর্বদা নিজেদের অসম্পূর্ণ এবং নিরাপত্তাহীন বলে মনে করে থাকে। বিভিন্ন ধরনের নিউরোসিসের মধ্যে anxiety বা উদ্বেগ নিউরোসিস খুবই সাধারণ। নিউরোটিক রোগীদের প্রতি তিনজনের একজনই উদ্বেগ নিউরোসিসে ভোগে।[৪৯]

উদ্বেগ আমাদের জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। পরীক্ষা দিয়ে পাস করব কিনা তা নিয়ে উদ্বেগ থাকে। কিছুদিন আগে দিল্লি গামী একটি বিমান পাটনায় ভেঙে পড়ে। ওই দিনই আমার ছেলের দিল্লি যাবার কথা ছিল। কিন্তু সে কোন প্লেনে যাচ্ছে তা আমরা জানতাম না। টিভিতে দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্র আমার স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে দিল্লি থেকে আমার ছেলে ফোন করে মাকে জানায় যে প্লেনটি দুর্ঘটনায় পড়ে সেটি ছিল হপিং ফ্লাইট। তার ফ্লাইট নন স্টপ দিল্লি। সে ফ্লাইটটা তার কিছুক্ষণ পরেই ছেড়ে নির্বিঘ্নে দিল্লি পৌঁছেছে। আমার স্ত্রীর এতক্ষণ ধরে যে উদ্বেগ সেটা স্বাভাবিক।

কিন্তু নিউরোটিক উদ্বেগ অস্বাভাবিক। তার উৎস ঘটনায় নয়, মনে। মনে হতাশা ও সংঘাত দেখা দিলে তা থেকেই নিউরোটিক উদ্বেগের শুরু। কিন্তু এই উদ্বেগের প্রকৃত কারণ কি মানুষটা জানে না। তাই তার উদ্বেগ দীর্ঘস্থায়ী হয়। পরীক্ষার আগে পরীক্ষার্থীদের এক উদ্বেগ হয়, কিন্তু সেটা পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু নিউরোটিক হলে পরীক্ষার আগে আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন এবং কোন পরীক্ষাই আপনি স্বাভাবিকভাবে দিতে পারবেন না। অনেক সময় কেউ কেউ সাফল্য লাভ করলেও সব সময় উদ্বিগ্ন থাকে এই বুঝি ক্ষমতা চলে গেল, তার ফলে তার মধ্যে নিউরোটিক উদ্বেগ দেখা দেয়। অদস বা ইদের সঙ্গে অহং-এর বাস্তব সত্তার সংঘাত বাধলে ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্থায়ী উদ্বেগ দেখা দিতে পারে।

ফোবিয়া (আতঙ্ক) Phobia

ফোবিয়া বা আতঙ্ক এক ধরনের মানসিক ভীতি যা রোগী মনে করে অবাস্তব কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে আতঙ্কের ব্যাখ্যা দিতে পারে না। আবার আতঙ্ককে জয়ও-করতে পারেনা। সে জানে অবাস্তবকে সে ভয় করছে তবু সে আতঙ্ককে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাচ্ছে। উদ্বেগ বা anxiety-র ক্ষেত্রে অকারণ ভীতি এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে না। কিন্তু ফোবিয়ার ক্ষেত্রে ভীতিটা কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন কারও ভূতের ভয় আছে। অন্ধকার হলেই তাদের গা ছমছম করে। কারও উঁচুতে উঠলে নিচের দিকে তাকালে

ভীতি থেকে মাথা ঘোরে, অনেক মেয়ের টিকটিকি ও আরশোলা ভীতি থাকে। মনোবিদরা সমীক্ষা করে দেখেছেন, প্রতি হাজারে ৭৭ জনের কোন না কোন ভীতি আছে। কতগুলি ভীতি খুব সাধারণ : যেমন : ইঞ্জেকশন ভীতি, জন ভীতি, উঁচু জায়গা ভীতি, রক্তভীতি (রক্ত দেখে মূর্চ্ছা যাওয়া), মৃত্যু ভীতি, বিষ ভীতি (এদের মনে হয় তাদের খাবারে কেউ বিষ দিয়েছে)

ফোবিয়া জন্মায় ছোটবেলায় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এক মহিলার খুব ইঁদুর ভীতি ছিল। কথায় কথায় জানা গেল ছোটবেলায় তাঁকে একবার ইঁদুরে কামড়েছিল। সেই থেকে এই ভীতি ঢুকে গেছে। আমাকে ছোটবেলায় কুকুরে কামড়ায় সেই থেকে আমি পোষা কুকুর দেখলে সিঁটিয়ে থাকি। সব সময় নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই যে ফোবিয়া হয় তা নয়, চোখের সামনে যদি কোন দুর্ঘটনায় প্রিয়জনকে মারা যেতে দেখেন তাহলে আপনার দুর্ঘটনা ভীতি হতে পারে।

অনেক বাবা-মা ভয় দেখাবার জন্য শিশুদের অন্ধকারে রেখে দেন। এর ফলে তাদের মনে সারা জীবন ধরে অন্ধকার ভীতি দেখা দেয়।

ইলেকট্রা কমপ্লেক্সের কথা আপনারা শুনেছেন। মেয়েদের মায়ের প্রতি ও ছেলেদের বাবার প্রতি চাপা ঈর্ষাকে এই ইলেকট্রো কমপ্লেক্স (Electro Complex) বলে। মেয়ে মনে করে মা তার বাবাকে ভালবাসার পথের প্রতিদ্বন্দ্বী।

এক ভদ্রমহিলার রান্নাঘরে ছুরি দেখলেই ভয় হত এই বুঝি তার মা তার গলায় ছুরিটি বসিয়ে দেবে। মনঃসমীক্ষণ করে জানা গেল যে এই ভীতি ইলেকট্রো কমপ্লেক্স থেকে এসেছে।

ফোবিয়া দূর করার একটা প্রক্রিয়া হল, রোগীর মনঃসমীক্ষণ করে ভীতির উৎসটা জেনে নেওয়া এবং তাকে সাজেশানের দ্বারা বোঝানো যে তার ভয়ের কারণ কী এবং সেটা কত অমূলক।

হিস্টিরিক্যাল নিউরোসিস : আগেই বলেছি উদ্বেগ বা anxiety থেকে যত কিছু মানসিক অসুখের উৎপত্তি। হিস্টিরিক্যাল নিউরোসিসের উৎপত্তিও উদ্বেগ থেকে। উদ্বেগ নিরসনের প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা থেকেই মনোবিকার জন্মায়। যখন উদ্বেগ নিরসনের চেষ্টা কতগুলি দৈহিক লক্ষণের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে তখন তাকে হিস্টিরিয়া বলে। কখনও দেখা যায় রোগীর দেহের কোন অংশ আংশিকভাবে পক্ষাঘাত হয়ে গেছে। এটি কাল্পনিক ভীতি থেকে হলেও শারীর লক্ষণগুলি কিন্তু বাস্তব। যেমন মনোবিদ গিরিশ বালা মহান্তি একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন : একটি ছেলে অত্যধিক হস্তমৈথুন করত। তার ফলে তার মনে আশংকা ও পাপ-বোধ দেখা দেয়। এটা নিয়ে উদ্বেগ হতে থাকে। দেখা যায় তার ডানহাতটি প্যারালিটিক হয়ে গেছে। অনেক সময় হিস্টিরিক্যাল নিউরোসিসের ফলে কোন যৌন সক্ষম ব্যক্তি সাময়িকভাবে ধ্বজভঙ্গ হয়ে যেতে পারে। তেমনি নারীও কামশীতল হয়ে যেতে পারে। অথবা এমন হতে পারে অন্যসময় তার যৌনাঙ্গ স্বাভাবিক কিন্তু সঙ্গমের সময় তা উত্তেজিত হয় না। অথচ সে ব্যক্তি প্রজনন অক্ষম নন এবং তাঁর স্পার্ম কাউন্ট স্বাভাবিক। অনেকদিন আগে একটি ইংরেজি পত্রিকার অ্যাগনিকলমে একজন পাইলট চিঠি লিখেছিলেন, তিনি

একজন বহুগামী। তিনি যখন স্ত্রীর সঙ্গে সঙ্গম করেন তখন তিনি স্বাভাবিক। কিন্তু যখনই পর নরনারীর সঙ্গে সঙ্গম করতে যান তখনই তিনি সাময়িকভাবে ধ্বজভঙ্গ হয়ে যান।

হিস্টিরিক্যাল নিউরোসিসের ফলে অ্যামনেসিয়া বা স্মৃতিবিভ্রম দেখা দিতে পারে। সাময়িকভাবে আমরা কারও নাম বা ঘটনা ভুলে যেতে পারি। এটি বেশিমাত্রায় হলে সে তার বন্ধু ও আত্মীয়দেরও চিনতে পারে না। অনেক সময় সে কিছুক্ষণ আগে যা বলেছে তা ভুলে যায়। এমনও হতে পারে সারাদিন ধরে সে একটা বই পড়ল কিন্তু পরে লেখকের নামটা পর্যন্ত মনে রাখতে পারল না।

অ্যামনেসিয়া হলে রোগীকে দেখে বা তার সঙ্গে কথা বলে কিছু বুঝবেন না। এমনিতে সে বইপত্তর পড়ছে, কথা বলছে, সংসার ধর্ম করছে, আবোল তাবোল বকছে না। তার প্রতিভা বিদ্যা বুদ্ধিকে সে কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ সে ভুলে যাচ্ছে সব কিছু। এমনকী মাত্র দু একমাস আগে কার সঙ্গে কী কথা হয়েছিল সে কিছুই মনে করতে পারছে না।

এক ভদ্রলোক কিছুতেই লোকের নাম মনে রাখতে পারেন না এমনকি তিনি তাঁদের মুখটাও ভুলে যান। এখন আপনাকে যদি আপনার পরিচিত কেউ চিনতে না পারে আপনি খুবই ক্ষুণ্ণ হবেন। এর ফলে ভদ্রলোক খুবই অপ্রস্তুত হন। এবং লোকজনের সংসর্গ এড়িয়ে চলেন। মনোবিদরা তাঁব মনঃসমীক্ষণ করে জানতে পাবলেন যে বহুলোক তাঁর মনে আঘাত দিয়েছে তাই তিনি মনে মনে মানুষজন সম্পর্কে বিরূপ হয়ে উঠেছেন। তাই নতুন পরিচিতদের নাম ও মুখ তিনি সহজে ভুলে যান। বহু অতীত ঘটনাও তিনি মনে করতে পারেন না। হিস্টিবিক নিউরোসিসের চরম পর্যায়ে চলে গেলে fugue বা তুরীয় অবস্থায় গিয়ে পৌঁছয় মানুষ। সে তো সব কিছু ভুলে যায় এমনকি নিজেব পরিচযটা পর্যন্ত বিস্মৃত হয়। এমন হয়েছে যে এই পর্যায়ে ব্যক্তির সমস্ত ব্যক্তিত্ব বদলে গেছে। সে নতুন নাম ও পরিচয় নিয়ে নতুন বাড়িতে বাস করছে। তারপর হঠাৎ একদিন সে তার পূর্বপরিচয় ফিরে পেয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি fugue প্রতিক্রিয়ায় ভোগেন দেখা যায় তাদের ব্যক্তিত্ব পর নির্ভর, উদ্বিগ্ন এবং অসম্পূর্ণ। তাঁরা দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক স্ট্রেস সহ্য করতে পাবেন। কিন্তু যখন অতিরিক্ত স্ট্রেস হয় তখনই হয় মুশকিল। তাঁদের ব্যক্তিত্ব আব স্ট্রেস নিতে পারে না এবং বাস্তবজগৎ থেকে তাঁরা পালিয়ে যেতে চান। এঁকে বলে flight from trauma—মানসিক আঘাত থেকে পলায়ন।

হিস্টিরিয়ার ফলে যে কোন অঙ্গের স্পর্শানুভূতি চলে যেতে পারে আবার অতিমাত্রায় অনুভূতি চলে আসতে পারে। দেহের যে কোন অংশে বিশেষ করে একটি প্রত্যঙ্গ অবশ হয়ে যেতে পারে। অনেক সময় হিস্টিরিয়ার ফলে রাইটার্স ক্র্যাম্প হয়। ব্যক্তি লিখতে পারে না কিন্তু হাত দিয়ে অন্য কাজ যেমন সূঁচ সুতোর কাজ করতে পারে। কোন কোন রোগীর মৃগী রোগ দেখা দেয়। কেউ কেউ পঙ্গু হয়ে যায়। দাঁড়াতে বা চলতে ফিরতে পারে না। কারও স্বাভাবিক কথা বলার ক্ষমতা নষ্ট হযে যায় এবং সে জোরে কথা বলতে পারে না। কারও আন্ত্রিক গোলমাল দেখা দেয়।

ডিপ্রেসিভ নিউরোসিস

যখন বিষণ্ণতাজনিত নিউরোসিসের ফলে ব্যক্তির উদ্বেগর্জনিত মনোবেদনা একবারে মনের ভেতরে চলে যায় তখনই ডিপ্রেসিভ নিউরোসিসের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মানসিক সংঘাতের ফলে ব্যক্তি মনমরা হয়ে থাকে। সাধারণত গভীর শোকের ফলে এই লক্ষণ বেশি করে দেখা দেয়। বেশ কিছুদিন ধরে এই অবস্থা থাকে। এরা আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। অনেকে আত্মহত্যা করতে যায়।

নিউরোস্থেনিয়া (Neurasthenia) ঃ

নিউরেস্থেনিয়া শব্দটির অর্থ স্নায়ু দৌর্বল্য। যাদের দীর্ঘদিন ধরে মানসিক সংঘাত চলে বা যাঁরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করেন তাদের এটা হয়। প্রয়োজনীয় নার্ভাস সেলগুলির ক্ষয় হওয়ার ফলে এটা হতে পারে। ফলে রোগী ক্রমাগত দুর্বলতা বোধ করে, মানসিক ক্লান্তিতে ভোগে, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে মানুষ অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে থাকে।

নিউরোটিক রোগীদের দশ শতাংশ এই অসুখে ভোগে। নিউরোটিক ব্যক্তিত্ব আমরা তাঁদের বলব যাঁরা অবিরাম উদ্বেগে ভোগেন। যাঁদের আত্মপ্রত্যয় এর ফলে বিপন্ন হয় এবং যাঁদের অহং আক্রান্ত। এঁদের ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে বাস্তবতার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। আর সংঘর্ষ যত জোরদার হয় ততই এঁদের উদ্বেগ বাড়ে।

এরফলে এদের জীবন হয়ে ওঠে ওরে আশা নাই আশা শুধু মিছে ছলনা। মনোবিদ সালিভান বলেন। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কে যখন চিড় ধরে এবং তা সমস্যা সঙ্কুল হয়ে ওঠে তখন উদ্বেগ বেড়ে চলে। এই অবস্থায় ব্যক্তির প্রতিরক্ষা ব্যূহ ভেঙে পড়ে।

মনোবিদরা বলছেন, এখন যেভাবে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্কগুলি ক্রমশ নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠছে ও পরস্পরের মধ্যে সার্থের সংঘাত দেখা দিচ্ছে তাতে করে যথেষ্ট নিউরোটিক ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ হচ্ছে। বিষয়টি আর একটু বুঝিয়ে বলি। আগে পাড়ার সবাইকে সবাই চিনত। আমি সল্টলেকে থাকি। গত ১৫ বছর ধরে এখানে বাস করছি। প্রতিবেশীরা আজও এখানে পল্লীর সবাই সবাইকে চেনেন না। চেনার আগ্রহও প্রকাশ করেন না। এক্ষেত্রে মানুষেরা কী করবেন; আরও বেশি করে দ্বির্ব্যক্তিক (inter personal) সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকবেন। অর্থাৎ ব্যক্তিগত বন্ধু, স্বামী-স্ত্রী-ছেলেমেয়ে তথা পারিবারিক বৃত্তের মধ্যেই জীবন আবর্তিত হবে। এখন এই পারস্পরিক সম্পর্কে চিড় ধরলেই মনোবেদনা দেখা দেবে এবং তার ফলে উদ্বেগের সৃষ্টি হবে। তাছাড়া আগের তুলনায় এখন অসংখ্য প্রয়োজন সৃষ্টি হচ্ছে। এর একটি না পেলেই ব্যক্তির মধ্যে বঞ্চনাবোধ ও হতাশা দেখা দেবে। এখন মধ্যবিত্তরা গাড়ি ও ফ্ল্যাট কেনার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ দেখাচ্ছেন। টিভি, ভি সি আর, সাউন্ড সিস্টেম, ওয়াশিং মেশিন, কম্পিউটর, সেল ফোন কত নিত্য নতুন প্রয়োজনের সৃষ্টি হচ্ছে। এর একটি না পেলেই বঞ্চনাবোধ জাগছে অমনি ব্যক্তিত্বের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া এসে পড়ছে।

সমাজ হয়ে উঠছে নৈর্ব্যক্তিক। আজ আমি যদি আক্রান্ত হই, কেউ আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। আমাদের প্রত্যেকের আত্মপরিচয় এখন আইডেনটিটি কার্ডে

চোদ্দ

কেমন করে সু-ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলবেন?

এ পর্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যতটুকু আলোচনা করলাম তাতে দেখেছেন প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আপনার চেষ্টা ছাড়াই শুধু জৈবিক কারণে (জিনের প্রভাবে) ও পরিবেশের প্রভাবে (আপনার পরিবার জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রিক জীবনের প্রভাবে) আপনার ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়ে যায়। আপনি কোন পরিবারে জন্মালেন, আপনার বাবা মায়ের পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আপনার সঙ্গে বাবা মা ও আপনজনের সম্পর্ক, আপনি কোন পরিবেশে বড় হয়েছেন সেই পরিবেশ তথা পাড়া, রাজ্য, দেশ সব মিলিয়ে আপনার ব্যক্তিত্ব তৈরি হয়েছে। আপনি যদি টাটা বিড়লা সিংহানিয়ার পরিবারে জন্মাতেন, যদি দিল্লির ডিফেন্স কলোনী কিংবা মুম্বইর বান্দ্রাতে বড় হতেন, যদি দুন কিংবা সিন্ধিয়া পাবলিক স্কুলে পড়তেন, অথবা যদি আমেরিকার অনাবাসী পরিবারে জন্মাতেন। তাহলে আপনার ব্যক্তিত্ব অন্যরকম হত। কিন্তু আপনি যা তাই।

মহাভারতে কর্ণ বলেছিল, আমার জন্ম দৈব ফল, কিন্তু পৌরুষ আমার হাতে। তাই আপনার যেখানেই যে পরিবেশে জন্ম হোক, আপনার জিনের ভেতর যতই নেতিবাচক প্রভাব থাকুক, আপনি সচেষ্ট হলে আপনার ব্যক্তিত্বকে আপনি ভেঙেচুরে নতুন করে তৈরি করতে পারেন। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন আপনি ব্যক্তিত্ব বদলাতে পারেন কিনা। ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনের প্রধান লক্ষ্য হল ঃ সুব্যক্তিত্ব তৈরি করা। এক কথায় সুব্যক্তিত্ব হল—

১. সমাজ প্রত্যাশিত কতগুলি আচরণ অনুসরণ করা। প্রত্যেক সমাজেই সুব্যক্তিত্বের কতগুলি স্টিরিও টাইপ আছে। সেই স্টিরিও টাইপগুলি হল সুব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কতগুলি ধারণা। যেমন সুঠাম চেহারা, সুস্বাস্থ্য, ছিমছাম সাজগোজ। ঝকঝকে দাঁত, মিষ্টি হাসি। মাথায় একমাথা চুল এমনকি চেহারার সঙ্গে মানান সই চুলের ছাট। আপনি যদি অনবরত পান খান। মুখ থেকে পানের রস গড়িয়ে পড়ে এবং ঘন ঘন পিক ফেলেন তাহলেও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এটা ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের কেউ এটা করলে তাঁর ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। বাংলাদেশে কিংবা বরাক উপত্যকায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা তাঁদের নিজস্ব জেলার ডায়ালেকটে বাংলা বলেন। এতে কেউ কিছু মনে করেন না। কিন্তু ভারতের অন্যান্য জায়গায় বিদগ্ধ ও সংস্কৃতিবান বাঙালিকে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা বলতে হয়। তাঁর ইংরাজি বলারও ক্ষমতা চাই। শুদ্ধ উচ্চারণ গমগমে ভারি গলা এবং প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট করে উচ্চারণ করতে হবে। যখন বাঙালির সঙ্গে কথা বলবেন তখন যদি একটাও ইংরাজি শব্দ ব্যবহার না করা হয় তাহলে কথাবার্তা অন্য মাত্রা পায়।

অন্যের কাছ থেকে সমীহ পেতে হলে পোশাক আশাকের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। সবার আগে দেখতে হবে কোন পোশাকে আপনাকে বেশী মানায়। পোশাক আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ হবে তেমনি বয়স, গায়ের রঙ অবয়ব সংস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য পূর্ণ হবে। পোশাক নিয়ে আগেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি। শুধু দেখতে হবে পোশাক যেন ব্যক্তিত্বকে বাড়ায়, ব্যক্তিকে যেন হাস্যাস্পদ না করে। এতো গেল পোশাক আশাকের কথা। কিন্তু দর্শনধারীর পরে গুণ বিচারী। প্রতিটি সমাজেরই কতগুলি মূল্যবোধ আছে। ওই মূল্যবোধের ভিত্তিতেই সমাজ রোল মডেল তৈরি করে। বিদ্যাসাগর আমাদের রোল মডেল মানবিক গুণ দয়া ও উদারতার জন্য। বিবেকানন্দ আমাদের রোল মডেল তাঁর তেজস্বীতার জন্য। নেতাজী রোল মডেল তাঁর নিঃস্বার্থ দেশ প্রেমের জন্য।

ভারতীয় মূল্যবোধের বড় কথা পরহিতের জন্য আত্মত্যাগই সুখ। পরোপকারই মহান ব্রত। সেজন্য আমরা সেইসব ব্যক্তিত্বকে বেশী পছন্দ করি যাঁরা অপরকে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে দেন। আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন : আপনার কাছে কেউ সাহায্য চাইলে আপনি বিরক্ত হন না গর্ববোধ করেন? বিরক্ত হতে পারেন কারণ অপরকে সাহায্য করাটা আপনার আবশ্যক কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। এটি আপনার মর্জি। যদি আপনি বোঝেন যে একে সাহায্য করলে ইনিও আপনাকে সাহায্য করবেন তাহলেই নিতান্ত স্বার্থের বাইরে আপনি তাকে সাহায্য করতে রাজি হন। কিন্তু প্রকৃত সাহায্য প্রবৃত্তি প্রতিদানের ওপর নির্ভর করেনা। তা নির্ভর করে হৃদয় প্রবৃত্তির ওপর। কারও মধ্যে হৃদয় প্রবৃত্তি খুব বেশি, কেউ হৃদয়হীন কিন্তু হৃদয়হীন ও স্বার্থপর ব্যক্তির চরিত্র একদিন না একদিন ধরা পড়ে যায়। তখন তার ভাবমূর্তি ম্লান হতে শুরু করে। ব্যক্তিত্ব নিষ্প্রভ হয়ে আসে। হাসিখুশি লোককেই লোকে পছন্দ করে। তাই ব্যক্তিত্বকে সব সময় হাসিখুশী রাখতে হবে। লোকের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ ও আন্তরিক মেলামেশা করতে হবে। মুখে হাসি যেন সবসময় লেগে থাকে। কারও প্রতি বিদ্বেষ থাকলেও মনোভাবের মধ্যে তা যেন প্রকাশ না পায়। আপনি যদি কাউকে পছন্দ নাও করেন। কেউ যদি আপনার মনে দাগা দেয় তাহলেও সেটা মনের ভেতরে রেখে দেবেন। শুধু অন্তরঙ্গ দুএকজনের কাছে এটা বলবেন। অপরিচিত ও অর্ধ পরিচিতের কাছে কারও নামে নিন্দা করলে তাঁরা আপনাকে দুর্বল ব্যক্তিত্ব বলে ভাববেন। কারণ আপনার ব্যক্তিগত সমস্যা আপনারই একান্ত সমস্যা। যদি কখনও সময় ও সুযোগ পান এ সম্পর্কে আপনার অতি আপনজনের কাছে মনোভাব ব্যক্ত করবেন। কিন্তু সব সময় সাতকাহন গাইবেন না। নিজের কথা সাতকাহন বলে লোকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাবেন না।

কেউ যদি আপনার সমালোচনা করে তাহলে মুখের হাসি দিয়ে তা উড়িয়ে দিতে হয়। কখনও তর্ক করবেন না। একমাত্র বিতর্ক প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কোথাও তর্কে জেতা যায় না। গুরুজনের সঙ্গে তর্ক করবেন না কারণ তাঁরা দুর্বিনীত ভাববেন। ছোটদের সঙ্গে তর্ক করবেন না, কারণ তারা ভাববে আপনি সংরক্ষণশীল। বন্ধুদের সঙ্গে তর্ক করবেন না, কারণ তাঁরা ভাববে আপনি তাদের বিরোধিতা করছেন। অধস্তনদের সঙ্গে

তর্ক করবেন না কারণ তারা ভাববে, পদাধিকার বলে আপনি তাদের ওপর আপনার মতামত চাপাচ্ছেন। যদি মনে করেন কেউ এঁড়ে তক্কো করছে, অবাস্তব কথাবার্তা বলছে তাহলে এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বার করে দেবেন। মুখে বলবেন, আপনার বিষয়টি নিয়ে ভাবব। এখন কিছু বলছি না। তবে আপনি যে তথ্য দিলেন সেটা বোধ
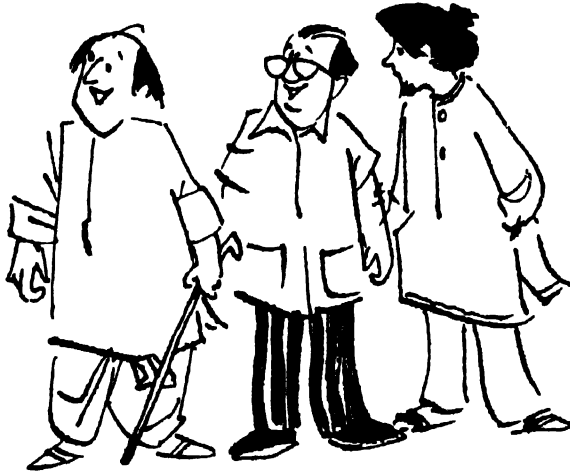
প্রতিবাদী চরিত্র

হয় ঠিক নয়, আমি যা জানি, তা হল এই বলে আপনি প্রকৃত সত্যটি তাকে জানালেন। কিন্তু তা অকাট্য বলে গ্রহণ করার ভার তার ওপর ছেড়ে দেবেন। নিজের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখবেন। লোকে প্রতিবাদী চরিত্র ও সোজাসুজি কথা বলার মানুষকে মনে মনে পছন্দ করে।

তাই আপনার মতামত প্রতিষ্ঠা করার সময় বেশ জোর দিয়ে কথা বলবেন। জোর দিয়ে কথা মানে চেঁচিয়ে কথা বলা বা টেবিলে ঘুঁসি মারা নয়। যুক্তি দিয়ে নিঃসংশয় ভাবে কোন কথা বলা। আপনার বক্তব্য কেউ গ্রহণ করল কি না, তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

যেখানে আইনত আপনি ঠিক, সেখানে বেআইনিভাবে আপনার মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হলে আপনি প্রতিবাদ করবেন। কেউ অন্যায় ভাবে, ভয় দেখিয়ে, ব্ল্যাক মেইল করে বা ঘুষ দিয়ে আপনার কাছ থেকে কোন অন্যায় অসঙ্গত কাজ যেন না করাতে পারে। দেখবেন, এর ফলে আপনার ভাবমূর্তি লোকের কাছে উজ্জ্বল হচ্ছে। আপনি উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের মানুষ বলে লোকের শ্রদ্ধা পাচ্ছেন। ভীরু ও কাপুরুষ হবেন না। আপনার যা আইনত কর্তব্য এবং নৈতিক অধিকার তা আপনি পালন করবেন। অর্থাৎ যা ভাল বুঝবেন তাই করবেন। যে কোন সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে তার আইনগত সমর্থন আছে কি না একবার দেখে নেবেন। তারপর দেখবেন আপনার বিবেকের সমর্থন আছে কি

না। এরপর ভাবতে হবে পরিনামের কথা। যদি দেখা যায় আইন মোতাবেক সব কিছু হলেও পরিণাম ভয়াবহ হতে পারে তাহলে সে কাজটা করবেন না। হয় পুনর্বিবেচনার জন্য সময় নেবেন। না হয় জনসমর্থন তৈরি করবেন।

আপনার স্বাস্থ্য ও পারিবারিক সুখ শান্তি নষ্ট হতে পারে এমন কাজ করবেন না। অত্যধিক মদ্যপান, রাত্রিজাগরণ, পরস্ত্রী সংসর্গ, সুষম খাদ্যের অভাব, ব্যায়ামের অভাবের ফলে আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট হতে পারে। অত্যধিক উদ্বেগ ও আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে। বিবাহ বহির্ভূত প্রেম আপনার জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে ও আপনার ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। আপনি যদি প্রতিভাবান হন তাহলে চরিত্রের শ্লথতা ও লাম্পট্যকেও লোকে ক্ষমা করতে পারে। আপনি বিল ক্লিন্টন বা কোন চিত্র তারকা কিংবা জীবনমুখী গানের কোন জনপ্রিয় শিল্পী নন। তাই ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা দুশ্চরিত্র ও উন্মার্গগামী হলেও প্রতিভার জন্য লোকে প্রতিভাবানদের ক্ষমা করে। কিন্তু আপনি যদি সাধারণ মানুষ হন তাহলে আপনার বিন্দুমাত্র স্খলন লোকে সহ্য করবে না।

লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের সময় প্রয়োজনীয় সৌজন্য প্রদর্শন করবেন, রাস্তায় পরিচিতদের সঙ্গে দেখা হলে উইশ করবেন। আমি দেখেছি, অনেক পরিচিত লোককে উইশ করলেও তাঁরা আন্তরিকভাবে উইশ করেন না। কিন্তু এতে দুঃখ পাবার কিছু নেই। তারা ভদ্রতা ও সৌজন্যবোধের কোন পাঠ নেননি। কিন্তু আপনি নিয়েছেন। কতগুলি সাধারণ এটিকেট ছেলে-মেয়েদের শেখান। যেমন বয়স্কদের প্রণাম করতে শেখান। আমার নিকট আত্মীয়দের ছেলেমেয়েদের বিজয়ার পর আমার সঙ্গে দেখা হলেও প্রণাম করতে দেখিনি। এটা তাদের বাবা মায়ের দোষ। অনেক সময় বলেও শেখানো যায়না। এর জন্য তাদের স্কুলিং দায়ী। ইংরাজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে ভারতীয় মূল্যবোধ কম শেখানো হয়। কিন্তু তাঁরা যদি ভাল সেলসম্যান তৈরি করার দায়িত্বও নিত তাহলে ভারতীয় আদব কায়দা তারা শেখাতো। চাকরিতে ইন্টারভিউর সময় পশ্চিমী আদব কায়দা কাজে দেয়। যদিও করজোড়ে নমস্কার, ধন্যবাদ জানানো বাক্যের শেষে মাঝে মাঝে স্যার বলে সম্বোধন করা এবং হাসিমুখে থাকা—এই ধরনের কেতাদুরস্ত আচরণ ব্যক্তিত্ব বিচারে ভাল নম্বরই আদায় করে নিতে পারে। অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকতে হবে। সব সময় মনে রাখবেন, আপনার পক্ষে সব জানা সম্ভব নয়। কারও পক্ষে নয়। তবে বেশ কিছুই আপনি জানেন। যা অন্যে জানে না। ব্যক্তিত্বকে সব সময় ধারালো রাখতে গেলে পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলে চলবেনা। দিনে দুঘন্টা যা হোক কিছু একটা পড়ুন। খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, গল্প-উপন্যাস। টিভি দেখার ফলে যেন পড়ার অভ্যাসে ভাটা না পড়ে। কারণ টিভি আপনাকে সচেতন করে। আনন্দ দেয়, কিন্তু আপনার বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ায় না। কিন্তু বই আপনার বিচার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা বাড়ায়।

বক্তৃতা দেবার অভ্যাস রাখুন। লোকে এক কথায় ভাল বক্তাকে শ্রদ্ধা করে। কিন্তু বলতে উঠে ভাল করে গুছিয়ে বলতে না পারলে লোকের কাছে ভাবমূর্তি মলিন হয়ে যাবে। প্রতিটি মানুষই ভাল বক্তা। শুধু অনেকে মহড়া দেন না বলে তাঁদের কথাবার্তা

এলোমেলো লাগে। সেজন্য বক্তৃতা দেওয়াটা প্রত্যেকেরই প্র্যাকটিস করা উচিত। আর উচিত আবৃত্তি করতে শেখা। আবৃত্তির ফলে উচ্চারণ শুদ্ধ হয়।

সব কিছু সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ান। শিশুর মত জিজ্ঞাসু হন : এটা কী। ওটা কী? যা দেখছেন, সেটা তলিয়ে দেখুন। যাকে দেখছেন, যার সম্পর্কে কথা বলছেন তার সম্পর্কে জানুন। আবার পরমাণু যুদ্ধ সম্পর্কেও দুচার কথা জানুন। অপরেব সম্পর্কে জানতে চাইলে অপরের প্রতি আগ্রহ দেখাতে হবে। আপনি যদি অন্যের ব্যাপারে আগ্রহী না হন তাহলে অপরেও আপনার প্রতি আগ্রহী হবেন না। ব্যক্তিত্ব গঠনের একটা বড দিক হল জনসংযোগ গড়ে তোলা। জনসংযোগের গোড়ার কথা অন্যদেব সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে অন্যকে আপনার সম্পর্কে আগ্রহী করে গোড়া তোলা। অন্যের প্রতি আগ্রহ দেখাতে হয় তার প্রতি মানবিক হয়ে। নিয়মিত তার খোঁজ খবর নিয়ে। তাঁব স্ত্রী বা স্বামী ও ছেলেমেয়েদের খোঁজ নিয়ে। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখে এসে ও তাঁর সাফল্যে তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে।

সমাজ প্রত্যাশিত মানবিক গুণের মধ্যে আছে ধৈর্য, ন্যূনতম সততা, চরিত্রের গতিশীলতা, আপন কর্মে আন্তরিক হওয়া।

* এক বা একাধিক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান অর্জন করুন। বর্তমান যুগ স্পেশ্যালাইজশনের। তাই একটা বিষয়ে নৈপুণ্য থাকলে ব্যক্তিত্বের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে। কিন্তু অন্য বিষয়ে সম্পর্কে কিছু না কিছু ধারণা থাকা দরকার।

* তড়িঘড়ি লাভ কবার জন্য কোন কাজ করবেন না, বিচক্ষণতা, আন্তরিকতা, নৈপুণ্য ও ধৈর্য থাকলে সাফল্য আসবেই। যদি নাও আসে, পাবেন মানসিক আনন্দ ও নৈতিক শক্তি এবং বেশ কিছু আন্তরিক মানুষের স্বীকৃতি।

ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত শক্তি : ব্যক্তিত্বের প্রথম অংশটি হল অন্যের চোখে আমি। দ্বিতীয় অংশটি আমার চোখে আমি। একেই আমি বলেছি ব্যক্তিত্বের অন্তর্নিহিত শক্তি।

এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে বাস্তবসম্মত আত্মোপলব্ধি , এলিজাবেথ হার্লক যাকে বলেছেন, Realistic self apprisal " এব মোদ্দা কথা হচ্ছে আগে নিজেকে জানুন। নিজেকে হামবড়া ভাবলে চলবে না। দেখতে হবে প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার মত আপনার যোগ্যতা কতটুকু। যোগ্যতা নিয়ে সবাই জন্মায় না। বহুলোক যোগ্যতা অর্জন করে। সেটা কঠোর পরিশ্রমের দ্বারাই সম্ভব। সব কাজেরই একটা চ্যালেঞ্জ থাকে। সেই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার কতখানি ক্ষমতা আছে আপনার তা একমাত্র আপনিই জানেন। আপনাকে শত্রুরা বলতে পারে আপনার কোন যোগ্যতা নেই। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। আপনিই একমাত্র বলতে পারেন যে আপনি যে কাজে হাত দিতে চলেছেন আপনি তার যোগ্য কিনা। আপনার মনোবল শক্ত আছে কি না। যদি না থাকে তা বাড়াবার জন্য আপনি সচেষ্ট কি না।

প্রত্যেকের সাধ্য অনুসারে নির্ধারিত কাজ আছে, সাধ্যমত কাজে দক্ষতা অর্জন করাটাই মনোবল অটুট রাখার মন্ত্রগুপ্তি। আমি প্রতিদিন বাজারে যার কাছ থেকে আলু কিনি, তার আত্মপ্রত্যয় দেখে আমি অবাক হয়ে যাই। সে আলু এবং বাজার বোঝে। সে কিন্তু মনে করে না একজন উচ্চশিক্ষিত এম.বি.এ হলে সে অনেক ভাল জীবন যাপন করতে পারত।

কিন্তু আমি একজন টাইপিস্টকে চিনি, সে টাইপটা ভাল করে শেখেনি। ইংরাজি গ্রামার ও বানান সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই অথচ তার ধারণা সে একজন প্রথম শ্রেণীর টাইপিস্ট। এবং এই ধারণা থেকে সে নানা উদ্বেগজনিত গোলমালে কষ্ট পাচ্ছে। অথচ সে যদি নিজের যোগ্যতার দিকটা একবার নিরপেক্ষভাবে বিচার করে দেখত তাহলে তার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোথাও গোলমাল দেখা দিত না।

আত্মসন্তুষ্টি বা অল্পে সন্তুষ্টি জীবনে উন্নতির পথে বাঁধা। কিন্তু কোথায় থামতে হয় সেটাও জানা চাই। যে নিজেকে নিরপেক্ষভাবে জানে, সেই একমাত্র বোঝে কোথায় বিরতি টানা দরকার। কোথায় আবাব যাত্রা শুরু করা প্রয়োজন। যদি আপনি বোঝেন যে আপনার যতটুকু যোগ্যতা তা চেষ্টা করেও আর বাড়ানো যাবে না, তাহলে যতটুকু পেয়েছেন ততটুকু নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। এইভাবে লক্ষ লক্ষ লোক আনন্দে আছেন। কিন্তু কষ্ট পাচ্ছেন তাঁরা, নিজের সম্পর্কে যাঁদের ধারণা অলীক এবং অবাস্তব। জ্যাক এইচ গ্রসম্যান (Jack H. Grossman) বলছেন : আপনি প্রথমে নিশ্চিত হন যে আপনি যা চাইছেন তা যুক্তিসম্মত। আপনি তখনই কোন জিনিস চাইতে পারেন যখন—

: ওই বস্তুটি সম্পর্কে আপনার তীব্র আগ্রহ থাকবে। পেলেও হয়, না পেলেও হয় এমন নয়। প্রথমে আপনার প্রবল ইচ্ছা জন্মাতে হবে ওই লক্ষ্যে পৌঁছনর জন্য।

: দেখতে হবে ওই বস্তুটি পাওয়ার ব্যাপারে অথবা ওই লক্ষ্যে পৌঁছবার ব্যাপারে আপনার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, নৈপুণ্য, অথবা তা অর্জন করার মত ক্ষমতা আছে কি না। বহু লোক উচ্চপদ পেয়েও রাখতে পারেন না। টাকা হাতে পেয়েও নষ্ট করে ফেলে। সুন্দরী স্ত্রী অথবা সর্বগুণান্বিত স্বামী পেয়েও বিয়ে ভেঙে যায়। বহু বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ হলেও সেই আলাপ ভাঙিয়ে তা থেকে নিজের উন্নতির জন্য কিছু করে নিতে পারে না। কেন পারে না? কারণ তাদের মধ্যে সে ক্ষমতা নেই। তাই যতটুকু ক্ষমতা ততটুকুর মধ্যে বিচরণ করা ভাল। গাছে না উঠতেই এক কাঁদির স্বপ্ন দেখা অলীক স্বপ্নময়তা। এই ধরনের ব্যক্তিত্ব অপরিণত এবং দুর্বল। নিজেকে বাস্তব সম্মতভাবে জানার প্রথম শর্ত হল, আপনার শক্তির দিক ও দুর্বলতার দিক দুটোই খুঁজে বার করুন। দেখা যাচ্ছে আপনার দুর্বলতা হল আপনি ইংরাজিটা ভাল জানেন না। কিন্তু বাংলাটা ভাল জানেন। তাহলে যতদিন না ইংরাজি ভাল শেখেন ততদিন আপনি এমন কাজের মধ্যে যাবেন না যেখানে ইংরাজিতে বক্তৃতা দিতে হয়। লেখালেখি করতে হয়। বাংলায় কাজ করা যায় এমন চাকরিই আপনি নেবেন।

অহংকার থাকা ভাল কিন্তু মিথ্যা অহংকার যেন আপনাকে আচ্ছন্ন না করে। যেখানে আপনার প্রকৃত শক্তি আপনি সেটা নিয়ে অহংকার করুন। আপনি লেখাপড়ায় ভাল নন। দেখতেও ভাল নন, ভাল চাকরিও করেন না। কিন্তু আপনি একজন সৎ মানুষ হতে পারেন এবং সেজন্য গর্ববোধ করতে পারেন। এটাই আপনার মানুষ অহংকার। কাউকে প্রভাবিত করার চেষ্টা না করে শুধু আপনার নিজের শক্তির দিকটাকে আলোকিত করুন।

কাউকে সমালোচনা বা নিন্দা না করার অর্থ কিন্তু মিনেমিনে ভাব নয়। যেখানে অন্যায়ের

প্রতিবাদ করা দরকার সেখানে প্রতিবাদ করুন। যে ব্যক্তিত্ব অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না সেই ব্যক্তিত্ব কখনও মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেনা। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গেলে ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। সেটা যদি সম্ভব না হয় চুপচাপ থাকাই ভাল। উপরি পাওনার আশা ছাড়তে হবে। এখানেই ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা। মনে রাখতে হবে বর্তমান রাজনীতি সর্বস্বতার যুগে দল নিরপেক্ষ ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সংকট এসে উপস্থিত হয়েছে। দৃঢ়চেতা ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠান পছন্দ করে না। একারণে মানুষের মধ্যে দ্বৈত ব্যক্তিত্ব দেখা দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের সঙ্গে নমনীয়, বাইরে বেরিয়ে অন্যাদের কাছে প্রতিবাদী। এই দ্বৈত সত্তাই এখন ব্যক্তিত্বের এক নতুন স্টিরিও টাইপ কিন্তু এ ধরণের ব্যক্তিত্ব আসলে দুর্বল ব্যক্তিত্ব।

বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা সেই ব্যক্তিত্বকে বুঝি যারা যেকোন পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে। এজন্য ব্যক্তিত্বকে কিছুটা নমনীয় রাখতে হয়। এই নমনীয়তা ব্যক্তিত্বের ছদ্ম আবরণ মাত্র। বাস্তবতাকে মেনে নিতে গেলে বহুক্ষেত্রে আপস করতে হয় আবার আপসের অভিনয়ও করতে হয়। শত্রু মিত্র নির্বিশেষে মৌখিক সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। সর্বত্র আপনি যদি ঝগড়া করেন তাহলে আপনারই কলহ পরায়ণ বলে বদনাম হয়ে যাবে। সেজন্য দুঃখ ও উদ্বেগের মধ্যেও মুখের হাসি বজায় রাখতে হবে। উত্তেজিত হলে চলবে না। অথচ উদ্বেগ থেকেই উত্তেজনা বাড়ে। আপনি যদি আগে থেকে সতর্ক থাকেন তাহলে যে কোন উদ্বেগজনক পরিস্থিতিকে আপনি লঘু করে তুলতে পাবেন। কিন্তু জাতে মাতালদের মত তালে ঠিক থাকতে হবে।

Adjustment বা পরিস্থিতি মোকাবেলার কতগুলি সাধারণ কৌশল।

* যা প্রতিকার করতে পারবেন না তা মুখ বুজে সহ্য করতেই হবে। অরণ্যে রোদন করে কোন লাভ নেই।

* যা প্রতিকার করতে পারবেন তার জন্য সঙ্গে সঙ্গেই তৎপর হন। কিন্তু প্রতিকার না হলে আফসোস করবেন না। আপনি সততার সঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন এটাই বড় কথা।

* সামান্য ক্ষতির প্রতিকারের জন্য বৃহত্তর ক্ষতির ঝুঁকি নেবেন না। যেটুকু গেছে যেতে দিন।

ধরুন আপনি কারও কাছে বেশ কিছু টাকা পাবেন। সেটি আদায়ের জন্য যদি মামলা করতে চান তাতে যে টাকা খরচ হবে তাতে পোষাবে না। তাহলে ওই টাকার আশা ছেড়ে ক্ষতিস্বীকার করতে হবে।

অপরের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হবেন না। সাফল্য আসে কঠোর পরিশ্রম, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ফলে। নিজেকে ব্যর্থ ঘোষণা করার আগে ভেবে দেখুন, আপনি কতটা কঠোর পরিশ্রম করেছেন, কতটা শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করেছেন ও কতখানি সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে পেরেছেন। প্রতিটি ব্যর্থতার পিছনে থাকে কোন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে না পারা। কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে পারাটা যদি একটা চ্যালেঞ্জ হয় তাহলে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা না করার জন্যও

ব্যর্থতা আসতে পারে। সুব্যক্তিত্বের অধিকারী সম্মানের সঙ্গে এই ব্যর্থতাকে মেনে নিয়ে অন্য ক্ষেত্রে সাফল্যের চেষ্টা করে যাবেন। যে দুর্বল ব্যক্তিত্ব পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে ব্যর্থ একমাত্র তিনিই ব্যর্থতাকে কলঙ্ক বলে মনে করেন। ব্যর্থতা কলঙ্ক নয়। ব্যর্থতা শুধু অনেক গুলি বিষয়ের মধ্যে কোন একটি বিষয়ে অকৃতকার্য হওয়া। এই ব্যর্থতা থেকে তাকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। ধরুন, যে কোন কারণে আপনি আপনার কর্মস্থলে এমন ভাবমূর্তির সৃষ্টি করতে পারেননি যে আপনি অপরিহার্য, সেক্ষেত্রে হয় আপনাকে এটা প্রমাণ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে, না হয় কর্মপরিবর্তন করতে হবে অথবা যদি দেখেন চাকরি আপনার মেজাজের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না আপনাকে স্বাধীন ব্যবসা বা পেশায় যেতে হবে।

আপনার ব্যর্থতার জন্য আপনার দুর্ভাগ্যকে দায়ী করে সান্ত্বনা পেতে পারেন কিন্তু বাস্তববাদী ব্যক্তিত্ব জানে ব্যর্থতার সঙ্গে গ্রহ-নক্ষত্রের কোন সম্পর্ক নেই। গ্রহবড় তাবিজ কবজ ধারণ করে সাফল্য আসে না, আসতে পারে না। আমি এককালে মনে করতাম আংটি পরে কর্মক্ষেত্রে কুগ্রহকে বশ করা যায়। পরে দেখলাম আংটি নয় কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করাটাই কর্মক্ষেত্রে উন্নতির চাবিকাঠি।

বাস্তব থেকে পালিয়ে না গিয়ে বাস্তবের সঙ্গে দোস্তি করুন। পানশালায় বসে হাহুতাশ না করে, নিউরোটিক ব্যক্তিত্বে পরিণত না হয়ে প্রতিকূল পরিবেশকে বশে আনার চেষ্টা করুন।

মনোবিদ lawton বলেছেন :

The well adjusted person would not change, even if he could, the fact that life is an endless struggle in which human purposes are hurled against external resisting forces, human and natural He knows, and makes use of knowledge, that in the struggle the person who fights himself least will have the most strength and the best judgement the outside battle [৪৭]

যে ব্যক্তিত্ব সকলের সঙ্গে ভালভাবে মানিয়ে চলতে জানে সে কিন্তু নিজেকে বদলাবে না। যদিও সে ইচ্ছে করলেই বদলাতে পারে। কিন্তু তার দরকার নেই। কারণ সে তো জানেই যে জীবন বাইরের প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম। মানুষ ও প্রকৃতি দুয়ের বিরুদ্ধেই তার লড়াই। সে জানে এবং তার ওই জ্ঞানকে কাজে লাগায় জ্ঞানটা হলো, সে নিজের সঙ্গে কম লড়াই করে শক্তি বাঁচাতে পারে, সে বাইরের সঙ্গে লড়াই করার মত বেশি শক্তি পায়। **দায়িত্ববোধ** : সুব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার জন্য সবার আগে দায়িত্ববোধের পরিচয় দিন। ব্যর্থতার দায় ভাগ অন্যের ওপর না চাপিয়ে নিজে বহন করুন। সরকারি কর্মচারীরা ঠিক সময় কাজে আসে না, কর্মসংস্কৃতি নেই। সেজন্য সরকারি কাজও ঢিলেঢালা। এসব কথা বলা কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির শোভা পায় না। কারণ কাজ করানোর দায়িত্ব ম্যানেজারের। সরকার সেই ম্যানেজার। দায় এড়ানোর প্রবণতা সুব্যক্তিত্বের লক্ষণ নয়। দুর্বল ব্যক্তিত্বের মানুষ পাছে কোন কাজের দায়িত্ব নিতে হয়

এজন্য সময় বুঝে সরে পড়েন। ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি দায়িত্ব নিতে ভয় পান না। তবে তিনি এমন দায়িত্বই নেন যাতে তাঁর দক্ষতা ও প্রবণতা আছে এবং আত্মবিশ্বাস আছে যে তিনি কাজটা পারবেন।

* কোন দায়িত্ব নেওয়ার পর কাজে ভুল-ত্রুটির সমালোচনা হলে অকপটে স্বীকার করুন। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন না। যে কোন কাজেই ত্রুটি খুঁজে বার করা যায়।

* আপনার ব্যবহার সমালোচনার কারণ হলে দুঃখপ্রকাশ করুন। একটা অন্যায় বা ভুল করে তার সাফাই গাইবার কোন মানে হয় না।

* জীবনে নারীপুরুষ প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে। নারীর ভূমিকা যে একটু অন্যরকম সমাজ ঠিক করে দিয়েছে। পুরুষের ভূমিকাও সমাজ নির্দিষ্ট। পুরুষ ও নারীর মধ্যে গুণগত কোন পার্থক্য নেই কিন্তু নারী-ও পুরুষের প্রত্যেকেরই আলাদা আলাদা ভূমিকা সব সমাজেই নির্ধারিত। নারী ও পুরুষ ইচ্ছা করলে তাদের এই ভূমিকা পরিবর্তন করতে পারবেনা। তাই বাস্তব অবস্থা মেনে উভয়কেই তাদের নিজের ভূমিকা পালন করতে হবে।

নারী যদি পুরুষের মত আচরণ করে ও পুরুষ যদি নারীর মত আচরণ করে তাহলে তাদের ব্যক্তিত্ব সমাজে গ্রহণযোগ্য হয় না।

সুব্যক্তিত্ব অর্জনের শেষ কথা হল নিজের কাছে নিজের গ্রহণযোগ্যতা। আপনাকে যদি আপনার পরিচয় দিতে বলি তাহলে আপনার সম্পর্কে কী লিখবেন?

ব্যক্তিত্ব গঠনের ক্লাসে আমি প্রথমেই ছেলেমেয়েদের আত্মপরিচয় লিখতে দিয়ে বলি তোমরা অকপটে তোমাদের কথা লেখ। তোমাদের শক্তি ও দুর্বলতার কথাও জানাও। ছেলেমেয়েদের আত্মপরিচয় গোপন করে কয়েকটি আত্মপরিচয় উদ্ধৃত করছি।

একটি মেয়ে লিখছে, আমার সম্পর্কে প্রথমেই বলি যে আমি ডন কুইকজোটের মত কিছুটা ইউটোপিয়ার জগতে বাস করি। সম্ভবত এটাই আমার বড় ত্রুটি। তবু আমি আমার ভুল-ত্রুটি থেকে শিখি। এইভাবে বাস্তবতার মোকাবেলা করি। ছোটবেলায় আমি কম কথা বলতাম, ভাবতাম বেশি। গল্পের বই আমার বড় আকর্ষণ ছিল। আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু ছিল আমার ব্যক্তিগত ডায়েরি, রঙ তুলি, ঘুঙুর আর টেপ রেকর্ডার। আমি কখনও পুতুল খেলিনি। একবার বা দুবার মাত্র খেলার মাঠে গিয়েছি। যখন অন্যমেয়েরা খেলা করছে। লাফাচ্ছে আমি ঘরে বসে গান শুনছি, ছবি আঁকছি। কলেজে উঠে আমি এই অন্তর্মুখীনতার সমস্যা দূর করার চেষ্টা করি। আমি ক্লাসের সহপাঠীদের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করি। দুএকজনের সঙ্গে আমার পছন্দের খুব মিল হয়। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভালবেসে এসেছি আমার ছবি আঁকা আর নাচকে।

তারপর ধীরে ধীরে আমি আমার দুর্বলতাকে কাটিয়ে উঠেছি। জীবনকে ভালবেসেছি। সময় আমাকে দিয়েছে ধৈর্য ও শান্তি। আমি এখন শিখেছি ঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে। আমি এখন আত্মবিশ্বাসী, মানসিকভাবে সুস্থিত। আমি ভগবানে বিশ্বাসী, প্রেমে বিশ্বাসী। এই বিশ্বাস আমাকে এনে দিয়েছে অন্তহীন আত্মপ্রত্যয়। এখন আমি জীবনের সমস্ত বাধা বিপত্তির মুখোমুখি হতে ভয় পাই না। আর একটি আত্মপরিচয় শুনুন। এটিও

লিখেছে একটি মেয়ে।

'ছোটবেলায় আমি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলাম। আমি নভোচারী, সুপার মডেল, পাইলট, উকিল ব্যালে নর্তকীর মধ্যে যে কোন একটা হতে চেয়েছিলাম। আমি ভাবতাম এই পৃথিবীটাই আমার পক্ষে বড় জায়গা নয়। আমি যা চাই তাই-ই আমি পেতে পারি।

যখন আমি ক্লাস টেনে পড়ি তখন আমার বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। আমি এর আগে কখনও উপলব্ধি করিনি, বাবা আমাকে কতটা ভালবাসতেন। সব কিছু আমার জীবনে বিস্বাদ হয়ে গেল। এমনকী তখন একটা শিশুকেও আমার আর ভাল লাগত না। অথচ আমি বাচ্চাদের ভালবাসতাম। বাস্তব আমাকে অদ্ভুত ভাবে আঘাত করল। এরপর প্রত্যেকটি ছেলে-মেয়ে যাদের বাবা জীবিত আছে তাদের দেখলে আমার রাগ হত।

তবে অভিজ্ঞতা মানুষকে পরিণত করে। আমি আরও স্পষ্ট করে সব কিছু দেখতে শিখলাম। কিন্তু আমি হয়ে উঠলাম এক রাডারহীন জাহাজ।

আমার মধ্যে সবচেয়ে বোকামি যেটা এখনও রয়ে গেছে সেটা হল আমার তিরিক্ষি মেজাজ। আমি যাকে ভালবাসি ও শ্রদ্ধাকরি তার জন্য সব কিছু করতে পারি আর যাদের অপছন্দ করি তাদের সম্পর্কে উদাসীন থাকি। আমি অত্যন্ত স্পর্শ কাতর ও ভাবাবেগ প্রবণ ব্যক্তিত্ব। যদি কেউ আমার ওপর কঠোর হয় তাহলে আমি তার প্রতি নিষ্ঠুর হতে পারি না। আমি লোককে চট করে বিশ্বাস করে ফেলি।

আমার যা কিছু ভাল সবই বাবার কাছ থেকে পেয়েছি। আমার সব সময় মনে হয় বাবা আমাকে আশীর্বাদ করছেন।'

এবার একটি ছেলের আত্মপরিচয় থেকে উদ্ধৃত করছি।

''আমার যখন ২১ বছর বয়স তখন আমার এই পৃথিবী হঠাৎ আমার সামনে চুরমার হয়ে ভেঙে গেল। আমি এর মোকাবিলা করার জন্য তৈরি ছিলাম না। যদি কেউ দেখে তার জীবনে একমাত্র ভালবাসার লোক হারিয়ে গেছে তাহলে সেতো তার জন্য তৈরি থাকেনা আমার মনে হল আমি সব শক্তি হারিয়ে ফেললাম। তারপর আমার হৃদয়ের গভীরে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম যে প্রভু তুমি আমাকে আরও শক্তি দাও, সঙ্কল্প দাও। আমার অন্তরের শক্তি আমাকে এই পৃথিবীকে নতুন করে উপলব্ধি করতে সাহায্য করল। আমি বুঝলাম উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা যা মানুষকে তিলে তিলে হত্যা করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার একমাত্র অস্ত্র সুখ। একজন প্রকৃত মানুষ সব সময় সুখী।'

ওপরের যে তিনটি ছেলেমেয়ের আত্মপরিচয় থেকে উদ্ধৃত করলাম সেগুলি মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠনের এক মূল্যবান দলিল হিসাবে আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি।

এই তিনজনই নিজেরা প্রবল আত্মোপলব্ধির জোরে নিজেদের ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটিয়েছে এবং আমার বিশ্বাস এরা ব্যক্তিত্বের আরও উন্নতি করবে। ব্যক্তিত্ব তাই সদা উন্নয়নশীল এক অস্তিত্ব। যাকে ভারতীয় ঋষিরা বলে এসেছেন অমৃত পিপাসা। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব অসুস্থ হয়ে পড়ছে আলোর সন্ধান পাচ্ছে না বলে। সুখ বা happiness

হল সেই আলো।

সুখ কী? গাড়ি বাড়ি প্রমোশন, বড় পদ, মোটা বেতন এগুলো সুখ নয়। টাকা দিয়ে সব কেনা যায়—আরাম, নিরাপত্তা, আনুগত্য, বন্ধুত্ব। চোখের সামনে আমরা যা কিছু দেখছি প্রত্যেকের ওপবেই একটি করে দামের লেবেল আছে। কিন্তু সুখ একমাত্র বস্তু যা অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। তা শুধু এক উপলব্ধি এই উপলব্ধি তারই হয় যে জীবনকে জানে, যার আত্মধারণা (Self concept) জন্মেছে।

সুখ আসে দুভাবে। বাইরের দিক থেকে যদি একাধিক উদ্দীপক এসে মানুষের অহংবোধকে পরিতৃপ্ত করে তাহলে আপনি সুখ পেতে পারেন। যেমন আপনি যদি ভাল কাজ করে যান। যাকে স্বামীজী বলেছেন দাগ রেখে যাওয়া। বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় কিছু করা যাওয়া। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় সংসার মাঝে দুএকটি সুর রাখি দিয়া গাবো করিয়া মধুর....।

রাম তার বাবার মৃত্যুর পর নাবালক ভাইবোনদের মানুষ করেছে, তাদের বড় করে তুলেছে। বোনের বিয়ে দিয়েছে। রাম এজন্য আত্মতৃপ্ত। সে যদি তার ভাইবোনদের কাছে প্রত্যাশা না করে সে তাহলে সুখী।

* শ্যাম বহু ছেলেমেয়েকে চাকরি করে দিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। শ্যাম যদি প্রত্যাশা করে যে সে যাদের চাকরি দিয়েছে তারা তাকে বছরে অন্তত একদিন বিজয়ার চিঠি দেবে তাহলেই তার প্রত্যাশা হয়ে গেল। প্রত্যাশা যদি সে না করে এবং ভাবে তার কাজ সে করেছে তারই আত্মতৃপ্তির জন্য তাহলেই সে সুখী।

এই আত্মসুখই একমাত্র আদর্শ ব্যক্তিত্বের জন্ম দিতে পারে।

উপসংহার

ব্যক্তিত্ব নিয়ে নয়টি প্রশ্ন

১। প্রশ্ন ঃ আমি একজন তরুণ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরি হচ্ছি। এর আগে দুবার লিখিত পরীক্ষায় পাস করেও ইন্টারভিউতে গিয়ে আটকে গিয়েছি। এর ফলে খুব ভেঙে পড়েছি।

উত্তর ঃ চাকরির ইন্টারভিউ শুধু মাত্র কতগুলি প্রশ্নোত্তরের পরীক্ষা নয়। তা ব্যক্তিত্বের পরীক্ষা। অনেকের ধারণা স্যুটবুট টাই পরে গিয়ে ওপর চালাকি দেখালেই বুঝি স্মার্ট বলে গণ্য হওয়া যায়। ব্যক্তিত্ব ব্যাপারটি হল আত্মবিশ্বাস। আর আত্মবিশ্বাস ব্যাপারটি মুখ চোখের মধ্যেই ফুটে ওঠে। উদ্বেগ থাকলে আর আত্মবিশ্বাসের ছিটেফোটা থাকবে না। তাই সবার আগে আপনাকে উদ্বেগ তথা টেনসনমুক্ত হতে হবে। এটা একদিনের ব্যাপার নয়। দিনের পর দিন প্র্যাকটিস করতে হয়। আপনি যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবেন তখন চাকরিটা হবে কি হবেনা, এ নিয়ে একদম ভাববেন না। মাথার মধ্যে যদি থাকে আমি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি তাহলে কিছুতেই সহজ হতে পারবেন না।

কখনও গম্ভীর মুখ করে থাকবেন না আবার মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে তোলার দরকার নেই। সহজভাবেই হাসবেন। নার্ভাসনেসের হাসি নয়।

সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর যদি দিতে নাও পারেন তাহলে সপ্রতিভ ভাবে স্বচ্ছ প্রবহমান ইংরেজিতে জবাব দিন। অবান্তর বা অপ্রাসঙ্গিক কথা বলবেন না। কিছুদিন আগে এক ইন্টারভিউতে দুজন প্রার্থী এলেন। একজনের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা আছে। কেরিয়র ভাল। আর একজন একদম নতুন। কিন্তু প্রথম অভিজ্ঞ প্রার্থী এমন উদ্বেগে ভুগছিলেন যে প্রতিটি প্রশ্নের তিনি দীর্ঘ এবং অবান্তর উত্তর দিচ্ছিলেন। আর একজন খুব সংক্ষেপে টু দি পয়েন্ট উত্তর দিচ্ছিলেন। শেষের জন নির্বাচিত হলেন। অথচ প্রথম প্রার্থীর কেরিয়র খুব ভাল ছিল। ভাল করে স্পষ্ট ইংরেজিতে আপনি কথা বলতে শিখুন।

২। প্রশ্ন ঃ আমার ছেলে ইন্টারভিউর সময় তোতলামো করে। অথচ অন্যসময় স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে। এজন্য খুব অশান্তিতে আছি।

উত্তর ঃ আমি অনেক তোতলা ব্যক্তিকে বড় বড় পদে চাকরি করতে দেখেছি। এঁরা দাপটের সঙ্গেই কাজ করছেন। আপনার ছেলের ব্যক্তিত্বের কোনো ঘাটতি আছে। অনেক

সময় আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে নার্ভাসনেস আসে। তারপর সাময়িকভাবে অনেক ছেলেমেয়ে তোতলামো করে। আবার আত্মবিশ্বাসের জোরে প্রকৃত তোতলারা দিব্যি ইন্টারভিউতে পার পেয়ে যায়। আপনি ছেলেকে নানা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে দিন। আবৃত্তি, ঘোষকের কাজ অল্প বক্তৃতা, অভিনয় এই সব। যাকে স্টেজ ফ্রি হওয়া বলে। সবচেয়ে ভাল হয় রোজ ভোরে ফাঁকা মাঠে গিয়ে বক্তৃতার রিহার্সাল দেওয়া। অনেক সময় ইন্ট্রোভারসান থেকে সাইনেস বা লাজুক ভাবে আসে। তবে স্বরযন্ত্রের কোন গোলমাল আছে কি না তা একবার ই.এন.টি বিশেষজ্ঞ কে দিয়ে দেখিয়ে নিতে পারেন। বার বার ব্যর্থতা থেকেও তোতলামো আরও বেড়ে যেতে পারে।

৩। প্রশ্ন ঃ আমি মধ্যবিত্ত ঘরের সাধারণ বাঙালি মেয়ে। আমি খুব রোগা, এজন্য কোনো ছেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছি না। অথচ আমি আমার বান্ধবীদের মত ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে মিশতে আগ্রহী।

উত্তরঃ আপনার এই ইচ্ছা স্বাভাবিক। এই বইতে আমি দেখিয়েছি বয়ঃসন্ধির সময় থেকেই ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ স্বাভাবিক এবং স্বাস্থ্যকর। এই বয়স থেকে ছেলে মেয়েদের স্বাভাবিক মেলামেশায় বাধা দিলে তাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে বঞ্চনাবোধ থেকে যাবে। পরবর্তীকালে দাম্পত্যজীবনে এর প্রভাব পড়তে পারে। পুরুষ তখন অবচেতন মনে নারীবিদ্বেষী ও নারী পুরুষবিদ্বেষী হয়ে উঠতে পারে।

আপনি কেন রোগা সেটি আগে ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিন। সাধারণত মেয়েরা অপুষ্টিতে ভোগে। এজন্য সুষম খাদ্য দরকার। তবে জেনেটিক কারণে আপনি যদি দুর্বল গড়নের হন, তাহলে মোটা হবার চেষ্টা করবেন না। তাতে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। আপনি শুধু যোগ ব্যায়াম করে দেহকে সুঠাম করুন। রোগা আধুনিক চোখে সৌন্দর্যের কোন ঘাটতি নয়। রুগ্ণতাই ঘাটতি।

৪। প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৫০। আমি খুব লড়াই করে মানুষ হয়েছি। চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছি। ভাইবোনদের লেখাপড়া শিখিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে অনেকগুলি বয়স নষ্ট হয়। এজন্য বেশি বয়সে বিয়ে করি। আমার শ্যালক, শ্যালিকাকেও আমি চাকরি করে দিয়েছি। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল নয়। সে আমাকে প্রায়ই কথা শোনায় যে আমার মত তথাকথিত পরোপকারীকে বিয়ে না করে কোন মিশনে গিয়ে জীবন কাটানোই উচিত ছিল। কারণ আমি এখনও বৃদ্ধ বাবা-মাকে নিজের কাছে রেখেছি। তাছাড়া যে আমাকে অনুরোধ করে আমি তারই উপকার করার চেষ্টা করি। কিন্তু উপকৃতেরাও কেউ আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ রাখে না। আফিসেও আন্তরিকতাব সঙ্গে কাজ করে স্বীকৃতি পাই না। এজন্য আমি সব সময় হীনম্মন্যতায় ভুগি। এসব ভাবতে ভাবতে ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছি। কী করব বলে দিন।

উত্তর ঃ আপনি যে কারণে কষ্ট পাচ্ছেন তাকে আমি ছোট করে দেখছি না ও আর পাঁচজনের মত এক কথায় উত্তর দিচ্ছি না যে কী আর করবেন, চেপে যান। কারও কাছে প্রত্যাশা করবেন না।

না। একথা আমি বলতে পারি না। কারণ মানুষ সমাজ তথা পরিবার তৈরি করেছিল তার নিরাপত্তার জন্য। এই নিরাপত্তার মধ্যে তার মানসিক নিরাপত্তাও আছে। একটি গাছ বড় হয়ে ওঠার জন্য যেমন মাটি সার জল লাগে তেমনি সূর্যালোক ও বাতাসেরও দরকার। সামাজিক স্বীকৃতি পারিবারিক স্বীকৃতি অনেকটা এই সূর্যালোকের মত। দখিনা বাতাসের মত। সমাজ যদি ব্যক্তি হিসাবে আমার আইডেনটিটিকে সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির সঙ্গে স্বীকার করে তাহলে আমি বুঝতে পারি সমাজের সঙ্গে আমার সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে আমার মানসিক স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

সামাজিক স্বীকৃতি বা সুসম্পর্ক মানে পাড়ার লোকজনের সঙ্গে শুধু সুসম্পর্ক নয়। পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক। আমার স্ত্রী ছেলেমেয়ে, ভাই বোন যদি আমাকে ভাল না বাসে তাহলে বিশ্বস্বীকৃতি পেয়েও আমার জীবন অসম্পূর্ণ। এজন্যই অপরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যত ভাল করা যাবে ততই আমাদের আত্মপ্রত্যয় বাড়বে।

কিন্তু এমন লোক খুঁজে পাওয়া মুশকিল যে সমাজের সকল শ্রেণীদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে। নৈর্ব্যক্তিক ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব দিয়ে এটা গড়ে তোল সম্ভব। একে বলে জনসংযোগ। একজন পি আর ও বা জনসংযোগ অফিসারকে শেখানো হয় কী ভাবে তিনি তার কোম্পানির ভাবমূর্তি অমলিন রাখবেন। কোথাও ভাবমূর্তি ভেঙে গেলে সেটা কী ভাবে মেরামত করতে হবে। কিন্তু ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা বড় কঠিন কাজ। কারণ তাঁকে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় ভাবাবেগ দিয়ে। প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। কোম্পানির জনসংযোগের ক্ষেত্রে আপনি। মিডিয়ার সাহায্য পেতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির ও ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে হয় একা ব্যক্তিকে।

মনে রাখতে হবে সবাইকে সন্তুষ্ট করা খুব দুঃসাধ্য কাজ। প্রথম কথা প্রত্যেক লোক চায় যে সমাজের সব লোক তার মত হোক। কিন্তু প্রকৃতিই প্রতিটি মানুষকে আলাদা আলাদা করে তৈরি করেছে। তাই রাম কখনও শ্যাম হতে পারে না। অথচ অন্যকে অন্যের মত করে গড়ে উঠতে দিতে অধিকাংশ লোক নারাজ হয়। বাবা চায় ছেলে তার মত হোক। মা চায় ছেলে তার মত হোক। শ্বশুর বাড়ির লোকেরা প্রত্যাশা করে নতুন বউ এসেই তাদের পরিবারের মেয়ের মতই অভিন্ন ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠবে। প্রত্যেক সমাজেরই কিছু না কিছু নিজস্ব চাহিদা থাকে। প্রত্যেক সমাজ ও পরিবারের নিজস্ব মূল্যবোধ আছে। সমাজ ও পরিবার প্রত্যাশা করে প্রত্যেকে ওই মূল্যবোধগুলি গ্রহণ করবে। যদি ব্যতিক্রম

হয় তখনই সমাজ ও পরিবার তার প্রতি বিরূপ হয়। অনেকেই সমাজের চোখে দুর্বিনীত বলে গণ্য হয়। এমনকি প্রত্যাশা পূরণ করতে না পারলে বাবা মা ভাই বোন সবাই সেই ব্যক্তিকে আর সুনজরে দেখে না।

বহু মানুষ এত স্বার্থপর যে একবার উপকার করেও তার মন পাওয়া যায় না। তাকে বার বার উপকার করতে হয়। এমনকী, সংসারের জন্য নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েও বহু মানুষ তার স্বীকৃতি পান না। এ সম্পর্কে স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশাই একটি চিঠিতে তাঁর বাবাকে যা লিখেছিলেন তা হুবহু উদ্ধৃত করছি :

শ্রীশ্রীহরিঃ শরণম্

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পিতৃদেব শ্রীচরণারবিন্দেযু প্রণতিপূর্ব্বকং নিবেদনম্

নানা কারণে আমার মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য জন্মিয়াছে আর আমার ক্ষণকালের জন্যেও সাংসারিক কোন বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোন সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ ইদানীং আমার মনের ও শরীরের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে তাহাতে সাংসারিক বিষয়ে সংসৃষ্ট থাকিলে অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। এ জন্য স্থির করিয়াছি যতদূর পারি নিশ্চিন্ত হইয়া জীবনের অবশিষ্ট ভাগ নিভৃতভাবে অতিবাহিত করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমতী মাতৃদেবী প্রভৃতিকে যে পত্র লিখিয়াছি তাহার প্রতিলিপি শ্রীচরণ সমীপে প্রেরিত হইতেছে যদি ইচ্ছা হয় দৃষ্টি করিবেন।

সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি সে বিষয়ে কোন অংশে কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। **যে সকলকে সন্তুষ্ট করিতে চেষ্টা পায় সে কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারে না এই প্রাচনী কথা কোনক্রমেই অযথা নহে।** সংসারী লোকে যেসকল ব্যক্তির কাছে দয়া ও স্নেহের আকাঙ্ক্ষা করে তাঁহাদের একজনেরও অন্তঃকণে যে আমার উপর দয়া ও স্নেহের লেশমাত্র নাই সে বিষয়ে আমার অণুমাত্র সংশয় নেই। এরূপ অবস্থায় সাংসারিক বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া ক্লেশ ভোগ করা নিরবচ্ছিন্ন মূর্খতার কর্ম্ম। যে সমস্ত কারণে আমার মনে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে আর তাহার উল্লেখ করা অনাবশ্যক। এক্ষণে আপনকার শ্রীচরণে আমার বক্তব্য এই - পিতার নিকট পুত্রের পদেপদে অপরাধ ঘটিবার সম্ভাবনা সুতরাং আপনকার শ্রীচরণে কতবার কত বিষয়ে অপরাধী হইয়াছি তাহা বলা যায় না। তজ্জন্য কৃতাঞ্জলীপুটে কাতর বচনে শ্রীরচণে প্রার্থনা করিতেছি কৃপা করিয়া এ অধম সন্তানের সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

কার্য্যগতিকে ঋণে বিলম্ব আবদ্ধ হইয়াছি। ঋণ পরিশোধ না হইলে লোকালয়ে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে যাহাতে সত্বর ঋণমুক্ত হই তদ্বিযয়ে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি। ঋণে নিষ্কৃতি পাইলেই কোন নির্জ্জন স্থানে গিয়া অবস্থিতি করিব।

গত বৎসর কলিকাতায় আসিয়া আপনকার প্রতিষ্ঠিত দেবতার নামে এক দানপত্র করিয়াছিলেন। দৈব নিগ্রহে ঐ দেবতা নষ্ট হইয়াছেন। এক্ষণে দানপত্রের লিখিত বিষয়ের যেরূপ ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা হয় করিবেন। আর মধুসূদন ভট্টাচার্য্যের দরুন খেরাজী জমী স্কুল ও ডাক্তারখানার সঙ্গে রাখাতে অতিশয় অসুবিধা ঘটিতেছে! ঐ জমীর প্রকারান্তরে বিনিয়োগ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আপনকার যেরূপ অভিরুচি হয় করিবেন। যদি স্কুল ও ডাক্তারখানার সঙ্গেই রাখিয়া দেন তবে অসুবিধা নিবারণের জন্য ঐ জমী ইস্থফা করিতে হইবেক। দুই দানপত্র প্রেরিত হইতেছে।

আপনকার নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যাহা প্রেরিত হইয়া থাকে যত দিন আপনি শরীর ধারণ করিবেন কোনও কারণে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবেক না জানিবেন ইতি ২৫ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সন।

ভৃত্য শ্রীঈশ্বরচন্দ্রশর্ম্মণঃ

প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাঁদের প্রতিভার জন্য সামাজিক সম্মান পেতে পারেন। তাঁরা সামাজিক জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে পারেন কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের ব্যক্তিত্ব আপন পরিবারে গ্রহনীয় হবে বলে কথা নেই। অনেক বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বিবাহিত জীবনে সফল হন নি। কারণ তাদের স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনা হয়নি। কারও বাবামায়ের সঙ্গে মতে মেলেনি। আমি একজন বিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিককে জানি প্রথম যৌবনে তাঁর মায়ের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়, জীবনে মা ও ছেলেতে আর দেখা হয়নি। মধ্যপ্রদেশের রাজপরিবারের এক সুবিখ্যাত ব্যক্তিত্ব জনগণের কাছে খুবই প্রিয়। এক সময় ভারতের সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রীর তালিকায় তাঁর নাম উঠেছিল। কিন্তু সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর মা ও বোনের বিবাদ এমন চরমে ওঠে যে ছেলে মাকে জেল খাটানোর জন্য চেষ্টা করে। এই খবর আমাকে শিউপুরীতে তাঁর প্রাসাদে বসে তাঁর বৃদ্ধা মা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন।

সকলের কাছে সমান জনপ্রিয়তা আশা করা এক অবাস্তব ঘটনা। এক সকলের বিখ্যাত যাদুকরের ভাই এর কাছে তাঁর দাদার ব্যক্তিত্ব নিয়ে নেতিবাচক কথা বলতেন। আবার গান্ধীজীর মত বিশ্বমানবকে এখনও প্রকাশ্যে বহুলোক গালমন্দ করে থাকেন। রাজনীতিকদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা শেয়ার বাজারের মত ওঠানামা করে। তবু সব মানুষই যথা সম্ভব সামাজিক স্বীকৃতি বাড়াবার জন্য চেষ্টা করে। কেউই ইচ্ছা করে জনপ্রিয়তা হারাতে চায় না বরং অনেকেই জনপ্রিয় হবার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করে। প্রচুর টাকা চাঁদা দেয়। পরিবারের সকলের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। স্ত্রীকে গহনা গড়িয়ে দেয়। আত্মীয় কুটুম্বকে নিয়মিত উপহার দেয়। কোন বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে না। কখনও অপ্রিয় সত্য কথা বলেন না। সামাজিক স্বীকৃতি হারাবার ভয়ে বহু লোক সুবিধাবাদী হয়ে যায়। পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিত্বকে গ্রহণীয় করে তোলার জন্য যেটুকু প্রয়োজন তা হল, কতগুলি মূল্যবোধ গ্রহণ

করা প্রলোভন এবং কতগুলি নিয়ন্ত্রণে আনা। পারিবারিক সুসম্পর্কের জন্য দরকার পারস্পরিক হর্ষ, ভালবাসা ও সহানুভুতি। ম্যাকডোগাল বলেছেনঃ হর্ষ বা আনন্দই মানুষকে সমুখপানে চলতে ও চালাতে শেখায়। ইচ্ছার পরিপূর্ণতা থেকেই হর্ষের উৎপত্তি। আপনি যদি দেখেন আপনার পরিবারে লোকজন আপনার ইচ্ছার পরিপূর্ণতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না বরং সাহায্য করছে তখনই আপনি পরিবার জীবনে আনন্দ খুঁজে পাবেন। তেমনি পরিবারের সদস্যদেরও আপনার কাছে কতগুলি প্রত্যাশা থাকে। সেটি অনেক ক্ষেত্রে মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মা বাবা চাইবে সন্তান তাদের ভক্তি করুক। ছেলেমেয়ে চাইবে বাবা মা তাদের ভালবাসুক। স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকেরেই তাদের কাছে অপরজনের একটি আদর্শ রোল মডেল আছে। সেই রোল মডেল অনসারে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে মিলিয়ে নিতে চায়। এটা স্বাভাবিক ঘটনা। আপনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন হতে পারেন, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকে অবহেলা করবেন বা পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করবেন এটি কোন স্ত্রী সহ্য করে না। আবার একমাত্র ছেলে বিবাহিতা স্ত্রী কন্যাকে বাবা মায়ের কাছে রেখে অন্যত্র বিয়ে করে আলাদা সংসার করছে। তা সত্ত্বেও বাবা বা ওই ছেলেকে ভালবাসার স্বীকৃতি দিতে পারেন না। অবশ্য এমনও দেখেছি অত্যধিক স্নেহ প্রবণ বাবা মা এমন কুলাঙ্গার ছেলের সঙ্গে গোপনে সম্পর্ক রেখেছে। কিন্তু এই ধরনের সমাজ বিরুদ্ধ ও মূল্যবোধের ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে থাকে এবং ব্যক্তিত্বের ওপর তার প্রভাব পড়ে।

একথা মনে রাখা দরকার যে একটি সুকুমার প্রবৃত্তিকে কঠোর প্রবৃত্তি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা যায়। ভাবাবেগকেও গোপন করা যায়। কিন্তু অচেতন ও সচেতন মনে একটি বঞ্চনা বোধ ক্রমশ লালিত হতে থাকে। সেইসঙ্গে অপরাধবোধও। জেমস ল্যাঙ্গ এর ভাবাবেগ তত্ত্ব অনুসারে আমরা যদি আমাদের আপনজনকে দুঃখ দেই, আঘাত দেই এবং তাদের প্রতি অন্যায় করি তাহলে তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে আমাদের মধ্যে ভাবাবেগ দেখা দিতে বাধ্য। কারণ ল্যাঙ্গ এর মতে ভাবাবেগের বশে আমরা কোন কাজ করি না। আগে কাজটা করে ফেলি তারপর প্রতিক্রিয়াই ভাবাবেগ দেখা দেয়।

কিন্তু জীবনের এই গভীর তত্ত্ব অন্যকে বোঝাবে কে? একথা আপনি বোঝাতে গেলে তিনি বুঝবেন না। কাজেই মনের পরিবর্তন তখনই হবে যখন তিনি কোন সময় যদি আমার এই বইটি পড়েন তাঁর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। তাঁকে বুঝতে হবে সুখ-শান্তি একতরফা নয়। কারও মনে আঘাত দিলে তার কাছ থেকেও আঘাত আসতে পারে। অন্তত আঘাত না এলেও তিনি আর তাঁর আনন্দের উৎস থাকছেনা। অর্থাৎ একটা সুইচ নিভিয়ে দিলে একটি আলোর উৎস কমে গেল। Give and Take এটা নিয়েই জীবনের পরিপূর্ণতা। যে উপকারীকে বিস্মৃত হয় সে নিজেকেই বিস্মৃত হয়ে নিজের পায়ে কুরুল মারে। একটা সুসম্পর্ককে নষ্ট করে। অন্তত আমি এইভাবে জীবনকে দেখি। আমি গর্ব

করে বলতে পারি এই মুহূর্তে বহু কৃতী যুবক যে করে খেতে পারছেন তাদের দাঁড় করানোর পিছনে আমার কিছুটা সাহায্য ছিল। কিন্তু তাঁরা কেউ আমাকে বিজয়া বা নববর্ষে ২৫ পয়সার একটি পোস্টকার্ডও পাঠান না। এতে কী আমার কষ্ট হয় না? হয়। কিন্তু আমি এই ভেবে মানসিক শান্তি পাই যে একটা ছেলেকে জীবনে দাঁড় করিয়ে আমি যে আনন্দ পেয়েছি। নৈতিক বল পেয়েছি তাতেই আমার পাওনা শোধ হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার উদ্বেগ দূর হয়ে যায়।

৫। প্রশ্ন ঃ আমি দেখেছি বর্তমান যুগে গোষ্ঠী বা গ্রুপবাজি ছাড়া ওপরে ওঠা অসম্ভব। আবাব গ্রুপে যোগ দিতে গেলেও মনে হয় এই বুঝি আমার ব্যক্তিত্ব অনেকটা খাটো হয়ে গেল। আমি ৩২ বছরের এক যুবক। একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। উচ্চাকাঙ্খী। আমার এম. বি. এ ডিগ্রিও আছে।

উত্তর ঃ গোষ্ঠীবদ্ধতা মানুযের আদিমপ্রবণতা। গোষ্ঠীর উৎপত্তিই হয়েছিল যৌথ নিরাপত্তা গড়ে তোলার জন্য। সুতরাং আজ যে মানবগোষ্ঠী অসংখ্য উপগোষ্ঠীতে বিভক্ত তার মধ্যে মানুষী ভাবনার কোন ব্যতিক্রম দেখিনা। পৃথিবীতে বড় বড় মনীষীরা নিজেরাই গোষ্ঠী বা School of thought নেতৃত্ব দিয়ে গিয়েছেন। আপনার ব্যক্তিরুচি চিন্তাভাবনা অনুসারে আপনি যে কোন সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক গোষ্ঠীতে যোগ দিতেই পারেন। তবে অনেক ক্ষেত্রে গোষ্ঠীকে অন্যায় ও বেআইনিভাবে ব্যক্তি স্বার্থের কাজে লাগানো হয়। যেমন এখন বাজনৈতিক গোষ্ঠী অন্যায় ও বেআইনিভাবে গোষ্ঠীর লোকদের চাকরিতে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও গোষ্ঠীর লোককে বড় বড় পদে বসাচ্ছে। সম্প্রদায় ও জাতপাতের নামে এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার চেষ্টায় আছে। এটা একুশ শতকের এই বিজ্ঞান মনস্ক পৃথিবীতে হওয়া উচিত ছিল না কিন্তু হচ্ছে। আপনি যাব যোগ্য নন গোষ্ঠীর জোরে সেই পদমর্যাদা অধিকার করলেও আপনার অবচেতন মনকে আপনি ফাঁকি দিতে পারেন না। এই পরিস্থিতিতে আপনি ব্যক্তিত্বের সংকটে ভুগতে বাধ্য।

আপনি যদি মনে করেন যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আপনার হয়ে কেউ বলার নেই বলে আপনি যথাস্থানে পৌঁছতে পারছেন না, তাহলে আপনি জনসংযোগের সুবিধার জন্য গোষ্ঠীতে যোগ দিতে পারেন। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বা জাতপাতের ভিত্তিতে তৈরি গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে জাত বিদ্বেষে কখনও ইন্ধন যোগাবেন না। যদি কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাস করেন তবেই দলে যোগ দেবেন। আমি অনেক লোককে জানি কার্লমার্কস কোন দেশের লোক, তাঁর মোদ্দা কথাটা কী বলতে পারেন না। অথচ মার্ক্সবাদী সেজেছেন শুধু বেআইনি ভাবে কিছু পাওয়ার লোভে। এমন গোষ্ঠীতে কখনই যোগ দিতে বলি না। এতে ব্যক্তিত্বের অপমান হয়।

৬। প্রশ্ন ঃ আমার বয়স ৪০। আমি গৃহবধূ। দুই সন্তানের জননী। আমার স্বামী পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। তিনি একটি কোম্পানির উচ্চপদে আছেন। আমরা কোম্পানির ফ্ল্যাটে থাকি। আমার স্বামী এমনিতে ভদ্র। কিন্তু তিনি কোন বিশেষ আদব-কায়দার ধার ধারেন না। তিনি বলেন, ওগুলো হল ফর্মালিটি। করমর্দন করা, মেয়েদের গাড়ি থেকে আগে নামিয়ে তারপর নিজে নামা। রেস্টুরেন্টে আস্তে আস্তে কথা বলা এসবের তিনি ধার ধারেন না। এমনকী, পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারেও তিনি উদাসীন। আমার মনে হয় এর ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বের যথেষ্ট খামতি থেকে যাচ্ছে।

উত্তর ঃ আপনার স্বামী নিশ্চয়ই পাবলিক স্কুলে পড়েননি। একমাত্র আবাসিক পাবলিক স্কুল ছাড়া অন্য স্কুলে কদাচিৎ ছেলেমেয়েদের এটিকেট শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে বহু এটিকেট মানুষ বড় হয়ে দেখে শেখে। আমি গ্রামের স্কুলে কলেজে পড়েছি। আমরা কোন সাহেবি এটিকেট শিখিনি। আমি ২২ বছর বয়সে যখন বিলেত যাই তখন আন্তর্জাতিক সামাজিক আদব কায়দা কিছুই জানতাম না। কিন্তু আমি বই বড়ে ও দেখে আদব কায়দা রপ্ত করি। মনে রাখতে হবে ব্যক্তিত্বকে বিভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেলে সেই সমাজের সংস্কৃতি রপ্ত করতে হয়। তা না হলে অন্যে তার ব্যতিক্রমী ব্যবহারকে নানাভাবে নেতিবাচক ব্যাখ্যা করতে পারে। যেমন বেআদপ, বেশরম, বেহায়া, উজবুক, অভদ্র এমন নানা শিরোপা জোটে। এতে আপনার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির ক্ষতি হতে পারে। সামাজিক স্বীকৃতি পেতে গেলে আপনাকে সমাজের আচরণবিধি মেনে চলতেই হবে।

৭। প্রশ্ন ঃ আমার ছেলের বয়স বারো। আমাদের একমাত্র ছেলে। কলকাতার একটি ভাল স্কুলে সে পড়ে। কিন্তু সে একদম মিশুকে প্রকৃতির নয়। আমাদের আত্মীয় স্বজন বাড়িতে এলেও সে দেখা করতে চায় না।-সে তখন ঘরে কম্পিউটার নিয়ে বসে থাকে। এর ফলে আমরা উদ্বিগ্ন।

উত্তর ঃ নিশ্চয়ই আপনাদের একটি মাত্র ছেলে। এক সন্তান মানুষ করার ব্যাপারে বাবা মাকে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হয় কারণ এক সন্তানের মধ্যে অন্তর্মুখীনতার প্রবণতা থাকে। বিশেষ করে সে যদি মায়োপিক হয়তো সোনায় সোহাগা। বাবা মায়েদের উচিত শিশুকে ইস্কুলে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখা তার সহপাঠী (Peer groop) দের সঙ্গে সহজে মিশতে পারছে কিনা। শিশুকে সামাজিক মেলামেশার উপযোগী করে তোলার জন্য কতগুলি নৈপুণ্য শেখাতে হয়। একটি হল. নানা ধরনের ইনডোর ও আউডোর খেলায় পারদর্শী করা। কতগুলি কমন হবির প্রতি আকৃষ্ট করা। সমবয়সীদের সঙ্গে আলাপে উৎসাহিত করা। ছেলেমেয়েরা সহপাঠীদের সঙ্গে আড্ডা দিলে সেটিকে নিরুৎসাহ না করা। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি বাব-মা ছেলেমেয়েদের তাদের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বা খেলধুলো করাকে মনে করেন সময় নষ্ট। তার চেয়ে পড়াশোনা করাটাকে তাঁরা সময়ের

সদ্ব্যবহার করা বলে মনে করেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক স্ফুরণের জন্য পছন্দসই গ্রুপে যোগ দেওয়াটা ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যই দরকার।

৮। প্রশ্ন : আপনাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ব্যক্তির পক্ষে আজ সবচেয়ে বড় সংকট কোনটি? আপনি তার কী উত্তর দেবেন?

উত্তরঃ আমার মতে ব্যক্তির ও ব্যক্তিত্বের বড় সংকট প্রেজুডিস বা পক্ষপাতিত্ব। নানা কারণে অধিকাংশ লোকই প্রেজুডিস বা বদ্ধমূল ধারণাবশত পক্ষপাতিত্ব রোগে আক্রান্ত। এই পক্ষপাতিত্বই যাবতীয় সামাজিক ও ব্যক্তিগত টেনশনের মূলে। কারও হয়তো প্রাদেশিকতার প্রেজুডিস, কারও হয়তো সাম্প্রদায়িকতার প্রেজুডিস, কারও আঞ্চলিকতার প্রেজুডিস। এ সম্পর্কে এই বইতে বলেছি।

প্রেজুডিস হল কতগুলি বদ্ধমূল ধারণা। এই ধারনার বশবর্তী হয়ে তাঁরা কতগুলি স্টিরিও টাইপ তৈরি করে নেন।

উদারতা এবং মুক্ত মন সুস্থ ব্যক্তিত্বের লক্ষণ। সুব্যক্তিত্বকে তাই নিরপেক্ষভাবে সব কিছু বিচার করতে হয়। কারণ স্টিরিওটাইপ জাত ধারণার উৎপত্তি ভাবাবেগ থেকে। জাতপাত, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির ধারণার পিছনে কোন যুক্তি নেই। তফাত যা হয় সেটুকু মানুষে মানুষে। জাতিতে জাতিতে গুণগত তফাত হতে পারে না। ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিচার করা তো আরও অবৈজ্ঞানিক। কারণ সভ্যতা বিস্তারের অনেক পরে সংগঠনবদ্ধ ধর্মের জন্ম। ধর্ম ব্যক্তি মানুষের মূল্যবোধ জাগাতে পারে কিন্তু আসলে ধর্ম কতগুলি বদ্ধমূল বিশ্বাস ও আচার আচরণ ছাড়া কিছুই নয়। একই ধর্মের সমস্ত মানুষের মানসিক গঠন ও ব্যক্তিত্ব কখনও এক হতে পারে না। প্রত্যেক ধর্ম ও ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ভালমন্দ দুধরনের লোকই আছে। কিন্তু ভেদবুদ্ধি ব্যক্তিত্বকে মলিন করে তোলে। মানুষের মনকে অপরধর্ম ও ভাষার প্রতি বিদ্বেষী করে তোলে। যে ব্যক্তিত্ব ক্রমাগত প্রেজুডিস তথা পক্ষপাতিত্বের শিকার তার পক্ষে সেই সমাজকে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। আমেরিকার শাদা মানুষেরা এক সময় কালোদের নিগার বলত। বাঙালিদের কেউ কেউ বিহারিদের 'খোট্টা', ওড়িয়াদের 'উড়ে' বলে হেয় করত। তারফলে প্রতিবেশী রাজ্যের বহু মানুষ এখন বাঙালিদের ঘৃণা করে। একটা সময় ওই রাজ্যের অধিবাসীরা হীনম্মন্যতায় ভুগত কিন্তু এই হীনম্মন্যতা কাটিয়ে ওঠার জন্য বিহার, ওড়িশা অসমে শিক্ষার হার বাড়ছে। এখন বাঙালিদের তুলনায় প্রতিবেশী রাজ্যের ছেলে মেয়েরাই বেশি আই. এ. এস পাচ্ছে। রাজনৈতিক অবস্থা প্রতিবন্ধক না হলে শিল্পায়নও ওই সব রাজ্যে আরও দ্রুত গতিতে হত।

আগে শহরের লোকদের গ্রামের লোক সম্পর্কে প্রেজুডিস ছিল। তাদের গেঁয়ো বলে উপহাস করা হত। আজ মফঃস্বলের ছেলে মেয়েরা শহরের ছেলেমেয়েদের চেয়ে ভাল

ফলাফল করছে। কিন্তু গ্রামের ছেলে মেয়েদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে যেমন একটা স্বাভাবিক সারল্য থাকে তেমনি আবার একটা হীনম্মন্যতা বোধ কাজ করে।

মেয়েদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই এক ধরনের হীনম্মন্যতা বোধ কাজ করে। এর কারণ সমাজ ছেলে ও মেয়েদের দুজনকে আলাদা আলাদা ভাবে দেখে। তাদের আলাদা মূল্যবোধ তৈরি করে দেয়। এটা প্রেজুডিস।

৯। প্রশ্ন ঃ আগামী বছর আমি সরকারি চাকরি থেকে রিটায়ারমেন্ট নেবো। আমার স্ত্রী চাকরি করেন না। আমি একটি বাড়ি তৈরি করেছি। আমার একমাত্র সন্তান সরকারি অফিসার। আমি ঠিক করেছি তার বিয়ে দিয়ে আমরা স্বামী-স্ত্রী বৃদ্ধাশ্রমে চলে যাবো। কিন্তু আমার স্ত্রীর এতে আপত্তি। আমি মনে করি অবসর গ্রহণের পর পুত্রবধূর সঙ্গে আমার স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের লড়াই দেখা দিতে পারে, যার ফলে আমরা দুজনেই মুশকিলে পড়ব। তার চেয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে বয়স ও যুগের দাবি মেনে নিয়ে আমাদের বৃদ্ধাশ্রমে বাস করা অনেক সম্মানের।

উত্তর ঃ পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ বলে আমাদের শাস্ত্রের বিধান ছিল। সংসারে চারটি আশ্রম জীবনের ক্রমিক পর্যায় অনুসারে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে করা হয়েছিল। এদিক থেকে অবসর গ্রহণের পর সংসার সম্পর্কে সমস্ত আসক্তি বর্জন করে আত্মস্থ থাকাই শান্তিপাবার একমাত্র উপায়। কিন্তু বহুক্ষেত্রে বাস্তবে তা সম্ভব হয় না। এর একটা কারণ আর্থিক। বৃদ্ধ বয়সে অধিকাংশই ছেলেদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আপনার চাকরিতে যেমন পেনসন আছে তেমনি অধিকাংশ চাকরিতে পেনসন নেই। তাই বহু লোককে আজীবন উপার্জন করে যেতে হয়। কিন্তু উপার্জন করলেও দুই প্রজন্মের মধ্যে মানসিক ব্যবধান থেকেই যায়। তাই ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে গেলে সেকেলে বৃদ্ধ বাবার প্রতি তাদের তেমন টান থাকে না। অথচ লোকাচার বশে অথবা গৃহসমস্যার জন্য প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে চট করে আলাদা বাসা করতে পারে না।

কিন্তু বয়স তার দাবি ঠিক পূরণ করে নেয়। বয়স অনুসারে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা। শিশু বালক যুবক প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের ব্যক্তিত্ব আলাদা আলাদা হয়ে যায়। এই পরিবর্তন এত ধীরে ধীরে হয় সে অত্যন্ত সচেতন না হলে মানুষ নিজে তার এই পরিবর্তন ধরতে পারে না।

বৃদ্ধরা প্রতি সমাজেই নিঃসঙ্গ। ধনী বা দরিদ্র যে কোন পরিবারেই বৃদ্ধরা কম-বেশি পরিবারের স্নেহ থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে বার্ধক্যের ফলে পঙ্গু ও অসমর্থ ব্যক্তিদের অবস্থা ভয়াবহ।

কয়েকবছর আগে কলকাতার একটি সেবা প্রতিষ্ঠান আনন্দলোকের পক্ষ থেকে কিছু গ্রামীণ দরিদ্র বৃদ্ধ বৃদ্ধার সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁরা বলেছেন। তাঁদের

ছেলেমেয়ে ছেলের বউ ও জামাই তাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেছে বলে তাঁরা সেবা প্রতিষ্ঠানের কাছে সাহায্যপ্রার্থী।

আমাদের গ্রামে এক শিক্ষিতা ও প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী বৃদ্ধা মহিলা আমার কাছে প্রায়ই আসেন। তাঁর স্বামী বিড়লাদের একটি বিখ্যাত কোম্পানির ম্যানেজার ছিলেন। ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর তিনি নিজের বসতবাটি বিক্রি করে কলকাতায় ছেলের কাছে থাকবেন বলে চলে আসেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তার ছেলে ও ছেলের বউ তাঁকে তাড়িয়ে দেয়। কপর্দকশূন্য অবস্থায় ওই মহিলা আশ্রয় ও অন্নের জন্য এর কাছে ওর কাছে হাত পাতছেন। আর একজন অতীতের এক বিখ্যাত অভিনেত্রীকে দেখেছি আনন্দলোক থেকে নিয়মিত রেশন নিয়ে যান। অথচ তাঁর ছেলে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মাকে সেবা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে দিন গুজরান করতে হয়। এই অসহায়ত্ব ও নিঃসঙ্গতা থেকে যে ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় তার মধ্যে যথেষ্ট হীনম্মন্যতা থাকে। একদিন যিনি সংসার নিয়ে গর্ব করতেন ও নিজেও সকলের কাছে গর্বের বস্তু ছিলেন তিনি শেষ বয়সে পথেব ভিখারিতে পরিণত হলেন। এতে ব্যাক্তিত্বের আত্মসম্মানবোধ বা Self esteem এ চিড় ধরে। এই মানসিক অশান্তির দরুন অনেক বৃদ্ধ দৈহিক সুস্থতা সত্ত্বেও অসুস্থ হয়ে পড়েন।

যাঁরা বৃদ্ধ বয়সে সংসারে থাকেন তাঁরাও যে খুব শান্তিতে থাকতে পারেন তা বলা যায় না। এ সম্পর্কে সরস্বতী মিশ্রের সমীক্ষাটি উল্লেখ্য। সরস্বতী দেবী সমাজতত্ত্বের একজন অধ্যাপিকা। চন্ডীগড়ে বৃদ্ধদের ওপর তিনি গবেষণা করেন। ওই সমীক্ষায় দেখা যায় বৃদ্ধদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যদের ঝগড়াঝাটি হবার প্রধান কারণ টাকা পয়সা (৫৩ শতাংশ)। অন্যান্য কারণ যেমন মতপার্থক্য, বিশৃঙ্খলা, প্রভৃতি ব্যাপারে মতভেদের কারণ অতবেশী নয়। দেখা গেছে এমন কোন পরিবার নেই যেখানে বৃদ্ধদের সঙ্গে পরিবারের শিশুদের সম্পর্ক খুব ভাল। কেবল দশ শতাংশ পরিবারে সম্পর্ক মোটামুটি ভাল। ২৫ শতাংশ পরিবারে সম্পর্ক খুবই খারাপ। বৃদ্ধ বয়সে বন্ধুবান্ধবও কমে যায়। সরস্বতী দেবী দেখিয়েছেন তিনি যাঁদের ওপর সমীক্ষা চালিয়েছেন তাঁদের মধ্যে ৩৬ শতাংশ মাত্র বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। প্রতিবেশীরাও বৃদ্ধদের সঙ্গে কথা বলে না। মাত্র ১৮ শতাংশ বৃদ্ধ প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পান। (Social adjustment in old ages - Saraswati Mishra. B.R. Publishers corporation, Page (76-116)

এই নিঃসঙ্গতা থেকে বাঁচবার জন্য বৃদ্ধাশ্রমে অন্তত সমবয়স্ক ব্যক্তিদের সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলার সুযোগ মেলে। আপনি যেহেতু টাকা দিয়ে থাকেন সেহেতু ওখানে হল কথা বলার আপনার অধিকারবোধ আছে।

বৃদ্ধাশ্রমে নতুন করে জীবন শুরু করুন। বৃদ্ধ বয়সে টাকাই আপনার পুত্রকন্যা। টাকাই বন্ধু। আলাদা থাকুন দেখবেন ছেলের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক ভাল থাকছে। মনে রাখবেন

অবসর জীবনের একটা আলাদা স্বাদ আছে। এই বয়সে মন ও বুদ্ধি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। জীবনের সব দায় দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় বলে আপনি হাল্কা বোধ করেন। এই বয়সে অধ্যাত্ম চিন্তা, গৃহে আত্মীয় বন্ধু সমাগম, টিভি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখা, বই পড়া, দুবেলা ভ্রমণ ভাল থাকার উপায়।

অবসর গ্রহণের আগে স্বাস্থ্য বিমা করে রাখুন। অবসরের পর বিমা করতে অসুবিধা হতে পারে।

বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল গৃহচিকিৎসকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

কোন মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়বেন না। নতুন করে কিছু পেতে চাইবেন না। কারণ প্রত্যাশা পূরণ না হলে আত্মপ্রত্যাখ্যানের স্পৃহা জাগবে। যাঁরা সৃজনশীল তাঁরা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সৃজনশীলতা চালিয়ে যান।

প্রিয়জন ও যুব সমাজের কাজ থেকে এই বয়সে যদি উপেক্ষা পান ভেঙে পড়বেন না। যদি কারও কাছ থেকে সহানুভূতি পান, সাহায্য পান তাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করবেন।

মেজাজ খারাপ করবেন না। বার্ধক্য আপনার ব্যক্তিত্বকে যেন অসহনীয় ও অশান্ত করে না তোলে। নির্জনে ও একা থাকার অভ্যাসও করুন।

আপনি যদি অনুভব করেন আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিছু ঘাটতি দেখা দিচ্ছে যেমন লাজুকতা, সামাজিক মেলামেশায় অক্ষমতা, নিজেকে জাহির করার ক্ষেত্রে অপারগতা। আলস্য, সাংগঠনিক দক্ষতার অভাব, পাছে লোকে কিছু বলে মনোভাব, উচ্চারণে ত্রুটি, স্বরক্ষেপণে গলতি, মেধার অভাব, বিস্মৃতি, আত্মবিশ্বাসের অভাব, আদব-কায়দা সম্পর্কে অজ্ঞতা এমনি আরও হাজার খামতি, তাহলে তাঁদের প্রত্যেককে আমি খামতি পূরণের পরামর্শ দিতে পারি। ব্যক্তিত্বের ওপর আলাদা পাঠক্রম আছে। কর্মশালা বা নিয়মিত পাঠক্রমের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটানো যায়। ঘটানো হচ্ছেও। কিন্তু তার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প চাই। ভীষণ মনের জোর চাই। এই মনের জোর অর্জনের জন্য দস্যু রত্নাকরকে বাল্মীকীতে পরিণত হবার জন্য তপস্যা করতে হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে আমার একটি পরীক্ষার কথা বলি। ২০০০ সালের জুলাই মাসে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন সেসন শুরু হবার সময় আমি নবাগত ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ব্যক্তিত্ব গঠনের একটি আলাদা কোর্স করি। আমেরিকায় ব্যক্তিত্ব গঠনের ওপর অসংখ্য অডিও ক্যাসেট আছে। আমি এর মধ্যে মাইকেল বর্ডার এর Positive attitude, নেপোলিয়ান হিলের Key to success ও এমমেট মিলারের See yourself success এই তিনটে ক্যাসেট শোনাই। বিদেশী ক্যাসেটগুলির পরিকল্পতা খুবই সুচিন্তিত ও বিজ্ঞানসম্মত কিন্তু

মুশকিল হচ্ছে সেগুলি সবই পশ্চিমি শ্রোতাদের জন্য। অথচ আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ও আমাদের বিশেষ চাহিদা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্ন চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আজ থেকে ১৭ বছর আগে আমি আমাদের ছেলেমেয়েদের জন্য ব্যক্তিত্ব বিকাশের কথা ভাবি। তারপর পাঠক-পাঠিকাদের সঙ্গে চিঠিপত্রেব মধ্য দিয়ে ও এই ব্যক্তিত্বের প্রথম ক্লাশের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি তারই ভিত্তিতে গড়ে তুলেছি ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠক্রম। পাঠক্রমের মধ্যে থাকবে ·

১। আত্মানুসন্ধানের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া

২। স্মৃতি শক্তি বৃদ্ধির প্রক্রিয়া

৩। মানাসিক শক্তি অর্জন

৪। কথা বলাব আর্ট তথা প্রকাশ ভংগি, উচ্চারণ

৫। নীরোগ থাকার উপায়।

৬। প্রয়োজনীয় আদব কায়দা।

৭। যোগাযোগ বৃদ্ধি ও কমিউনিকেশন ও জনসংযোগ

এই ধরনের পাঠক্রম দুই বা তিনদিনের ওয়ার্কশপের মাধ্যমে দেওয়া যায়। বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

ওপরের বিষয়গুলির ওপর ভিত্তি করেই কেমন করে আত্মবিশ্বাস বাড়াবেন বইটি প্রকাশিত হবে।

পুত্রের শিক্ষকের কাছে ছাত্রের সুব্যক্তিত্ব গঠনের শিক্ষার আবেদন জানিয়ে আব্রাহাম লিঙ্কনের চিঠি।

আব্রাহাম লিঙ্কন তীব্র জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট ধারণা ছিল। ছিল গভীর জীবনবোধ। তিনি তাঁর ছেলেকে যখন স্কুলে ভর্তি করেন তখন হেডমাস্টার মশাইকে একটি চিঠি লেখেন, চিঠির বিষয়বস্তু কেমন করে ছাত্রদের মধ্যে ব্যক্তিত্ব গঠনের শিক্ষা দিতে হবে।

LINCOLN'S LETTER TO HIS SON'S HEADMASTER

Respected Teacher,

My son will have to learn I know,
That all men are not just.
All men are not true, but teach him also
That for every scoundrel,
Three is a hero.
That for every selfish politician,
There is a dedicated leader.
Teach him that for every enemy
There is a friend.
It will take him time I know:
But teach him if you can,
That a dollar earned
Is of far more value
Than five pound.
Teach him to learn to lose
And also enjoy earning.
Steer him away from envy, if you can ;
Teach him the secret of quiet laughter
Let him learn early that the bullies
Are the easiest to lick.
Teach him if you can, 'the wonder of books....
But also give him quiet time to ponder.
Over the eternal mystry of birds
In the sky, bees, in the sun,
And flowers of a green hill side.
In school teach him it is far more
Honourable to fall than to cheat
Teach him to have faith in his own ideas.
Even if everyone tells him they are wrong.
Teach him to be gentle with gentle people,
And tough with the tough.
Try to give my son the strength

Not to follow the crowd when
Everyone is getting in the band-wagon.
Teach him to listen to all men
But teach him also to fighter all he hears
On the screen of truth and take only
The good that comes through.
Teach him if you can, how to laugh when
He is sad : teach him there is no shame
In tears : teach him to scoff at cynics
And to beware of too much sweetness.
Teach him to sell his brawn and brain
To the highest bidders. but never to
Put a price tag on his heart and soul.
Teach him to close his ears to a
Howling mob ... and to stand and fight
If he thinks he is right.
Teach him gently : but do not cuddle
Him because only the test of fire
Makes fine steel.
Let him have courage to be impatient,
Let him have patience to be brave
Teach him to have sublime faith in himself
Because. then he will always
Have sublime faith in mankind.

This is a big order
But see what you can do.
He is such a fine little fellow my son.

—Abraham Lincoln

লিঙ্কনের চিঠির অনুবাদ

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মহাশয়,

আমি জানি আমার ছেলেকে এই
শিক্ষা পেতে হবে যে সব মানুষ
সমান ন্যায়পরায়ণ হবে না।
সব মানুষই সত্যের পূজারী নয়
কিন্তু এটাই তাকে শেখান, যে
প্রত্যেকটি স্কাউনড্রেলের পিছনে
একজন করে হিরো আছে। প্রত্যেক
স্বার্থপর রাজনীতিবিদের পিছনে একজন
আত্মত্যাগী নেতা থাকেন। তাকে
এটাই শিক্ষা দিন যে প্রত্যেকটি
শত্রুর পিছনে একজন করে মিত্র ও থাকে।
এগুলো শেখানো সময় সাপেক্ষ
আমি জানি; তবু তাকে শেখাতে হবে
নিজে আয় করা এক ডলারের দাম
পাঁচ ডলারের চেয়েও বেশি
ওকে শেখান, কেমন করে হার
মেনে নিতে হয়; আবার
কেমন করে জয়ের আনন্দ
উপভোগ করতে হয়।
তাকে শেখান নীরব হাসির গুপ্তরহস্য
সে এখনই শিখুক সবচেয়ে সোজা
হল হম্বিতম্বি করা....।
যদি পারেন শেখান, বই এর মধ্যে রয়েছে
কত রহস্য। কিন্তু তাকে একান্তে ভাববার মত
সময় দিন। সে ভাবুক পাখিদের
জীবনের চিরন্তন রহস্য অনন্ত
আকাশের নীলিমায়। রৌদ্রালোকিত
দিনে দেখুক মৌমাছিদের আর
দেখুক সবুজ পাহাড়ের ধারে
ফুটে থাকা ফুলের সমারোহ।

স্কুলে তাকে শেখান আরও অনেক কিছু
কাউকে প্রতারণা করার চেয়ে
মেনে নেওয়া অনেক গৌরবের। শেখান,
যদি সবাই তাকে বলে তার আদর্শভুল
তবু সে যেন তার আদর্শে বিশ্বাস রাখে।
তাকে ভদ্রলোকের সঙ্গে ভদ্র হতে শেখান।
কঠোর লোকদের সঙ্গে সে যেন কঠোর হয়।
চেষ্টা করুন, আমার ছেলেকে
এই শক্তি দিতে যখন
সবাই গড্ডলিকা প্রবাহে গা
ভাসাচ্ছে সে যেন তখন মিছিলে
যোগ না দেয়। তাকে বলুন, তখন
সে সবার কথা শুনুক। কিন্তু সে
যেন সব কিছু যাচাই করে নেয় সত্যের
ছাঁকনি দিয়ে এবং তার
মধ্যদিয়ে যে সত্যটুকু পড়ে তাকেই
যেন গ্রহণ করে।
তাকে শেখান কেমন করে দুঃখের
সময় হাসতে হয়। শেখান
কান্নার মধ্যেও কোন লজ্জা নেই।
তাঁকে শেখান নৈরাশ্যবাদীদের
ভর্ৎসনা করতে। শেখান তারা
যেন মুখ মিষ্টি লোক সম্পর্কে
সতর্ক হয়। শেখান সে যেন শুধু
সবচেয়ে বেশি দাম যে দেবে তাকেই
তার বুদ্ধি ও শক্তি বেচে। কিন্তু তার
হৃদয় ও আত্মা যেন কোন দামেই বিক্রি না করে।
উন্মত্ত জনতার চিৎকার শুনলে
সে যেন কানে আঙুল দেয় তবে
যদি সে যথার্থ মনে করে
তাহলে যেন রুখে দাড়িয়ে লড়াই করে।
তাকে ধীরে ধীরে শিক্ষা
দিন, কিন্তু তাকে আদর দেবেন না।
কেননা ইস্পাত কতখানি
মজবুত তার প্রমাণ মেলে না আগুনে

না পুড়লে।
তাকে অধৈর্য হবার মত সাহস দিন।
আবার সাহসী হবার মত ধৈর্য দিন।
তাকে মহিমান্বিত হতে শেখান, নিজের
ওপর বিশ্বাস রাখতে বলুন।
কারণ তাহলে সে মানুষের ওপর
মহোত্তম বিশ্বাস রাখতে পারবে।
এটি আপনার কাছে আমার
মস্ত বড় দাবি
দেখুন কি করতে পারেন
সে যে আমার সুন্দর ছোট্ট
ছেলে। আমার ছেলে।

নির্দেশিকা

১. How to be often more successful. A Readers Digest Selection. PP124

২. M. J Wagnon · Reading in Educational Phychology. Columbia university. PP 401.

৩. General Psychology. S. K. Mangal. PP 220-252. Sterling Puoiesgers Private Ltd. New Delhi.

৪. Human Behaviour. Sunie K. Pandey. PP 7.

৫. A. Tyler and Clive Hollin : Centemporary Psychology An introduction See, article individual Difference. PP 106

৬. Ibid. PP 110

Type behaviour and your Heart by Friedman. M. Roseman. R.F. PP 110.

৭. Soicology A New Approach D. K. Agencies. New Delhi

৮. R. B. Cattle. Description and reanrement of Personality. Georgy Harrp. 1946.

৯. Theoris of Personalities. David Lester. PP 16.

১০. Ibid.

১১. Personality Development. ELizabeth Herlock. PP 59. Tato Magrohie.

১২. Ibid. PP 47

১৩. Ibid. PP 59

১৪. Contemporary Psychology : An Introduction. PP 106.

১৫. Carage and Cenfidence. Norman Vincent peale. PP 35.

১৬. Introduction to Theories of Personalty Development. Elizabeth B. Herlock PP 9.

১৭. Personality Development. Elizabeth. B. Herlock PP 9.
১৮. দৃষ্টিভংগি, সাপ্তাহিক। ৪ জুলাই, ২০০০
১৯. Contemporary Psychology . Cliive Hollin. PP 118.
২০. Our Cenes ; Their patents. Dinesh Sharma. July 9, 2000. Hindustan Times.
২১. ব্যক্তিস্ফুরণে জিন ও পরিবেশ ৬ বিদিশা ঘোষদস্তিদার। যুব মানস। মে-জুন ২০০০
২২. Ibid.
২৩. The Development of Personality, Vol 17. C. G. Jung. Roufledge and Kegan Pool. PP 169.
২৪. Ibid. PP 172.
২৫. Sociology A New Approach by Michael Haralambos. PP 6.
২৬. Ibid. PP 6.
২৭. ফ্রয়েড : সুনীল কুমার সরকার। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ। পৃঃ ২৭।
২৮. Life Span Development Kelvin Browe and Clive R. Hael Contemporary Psychology edited by Clive Hollin. PP 85.
২৯. ইংরাজি প্রবাদ Commonsense is the most uncommon thing এই উক্তিটি স্মরণীয়।
৩০. Introduction to theories of Personality. Calvin S. Hael. Cardner Lindzey. P 112.
৩১. Development Social Psychology. Kelvin. Durkin. PP 122.
৩২. Practice and Theory of Individual Psychology. Psychology of 1930. Adlert, A. PP 398.
৩৩. Introduction to Theoris of Personalitis. Hael and Lindzey PP 149.
৩৪. Deviant Behaviour. Clifton D. Bryant. Hemis Phere Publishing Corporation.
৩৫. Deviance Conceptions and Perceptions : Form and Content, C. D. Bryant. PP 29
৩৬. Deviant Behaviour. Cliffon. D. Bryant. PP 293.
৩৭. Developmental Social Psychology. Kevin and Durkin. PP 565
৩৮. General Psychology. S. K. Mangal. PP 199.
৩৯. Personality Development Elizabeth Herlock. PP 329.
৪০. Ibid. PP 335.

৪১. Talented Teen Ager. the roots of Success and goieure. Cambridge University Press, Chapt I.

৪২. General Psychology. S. K. Mangal. PP 71.

৪৩. Personality Development. E. Herlock. PP 204

৪৪. Developmental Social Psychology. PP 485.

৪৫. Personality Development. Elizabeeth Herlock PP 473.

৪৬. A text book of Abnormal Psychology. Girishbala Mahanty. Kalyani Publishers. Ludhiana.

৪৭. Personality Development. PP 427.

নির্ঘণ্ট

অমিতাভ চৌধুরী (শ্রী নিরপেক্ষ) ১০

অনুকুল চন্দ্র শ্রী শ্রী— ৮৩

অমিয় মুখার্জি (লণ্ডন) ১৮৩

অবাঙজ্ঞাপন ১৫৩

আইসনেক ৪১

আইনস্টাইন ১৩৯

অ্যাভোরনো এট অল ১১২

অ্যাডলার ১১৫-১২৫

আলেকজাণ্ডার গ্রেট ১৬১

এলিজাবেথ হারলক ৭১, ১৮১, ১৮৮

এম পেভোক্লিস ৪০

এনডোমোরফিক ৩৯

এক্টোমোরফিক ৩৯

এরিকসন ১০৪

ওয়াটসন ১৩২

উপাঙ্গস্তর ১১০

উডওয়ার্ড ২৬

উইনস্টন চার্চিল ১৮১

উত্তমকুমার ৭০

উন্নয়ন মূলক মনস্তত্ব ৯৫

ওয়াটসন ১৩২

ঔরংজীব ৯

কমপ্লেক্স ১০৮

কার্ল ইয়্যুং ২৭, ৭৬, ৭৭, ১১৩, ১২৬

ক্লাইভ হনিন ৯৫

ক্লিনটন ৩৫

ক্যাথারসিস ২০৬

কে, আর নারায়নন ১০২

কেভিন ব্রাউন ৯৫

গোল্ডরাস ২৮

গ্রুপ সেক্স ১২৭

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (স্যর)১৬২

গৌরকিশোর ঘোষ ২৬

চ্যার্লিচ্যাপলিন ১৩৯

জহরলাল নেহরু ২১, ৩৫

জীবনানন্দ ৫৯

জানেৎ কিয়ার ৭২

জৈল সিং ১৩

ডিপ্রেসিভ নিউরোসিস ২১৯

ডি এন লমবার্ড ২০৩

ডেভিড লেস্টার ২৮, ২৯, ১০৫, ১০৮

তসলিমা নাসরিন ১২৭

তরুণ কুমার ৭০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮, ৫৯

থিয়োপাসটাস ২৪
দান্তে ৬৪
দীপ্তেন সন্যাল ১৫২
দেবীরায় ১৪০
ডব্লু এফ, মারফিন ৫৬
নারায়ন সান্যাল ১৩
নিউরোপেপটিডেস ১১
নিউরোস্থেনিয়া ২১৯
নিউরোসিস ১০৮
নিরঞ্জন মজুমদার ৪২
পামজা নাইডু ৩৭
পলায়নী প্রবৃত্তি ১৭৪
প্যাট্রিক টাইলার ১০
প্রবৃত্তি ৯৪, ১১৩
পায়ুস্তর ১১০
প্রিন্স দ্বারকানাথ ১৩
১০৩, ১০৫-১০৬
ফ্রয়েড ৩০, ৯৭-১০১
ফিদা হুসেন ১৪০
ফোবিয়া ২১৬
বনফুল ১৩
ব্যক্তিগত প্রভেদ তত্ত্ব ১৫
বার্নাডশ জর্জ ১৩৯
বাংলাদেশ ১৬৪
বিবেকপ্রবণ ব্যক্তিত্ব ৩৫
বিদ্যাসাগর ৯৯
বিনোবাভাবে ১৪৭
বৈশালী ৫১
মসলো ১১১
মসলোর ত্রিভুজ ১০২
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭
মা তেরেসা ৯০
মাধুরী দীক্ষিত ১২৭
মাইকেল হ্যারামস ২৫
মারফি ডব্লু তক ৫৬
মূল্যবোধ ১১৪
মেসোমরফিক ৪১
মেধাপাটেকর ১৪০
রবীন্দ্রনাথ ১২. ৩৫
রাজীবগান্ধী ৭৮, ৩৫
রানীরাসমনি ১৩
রাজ শেখর বসু ১২
ব্রাউন এম. এ. ২১৪
শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৮, ১২৭
শরৎ বসু ১০
শিলচর ৮৩, ৯২, ২১০
শ্রীকোনা ৮৬
শেক্সপিয়র ৫২
শিবরাম চক্রবর্ত্তী ৪৮
শিবরাসন ৭২
শাজাহান ৯
সমরেশ বসু ২৬
সন্তোষ কুমার ঘোষ ২০০
সাধন দত্ত ১৩
সুজা ৯

সুভাষচন্দ্র বসু ৯, ৩৫
সেলডন ৪১
সিস্টেম প্রিন্সিপল ৩০
সোমাটোটাইপ ৩৯
সোমাটোটোনিয়া ৪০
সেরিব্রোটোনিয়া ৪০
সেণ্ট অগস্টাইন ৫৮
সংস্কৃতি ৯৪
সাইকিক মূল্যবোধ ১২৬
সিজোফ্রেনিয়া ২২০
স্নায়ুচলন প্রক্রিয়া ১৭১
স্ত্রী-বিনিময় ১৩৯
সাইকোনিউরোসিস ২১৪
হিস্টিরিক্যাল নিউরোসিস ২১৭
হেটেরোসেকসুয়লিটি ১৩৯
(মিশ্রকামিতা)
হাওয়াইদ্বীপ ৭৯
হিপোক্র্যাটিস ৩৮